পূর্ণিমা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

ষোড়শ বর্ষ।

বাঁশবেড়িয়া,

পূর্ণিমা যন্ত্রে শ্রীশ্রীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গাব্দ ১৩১৫।

২৯৩
১৩
৪৯৮
৪৯৯)

সূচীপত্র।

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
আমাদের কথা	১৩৯
আমাদের আপনাদের কথা	৪২৩
আসিছে জননী (পদ্য)	২৪৩
আগমনী (পদ্য)	২৪৫
আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস	২০৩ । ৩৯৩ । ৪৩৯
উদ্ভট কবিতা	৫৩১
এলি কি গো—জগদম্বে ! জগতে আবার ? (পদ্য)	৩৪১
কবিকঙ্কণের কাব্য চণ্ডীমঙ্গল	৩৯৬ । ৪৩০ । ৪৭৯
কবি নবীনচন্দ্র	৪৫০
কাল্‌কা-সিমলা রেল দর্শনে (পদ্য)	৫৩০
গণেশ মামা	১৯০
ত্রিগুণ ও ত্রিদোষ	৫১ । ১০৯
দরিদ্রের দান (পদ্য)	৪৭৮
দার্জিলিং	১৩১
দেশ ভ্রমণ	২৬ । ৬০ । ৯৯ । ১৫৬
দ্বারকার পথে	২২ । ৮২ । ১২৪ । ১৭৪ । ২১৩ । ২৫৬ । ৩০১ । ৩৬০ । ৪১৩ । ৫২০
ধ্রুবতারা (সমালোচনা)	২৮৪
নদীয়া কাহিনী	১ । ৭০ । ১১৫ । ১৬৭ । ২২৫ । ২৭৪ । ৩৬৫
নৈবেদ্য (পদ্য)	৮৭
পল্লীকথা	১৮
পরিত্যক্তা (পদ্য)	২৩৫
পূজার চাট্‌নী	২৬৩
পূর্ণিমার ঊষা (পদ্য)	২৯৩
প্রত্যাখ্যাতা (পদ্য)	১৩
ফুল (পদ্য)	৩৯৮
ফুলের উত্তর (পদ্য)	৪৯৯
বউ কথা কও (পদ্য)	৩৮১
বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অস্তিত্ব	২৮০ । ৩০৭
বৎসরের কথা	৪০
বর্ষ শেষে	৫৩৮
ভারতী চরণে (পদ্য)	১৮৮
ভারতে সাধারণের শিক্ষা	৪৭১
মহর্ষি কণ্ব	২৪৮ । ২৯৪
মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি	৫০৩
মেখলা (গল্প)	৩৫২ । ৪০৬
মোতি-কুমারী (গল্প)	১৮০ । ২২০ । ২৬৭ । ৩১৮
মৃত্যুর পর	৮৫ । ১৬১ । ২৪০ । ২৬৪ । ৫০০
যা' নাই ভারতে, তা' নাই জগতে	৩৫
শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পণ	৪২৯
সন্ধ্যা (পদ্য)	৫১৯
সবৌরে কৃষি কলেজ পত্তন	২৩৭
সমালোচনা	১৯৬ । ৩৩৬ । ৩৭৩ । ৪৬৩ । ৫০৯
সহানুভূতি	৩৮৩
স্বদেশীর গান	৪৯
সিংভূমে তসরের চাষ	৩২৮ । ৩৪৩
সুভদ্রা (পদ্য)	৭৯
সৈয়দ চাঁদা	১৫১
হিমালয় বনভূমি	৮৮
হেমন্তে বঙ্গলক্ষ্মী (পদ্য)	৩৩৪
হৈমবতী (গল্প)	৪৫৪ । ৪৯০ । ৫১১

পূর্ণিমা

ষোড়শ বৎসরের লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার।
" বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।
" সুরেশচন্দ্র সেন।
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।
" চন্দ্রশেখর কর।
" লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।
" গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।
" চুণীলাল সেন।
" ব্রজবল্লভ রায়।
" মুনীন্দ্রদেব রায়।
" অজরচন্দ্র সরকার।
" অচ্যুতচন্দ্র সরকার।
" যোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
" কুমুদনাথ মল্লিক।
" ইন্দ্রনারায়ণ দেবশর্ম্মা।
" চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্য।
" ভবভূতি ভট্টাচার্য্য।
" রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
" শ্যামলাল মজুমদার।

ত্রিগুণ ও ত্রিদোষ।

বহুকাল পরে আবার আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্তি হইবার সময় আসিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদের আবির্ভাব কালের, আর বর্ত্তমান সময়ের, মধ্যবর্ত্তী কাল—অতি দীর্ঘ। এই মহৎ কালচক্রের আবর্ত্তনে, আয়ুর্ব্বেদের উপর দিয়া কত যুগ যুগান্তর চলিয়া গিয়াছে। এক সময়ে—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা—জগতের শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিল। যখন জগতের অন্যান্য দেশ অজ্ঞান-রূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, সেই প্রাচীনতম কালেও ভারতে আয়ুর্ব্বেদের চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। রোগের কঠোর যন্ত্রণায়, লোকক্ষয়কর মহা-মারীর প্রভাবে, যখন জগতের অন্যান্য দেশের অধিবাসীগণ নিরুপায় ভাবে—শমনের অতিথি হইত, সেই স্মরণাতীত কালেও—আয়ুর্ব্বেদ—সুমধুর উপ-দেশ দিয়া—ভারতবাসীর স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রাখিয়াছিল। য়ুরোপীয় পণ্ডিত-মণ্ডলী যে ঋগ্বেদকে জগতের প্রথম গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই ঋগ্বেদের সময়েও—আয়ুর্ব্বেদের সম্মান ছিল। ঋগ্বেদে—আমরা "হৃদ্রোগ" "হরিমাণ রোগ" এবং "শ্বেতি রোগের" পরিচয় পাই। কোনও সময়ে—যুদ্ধস্থলে খেলের স্ত্রী বিশ্পলার একটী পা ভাঙ্গিয়া যায়, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এক রাত্রির মধ্যেই—বিশ্পলাকে "লৌহময়ী জঙ্ঘা" পরাইয়া দিয়াছিলেন। কাক্ষীবানের কন্যা কুষ্ঠরোগিনী ছিলেন, এই জন্য পরিণত বয়সেও তাঁহার বিবাহ হয় নাই। পরে অশ্বিনীকুমারের কৃপায় রোগমুক্ত হওয়ায়—বৃদ্ধ বয়সে তিনি পতিলাভ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের এই সব উপাখ্যানগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই বুঝা যায়—ঋগ্বেদের সময়ও ভারতে "কায়চিকিৎসা" এবং "অস্ত্রচিকিৎসা" অনেক উন্নত ছিল।

আয়ুর্ব্বেদের অনুবলে—ব্রহ্মার ছিন্নমস্তক সংযোজিত হয়, ইন্দ্রের ভুজস্তম্ভ রোগ আরোগ্য হয়, সূর্য্য দন্তরোগ হইতে পরিত্রাণ পান, চন্দ্র যক্ষ্মারোগ হইতে মুক্ত হন, জরাগ্রস্ত চ্যবনমুনি নবযৌবন লাভ করেন। অশ্বিনী-কুমারদ্বয় এই সকল দেবগণকে চিকিৎসা করিয়া, যজ্ঞাংশভোজী হইয়া-

ছিলেন। আয়ুর্ব্বেদের অপ্রতিম প্রভাব দেখিয়া—দেবগণও ইহা শিক্ষা করিয়াছিলেন। আধুনিক শিক্ষিত যুবকেরা—এই সকল কথা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভাবিয়া বিশ্বাস না করিতে পারেন, কিন্তু ইহাতে আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব প্রমাণের ব্যাঘাত হয় না।

অশ্বিনীকুমার ও দেবগণ কর্ত্তৃক আয়ুর্ব্বেদ প্রচারের সময়কে, আমরা আয়ুর্ব্বেদের প্রথম যুগ বলিতে পারি। ইহার পর আয়ুর্ব্বেদের দ্বিতীয় যুগ। তখন, মুনিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজের নিকটে, অগ্নিবেশ প্রভৃতি লোকহিতৈষী ঋষিগণ আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ লইতেছিলেন। স্বয়ং ধন্বন্তরি বিবিধ অস্ত্রচিকিৎসার কৌশল উদ্ভাবনে ব্যাপৃত ছিলেন। তা'র পর আয়ুর্ব্বেদের তৃতীয় যুগ। এই সময়ে, চরক সুশ্রুত প্রভৃতি মনস্বীগণের প্রাদুর্ভাবে—আয়ুর্ব্বেদের 'কায় চিকিৎসা' 'শল্য চিকিৎসা' কত উন্নত! নাড়ীজ্ঞান ও অরিষ্ট লক্ষণের অনুশীলনে, লোকে ছয় মাস পূর্ব্বে নিজের মৃত্যু জানিতে পারায়, এক রকম স্বেচ্ছামৃত্যু লাভ করিয়া, মুক্তির পথে অগ্রসর হইতেছিল।

চক্রপাণি, জেজ্জড় ও গয়দাস প্রভৃতির আবির্ভাব কাল—আয়ুর্ব্বেদের আর এক যুগ। তখনও আয়ুর্ব্বেদের রসায়ন বিদ্যা প্রভাবে লোক দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারিত। তখনও রসায়ন তত্ত্ববিদ্ ভিষক সম্প্রদায়, কৌশলে—ধাতু উপধাতু বিষ উপবিষ, রত্ন উপরত্ন বাছিয়া লইয়া ঔষধস্কন্ধের পুষ্টিসাধন করিতেছিলেন।

ইহার পর আয়ুর্ব্বেদের আর এক যুগ। বলিতে দুঃখ হয়—ইহাই আয়ুর্ব্বেদের অবনতির যুগ। সে বড় বেশী দিনের কথা নয়—যে দিন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান—কল্পনাতীত আড়ম্বরের সহিত ভারত-বক্ষে পদার্পণ করিল, সেই দিন হইতেই ভারতবাসী আয়ুর্ব্বেদের মহিমা ভুলিয়া গেল! সেই দিন হইতেই নূতন প্রিয় মানবের কাছে পুরাতন অনাদৃত হইল।

ইংরাজের অভ্রভেদী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঔষধালয়—নীল, পীত, লোহিত বিবিধ বর্ণের জলপূর্ণ—সুবৃহৎ কাচপাত্র সম্মুখে রাখিয়া—আয়ুর্ব্বেদকে আপনার বীরদর্প দেখাইতে লাগিল! শিশি, গ্লাসকেশ, লেবেলাদির স্পর্দ্ধা দেখিয়া, কুটিরবাসী আয়ুর্ব্বেদের—সেই মৃত্তিকাপাত্রস্থ বন্য গুল্মের ক্বাথ—অধিকক্ষণ আর তিষ্ঠিতে পারিল না। যে আয়ুর্ব্বেদ এতদিন

সৃষ্টিকর্ত্তার মুখনিঃসৃত বলিয়া সম্মানের সামগ্রী ছিল, ভাগ্যবিপর্য্যয়ে কাল-বিপর্য্যয়ে এবং শিক্ষাবিপর্য্যয়ে সেই আয়ুর্ব্বেদ—নিত্য পরিবর্ত্তনশীল বিলাস-ব্যসনানুরক্ত মনুষ্য প্রচারিত "এলোপ্যাথীর" আবর্ত্তে পড়িয়া ডুবিয়া গেল! হতভাগ্য ভারতবাসী আর ভাবিবারও অবসর পাইল না—বাহ্য সৌন্দর্য্যের মধ্যে আত্ম অস্তিত্ব বিসর্জ্জন দিল।

এখন আবার আয়ুর্ব্বেদের যুগান্তর উপস্থিত। অতীতের প্রতি অনুরাগ স্বাভাবিক বলিয়াই হউক, কিম্বা যে কোনও কারণেই হউক, বিদেশী চিকিৎসার একান্ত অনুরাগী হইয়াও বহুদিন পরে ভারতবাসী আবার—প্রাচীন মতের অনুবর্ত্তনে উন্মুখ হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ আবার—অল্পে অল্পে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের চাকচিক্য ভেদ করিয়া স্বীয় স্বর্ণগতম কিরণ বিকীর্ণ করিতে সমর্থ হইতেছে। এই আপাত প্রমোদপ্রিয়তার রাজত্বে, ভস্মধূসরিত বিকট জটাবেষ্টিত বৃদ্ধ ঋষির কথায় দুই একজন আবার কর্ণপাত করিতেছেন। কাবাব কাট্‌লেটের মমতা ছাড়িয়া, কেহ কেহ বা ঋষিহস্ত-প্রসারিত—পল্‌তার ডাল্‌নারূপ অস্বাদু প্রসাদের ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ডাক্তারের উন্নতিকল্পে—রাজার কত সহানুভূতি, কত মেডেল, কত ঔষধ; সে সব ছাড়িয়া—অস্থিচর্ম্মাবশেষ ভারতবাসী—আবার আয়ুর্ব্বেদের উপাসনা আরম্ভ করিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, বহুদিন পরে আবার আয়ুর্ব্বেদ আলোচনার সময় আসিয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য—স্বাস্থ্যরক্ষা করা। আর্য্য ঋষিগণ বলেন—বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা—এই তিনটী আমাদের শরীরে সমানভাবে থাকিলেই, আমরা সুস্থ থাকিতে পারি। আজ আমরা সেই বায়ু, পিত্ত ও কফের বিষয়েই কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ধর্ম্ম বলুন, অর্থ বলুন, কাম মোক্ষ যাহাই বলুন, শরীর ভাল না থাকিলে, কিছুই হয় না। স্বাস্থ্য সকলেই চায়; এ হেন স্বাস্থ্যরূপ অমূল্য রত্নকে—ভারতবাসী হারাইয়া ফেলিয়াছেন;—এ সময়ে বোধ হয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দুই চারিটা পুরাতন কথা পাড়িলে, বিশেষ অপরাধ হইবে না।

বায়ু, পিত্ত, কফই যে আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার মূল, এ প্রবন্ধে আমরা তাহাই দেখাইব। কিন্তু আলোচ্য বিষয়টী বড় গুরুতর, ইহাকে পরিস্ফুট

করিতে হইলে, আমাদের মত অজ্ঞানের অধিক বাগ্‌জাল বিস্তার করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে, অথচ এই প্রবন্ধে সেরূপ বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবার অবসর নাই, সুতরাং অনেক বিষয় বাধ্য হইয়া কেবল স্পর্শ করিয়া যাইব মাত্র। শাস্ত্রদর্শী সুধীগণ, সেই অপূর্ণতা দোষ মার্জ্জনা করিলে কৃতকৃতার্থ হইব।

আমাদের শরীরের সঙ্গে—বায়ু পিত্ত ও কফের অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ আবার—আমাদের শরীরের উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশের সঙ্গে জড়িত। যেমন বায়ু, সূর্য্য ও চন্দ্র, সঞ্চালন আকর্ষণ ও ক্ষরণ ক্রিয়ার দ্বারা এই জগৎরূপ বিরাট দেহ ধারণ করিয়া আছেন, বায়ু, পিত্ত ও কফ সেইরূপ—সঞ্চালন, আকর্ষণ ও ক্ষরণ ক্রিয়া দ্বারা—আমাদের দেহ রক্ষা করিতেছে। বাহ্য জগত ও দেহ জগত অভিন্ন। কিন্তু এ সকল কথা বুঝিতে হইলে সৃষ্টিরহস্যও বুঝিতে হয়। এই জন্য—সংক্ষেপে সৃষ্টিরহস্যের অবতারণা করিতেছি।

জগদীশ্বরের সৃষ্টি শক্তির নাম প্রকৃতি। জগতের যে কোনও পদার্থে যত গুণ ও যত শক্তি আমরা দেখিতে পাই, সে সব প্রকৃতিরই শক্তি। আমরা যে সব দ্রব্য আহার করি, যে শক্তিতে কার্য্য করি, সে সব প্রকৃতিরই রূপ। দার্শনিক পণ্ডিতেরা—প্রকৃতির সেই শক্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সেই তিন ভাগের নাম সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ। ইহাদিগকে প্রকৃতির গুণ বলে। প্রকৃতির যে গুণের দ্বারা সৃষ্টি, চেষ্টা ও কার্য্য হয়, তাহার নাম রজোগুণ। ইহা অত্যন্ত চঞ্চল। রজোগুণেই প্রকৃতি সৃষ্টিতে পরিণত হয়। ইহার কার্য্যকারিতা শক্তি—সর্ব্বত্রই আমরা দেখিতে পাই।

প্রকৃতির যে গুণ জগৎকে পালন করে, সেই স্থিতিশীল উৎকৃষ্ট গুণের নাম সত্ত্বগুণ; আর যে গুণে জগৎ তেজোহীন ও শক্তি হীন হইয়া যায়, তাহাই তমোগুণ। এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতেই পঞ্চমহাভূতের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই পঞ্চ মহাভূতের নাম—পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, ও আকাশ।

পঞ্চ মহাভূত হইতেই আবার মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, বৃক্ষ, লতা

প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। সকলেরই মূলে—সেই এক প্রকৃতির বিকাশ। আমাদের দেহ মন ও ইন্দ্রিয়— প্রকৃতিরই ব্যাপার। এক্ষণে দেখা যাউক —পঞ্চ ভূতের কোন্ কোন্ অংশ—আমাদের শরীরে কি কি ভাবে আছে।

পৃথিবী ... ... মূর্ত্তি।
জল ... ... ক্লেদ।
অগ্নি ... ... তাপ।
বায়ু ... ... প্রাণ।
আকাশ ... ... ছিদ্র সমূহ।

পৃথিবীর গুণ—গন্ধ, কঠিনতা ও গুরুতা; ঘ্রাণেন্দ্রিয়, মাংস, অস্থি, কেশ, লোম, চর্ম্ম, নখ ও বিষ্ঠা—এই গুলিকে আমাদের দেহের পার্থিব ভাগ বলা যায়।

রস, শীতলত্ব, স্নিগ্ধত্ব, গুরুত্ব, এবং দ্রবত্ব—এই সকল জলের গুণ। আমাদের রসনেন্দ্রিয়, শ্লেষ্মা, রস, রক্ত, বসা [চর্ব্বি], ঘর্ম্ম, মূত্র, ও শুক্র প্রভৃতি জলের বিকার। শ্লেষ্মায়—জলের এই সকল গুণ গুলিই দেখিতে পাওয়া যায়।

রূপ, উষ্ণতা, তীক্ষ্ণতা, দীপ্তি এবং পাক—এই কয়েকটী তেজের প্রসিদ্ধ গুণ; আমাদের শরীরস্থ পিত্ত নামক পদার্থে—এই গুণগুলি আছে। সুতরাং পিত্ত তৈজস পদার্থ।

স্পর্শ, লঘুতা, স্পন্দন এবং চেষ্টা—দার্শনিকেরা এই গুলিকে বায়ুর প্রধান গুণ বলেন। স্পর্শ শক্তি এবং উশ্বাস, নিশ্বাস, নিমেষ উন্মেষ, আকুঞ্চন প্রসারণ, গমন ও প্রেরণ—আমাদের শরীরের এই সকল ক্রিয়া শক্তি, বায়ুর গুণেই সম্পন্ন হয়।

ছিদ্র, শব্দ ও প্রকাশ—আকাশের এই তিনটী গুণ, আকাশের গুণেই আমাদের শরীর সম্বন্ধীয় শিরা, স্নায়ু, অস্থি ও পেশী সমূহ—পরস্পর পৃথক রূপে প্রকাশিত হয়। আকাশ হইতেই আমরা—শ্রবণেন্দ্রিয় এবং শারীরিক ছিদ্র সমস্ত পাইয়াছি।

বায়ুর গুণ দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, যে শক্তির দ্বারা আমাদের শারীরিক যন্ত্র সমূহের ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়—তাহাই আমাদের দৈহিক বায়ু।

এই বায়ু অত্যন্ত চঞ্চল—তমোগুণ ও চঞ্চল ধর্ম্মী—সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে বায়ুতে তমোগুণের ভাগ বেশী আছে। বৈদ্যগণ বায়ুর এই রূপ

বায়ুর স্বরূপ। স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন; যথা—"বায়ু সূক্ষ্ম, রুক্ষ, লঘু, শীঘ্রকারী এবং শীতল।" বায়ু সূক্ষ্ম বলিয়াই—কি করিয়া যে আমাদের শারীরিক ক্রিয়া বায়ুর সাহায্যে সম্পন্ন হয়, তাহা আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না। অতি তরল রস [আহার জাতব] ও যে ক্রমে ক্রমে কঠিন অস্থিতে পরিণত হয়, ইহা বায়ুর রুক্ষতা গুণে। লঘু বলিয়াই বায়ু চঞ্চল। ইহার শীঘ্রকারিতা গুণে—আমাদের ইন্দ্রিয় শক্তি প্রভৃতির পটুতা জন্মে। বায়ু শীতল বলিয়া—ইহাতে কম্পন শক্তি প্রচুর পরিমানে আছে।

এক মাত্র বায়ুই আমাদের শরীরে—কার্য্যভেদে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে যথা—প্রাণবায়ু, উদানবায়ু, সমানবায়ু, ব্যানবায়ু ও অপানবায়ু। শ্বাস প্রশ্বাস কালে যে বায়ু—দেহের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার নামই

প্রাণ বায়ুর স্থান ও কার্য্য। প্রাণ বায়ু। মস্তক, বক্ষঃস্থল, কণ্ঠ, জিহ্বা, মুখ ও নাসিকা, প্রাণবায়ু শরীরের এই সকল স্থান আশ্রয় করিয়া থাকে। তন্মধ্যে বক্ষঃস্থলই ইহার প্রধান স্থান। যে আহার আমাদের জীবন রক্ষার প্রধান কারণ, প্রাণবায়ুই তাহাকে উদরে লইয়া যায়। নিষ্ঠীবনত্যাগ, উদ্গারওঠা, হাঁচি, এ সব প্রাণবায়ুরই কার্য্য। প্রাণবায়ু বিকৃত হইলে—হিক্কা ও শ্বাস প্রভৃতি রোগ জন্মে। এই জন্যই হিক্কা ও শ্বাস রোগে—রোগীর বাঁচিবার আশা প্রায়ই থাকে না।

শ্বাস প্রশ্বাস কালে, যে বায়ু শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়, তাহার নাম উদান বায়ু। কণ্ঠ, বক্ষঃ, ও নাভি উদান বায়ুর এই তিনটী নির্দ্দিষ্ট

উদান ও সমান বায়ুর স্থান ও কার্য্য। স্থান। কণ্ঠই ইহার প্রধান আশ্রয়। ইহার সাহায্যেই আমরা কথা কহিতে পারি এবং গান গাহিতে পারি। উদান বায়ু কুপিত হইলে, প্রায় স্বরভঙ্গাদি রোগ জন্মিতে দেখা যায়। যে বায়ু আমাশয়ে ও অন্ত্রের মধ্যে বিচরণ করিয়া বেড়ায়, তাহাকে সমান বায়ু বলা যায়। এই বায়ু পাচকাগ্নিকে প্রজ্বলিত করে। ভক্ষ্যদ্রব্য জীর্ণ হইয়া গেলে, তাহা

হইতে যে রস ও মল উৎপন্ন হয়, সমান বায়ু তাহা পৃথক করিয়া দেয়। ইহা কুপিত হইলে অগ্নিমান্দ্য, অতিসার এবং গুল্মাদি রোগ জন্মে।

যে বায়ু আমাদের সর্ব্ব দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে, বৈদ্যগণ তাহাকে ব্যান বায়ু বলেন। এই বায়ুর গতি শক্তি অতি দ্রুত। ইহারই সাহায্যে আমাদের শব্দ ও স্পর্শাদি ইন্দ্রিয় কার্য্য এবং আকুঞ্চন প্রসারণাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। রক্তস্রাব, ঘর্ম্মস্রাব, গমনশক্তি, উন্মেষ নিমেষ—এ সকল কার্য্য ব্যান বায়ুর সাহায্যেই হয়। দেহীদিগের সকল কাজেই

ব্যান বায়ুর স্থান ও কার্য্য। প্রায় ইহার সম্বন্ধ আছে। সকল দেহে থাকে বলিয়া, ইহা কুপিত হইলে, সর্ব্বাঙ্গগত রোগ [যেমন জ্বর] জন্মিয়া থাকে। তলপেট, নাভি, উরু, মূত্রদ্বার ও মলদ্বার—এই গুলি অপান বায়ুর নির্দ্দিষ্ট স্থান। ইহার কার্য্য—মল, মূত্র, বায়ু, শুক্র

অপান বায়ুর স্থান ও কার্য্য। এবং আর্ত্তব প্রভৃতিকে অধঃ প্রেরণ করা। অপান বায়ু কুপিত হইলে, মেহ, শুক্রদোষ, এবং গুহ্য দেশ সংক্রান্ত বহুবিধ ব্যাধি উৎপাদন করিতে পারে। অপান বায়ুর সাহায্যেই রমণীগণ প্রসব করিতে পারে।

বায়ু প্রকৃতিস্থ ভাবে আমাদের শরীরে থাকিলে, শারীরিক ক্রিয়া এবং রস রক্তাদির অবস্থা সমান থাকে। পিত্ত, শ্লেষ্মা, ও রস রক্তাদি ধাতু সমূহ নিশ্চল, বায়ুই তাহাদিগকে যথা স্থানে প্রেরণ করে, বায়ু তাহাদিগকে কুপিত ও দূষিত করে। উহাদের নিজের কোনও শক্তি নাই, বায়ুর শক্তিই উহাদের অবলম্বন। এই জন্যই চরক ঋষি বায়ুকে, জীবের পরমায়ু বলিয়াছেন।

আমাদের দেহে ১৭৫টী বায়ু বাহিনী শিরা আছে। বায়ু এই সকল শিরায় সর্ব্বদাই বিচরণ করে। ইহাদের বর্ণ—অরুণ।

"বা" ধাতুর অর্থ গতি এবং গন্ধ প্রকাশ বুঝায় তাহার উত্তর "উণ্" প্রত্যয় (ব-উণ্-যে) করিয়া বায়ু শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

পিত্ত—পূতিগন্ধময় পীত বর্ণ তরল পদার্থ। আমরা পূর্ব্বে ইহাকে তৈজস পদার্থ বলিয়াছি। তেজের ভাগ বেশী আছে বলিয়াই—ইহা উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ। উষ্ণতাগুণেই—পিত্তে আমাদের শারীরিক তাপ রক্ষা করিতে

পারে। তাপ না থাকিলে—মানুষ বাঁচে না। এই তাপকেই ডাক্তারেরা "য়্যানিমেল্ হিট" বলেন। শ্লেষ্মার শৈত্য শক্তিতে আচ্ছন্ন হইলে, এই তাপ কমিয়া যায়, এ অবস্থায় মানুষ অধিকক্ষণ বাঁচিতে পারে না। এই তাপ—জ্বরে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। সুতরাং জ্বর মাত্রেই পিত্তাত্মক। এই জন্যই বোধ হয় পিত্তনাশক তিক্ত দ্রব্য সেবনে জ্বর নষ্ট হইয়া থাকে। ক্রোধ, সাহস প্রভৃতি বৃত্তিগুলিতে পিত্তের উত্তেজনা আছে। সুতরাং পিত্তও রজোগুণাত্মক।

পিত্তের স্বরূপ।

আয়ুর্ব্বেদবেত্তারা পিত্তকে অম্লরস বিশিষ্ট পদার্থ বলেন। অম্লরসের—পাচকতা ও জারকতা গুণ আছে। এই জন্যই পিত্ত আমাদের ভক্ষ্য দ্রব্যকে জীর্ণ করিতে পারে। কাহারও মতে—পিত্ত আস্বাদনে কটু। কটু রসের দাহশক্তি আছে, পিত্তেরও দাহশক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের বোধ হয়—পিত্ত বিকৃত হইলেই কটুরস হয়। পিত্তের বিকারে—যখন আমাদের অজীর্ণ ও অম্লাদি পীড়া জন্মে, তখন প্রায়ই গলা জ্বালা করিতে থাকে।

পিত্তের তীক্ষ্ণ গুণ আছে বলিয়াই—আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণার উদ্রেক হইয়া থাকে। ক্ষুধার সময় আহার না করিলে এবং পিপাসার সময় জল পান না করিলে, পিত্ত কুপিত হইয়া আমাদের সমস্ত ধাতুকেই পরিপাক করিতে পারে। তাহাতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিবার সম্ভাবনা। পিত্ত যখন আগ্নেয় পদার্থ, তখন উপযুক্ত ইন্ধন না পাইলে, রস রক্তাদিকে যে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে তাহার আর সন্দেহ কি? কেহ কেহ পিত্তকেই আমাদের দৈহিক অগ্নি বলেন, কেননা দাহনশক্তি ও পরিপাক শক্তি উভয়েরই আছে। অগ্নি রুক্ষ ও ঊর্দ্ধগামী—পিত্ত—তরল ও অধোগামী, উভয়ের এই বিপরীত গুণ দেখিয়া—কেহ কেহ পিত্তকে অগ্নি বলিয়া স্বীকার করেন না। কিন্তু সুশ্রুত বলেন যখন পিত্ত ভিন্ন জীবশরীরে দ্বিতীয় অগ্নির সত্তা বুঝিতে পারা যায় না, তখন পিত্তকেই অগ্নি বলিতে ক্ষতি কি?" আমরাও এই মতের অনুমোদন করি। পিত্ত ও অগ্নি যদি পৃথক্ হইবে, তাহা হইলে আমাদের দেহে অগ্নিমান্দ্য ঘটিলে, পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য ভক্ষণ করিবামাত্র ঐ অগ্নির বৃদ্ধি হয় কেন? "দ্রব্যের সমানতাই তাহার বৃদ্ধির কারণ"

দার্শনিকেরাও ইহা স্বীকার করেন। পরিপাক শক্তি—পিত্তে প্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়াই—আহার অভাবে পিত্ত আমাদের শারীরিক সমস্ত উপাদানগুলিকে পরিপাক করিতে পারে। এই জন্যই চরক বলেন—"অরুচি হইলেও অন্নকালে আহার করিবে।" জ্বর-রোগীকে উপবাস দেওয়ান একান্ত কর্ত্তব্য হইলেও মধ্যাহ্নে [পিত্তের সময়ে] কিছু খাওয়ান চাই। নহিলে রোগীর মোহ ঘটিতে পারে। বাস্তবিক পিত্ত অতি ভয়ানক। পিত্তকে দমন করিবার জন্য—রোগীর যদি পথ্যে রুচি না থাকে, তাহা হইলে অপথ্যও দিতে পারা যায়, পণ্ডিতগণ ইহা বলিয়াছেন।

পিত্ত পীতবর্ণ বলিয়া—ইহার বৃদ্ধি হইলে মনুষ্যের মলমূত্র নেত্র ও দেহের বর্ণ হরিদ্রা বর্ণ হইয়া যায়। কুপিত পিত্তের স্বধর্ম্ম হেতু—ভুক্ত দ্রব্য যখন বমন হয় সেই বমন প্রায়ই হরিৎ বর্ণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্য কেহ কেহ পিত্তকে নীল বর্ণও বলেন। বায়ুর মত পিত্তও আমাদের শরীরে পাঁচ ভাগে বিভক্ত। কার্য্য ভেদে—পিত্তের নামও পাঁচটী। যথা পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক। পাচক পিত্ত আমাশয় ও মলাশয়ের মধ্যস্থানে থাকিয়া, ভক্ষিত দ্রব্যকে পরিপাক করিয়া দেয়। অপর চারিটী পিত্ত—ইহার শক্তিতেই উত্তেজিত হয়। এই জন্যই পাচকপিত্ত সকল পিত্তের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। "রঞ্জক" পিত্ত—যকৃত ও প্লীহার মধ্যে অবস্থিতি করে। আহার জাত রস, যখন যকৃৎ ও প্লীহায় আসিয়া উপস্থিত হয়, রঞ্জক পিত্ত সেই রসকে রক্তবর্ণে রঞ্জিত করে। এইরূপ রস রূপান্তর প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে রক্ত বলা যায়। এই রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়। সুতরাং এস্থানে বলিতে পারা যায় যে, যে রক্ত আমাদের শরীরের একটী শ্রেষ্ঠ উপাদান, পিত্তই তাহার জন্মদাতা।

পাচক পিত্তের স্থান ও কার্য্য।

রঞ্জক পিত্তের স্থান ও কার্য্য।

সাধক পিত্তের স্থান ও কার্য্য।

"সাধক" নামক পিত্তের স্থান—হৃদয়ে। ইহার দ্বারা আমাদের বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি শক্তি উৎপন্ন হয়। আমাদের মনের সকল অভিলাষই—এই সাধক পিত্তের প্রভাবে সাধিত হইয়া থাকে।

"আলোচক" নামক পিত্ত—চক্ষুতে অবস্থিতি করে। ইহার শক্তিতেই আমরা দর্শনীয় বস্তু ও তাহাদের রূপাদি দেখিতে পাই। যে পিত্ত আমাদের সর্ব্ব শরীরস্থ চর্ম্মে অবস্থিত, তাহার নাম "ভ্রাজক"। শরীরের উত্তাপ রক্ষা—ইহার প্রধান কার্য্য। আমরা স্নানের সময়, যে সকল তৈলাদি মর্দ্দন করি, কিম্বা শরীরে যে সকল চন্দনাদি প্রলেপ দিই, এই ভ্রাজক পিত্তই তাহাদের রস আকর্ষণ করে।

আলোচক এবং ভ্রাজক পিত্তের স্থান ও কার্য্য।

আমাদের শরীরে পিত্ত বাহিনী শিরাও ১৭৫টী আছে। ইহাদের বর্ণ নীল এবং স্পর্শ করিলে উষ্ণ বোধ হয়। পিত্ত এই সকল শিরায় সর্ব্বদাই বিচরণ করে। পিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকিলে, পরিপাক শক্তি, দৃষ্টিশক্তি, স্মরণ শক্তি, লাবণ্য, যথাসময়ে ক্ষুধা তৃষ্ণার উদয়, এবং দেহের উত্তাপ অব্যাহত ভাবে থাকে।

"তপ" ধাতুর অর্থ "সন্তাপ"। ইহার উত্তর ইচ্ প্রত্যয় করিয়া পিত্ত শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

চুঁচুড়া। শ্রীব্রজবল্লভ রায়।

শিক্ষার সুবিধার জন্য ছাত্র কর্ত্তৃক

দেশভ্রমণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমার পূর্ব্বপত্রে চাঁইবাসা সহরের অনেক সংবাদ পাইয়াছ। গত মঙ্গলবারে আহারাদি করিয়া, আমি ও সামন্ত হাট দেখিতে গেলাম। প্রাতে উঠিয়াই দেখিতেছি, আমাদের বাঙ্গলার পার্শ্বের রাস্তা দিয়া কাতারে কাতারে লোক চলিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম, সেদিন হাটবার, তজ্জন্য মফস্বলের ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে হাটে বেচাকেনা করিবার জন্য লোক আসিতেছে। হাটতলায় গিয়া দেখি বহুতর লোকের সমাগম

হইয়াছে; বোধ হয় ৫।৭ হাজার লোক হইবে। ইহাদিগের অধিকাংশই কৌপীনধারী অসভ্য কোল ও ওরাং। স্ত্রীলোকেরা ১॥ হাত পৌনে ২ হাত বহরের কাপড় পরিয়া আছে বটে, তবে কোমরের উপরের অংশ প্রায় অনেকেরই বস্ত্রাবৃত নহে। হাটে এইরূপ কোলের আমদানী দেখিয়া বুঝিলাম, আমরা কোথায় আসিয়াছি। বাঙ্গালী ২।১০ জন এবং হিন্দুস্থানী ও মাড়োয়ারী প্রভৃতি ৫০।৬০ জনের অধিক লোক দেখিলাম না। হাটে ধান ও চালের বহুৎ আমদানী দেখিলাম। ছোট ছোট টুকরী করিয়া ১০।১৫ সের করিয়া ধান কিম্বা চাল মাথায় করিয়া বিক্রয় করিতে আনিয়াছে। অধিকাংশ চালই লাল লাল মোটা মোটা। ঘুরিতে ঘুরিতে একস্থানে বেশ পরিষ্কার সরু সরু চাল দেখিতে পাইলাম। সেই চালের দর জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু কাহাকে জিজ্ঞাসা করি? কোলেরা তাহাদের নিজের ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা জানে না। ইহাদের ভাষার শব্দগুলি, সাঁওতালদের মত Monosyllabic। কেমন চড়াইয়া নামাইয়া, টুং টাং করিয়া আস্তে আস্তে ছোট ছোট কথা-গুলি বলে! ইহাদের ভাষা শুনিতে বেশ মধুর লাগে, কিন্তু তাহার মাথা মুণ্ড কিছুই বুঝিতে পারি না। এই দেশের গোয়ালা ও কাহার প্রভৃতি অধিবাসীরা হিন্দি ভাষা বুঝে ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দি কথা বলিতে পারে। এখানে আসিয়া এই এক ভাষা বিভ্রাটে পড়িয়াছি। ডিরেক্টার আমাদিগকে কৃষিকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া, কৃষি সম্বন্ধে নানা সংবাদ সংগ্রহ করিয়া, সেই বিষয় আলোচনা করিবার জন্য এখানে পাঠাইয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই স্থানের অধিবাসীরা আমাদের ভাষা একেবারে বুঝে না বলিয়া, আমরা বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছি। চাষবাস সম্বন্ধে কোন সংবাদ ইহাদিগের নিকট হইতে পাইবার উপায় নাই। চালের দর জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া, নিজেদের দুঃখের কথা, অসুবিধার কথা লিখিয়া ফেলিলাম। নিকটে এক জন মুসলমান আড়ৎদার দাঁড়াইয়াছিল। তাহার সাহায্যে অবগত হইলাম, টাকায় ৫ পালি করিয়া চাল বিক্রয় করিবে। তাহাদিগের এক পালিতে কত চাল ধরে, হাতের মুঠায় মাপিয়া একটা আন্দাজ করিয়া বুঝিলাম, সেই চালের মণ প্রায় ৮৲ টাকা করিয়া পড়িবে।

কোলেরা এখনও ওজন করিয়া জিনিস বিক্রয় করিতে শিখে নাই। তাহারা ঘর হইতে নিজেদের মনোমত এক একটা কাঠের পালি তৈয়ার করিয়া আনে, আর সেই পালির হিসাবে চালের দর বলিয়া থাকে। অনেক সময় সরু চাল ও মোটা চাল, টাকায় একই পরিমাণ দেয়। লোকগুলা কিরূপ বোকা দেখ। শুনিলাম ২ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, এই হাট হইতে শত শত মণ চাল অন্যত্র রপ্তানী হইত। নানা দেশ হইতে চালের মহাজন আসিয়া এই হাট হইতে চাল খরিদ করিয়া বিদেশে চালান দেয়। কোলেরা ঝুড়ি করিয়া চাল হাটে আনিয়া দিয়াই খালাস। ব্যবসার তাহারা কি বুঝিবে।

হাটে তরিতরকারী কিরূপ আসিয়াছে, দেখিবার জন্য, অন্য অংশে গেলাম। তরকারীর মধ্যে কুদ্‌রী (আমাদের দেশের তেলাকুচার ন্যায় এক প্রকার বুনো ফল; তবে খাইতে তেলাকুচার মত তিত নহে), বুনো কাঁকরোল, এক প্রকার শাক ও কাঁচা লঙ্কা। আমি হুগলি ও সামন্ত বর্দ্ধমান জেলার লোক; তরকারীর রকম দেখিয়া একবারে অবাক হইলাম। হাটে ২।৩ খানি মসলা ও লবণের দোকান বসিয়াছে। সমস্তই লিবারপুলের লবণ। কোলেরা ধান দিয়া লবণ ও মসলা খরিদ করে। টাকা পয়সা তাহারা কখনও বড় একটা চিনে নাই; অনেক সময়েই ধান দিয়া বেচাকেনা করে। দেশীয় তাঁতিরা হাটে মোটা সূতার কাপড় বিক্রয় করিতেছে। কাপড়গুলি চওড়ায় ১॥ হাত হইতে পৌনে ২ হাত; কিন্তু লম্বে ১০।১১ হাত পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ছোট ছোট কাপড় ও নানা রকম গামছা দেখিলাম। ১০।১১ হাত একখানা কাপড়ের দাম ১৲ হইতে ১।৹ পর্য্যন্ত। তবে সেই কাপড় দেখিলে মনে হয় যে এই কাপড় এক পুরুষে ছিঁড়িবে না, উত্তরাধিকারীকে উইল করিয়া যাইতে হইবে। একখানি মাত্র বিলাতী বস্ত্রের দোকান বসিয়াছে। বিলাতী কাপড় ইহারা প্রায়ই ব্যবহার করে না। পাত্‌লা ফিন্‌ফিনে কাপড় পরিয়া অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় থাকাকে ইহারা এখনও সভ্যতার চরম বলিয়া মনে করে না। ফরাসডাঙ্গা ও ঢাকার মিহি ধুতি পরিলে, কিসে যে বাবুগিরির চূড়ান্ত হয়, তাহা আমিও ভাল বুঝি না। কাঁচি ধুতি দেশ হইতে একেবারে উঠিয়া গেল। এখন

কাপড় যত মিহি হয়, ততই তাহার আদর অধিক, তাহাতে লজ্জা নিবারণ হয় ভালই, না হয় সোভি আচ্ছা!

কোলেদের মধ্যে বিলাসিতা এখনও ঢুকে নাই। সকল দেশের স্ত্রীলোকেরাই অলঙ্কার প্রিয়। এখানকার স্ত্রীলোকের মধ্যে অলঙ্কারের চলন বড় দেখা যায় না। পায়ে এক প্রকার কাঁসার বাঁক মল ছাড়া, ইহারা অপর কোন অলঙ্কার ব্যবহার করে না। তবে যাহারা দুই পয়সা জমাইয়াছে, তাহাদের বাড়ীর মেয়েরা রূপার চুড়ি কখন কখন ব্যবহার করে। আর আমাদের নভেলগতপ্রাণা বাঙ্গালী মহিলাদিগের গহনার "বাণি" জোগাইতে, চাকরীগতপ্রাণ বঙ্গীয় যুবক ব্যতিব্যস্ত। অলঙ্কারের মূল্যের কথা না বলিয়া, কেবল "বাণি"র উল্লেখ করিলাম কেন? নূতন অলঙ্কারের ফরমাস না হইলেও পুরাতন অলঙ্কারগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন ফ্যাসানে প্রায়ই গড়াইয়া দিতে হয়, আজ গোট ভাঙ্গিয়া রেট হইল, কাল আর একখানা ভাঙ্গিয়া ব্রেসলেট হইল ইত্যাদি নানা প্রকারে "বাণি" যোগাইতে গৃহস্থের ছেলের প্রাণ ওষ্ঠাগত। হাটে অনেক কাঁসার বাঁকমল বিক্রয় হইতেছে, দেখিলাম। এই মলগুলি পায়ের চেটোর উপর একেবারে আঁটিয়া থাকে। মলওয়ালাই স্ত্রীলোকদিগের পায়ে মল পরাইয়া দিতেছে। সে এক ভয়ানক দৃশ্য। দেখিলাম স্ত্রীলোকটীর পায়ের গাঁটের ৪।৫ অঙ্গুলি উপরে চামড়ার দড়ি বাঁধা হইয়াছে। আর সেই দড়ির শেষাংশ মলের ভিতর দিয়া গলাইয়া দিয়া, দড়ি টানিয়া মল পায়ে উঠান হইতেছে। বালিকা মাতাকে বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া, তাঁহার বুকের ভিতর মাথা রাখিয়া দাঁড়াইয়া নীরবে রোদন করিতেছে। এইরূপ ভাবে মল পরাইতে, আধ ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা সময় লাগে। হাজার কষ্ট হউক, তবুও স্ত্রীলোকে গহনা পরিতে ছাড়ে না;—বাড়ীতে অনেক সময় দেখিয়াছি যে হাতে চুড়ি উঠিতেছে না, কত তেল জল দেওয়াতেও হাতের ছাল উঠিয়া যাইতেছে, হাত ব্যাঙ্গের মত ফুলিয়া উঠিল তবুও সেই চুড়ি ছাড়া হইবে না, কোন গতিকে মরিয়া বাঁচিয়া পরিতেই হইবে। কিন্তু এরূপ ভাবে কষ্ট স্বীকার করিয়া অলঙ্কার পরা আর কখনও দেখি নাই। আমরা স্তম্ভিত হইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা তাহাই দেখিতে লাগিলাম। তবে ইহারা হিষ্টিরিয়া-

গ্রস্ত ননির পুত্তলি বাঙ্গালী মহিলা নহে, ইহারা পার্ব্বতীয় কোলনারী। কোলনারীগণ পুরুষ অপেক্ষা অধিক বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী। ইহারা চাষ বাস হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহস্থালীর সকল কার্য্য করে, কোলেরা প্রায়ই "হাড়িয়া" নামে এক প্রকার ভাতের "পচাই" খাইয়া নেশা করিয়া পড়িয়া থাকে।

মহিষ, গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশু, হাটে বিক্রয় হয়। একটা প্রকাণ্ড মাঠ জুড়িয়া পশুগুলি দাঁড়াইয়া আছে। এখানকার গরুর অবস্থা, আমাদের বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা শোচনীয়। শুনা যায়, ছোট-নাগপুরের গরু ও মহিষ ভাল; কিন্তু সে ছোটনাগপুর অর্থে হাজারিবাগ বুঝিতে হইবে। হাজারিবাগ অঞ্চলের কয়েকটা বেশ বলবান বলদ দেখিলাম। ৩০০৲ টাকা জোড়া হাঁকিল। এরূপ বলদ আমাদের দেশে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। গরু বাছুরের এইরূপ হাট পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি চাঁইবাসার প্রধান ব্যবসায়, তসর-গুটির ও গালার। হাটের স্থানে স্থানে স্তূপাকার তসর-গুটি দেখিলাম। গুটির জন্য এই হাট দেশপ্রসিদ্ধ। ভাগলপুর, পাটনা, বীরভূম, হাজারিবাগ, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বিলাসপুর ও মারহাট্টা দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বহুবিধ তন্তুবায় ও মহাজন আসিয়া চাঁইবাসার এই হাট হইতে তসর-গুটি ক্রয় করিয়া থাকে। নানা দেশের লোক আসিয়া হাজার হাজার লোকের নিকট হইতে তসর-গুটি ক্রয় করিতেছে—হাটে সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। উপরোক্ত সকল স্থলে তসর বস্ত্র প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু স্ব স্ব স্থানের উৎপন্ন গুটির দ্বারা তাহাদিগের বস্ত্রবয়ন ব্যবসা চলে না। এই হাট হইতে আবশ্যক মত গুটি তাহারা খরিদ করিয়া লইয়া যায়। সিংভূম অনায়াসে এতদিন যাবৎ ঐ সকল দেশের তাঁতি ও মহাজনগণকে গুটি জোগাইয়া আসিতেছে। সিংভূমে প্রচুর পরিমাণে গুটি উৎপন্ন হয়, কিন্তু বস্ত্রবয়ন ব্যবসা এখানে খুবই কম। কোল, ওরাং প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা বহুকাল হইতে, পুরুষানুক্রমে গুটী উৎপন্ন করিয়া আসিতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজিও তাহারা গুটি হইতে সূতা তুলিতে পারে না। গুটি হইতে সূতা

বাহির করা শিক্ষা করিতে পারিলে, এতদিনে তাহারা ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের তসর-ব্যবসায়ী অপেক্ষা অধিকতর উন্নতি করিতে পারিত সন্দেহ নাই। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে গুটির আমদানী অধিক হয়, আজ কাল অপেক্ষাকৃত কম। শুনিলাম, গুটির দুর্গন্ধের দরুণ পথ চলা দায় হয়। যে সকল গুটি কাটিয়া কীট বাহির হইয়া গিয়াছে, সেই সকল গুটি, ৭।৮ টাকা দরে কাহন বিক্রীত হইতে দেখিলাম। আর বন হইতে বীজের জন্য, পোকা শুদ্ধ যে গুটি আনিয়াছে, সেগুলি পয়সা পয়সা। "সিংভূমে তসরের চাষ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিতেছি; লেখা সমাপ্ত হইলেই প্রবন্ধটী পিতাকে পাঠাইয়া দিব। তিনি সেটী প্রকাশ করিবার উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, কোন মাসিক পত্রে ছাপাইতে দিবেন, ইহাই আমার ইচ্ছা।

এখানে গালার চাষও খুব হয়। তবে কোলেরা গালা গালাইয়া পরিষ্কার করিতে জানে না; Crude, অপরিষ্কার অবস্থায় হাটে আনিয়া বিক্রয় করে। এই অপরিষ্কার গালা আজ কাল ২৭।৩০ টাকায় মণ বিক্রয় হইতেছে। চক্রধরপুরে একটী বড় গালার কারখানা আছে। তাহারা এই Crude গালাকে সংশোধিত করিয়া, গালার লম্বা লম্বা বাতি প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দেয়।

সিংভূম জেলার নানা স্থানে লোহার খনি আছে। চাঁইবাসা সহরের এক মাইল দূরে, কয়েকটী Manganese খনি বাহির হইয়াছে। খনির কোম্পানিরা বেশ দুই পয়সা লাভ করিতেছে। আজ কাল Manganese এর বড়ই দরকার। রাসায়নিক নানাবিধ পরীক্ষার জন্য, Manganese dioxide ব্যবহার করিতে হয়; আর Potassium per manganate, disinfectant রূপে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা ভিন্ন, কাচে নানা রূপ রং করিবার জন্য Manganese খুব দরকারি। লোহা খনি ছাড়াও, বনে জঙ্গলে, নদীর ধারে, নানা স্থানে পাওয়া যায়। এই সকল ছোট ছোট লোহার "ঢেলা" কুড়াইয়া, সেইগুলি গলাইয়া, এই জেলার কামারে কোদালি ও কাস্তে প্রস্তুত করে। হাটে ঐরূপ খাঁটি স্বদেশী কোদাল ও কাস্তে বিক্রয় হইতেছে দেখিলাম।

২।৩ ঘণ্টা হাট ঘুরিয়া বেড়াইলাম। একটা জিনিসের উপর হঠাৎ নজর পড়িল। হাজার হাজার লোক জমা হইয়াছে; বর্ষাকাল সকলেরই মাথায় ছাতি আছে, কিন্তু সবগুলিই বিলাতী ষ্টিলের ছাতি। অনেক অন্বেষণ করিয়া ৪টী মাত্র দেশী পাতার তৈয়ারি ছাতা দেখিতে পাইলাম। পরণে একটু একটু কৌপীন, কিন্তু মাথার উপর ১২।১৪ আনা দামের এক একটা বিদেশী ছাতা! অসভ্য কোলেরাও ষ্টিলের ছাতা ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে; তবুও তাহাদিগকে অসভ্য বলিতেছি। হাটে সকল দ্রব্য পাওয়া যাউক বা না যাউক, এমন হাট ত আর কখন দেখি নাই।

তসর-চাষ বিষয়ে প্রবন্ধ এখনও শেষ করিতে পারি নাই। আজ তোমাকে তসর-চাষ সম্বন্ধে গোটাকতক প্রধান কথা লিখিতেছি। আমার প্রবন্ধ পড়িয়া পরে এই বিষয়ে সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে।

আমাদের দেশে প্রধানত তিন প্রকার রেসম তৈয়ার হইয়া থাকে;—(১) গরদ; (২) তসর; (৩) এড়ি বা এণ্ডি। গরদের ও তসরের গুটি হইতে অনায়াসে পরিষ্কার সূক্ষ্ম সূতা তোলা যায়, কিন্তু এড়ির গুটি হইতে অনায়াসে সূতা তুলিতে পারা যায় না;—সমস্ত গুটিকে তুলার মত পিঁজিয়া পরে চরকা ও টেকোর সাহায্যে সূতা কাটিতে হয়। গরদের গুটি বনে জঙ্গলে হয় না, মনুষ্যে অনেক পরিশ্রম করিয়া তাহাদিগের বাটীতে, নিজের তত্ত্বাবধানে, তুঁত ও কুল প্রভৃতি গাছে, ইহার আবাদ করে। নিজেদের সন্তান সন্ততিকে যেরূপ ভাবে যত্নের সহিত লালন পালন করিতে হয় তাহা অপেক্ষা শত গুণে অধিক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া গরদকীটের লালন পালন করিতে হয়। পক্ষান্তরে, তসর ও এড়ির গুটি বনে জঙ্গলে নানা স্থানে জন্মায়। রেড়ী, ভেরাণ্ডা অথবা বিশুদ্ধ ভাষায় এরণ্ড গাছে গুটি জন্মায় বলিয়া, ইহাকে "এড়ি" অথবা এণ্ডি বলে। আর আসন, শাল, অর্জ্জুন প্রভৃতি পার্ব্বতীয় গাছে তসর গুটির জন্ম। কেবল যে অরণ্য মধ্যে তসরের জন্ম তাহা নহে,—খোলা মাঠের উপর, মুক্ত বায়ুতে, ঐ সকল গাছে, লোকে নিজেদের তত্ত্বাবধানে ইহাদিগের আবাদ করে।

গুটিপোকা পূর্ণযৌবন প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে, ইহাদিগের চারিটী বিভিন্ন অবস্থা অথবা ক্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে। (১) মাতৃগর্ভ হইতে পতিত হইবার

পর ৯।১০ দিন পর্য্যন্ত ডিম্বাবস্থা। (২) ডিম ফুটিবার পর হইতে, ১ মাস হইতে ২।৩ মাস পর্য্যন্ত কীটাবস্থা। এই কীটাবস্থা প্রাপ্ত পোকাকে আমরা সচরাচর গুটিপোকা (Caterpillar) বলিয়া থাকি। এই অবস্থায় কীটগণ চারিবার দেহের উপরিভাগের ত্বক পরিত্যাগ করে। ইংরাজীতে ইহাকে moulting বলে। ইহা সাপের খোলস্ ছাড়ার মত। (৩) চারিবার খোলস্ ছাড়ার পর কীটগণ মুখ হইতে লালা বাহির করিতে করিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্বদেহের চতুর্দ্দিকে গুটি তৈয়ার করে, এবং সম্পূর্ণরূপ স্বকৃত গুটির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। সকল শ্রেণীর গুটিপোকার তৃতীয় অবস্থার কাল সমান নহে। ২০ দিন, ১ মাস, ২ মাস হইতে প্রায় ১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন কোন পোকা এই অবস্থায় গুটির মধ্যে আবদ্ধ থাকে। এই অবস্থায় ইহাদের চোখ মুখ প্রভৃতি সকলই লোপ পায়। তখন ইহারা গাঢ় রক্ত-বর্ণের ডিম্বাকৃতি জীবে পরিণত হয়। বদ্ধবায়ুর মধ্যে, আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া স্থির ও ধীরভাবে কালযাপন করে বলিয়া, এই দেশের লোকের বিশ্বাস যে, ঐ অবস্থায় কীটগণ যোগাসনে বসিয়া ভগবৎচিন্তায় বিভোর;—সুতরাং তাহারা বাহ্যজ্ঞান শূন্য; যোগ করিতে করিতে শরীরের অভাবনীয় পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তবুও তাহাদিগের ভ্রূক্ষেপ নাই। এই তৃতীয় অবস্থা প্রাপ্ত কীটগণকে ইংরাজীতে Crysalids কহে। আমি আমার প্রবন্ধে এই অবস্থাকে কীটের "যোগাবস্থা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। (৪) যোগাবসান হইলেই, নানা বর্ণে রঞ্জিত পক্ষাদি সংযুক্ত প্রজাপতির আকার ধারণ করিয়া কীট গুটির ঊর্দ্ধদেশ কাটিয়া, তথা হইতে বাহির হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় কীটকে গুটি-প্রজাপতি (moth) বলা যায়। ইহাই কীটগণের পূর্ণযৌবন কাল। কোন গুটি হইতে পুং ও কোন গুটি হইতে স্ত্রী প্রজাপতি বাহির হয়, তবে স্ত্রীপ্রজাপতির সংখ্যাই অধিক।

বন হইতে কীটসমেত-গুটি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া গৃহে রাখা হয়। পরে সেই গুটি কাটিয়া পুং প্রজাপতি বাহির হইলে, তাহার কোন যত্ন না লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায়। আর স্ত্রীপ্রজাপতিগুলিকে অতি সন্তর্পণে পাতার উপর বসাইয়া গৃহের সন্নিকটে কোন গাছের পাতার সহিত আটকাইয়া দেওয়া হয়। বাহুড়ে প্রজাপতি খাইতে বড় ভালবাসে, সেই

জন্য সমস্ত রাত্রি বাদুড়ের হাত হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিতে হয়। প্রাতে দেখা যায় সেই সকল স্ত্রীপ্রজাপতি পুরুষের সহিত মিলিত হইয়া রহিয়াছে। সেই অবস্থায় পাতায় করিয়া তাহাদিগকে গৃহে আনা হয়। বৈকালে পুং প্রজাপতি চলিয়া যাইবামাত্র, স্ত্রীগণ ডিম্ব প্রসব করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে তিন দিন ক্রমাগত তাহারা ডিম পাড়ে। ডিমগুলির গাত্রে আঠার মত একটা চটচটে পদার্থ লাগিয়া থাকে। আস্তে আস্তে ছাইয়ের উপর ঘসিয়া, সেগুলি পরিষ্কার করিয়া, এক একটী পাতার দোনার মধ্যে, ৯০ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত ডিম রাখিয়া দেওয়া হয়। ৯।১০ দিন পরে এই ডিম ফুটিয়া কীট বাহির হইলে, ৫।৬টী কীটপূর্ণ দোনা, এক একটী গাছের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লাগাইয়া দেওয়া উচিত। এদেশে প্রধানতঃ শাল ও আসন গাছে গুটির চাষ করা হয়। এক গাছের সমস্ত পাতা খাইয়া ফেলিলে, কীটগুলিকে অন্য গাছে স্থানান্তরিত করা হয়। কীটাবস্থা প্রাপ্ত হইবার ৫।৬ সপ্তাহের মধ্যে, কীটগণ চতুর্থবার দেহের ত্বক ত্যাগ করে। ইহার পরেই, কীটগণ গুটি তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে স্বকৃত গুটির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ হয়। ২।৩ দিনের মধ্যে গুটি শক্ত হইয়া, গুটির মধ্যে পোকা কীটাবস্থা হইতে যোগাবস্থায় পরিণত হয়। এই সময়, ছোট ছোট ডালশুদ্ধ ভাঙ্গিয়া, গুটিগুলিকে গৃহে আনয়ন করা হয়। কোন কোন শ্রেণীর গুটি হইতে, বৎসরের মধ্যে ২।৩ বার প্রজাপতি বাহির হয়! গুটি হইতে অন্য ফসল পাইবার প্রত্যাশা না করিলে, গরম বাষ্পের ভাবরায় সে গুলিকে মারিয়া ফেলা হয়। যে সকল গুটি কাটিয়া প্রজাপতি বাহির হইয়াছে, সেই সকল কাটা গুটি হইতে, মটকা, খেটে প্রভৃতি মোটা তসরের কাপড় প্রস্তুত হয়; আর যে গুটি হইতে প্রজাপতি বাহির হয় নাই, যোগাবস্থাপ্রাপ্ত কীটকে গুটির মধ্যের বাষ্পের উত্তাপে মারিয়া ফেলা হইয়াছে, তাহা হইতেই উৎকৃষ্ট তসর তৈয়ার হয়। জীবহিংসা করিয়া তসর কাপড় প্রস্তুত হয় বলিয়া জৈনগণ তসর কাপড় ব্যবহার করেন না।

ঋতুর অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন গুটি পোকার বিষম শত্রু। আব হাওয়ার কিঞ্চিৎ বৈষম্য লক্ষিত হইলেই ইহাদিগের মরণ। এই সকল দৈবদুর্ব্বিপাক

হইতে কীটগণকে রক্ষা করিবার উপায় নাই। ইহা ভিন্ন অনেক পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ সকলেই গুটিপোকার চিরশত্রু। শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য লোকে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া, দিবারাত্র পাহারায় নিযুক্ত থাকে। নানা প্রকার সংক্রামক ও আণুবীক্ষণিক উদ্ভিজ ব্যাধিও (Fungoid) ইহাদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। আজ পর্য্যন্ত এই সকল রোগের প্রায় কোন প্রতিকার আবিষ্কৃত হয় নাই। গুটি-চাষ বহু আয়াসসাধ্য এবং ফসলের ভাল মন্দ অনেক সময়েই ভগবানের উপর নির্ভর করে।

গুটি হইতে সূতা তুলিবার জন্য, ছাই ও সাজিমাটি মিশ্রিত জলে, গুটিগুলি সিদ্ধ করা হয়। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল ক্ষারের জলে গুটি সিদ্ধ করিয়া, পরে পরিষ্কার জলে সেইগুলি ধুইয়া ফেলা উচিত। তৎপরে শুষ্ক ছাইয়ের উপর পাতলা কাপড় বিছাইয়া, তাহার উপর গুটি রাখিলে সেগুলি অল্প শুষ্কাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় গুটি হইতে সূতা তুলিতে হয়। বাম হাতে করিয়া ৪।৫টী গুটি হইতে একেবারে সূতা তুলিতে আরম্ভ করে এবং দক্ষিণ হস্তে নাটাই লইয়া সঙ্গে সঙ্গে সেই সূতা নাটাইয়ে জড়াইতে থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ দেশে যাহারা গুটির চাষ করিয়া থাকে, তাহারা সূতা তুলিতে জানে না। তাঁতির ঘরের স্ত্রীলোকেরাই এখানে সচরাচর গুটি হইতে সূতা তুলিয়া থাকে। সিংভূম জেলায় "কোষ্টা" অথবা তাঁতির সংখ্যা অতিশয় অল্প।

শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার।

নদীয়ায় যবনাধিকার।

বক্তিয়ার খিলিজি, অধিকৃত প্রদেশ দুই ভাগে বিভক্ত করেন, এবং গৌড়ের ন্যায় দিনাজপুরের সন্নিহিত দেবকোটে আর একটী রাজধানী স্থাপন করেন। এই দেবকোটেই বক্তিয়ার কালগ্রাসে পতিত হন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ দিল্লীশ্বরের অধীন হয়, বাদশাহ গায়সুদ্দিন বলবন্ শাসন সৌকার্য্যার্থ বঙ্গদেশকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া গৌড়নগরীকে উত্তর ভাগের, সুবর্ণগ্রামকে পূর্ব্ব ভাগের এবং নবদ্বীপের পরিবর্ত্তে সরস্বতী তীরস্থ সপ্তগ্রামকে পশ্চিম ভাগের রাজধানী মনোনীত করেন *। সপ্তগ্রাম তখন বাণিজ্যাদির কেন্দ্রস্থলরূপে গণ্য হয় এবং বহুসংখ্যক ধনবান্ বণিক এখানে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। কালে এই সমৃদ্ধিশালী সপ্তগ্রাম বিজন অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। ধনীর অভ্রভেদী প্রাসাদ ও দরিদ্রের পর্ণকুটীর একই দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে দিন বিশাল-কায়া বেগবতী পুণ্যসলিলা সরস্বতীর স্রোত মন্দীভূত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল সেই দিন হইতে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সপ্তগ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধি হ্রাস পাইতে আরম্ভ হয়।

১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে সামসুদ্দিন ইলিয়স্ সমগ্র বঙ্গদেশের একছত্র রাজা হন এবং দিল্লীশ্বরের অধীনতা অস্বীকার করেন। সামসুদ্দিন গৌড় পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র সুবিখ্যাত সেরসাহ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কিন্তু তিনি

* In the early period of the Mahometan rule Satgaon was the seat of the Governors of Lower Bengal and a mint town. It was also a place of great commercial importance.

Encyclopedia Brittanica. 9th Edition Vol. XII Page 148.

তাঁহার কৃতঘ্ন পুত্র গীয়াসুদ্দিন কর্ত্তৃক নিহত হইলে, ভাতুড়িয়ার জমিদার রাজা গণেশ বা কংসনারায়ণ বাইজিদ্‌সাহ নামে একজনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন, পরে ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দশ বৎসর নির্ব্বিবাদে রাজ্য ভোগ করেন। গণেশের পুত্র জাঠমল বা যদু জালালুদ্দিন নাম ধারণ পূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া ১৪১৪ হইতে ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অনন্তর জালালুদ্দিনের পুত্র আহমদ্‌সাহ সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু তিনি অচিরে তাঁহার ভৃত্যবর্গ কর্ত্তৃক নিহত হইলে নসিরুদ্দিন মহম্মদ সাহ সিংহাসন অধিকার করেন। ইঁহার পুত্র বারবাক্ সাহ নিজ সেনাদলে আট হাজার হাব্‌সী ক্রীতদাসকে স্থান দান করেন। তাহারা ক্রমশঃ প্রভূত শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং অন্তঃপুর রক্ষী খোজা ও পাইক সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া, ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গাধিপতি ফতে সাহকে হত্যাপূর্ব্বক বারীক নামক খোজাকে সুলতান সাজাদা নামে বাঙ্গালার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। বাঙ্গালার সিংহাসনে এইরূপে এক নপুংসক সমারূঢ় হইল। কিন্তু তাহাকে অধিক দিন রাজ্যভোগ করিতে হয় নাই। হাব্‌সী সেনাপতি মালিকিদ্দিন ইহাকে নিহত করিয়া ফিরোজ সাহ নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার পর নসিরুদ্দিন মহম্মদসাহ রাজা হন। তিনিও আবার সিদ্দিবদর দেওয়ানে নামক এক ব্যক্তির দ্বারা নিহত হন। এই সিদ্দিবদর মজাফর সাহ নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তাঁহার ন্যায় নৃশংস ও যথেচ্ছাচারী রাজা অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হয়। তিনি নিরুপদ্রবে রাজ্য ভোগ করিবার মানসে প্রথমে তুর্কী জাতীয় ওমরাহগণের নিধন সাধন করেন, পশ্চাৎ হিন্দু সামন্ত রাজা ও জমিদারগণকে নিহত ও বিধ্বস্ত করেন। এই নির্ম্মম নরপতির অত্যাচার হইতে কাহারও নিস্তার ছিল না। তিনি ভয়ঙ্কর হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। এই সময়ে কতকগুলি মুসলমান তাঁহার নিকট নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদিগের নামে নানারূপ মিথ্যাপবাদ দিয়া নবদ্বীপ ধ্বংসের অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাতে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণগণের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার হয়। তাহাদের অত্যাচার নবদ্বীপের সন্নিহিত পিরল্যা গ্রামেই অতিশয় ভীষণ আকার ধারণ করে। তাহারা পিরল্যাবাসী ব্রাহ্মণগণকে বলপূর্ব্বক তাহাদের উচ্ছিষ্ট

অভক্ষ্য দ্রব্যাদি ভক্ষণ করাইয়া জাতি ধর্ম্ম নাশ করিয়াছিল। এইরূপে নষ্টধর্ম্ম পিরল্যাবাসী ব্রাহ্মণগণ উত্তরকালে পিরালী নামে অভিহিত হন *।

---

* "আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কাঁধে।
ঘর দ্বার লোটে তার নাগপাশে বাঁধে॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।
প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপ বাসী॥
গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত।
অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত॥
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।
বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে॥
গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিল মিথ্যা বাদ।
নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিবে প্রমাদ॥
গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে হেন আছে।
নিশ্চিন্ত না থাকিও প্রমাদ হবে পাছে॥
নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হবে রাজা।
গন্ধর্বে লিখন আছে ধনুর্ম্ময় প্রজা॥
এই মিথ্যাকথা রাজার মনেতে থাকিল।
নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল"॥

পূর্ব্বোক্ত বিবরণটী শ্রীচৈতন্য দেবের প্রিয় ভক্ত সুবুদ্ধি মিশ্রের ভাগ্যবান পুত্র শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাত্র জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে বিবৃত করিয়াছেন। জয়ানন্দ এই ঘটনার প্রায় সমসাময়িক ব্যক্তি, সুতরাং তিনি যাহা দেখিয়াছেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এরূপ স্থলে তাঁহার কথায় অবিশ্বাসের কোনও কারণ নাই। এই উৎপীড়িত পিরল্যাগ্রামবাসীগণের "পিরালী" নামকরণ সম্বন্ধে দুই মত দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন এই পিরল্যাবাসী নষ্টধর্ম্মী ব্যক্তিগণই পিরালী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; যেমন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের মধ্যে বিশেষ বিশেষ গ্রাম বা ব্যক্তির নাম হইতে সমাজ মধ্যে বিভিন্ন থাকের উৎপত্তি তেমনি পিরল্যা হইতে "পিরালী" থাকের উৎপত্তি হয়। আবার কেহ বলেন, বাগের হাটের পীর আলি সাহেব হইতে পিরালীর উৎপত্তি, এবং বাগের হাটে পীরআলি সাহেবের যে কবর

অনিচ্ছায় বল প্রয়োগে জাতিচ্যুত হইলে অনেকে যবনাচার গ্রহণ করিয়াছিলেন, আবার অনেকে করেন নাই *।

পিরালীগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে। কথিত আছে পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে † খাঁ জাহান আলি বা খাঞ্জেআলি নামে কোন এক ধনশালী মুসলমান দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে সুন্দরবন আবাদের সনন্দ লইয়া যশোহরে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সুজলা সুফলা উর্ব্বরা ভূমিতে বিস্তীর্ণভাবে আবাদ করিয়া খাঞ্জেআলি অল্পকালের মধ্যে বিপুল ধনের অধিকারী হইয়া উঠেন এবং নবাব খাঞ্জেআলি নামে খ্যাত হন। নবাব খাঞ্জেআলির সুবিস্তীর্ণ জমিদারীর শাসনভার যশোহরের বেঙুটিয়া পরগণার জমিদার কামদেব ও জয়দেব রায় চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয়ের উপর অর্পিত ছিল। এই দুই ভ্রাতা নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাঁহাদের যত্নে এবং নবাব খাঞ্জে আলির অর্থে খুলনা বাগেরহাট প্রভৃতি অঞ্চলে অনেকগুলি প্রশস্ত রাজবর্ত্ম প্রস্তুত ও পুষ্করিণী খনন করা হয় ‡।

এই সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণ সন্তান মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মহম্মদ তাহের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক নবাব খাঞ্জে আলির সহিত মিলিত হন। মহম্মদ তাহের স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একজন গোঁড়া মুসলমান হইয়া উঠেন এবং নবাব খাঞ্জে আলির সাহায্যে তৎপ্রদেশস্থ হিন্দুগণকে মুসলমান করিতে প্রবৃত্ত হন ও তিন শত ষাটটী মস্‌জিদ্ স্থাপন করেন, এ কারণে

অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে উহাতে পীর-আলির মৃত্যু তারিখ ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দ বলিয়া লিখিত আছে, অতএব পীরালীর সৃষ্টি জয়ানন্দ বর্ণিত ঘটনার কিছু দিন পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ ঐ নষ্টধর্ম্মী পিরালীগণের মধ্যে বহু লোক আসিয়া নবদ্বীপের পল্লীবিশেষে বাস করায় উহাই পীরল্যা গ্রাম নামে অভিহিত হয় এবং উক্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া গৌড়েশ্বর নবদ্বীপ ধ্বংসের অনুমতি প্রদান করেন।

* ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৪ আইনের ৭ ধারা দৃষ্টে জানা যায় ম্লেচ্ছাচারী পিরালীগণের শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না। পরে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে নিষিদ্ধ জাতির তালিকা হইতে পিরালী নাম তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

† জয়ানন্দ বর্ণিত পিরালী বিপ্লবের প্রায় সমসাময়িক।

‡ Vide Hunter's Statistical Account of Jessore.

তৎপ্রদেশস্থ মুসলমানগণ তাঁহাকে "পির আলি" নামে অভিহিত করিয়া সম্মানিত করেন। পিরআলি আপনার বুদ্ধিকৌশলে ক্রমে ক্রমে নবাব খাঞ্জে আলির অতিশয় প্রিয়পাত্র হন এবং পরিশেষে তাঁহার উজিরী পদ লাভ করেন। দরিদ্র তাহের উজিরী পদ প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইল না, তিনি দেখিলেন তদঞ্চলে কামদেব ও জয়দেব রায়চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতিপত্তি অসাধারণ; একে তাঁহারা স্বয়ং বহু অর্থের অধীশ্বর তাহাতে আবার নবাব খাঞ্জে আলির সুবিস্তীর্ণ জমিদারীর শাসনভার হস্তে থাকায়, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে সে অঞ্চলের রাজা; সুতরাং উজিরী পাইলেও তাঁহাকে এই দুই ভ্রাতাকে মান্য করিয়া চলিতে হইবে; বিশেষতঃ তাঁহারা নিষ্ঠাবান কুলীন ব্রাহ্মণ, আর তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াও স্বধর্ম্মত্যাগী মুসলমান বলিয়া অনেকের চক্ষে অতি হীন। এই সকল কারণে পিরআলি, চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয়ের পরম বিদ্বেষী হইয়া উঠেন এবং কিসে তাঁহাদের অনিষ্ট করিবেন তাহার সুযোগ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে কোন একটী ঘটনা উপলক্ষে পিরআলি তাঁহাদের সর্ব্বনাশ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। নবাব খাঞ্জে আলি সকল সময়ে দরবারে উপস্থিত থাকিতেন না। এক্ষণে উজির হওয়ায় পিরআলিই অধিকাংশ সময় দরবারে উপস্থিত থাকিতেন। কামদেব ও জয়দেব রায় চৌধুরীও কার্য্যোপলক্ষে সময়ে সময়ে দরবারে আসিতেন। এক দিন রোজার উপবাস কালের মধ্যে দরবার হইতেছে, এমন সময়ে জনৈক কর্ম্মচারী একটী ঘৃতকলম্বা লেবু আনিয়া উজিরকে উপহার দিলেন। পিরআলি লেবুটীর আঘ্রাণ লইয়া সবিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। সেই দরবার গৃহে নিষ্ঠাবান হিন্দু চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয় উপস্থিত ছিলেন, জ্যেষ্ঠ কামদেব রায়চৌধুরী উপবাসকাল মধ্যে উজির সাহেবকে লেবুর আঘ্রাণ লইতে দেখিয়া বলিলেন—"হুজুর করিলেন কি, রোজার দিন লেবুর আঘ্রাণ লইলেন?"। উজির জিজ্ঞাসা করিলেন—"দোষ কি?" তাহাতে কামদেব উত্তর করিলেন, "আমাদের শাস্ত্রে উক্ত আছে উপবাসের দিন কোন দ্রব্যের ঘ্রাণ পর্য্যন্ত লইতে নাই, কারণ ঘ্রাণে অর্দ্ধেক ভোজন হয়।" পির-আলি একথা শুনিয়া মনে করিলেন তিনি যে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহাই লক্ষ্য

করিয়া কামদেব তাঁহাকে এবম্বিধ বিদ্রূপ করিতে সাহসী হইয়াছেন। তিনি মনে মনে ইহার প্রতিশোধ লইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

প্রতিহিংসা-পরায়ণ উজির এক দিন প্রজাসাধারণ ও কর্ম্মচারীবৃন্দের এক দরবার আহ্বান করিলেন এবং চৌধুরীবংশের সকলকে বিশেষ করিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে যথাসময়ে সকলে দরবারে উপস্থিত হইলে পূর্ব্বনির্দ্দেশানুসারে ঐ দরবার প্রাঙ্গণের সন্নিকটে এক সুপ্রশস্ত গৃহে মুসলমান বাবুর্চ্চিগণ নানাবিধ সুগন্ধি মসলা পলাণ্ডু ও লশুনাদি সংযোগে গোমাংস রন্ধন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সভাগৃহ গন্ধে ভরপুর হইয়া উঠিল। সভাস্থ হিন্দুগণ নাসিকায় বস্ত্র দিয়া বসিলেন; পিরআলি মনে মনে সবিশেষ আহ্লাদিত হইয়া মৌখিক সৌজন্য সহকারে বলিলেন, "চৌধুরী মহাশয়গণ ওরূপ নাসিকা আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন কেন? ব্যাপার কি?" কামদেব উত্তর করিলেন "মাংসের গন্ধ"। তখন নষ্টবুদ্ধি পিরআলি বলিলেন "অগ্রে গোমাংসের গন্ধ পাইয়া পরে নাসিকা আচ্ছাদন করিয়াছেন, তাহা হইলে হিন্দুশাস্ত্র মতে আপনাদের সকলেরই ঘ্রাণে অর্দ্ধ ভোজন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আপনাদের সকলেরই জাতিচ্যুতি ঘটিয়াছে, এক্ষণে আর নাসিকাচ্ছাদনে ফল কি?" পিরআলির এবম্বিধ বাক্যে কামদেব প্রমাদ গণিলেন। ওদিকে উজিরের আদেশে কয়েকজন সিপাহী আসিয়া বলপূর্ব্বক কামদেব ও জয়দেবের মুখে গোমাংস প্রদান করিল। গ্রামস্থ হিন্দুগণ সকলে মিলিয়া রায়চৌধুরী বংশীয়গণকে ও অন্যান্য দরবারে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে পতিত সিদ্ধান্ত করিলেন এবং তাঁহাদের সহিত আহার ব্যবহার রহিত করিলেন। এ দিকে কামদেব ও জয়দেবের মুখে প্রত্যক্ষভাবে গোমাংস পতিত হওয়ায় তাঁহাদের জ্ঞাতিবর্গ ও নিকট কুটুম্বগণও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন, তখন সেই দুই দুর্ভাগ্য ব্রাহ্মণ সন্তান মুসলমান হওয়া ব্যতিত গত্যন্তর নাই দেখিয়া নবাব খাঞ্জেআলি খাঁর শরণাপন্ন হইলেন ও যথাক্রমে কামালউদ্দীন খাঁ চৌধুরী ও জামালুদ্দীন খাঁ চৌধুরী নাম লইয়া যশোহরের পাঁচ ক্রোশ দূরে সিংহিয়া গ্রাম জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করিলেন; ইঁহাদের বংশাবলী বৃদ্ধি পাইয়া এখন

সাতক্ষীরা, হুসেনপুর, মাগুরা, বসুলিয়া প্রভৃতি গ্রামে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

পীরআলির দৌরাত্ম্যে এই সকল ব্যক্তির জাতিচ্যুতি ঘটায় তাঁহাদের পতিত বংশাবলী সাধারণতঃ পিরালী নামে খ্যাত হন। রায় চৌধুরী বংশীয়গণ এইরূপে গুড়গ্রামী সাধ্য শ্রোত্রীয় হইতে পিরালী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে বিশেষ দায়ে পড়িতে লাগিলেন। তাঁহাদের ধনের অপ্রতুল ছিল না, সুতরাং ধনবলে কুলীন ও শ্রোত্রীয় পাত্র সংগ্রহ করিয়া বিবাহাদি সম্পন্ন করিতে লাগিলেন, তখন সেই সকল কুটুম্বগণও পতিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে পিরালীগণের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এতদ্ব্যতীত পিরালীগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। এ সকল কিম্বদন্তীর মধ্যে কতটুকু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন, সুতরাং জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল, যাহা ইতিহাসবহুল প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া সাহিত্যে আদৃত তথায় কথিত বিবরণটী, এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

নবদ্বীপবাসীগণের উপর অত্যাচার অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। পিশাচ প্রকৃতি মজাফরের প্রধান মন্ত্রী সৈয়দ হুসেন সাহ মুসলমান ও হিন্দু জমিদারগণের সহিত মিলিত হইয়া ১৪৯৬ অব্দে মজাফরের কলুষময় জীবনের অবসান করত স্বয়ং বঙ্গসিংহাসন অধিকার করেন। হুসেন সাহ নবদ্বীপের নষ্ট মন্দির ও ভগ্ন দেউল প্রভৃতির পুনঃসংস্কারের অনুমতি প্রদান করেন। এই হুসেন সাহ পূর্ব্বে সুবুদ্ধি খাঁ নামক এক জন ধনাঢ্য কায়স্থের বাটীতে ভৃত্যের কার্য্য করিতেন। কোন সময়ে সুবুদ্ধি খাঁ তাঁহাকে পুষ্করিণী খনন কার্য্যের পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। কিন্তু হুসেন তাঁহার প্রভুর নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে সবিশেষ মনোযোগী না হওয়ায়, সুবুদ্ধি বেত্রাঘাতে তাঁহাকে জর্জ্জরিত করেন। হুসেন নীরবে বেত্রাঘাত সহ্য করেন এবং পূর্ব্ববৎ প্রভুর কার্য্য করিতে থাকেন, এ কারণ সুবুদ্ধির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। সুবুদ্ধির চেষ্টায় হুসেন রাজসরকারে প্রথমে একটী সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হন, উত্তরকালে স্বীয় সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভাবে রাজসিংহাসন পর্য্যন্ত লাভ করেন।

হুসেন সাহের সময়ে কামরূপ বিজিত হয় এবং চট্টগ্রামে মগগণ পরাজিত হয়। ইনিই মেদিনীপুর অঞ্চলে হাব্‌সীদিগকে নিষ্কর ভূমি দান করিয়া উড়িষ্যার রাজাদিগের আক্রমণ হইতে বঙ্গদেশ রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার সময়ে প্রজাসাধারণের অবস্থা অতি সচ্ছল ছিল। ধনীগণ স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করিতেন। নিমন্ত্রণ সভায় যিনি যত সুবর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন তিনি তত মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতেন।

তিনি একদিকে যেমন সুশাসক বলিয়া পরিচিত, তেমনি বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহদাতা বলিয়াও সুবিখ্যাত। ইহারই আদেশে সুপ্রসিদ্ধ কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত অনুবাদ করেন, ইহা পারগলী ভারত বলিয়াও খ্যাত। বঙ্গকবি গুণরাজ খাঁ, ছুটী খাঁ, গোপীনাথ বসু প্রভৃতি ইহার সভার উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন।

হুসেনের সময় অনেক হিন্দু উচ্চ রাজকর্ম্ম প্রাপ্ত হন। সুপ্রসিদ্ধ রূপ ও সনাতন ভ্রাতৃদ্বয় দবীর খাস ও সাকর মল্লিক নামে তাঁহার সভায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন সপ্তগ্রামের রাজপ্রতিনিধি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই দুই ভ্রাতা নবদ্বীপস্থ ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর অর্থ ও ভূমি দান করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন *। চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থে ও বহু সমসাময়িক সাহিত্যে দেখা যায় যে সে সময়ে কয়েকজন কাজী বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া নদীয়া শাসন করিতেন। চাঁদ খাঁ নামক একজন কাজী নবদ্বীপের একাংশে বেলপুখুরিয়ায় বাস করিতেন। আর একজন শান্তিপুরের গঙ্গাতীরে থাকিতেন; তাঁহার নাম ছিল মুলুক; ইহার গোরাই নামে এক জন হিন্দুবিদ্বেষী পরম অত্যাচারী জামাতা ছিল। কাজীগণ বিদ্বেষ বশতঃ সর্ব্বদাই হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন। ভক্ত-

* হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই সহোদর।
সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥
মহৈশ্বর্য্য যুক্ত দোঁহে বদান্য ব্রাহ্মণ্য।
সদাচার সৎকুল ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য॥
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়।
অর্থ, ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥ চৈতন্যচরিতামৃত।

শিরোমণি যবন হরিদাস * ইসলাম ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করায় শান্তিপুর নিবাসী কাজীর প্ররোচনায় ও বাদসাহের বিচারে বেত্রাঘাতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। কথিত আছে হরিদাস ভক্তবৎসল মহাপ্রভুর অপার কৃপায় পুনর্জীবন লাভ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপস্থ চাঁদ কাজী মহাপ্রভুর বিরুদ্ধাচারী হইয়াও পরিশেষে তাঁহার কৃপালাভ করিতে সমর্থ হন।

শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক।

---

* ভক্ত শিরোমণি হরিদাস ঠাকুর বনগ্রাম মহকুমার অধীন বুঢ়ণ গ্রামে মুসলমান কুলে জন্ম গ্রহণ করেন, প্রথমে তিনি বনগ্রামের অন্তর্গত বেনাপোলের বনাভ্যন্তরে নিভৃত কুটীরে নাম যজ্ঞ আরম্ভ করেন। কিন্তু স্থানের জমীদার রামচন্দ্র খানের পীড়নে তিনি উক্ত আশ্রম ত্যাগ করিয়া প্রথমে শান্তিপুরে, পরে সপ্তগ্রামের সন্নিকটস্থ চাঁদপুর গ্রামে আসি কিছু দিন বাস করেন, পরে তথা হইতে আসিয়া শান্তিপুরের সন্নিক ফুলিয়া গ্রামে গঙ্গাতীরে এক গুহা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন এই সময়ে তাঁহার প্রতি শান্তিপুরের কাজীর বিদ্বেষ জন্মে। ফুলিয়া গ্রা হরিদাসের গুহার কোনও চিহ্ন ছিল না। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে যশো জেলার চাঁচুড়ি পুড়ুরী গ্রামের জগদানন্দ গোস্বামী বহু কষ্টে ও অনুসন্ধা হরিদাসের আশ্রম ও ভজন গুহাটী আবিষ্কার করিয়াছিলেন ও গুহাটী কূপাকারে সংরক্ষণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে আশ্রমের তলে গঙ্গা থাকিলেও গঙ্গার গভীর খাত বিদ্যমান আছে। ইহার উপর ক কৃত্তিবাসের বাস্তুভিটা।

সুভদ্রা।

শুভক্ষণে জন্ম তব, সুভদ্রা সুন্দরী!
শুভক্ষণে অভ্যুদয় হয়েছিল তব,
পুণ্যের পতন আর ধরমের গ্লানি
ঘটেছিল যবে এই আর্য্যাবর্ত্ত ভূমে
বিগত দ্বাপর যুগে। ভদ্রা, বীরাঙ্গনা,
বীর সুতা, বীরপত্নী, বীরমাতা দেবী!
করেছিলে সুপবিত্র কুলত্রয় তব
পুণ্য আচরণে, সদা পুণ্য কর্ম্ম বলে।
পুণ্যক্ষেত্র হয়েছিল এ ভারত ভূমি
তব পুণ্যসমাগমে—তব ধর্ম্মবলে।
ভারতললনা লভেছিল সুপ্রতিষ্ঠা
জগৎসমক্ষে ধরি' আদর্শ তোমার—
উচ্চশিক্ষা দীক্ষা তব করিয়ে গ্রহণ।
ধর্ম্মপ্রাণা, কীর্ত্তি তব দীপ্ত রবিসম
করেছিল উদ্ভাসিত দিগদিগন্তর।
কৃষ্ণভগ্নি, কৃষ্ণশিষ্যা সর্ব্বগুণযুতা
উচ্চপ্রাণা এ সংসারে কোথা তব তুলা?
বয়সে বালিকামাত্র যবে ছিলে তুমি
বীরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়ে হেরি', হেরি' তাঁর
বীর আচরণ, শুনি' লোকমুখে তাঁর
অসামান্য বীরত্বের মহত্ত্বের গাথা,
বীরসেবা বীর পূজা করিয়ে মনন
স্বেচ্ছায় করিয়াছিলে তাঁরে আত্মদান
বলদেব অভিপ্রায় বিরুদ্ধে তখন।
যাদবীয় চমূসনে এই হেতু পরে
বাধিলে সংগ্রাম 'নিজে দ্বন্দ্বমূল' জানি'

পূর্ণিমা।

স্বেচ্ছায় সারথ্যভার লয়ে নিজ করে
মথিয়া যাদবগণে নির্ভীক হৃদয়ে
অর্জ্জুনের রথখানি চালাইলে তুমি
অপূর্ব্ব কৌশলে কোটী ইরম্মদ তেজে।
রণ অবসানে শেষে শ্রদ্ধা ভক্তি ভরে
একেশ্বর রথী বিজয়ী বিজয় গলে
যত্নে পরাইয়াছিলে বিজয় মালিকা।
বলভদ্র আদি তবে যদুশ্রেষ্ঠ সবে
হেরেছিল বীরবালা কি সাধিতে পারে!
অতঃপর কৃষ্ণবৈরী দণ্ডীরাজ যবে
দেবাসুর নর যক্ষরক্ষঃ সবাকার
সাহায্য মাগিয়া শেষে ব্যর্থমনোরথ
তোমার শরণাগত হয়েছিল আসি'
বীরপত্নি! বীরবাক্যে আশান্বিত করি'
তুমিই রাখিয়াছিলে আশ্রিতের মান।
'আত্মহত্যা মহাপাপ' বুঝায়ে দণ্ডীরে
তুমিই বাঁচায়েছিলে তাহার পরাণ।
ক্ষত্রধর্ম্ম, ন্যায়ধর্ম্ম রক্ষিতে সংসারে
স্বামী ধনঞ্জয়ে আর ভ্রাতৃবর্গে তাঁর
কৃষ্ণ কৃষ্ণসহকারী বিপক্ষে সবার
রণমদে উত্তেজিত করিয়া ধরায়
অতুল পাণ্ডবকীর্ত্তি করিলে স্থাপন।
আর একবার যবে কুরুক্ষেত্র মাঝে
কুরুরণে নিগৃহীত হইল পাণ্ডব
ভঙ্গ দিল চারি দিকে পাণ্ডু অনীকিনী
নিজহস্তে রণসাজে সাজায়ে কুমারে
তুমিই বলিয়াছিলে "যাও পুত্র রণে,
যাও অভিমন্যু মোর, অরাতির শির

কাটি' রাশি রাশি, রক্তে তাহাদের কর
কুলের তর্পণ; মৃত্যুরে না ডর বৎস;
এ সংসার মায়াময়; অনিত্য এ দেহ;
কীর্ত্তিমাত্র মানবের অমর ভুবনে;
পৃষ্ঠ নাহি দেহ রণে; অস্ত্রলেখা যদি
ধরিতে হইবে, ধরিও নির্ভয়ে বক্ষে;
সম্মুখ সমরে মৃত্যু বাঞ্ছনীয় সদা
ক্ষত্রিয় বীরের; সম্মুখ সমরে মৃত্যু
স্বর্গের সোপান; 'অর্জ্জুনি অর্জ্জুনসম
বীরশ্রেষ্ঠ' সবে দেহ পরিচয় তার;
লহ মাতৃ আশীর্ব্বাদ—অন্য আশীর্ব্বাদ
নাহি জানি আমি—মৃত্যু কিম্বা রণজয়,
হোক্ ভাগ্যে তোর—সমশ্রেয়ঃ লাভ দোঁহে"।
হায়! দেবি, কোথা তুমি; আজ একবার
এস এই ভারতের অবনতি-দিনে,
মাতা, পত্নী, কন্যারূপে হওগো উদয়;
প্রতি গৃহে এনে দাও নবীন জীবন
নবীন শকতি, আশা, নবীন উদ্যম;
স্বাধীনতা মন্ত্রে পুনঃ করগো দীক্ষিত
ভারতের নর নারী সবার হৃদয়।

শ্রীচুনীলাল সেন।

দ্বারকার পথে।

দেশহিত

(২)

তখন টিকিট কিনিবার তাড়াতাড়ি পড়িয়া গেল। দুজনে একত্রে থাকিবার জন্য আর মিটার গেজের সেকাণ্ড ক্লাসগুলা কেমন একরূপ অপরিসর ও যাত্রীর গাদাগাদি দেখিয়া ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের অর্থাৎ মধ্য শ্রেণীর টিকিট কিনিতে গেলাম। শুনিলাম মধ্য শ্রেণীর টিকিট পাওয়া যায় না। কেবল মেল ট্রেণে পাওয়া যায়। তাও সর্ব্ব সময়ে নয়। তখন গ্লাডষ্টোনের অহঙ্কারের কথা মনে পড়িয়া গেল। একজন গ্লাডষ্টোনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে "মহাশয়, তৃতীয় ক্লাসে ভ্রমণ করেন কেন?" গ্লাডষ্টোন ইংলণ্ডের মহা মন্ত্রী বড় কে-ও-কে-টা নয়, লোক জবাব শুনিবার জন্য ব্যগ্র এমন সময় বজ্র গম্ভীর স্বরে উত্তর হইল

"চতুর্থ ক্লাস নাই বলিয়া।"

আমিও আজ কাজের গতিকে বড়লোক হইয়া পড়িলাম। এগার টাকা কয়েক আনা দিয়া পোরবন্দর পর্য্যন্ত দুই খানি টিকিট কিনিলাম। মূল্য দেখিয়া দূরত্বের আভাস পাইলাম। এ দেশের মতন সেখা নয়। টিকিট কিনিয়াছি তবু প্লাটফরমে যাইতে দিবে না কেন একটু বিলম্ব আছে। যাইবে যাও প্লাটফরম টিকিট ক্রয় কর। খ করিলে ১ খান প্লাটফরম টিকিট পাওয়া যায়। বার দুই তিন টিকি কিনিয়া আনাগোণা করিতে বাধ্য হইলাম। মোট ঘাট ঠিক হইলে সুমু চাহিয়া দেখি সেই পার্সী দম্পতী। আবার সদালাপ হইল। আলা জানিলাম তাঁহারা ভড়োচ যাইতেছেন। তাঁহারা সওদাগর। অনে কথাবার্ত্তার পর তাঁহারা গাড়ী আসিলে নিজ কামরায় গেলেন। আমরা একটা কামরা "নিজ" করিয়া লইলাম। কিন্তু বড় বিপদ আমার কাি ট্রঙ্ক ঢুকে না—গাড়ি এত অপ্রশস্থ। বাঁকাইয়া লোক সাহায্যে তাহাকে ঢুকাইলাম তার পর পানীয় জল লইবার পর গাড়ি ছাড়িয়া দিল। আ প্রতি মুহূর্ত্তে কলিকাতা হইতে দুরে যাইতে লাগিলাম।

হুস্ হুস্ করিয়া ট্রেণ ছুটিল। আমি আমার চিন্তা লইয়াই বসিয়া রহিলাম। ক্ষণকাল পরে সম্মুখে দেখিলাম এক জন বৃদ্ধ বসিয়া আছেন ও আলাপ করিবার জন্য ব্যগ্র। কার্ড দিলেন পরিচয় পাইলাম বাটী ভড়োচ—তিনি পেন্সনভোগী পুলিস ইন্স্পেক্টর। কংগ্রেসের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলাম কাগজে দেখিবেন আমাকে আর জিজ্ঞাসা করা কেন? মনে মনে বুঝিলাম তাঁহাদিগকেও সরকার ছাড়েন নাই লইয়া গিয়াছিলেন যাহা হৌক বৃদ্ধটী বড়ই সদালাপী, বলিলেন আমার বাটী চলুন সেখান হইতে বিলি ব্যবস্থা করিয়া দিব আমার ভাই আছেন অমুক স্থানে তিনিও পুলিস তিনি আপনাকে সাহায্য করিবেন ইত্যাদি। আমার পিতামহীর গল্প মনে পড়িল—যেন ডাকাতের হাতে পড়িয়াছি, কি করিয়া ছাড়াইয়া যাই। বলিলাম শত সহস্র ধন্যবাদ; কিন্তু আমার কোন সাহায্যের প্রয়োজন নাই, তবে ফিরিবার সময় যদি এই পথে ফিরি তবে মহাশয়ের বাটীতে যাইব। তখন তিনি মহা সুখী হইয়া বলিলেন, তার করিবেন আমি স্বয়ং ষ্টেসনে উপস্থিত থাকিব। ক্রমে দেখিলাম ও বুঝিলাম লোকটী বড়ই ভদ্র। পুলিসের মতই নয়।

আরও এক জন পার্সী ব্রাহ্মণের সহিত আলাপ হইল তিনি তাঁহার রেসমের পৈতা দেখাইলেন। বলিলেন অনেকের মৃগচর্ম্মের পৈতা আছে। আমার আমাদের দেশের উপনয়ন মনে পড়িয়া গেল। উপনয়নের দিনে এই সব-ই ত চাই। মনে মনে আরও বুঝিলাম যে পার্সীদের জেন্দ্—অথর্ব্ব বেদ আর কিছুই নহে। তবে কালে কালে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। পার্সীরা মৃত দেহ কেন দগ্ধ করে না জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন "অগ্নি আমাদের দেবতা তাহাতে কি করিয়া মৃত দেহ নিক্ষেপ করিব? বুঝিলাম, এ সব-ই আমার জগদম্বা মা-টীর খেলা। কেমন বুঝাইয়া রাখিয়াছেন। আর সেই অগ্নি আমাদেরও দেবতা—কেমন সচ্ছন্দে আমরা মৃত দেহ দগ্ধ করি ও করাই।

কথায় কথায় অপর ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন নামিয়া দেখি গাড়ীতে অনেক বাঙ্গালী। সুরতে নামা উঠা লইয়া ব্যস্ত ছিলাম—তখন দেখি নাই জিজ্ঞাসায় জানিলাম কেহ যাবেন বরদা দেখিতে, কেহ যাবেন ওঁকারনাথ হইয়া ই, আই, আর দিয়া রাঁচী। কেহ যাইবেন

রাজপুতানা কিন্তু কেহ বলিলেন না যে তিনি দ্বারকা যাইবেন। ভুল হইয়াছে পাবনার এক জন ডাক্তার প্রথমে বলিয়াছিলেন দ্বারকা যাইবেন। কিন্তু পরে বন্ধুবর্গের কথায় ও মন্ত্রণা ত্যাগ করিলেন। সুতরাং সেই আমি ও তিনি সেই তিনি ও আমি—দুই জনে "একলা-টি"।

শুনিয়াছিলাম এই লাইন দিয়া ভাটিয়াদের দেশে যাইতে হয় আর ভাটিয়ার মত সুন্দরী রমণী আর নাই। পুলিস ও পার্সী উভয়কেই জিজ্ঞাসা করিয়া যাথার্থ্য অনুভব করিলাম। গাড়ীতেই দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম।

তার পর নর্ম্মদার বিশাল সেতু পার হইয়া ভড়োচ সহরের সম্মুখীন হইলাম। কি কারণে জানি না গাড়ী দাঁড়াইল। আর পুলিস ইন্‌স্পেক্টর আমাকে নানা সংবাদ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। ভড়োচ (এক্ষণে Brooch) পূর্ব্বে বলি রাজার রাজধানী ছিল এখনও সহরের চতুর্দ্দিকের দুর্গ প্রাকার বর্ত্তমান। বলি শত অশ্বমেধ করিয়া ইন্দ্রত্ব লইতে চাহিয়াছিলেন। তিনি কাশীতে ১০টী অশ্বমেধ করেন তাই সেখানে দশাশ্বমেধ ঘাট এখনও বর্ত্তমান। ঐরূপ উজ্জয়িনী সহরে ১০টী প্রয়াগে ১০টী প্রভৃতি স্থানে স্থানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি ভড়োচ রাজধানীতেও ১০টী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন—গাড়ী হইতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ইন্‌স্পেক্টর দশাশ্বমেধ ঘাট আমাকে দেখাইলেন। এখানেও মণিকর্ণিকা আছে—সেইরূপ শব দাহ। দেখিলেই বোধ হয় সহরটী বহু পুরাতন আর কেল্লা দেখিলেই চক্ষুস্থির। এখন সহরটী বাণিজ্য-প্রধান স্থান। নর্ম্মদার এখানকার বিস্তৃতি দেখিবার মত বটে। তবে সেটা বর্ষাকালে দেখিতে হয়। এই সঙ্গে একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় আমার মুখে ভড়োচ—বলি সংবাদ শুনিয়া বলিয়াছিলেন যে বলি যে পাতালপুরীতে ছিলেন, তাহা পাতালপুরীই বটে দেখিলে তাহাই বলিয়া মনে হয়, সহরটী মৃত্তিকায় প্রোথিত, সহরের নামটী মহাবলিপুর তাহা মান্দ্রাজের উত্তর মাদ্রাসের নিকট। অক্ষয় বাবু বলেন যে তিনি মহাবলিপুরের বিবরণ ৺ ভূদেব বাবুর নিকট শুনিয়াছিলেন। পাঠক মহাশয় মিলাইয়া দেখিবেন, সুখীও হইতে পারেন আমি কিন্তু ও চেষ্টা করিব না।

নর্ম্মদার বক্ষে এখন নানাবিধ চাষ হইয়াছে। কিন্তু দেখিলেই বোধ হয়

দেশে বড়ই জলকষ্ট। হায় রে, আমাদের মুখে আর এ কথা সাজে না। যে বাঙ্গালার লোক গ্রামে গ্রামে পুষ্করিণী খনন করিয়া সাধারণ লোক জনের উদ্দেশে দান করিয়াছিল, আজ সেই বাঙ্গালায় কেহ একটী কূপ খনন করিয়াও দেয় না—পুষ্করিণী খনন বা পঙ্কোদ্ধার করা ত বহু দূরের কথা। আজ বাঙ্গালা জলকষ্টে হাহাকার করিতেছে—আর বলিতেছে রাজা আমাদিগকে বড়ই ভাল বাসেন নহিলে এ সময় রাজবাড়ীতে নাচ ঘর তৈয়ারি হইবে কেন?

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

মৃত্যুর পর।

(৪০)

কর্ম্মযোগ।

শব্দকল্পদ্রুম হইতে ভক্তির লক্ষণাদি যাহা দিয়াছি তাহা সংস্কৃত। কিন্তু সংস্কৃত হইলেও সহজ—সেই জন্য আর বাঙ্গালা অনুবাদ দিলাম না। আরও ইচ্ছা ছিল সনাতনের প্রতি গৌরাঙ্গের ভক্তি সম্বন্ধীয় উপদেশটী পাঠক মহাশয়কে উপহার প্রদান করিব। আরো একবার মনে হইয়াছিল জীব গোস্বামীর ভক্তির বিশ্লেষণটীও উপহার দিব। তার পর মনে মনে বুঝিলাম "পুঁথী বাড়িয়া যাইবে।" আমি ত আর ভক্তি সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিতেছি না। যদি কেহ সবিস্তারে এই সকল বিষয় জানিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং মূল গ্রন্থ পাঠ করিবেন অর্থাৎ বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে ঐ সকল বিষয় পাঠ করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে শাণ্ডিল্য সূত্রও পড়িতে পারেন। "মৃত্যুর পর" অনেক দিন আরম্ভ হইয়াছে—মনে হয় ১৩০৩ সালে আরম্ভ করিয়াছি, আর আজ ১৩১৫—এক যুগ ধরিয়া একটা প্রবন্ধ আর কোন বাঙ্গালা কাগজে কখনও বাহির হয় নাই। পাঠকের ত ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছেই—বন্ধুবর্গেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছে। তাঁহারা সকলে আমাকে প্রবন্ধ শেষ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন। তাঁহাদের কথা শিরোধার্য্য করিয়া কার্য্যে ব্রতী হইলাম, ভরসা করি মা জগদম্বার কৃপায় ও শ্রীশ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদে আমার আশার সাফল্য হইবে। এই বার কর্ম্মযোগের কথা।

জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ প্রধানত এই তিনটী বিভাগ হইলেও কোন একটী প্রস্তাবিত বিষয় কোন্ বিভাগে পড়িবে সে বিষয়ে বিলক্ষণ গোলযোগ আছে। কাহারও মতে যোগটা কর্ম্মযোগের অন্তর্গত। কেন না যোগের মধ্যে ষটচক্র ভেদ রূপ ক্রিয়া আছে। হট্ যোগে ত এক রূপ জিম্ন্যাস্টিক্ বা ব্যায়াম। কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন যে যোগটা জ্ঞানযোগের অন্তর্গত। ৩৯ অধ্যায়ের প্রারম্ভে আমি জ্ঞানযোগ, কর্ম্ম-যোগ ও ভক্তিযোগ সম্বন্ধে পরমহংসদেবের মত তাঁহার অতি বিশদ ভাষায় বিবৃত করিয়াছি। পাঠক মহাশয় দেখিবেন। আমি কিন্তু বোধ সৌক-র্য্যার্থে কেবল কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে তাঁহার কথাগুলির পুনরুল্লেখ করিলাম।

কর্ম্মযোগ—জীব কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না—কর্ম্ম তাহার প্রকৃতি-গত। ইচ্ছা না করিলেও কর্ম্ম করিতে হয়। সেই জন্য অনাসক্ত ভাবে অর্থাৎ কর্ম্মের ফল আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কর্ম্ম করিতে হয়। পূজা, হোম, জপ, তপ কর কিন্তু দেখিও যেন লোক মান্য হইবার জন্য বা পুণ্য কর্ম্ম করিবার জন্য তোমার এ কর্ম্ম না করা হয়।

কলিতে কর্ম্মযোগ ভারি কঠিন পূজা করিলাম মহোৎসব করিলাম কোথা হইতে একটু লোক মান্য হইবার ইচ্ছা এসে পড়ে। তাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে হয়। হে ঈশ্বর আমার কর্ম্ম কমিয়ে দাও, যে টুকু কর্ম্ম কর্‌ব যেন অনাসক্ত হয়ে কর্ত্তে পারি।

আমি চিন্তা করিতেছি, আমি ধ্যান করিতেছি ইহাও কর্ম্ম। যে একবার ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছে কেবল সেই অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম কর্‌তে পারে।

কর্ম্ম জীবনের উদ্দেশ্য নয়। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। কর্ম্ম একটা উপায়ও নয়। নিষ্কাম কর্ম্ম একটা উপায় বটে—কখনও উদ্দেশ্য হইতে পারে না। (বিলাত প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশবাসীরা কর্ম্মকে যে জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে সেটা তাদের ভুল।)

প্রথমেই শ্রীমদ্ভগবদগীতায় কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে কি আছে তাহা দেখিব। শ্রীভগবান স্বয়ং এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা আলোচনা করা সঙ্গত নহে কি?

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

"নৈবেদ্য।"

দেবি বহুদিন হতে আছিল বাসনা,
সপুষ্প নৈবেদ্য এক সঁপি' তব পদে,
পূতমন্ত্রে করি' শেষ পূজা সমাধান,
সমাপিব জীবনের ব্রত এ ধরায়।
শুভদিন সমাগত আজ—শুভলগ্ন;
ওই শুন বাজে বাদ্য সপ্তসুরা বীণ
সমসুরে সুগম্ভীরে এ বিশ্বমন্দিরে;
ওই শুন সুমধুর প্রতিধ্বনি তার
বাজিছে গগনপ্রান্তে বসন্ত পবনে,
যেন কহি' চরাচরে "কে কোথায় আছ
চল এস—ছুটে এস এ মাহেন্দ্রক্ষণে;
চির-আকাঙ্ক্ষিত ওই সাধনার ধন
ভুবনমোহনরূপে সম্মুখে তোমার;
আত্মনিবেদন পদে কর এই বেলা।"
ওই শুন বাজে শঙ্খ অন্তরে আমার
আকুল আহ্বানে পুনঃ আহ্বানিয়া মোর
অন্তর-আত্মারে, কহি' "বৃথা দিন যায়;
কি কর নিশ্চেষ্ট বসি' অবোধ সাধক;
সংসারের বাধা বিঘ্ন সব উপেক্ষিয়া
এই বেলা আত্মদানে তুষ্ট কর তব
ইষ্টদেবতারে; মেগে লও আশীর্ব্বাদ—
মেগে লও তোমাপ্রতি চিরপ্রীতি তাঁর।"
দাঁড়াও দাঁড়াও তবে পুরোভাগে মোর,
দাঁড়াও বারেক, দেবি, আজি একবার
রাজরাজেশ্বরী-মূর্ত্তি ধরিয়া কৃপায়।

পূর্ণিমা।

এত দিন পথপানে সতৃষ্ণনয়নে
আছিনু চাহিয়া ; এল শুভতিথি আজ,
দেহ, দেবি, দেহ তবে অনুমতি মোরে,
স্নেহগঙ্গোদকপূত প্রেম অনুরাগ
-চন্দনলেপিত এই প্রাণপুষ্প সনে
দেহ ডালি নিয়োজিব তোমার পূজায়।
দীন এ নৈবেদ্য যদি, তবুও সে জেনো
আন্তরিক ভক্তিমাখা তোমারি ভক্তের,
অতএব উপেক্ষার নহে যোগ্য কভু,
ভক্তশ্রেষ্ঠ বিদুরের তণ্ডুল যেমন
হয় নাই ভক্তাধীন কৃষ্ণের উপেক্ষ্য।

শ্রীচুনীলাল সেন।

হিমালয় বনভূমি।

দার্জিলিং।

গোড়াতেই বিড়ম্বনা দেখুন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ই ২৫শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার আমাদের দার্জিলিং যাত্রার দিন ভাল বলিয়া স্থির করিয়া দেন, কিন্তু ২৩শে আসিয়া তিনিই বলিলেন, "আমার খুড়া মহাশয় আসিয়াছেন, তিনি বলিতেছেন, যে ২৭শে মঙ্গলবার গঙ্গাস্নানের মহা যোগ, তাহার পূর্ব্বে তুমি বাবুকে তাড়াইয়া দিতেছ কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া তুমি গঙ্গার মাহাত্ম্য ভুলিয়া যাইতেছ।" আমি কথাটা শুনিয়া একটু হাসিলাম, মনে মনে ভাবিলাম, যখন হিমালয় সন্দর্শনে যাইতেছি, তখন হিমালয়-কন্যা গঙ্গা তাহাতে আমার উপর সন্তুষ্ট ব্যতীত কখনই রুষ্ট হইবেন না। এ পর্য্যন্ত কোন স্ত্রীলোক 'তোমার বাপের বাড়ী যাইতেছি' বলাতে আহ্লাদিত হন নাই, এমন কখন শুনি নাই, দেখি নাই— তা কি, অর্দ্ধাঙ্গিনী পত্নী, দেবী সদৃশা মাতা, আর কি পাড়া প্রতিবেশী মামী মাসী। হৌন্ না কেন গঙ্গা দেবতা—স্ত্রীলোক ত বটেন, আমি এ বয়সে এত কষ্ট করিয়া, অর্থ ব্যয়

করিয়া তাঁহার পিতৃ সন্দর্শনে যাইব, আর তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন,—তা কখন হইবে না, মঙ্গলবারের স্নানের পুণ্য অবশ্যই পাইব। আমার মনের খুঁৎখুতুনি চলিয়া গেল; কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে এ কথা ভাঙ্গিলাম না; তিনি অগাধ শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও, আমার শাস্ত্র তাঁহার ত পড়া নাই।

বুড়ো যাবে হিমালয়, সঙ্গে যাবে কে?
আরও দুটা বুড়া আছে, কোমর বেঁধেছে।

পেন্‌সন্‌প্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট জজ শ্রীযুক্ত শ্যামচাঁদ ধর, এবং কলের সাহেবদের কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত কালীকুমার সেন, আমার দুই বাল্যকালের বন্ধু আমার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত; শ্যামের দুই পুত্র আমাদের পূর্ব্বেই যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং পৌঁছিয়া আমাদের খবরাখবর দিতেছিলেন, আমার কনিষ্ঠ পুত্র অচ্যুতচন্দ্র আমার সঙ্গেই চলিলেন; রবিবার পূর্ব্বাহ্নে আমরা পিতাপুত্রে আহারাদি করিয়া তল্পি তোবড়া লইয়া শ্যাম-সদনে উপস্থিত, কালীকুমারও সেই স্থানে আছেন; তবে তাঁহারা তখনও দোমনা। আমি তাঁহাদের একমনা করিয়া দিলাম, তাঁহারা প্রস্তুত হইলেন, তাঁহারা বলেন, আমার স্ফূর্ত্তি দেখিয়াই তাঁহাদের মতি স্থির হইল। দুই প্রহরের পর আমরা কলিকাতা রওনা হইলাম। সেখানে ৩ ঘণ্টা সময় পাওয়া গেল, অচ্যুতচন্দ্র এটা ওটা ক্রয় করিয়া লইলেন; আমি কিছু জল-খাবার তৈয়ার করাইয়া লইলাম। শ্যাম বাবু কালী বাবুর সঙ্গে জলখাবার ছিল; আম আমাদের সকলেরই সঙ্গে ছিল।

রবিবার অপরাহ্ণ ৫টার সময় দার্জিলিং মেলে একটী কামরায় আমরা ৪ জন আর একজন অপরিচিত লইয়া ৫ জন আরোহী, গড়্ গড়্ চলিয়াছি। নদে জেলার ভিতর দিয়া যখন যাইতেছি, তখনও পার্শ্বের ক্ষেত্রগুলি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—ছোট ছোট পাটের চারা হইয়াছে; আউশ ধান কোথাও এক ছটাক আবাদ হয় নাই। পাটের ও ধানের তুলনা চলিল। ধান্য—লক্ষ্মী; পাট—মুদ্রা। আমরা মুদ্রা অপেক্ষা লক্ষ্মীর গৌরব গান করিতে লাগিলাম। রেলগাড়ী, আমাদের উপহাস করিয়া গর্জন করিতে করিতে পদ্মা অভিমুখে ছুটিল।

বিপদে পড়িয়া যে হাসিমুখে কষ্ট সহ্য করিতে পারে, অবসন্ন হয় না,—সেত মহাশয় ব্যক্তি। যে বাল্যে কিশোরে, গুরূপদেশে কষ্ট, কঠোরতা, সংযম শিক্ষা করে, সে বয়সকালে, হবে' মহাশয়; কিন্তু এই বুড়ো বয়সে, এই যে আমরা সক্ করিয়া কষ্ট ভোগ করিতেছি—আমরা কি? এই কয়েদীর মত কঠিন কাষ্ঠাসনে, পাঁচ জনে বসিয়া আছি—এ কষ্ট নয়ত কি। কষ্ট বটে—তা ধরি আর নাই ধরি—গায়ে মাখি, আর নাই মাখি। সক্ করিয়া এইরূপ কষ্ট সহ্য করা কেন? ইহাকে কি বলিব? পাগলামি নয় কি? পাগলামি বটে, তবে পাগলের সংখ্যা বেশী হইলে, পাগলামির নাম বদল হয়। দেবতার পাগলামী—লীলা; বালকের পাগলামি—খেলা; মানুষ মারায় হয়—বাহাদুরি। প্রজা-পীড়নে হয়—জমিন্দারী; ব্যবসাদারিতে হয় রাজগিরি। বক্তৃতায় হয়—দেশোদ্ধার, বাজি ফুটায়ে রাজ্যোদ্ধার। ধনীর পাগলামি—উদারতা, মধ্যবিত্তের পাগলামি—লৌকিকতা। বিজ্ঞের পাগলামি—জাতীয় সমিতি; অজ্ঞের পাগলামি—বিজাতীয় অনুকরণ। আমাদের মত পাগল বিস্তর—কাজেই আমাদের পাগলামির নাম—স্বাস্থ্য সন্ধান। রেলগাড়ীর হেচ্‌কা টানে হাড়চূর্ণ হইতে লাগিল—আমরা স্বাস্থ্য সন্ধানে চলিয়াছি।—সে বেশ।

রাত্রি ৯টার সময় ঝক্‌ঝকে ইলেক্‌ট্রিক আলোতে, ষ্টীমারের উপর ডেকে ধূলার উপর চাপড়ুলি খাইয়া বসিয়া আমরা—বেশ ধীরে সুস্থে পদ্মা পার হইতেছি। তরঙ্গ-ভঙ্গ নাই—ষ্টীমারের ঝাকানি নাই, পদ্মার গর্জন নাই, কোন বালাই নাই—টাইম্‌টেবেলে লেখা না থাকিলে, কিসে বুঝিতাম যে পদ্মা পার হইতেছি। কিন্তু বাস্তবিক আমরা পদ্মা পার হইলাম; অথচ পদ্মা দেখিতে পাই নাই।

পদ্মা পারে ছোট গাড়ী। বড় ভয়, বড় ভীড় হইবে। তাহা কি[illegible] হইল না। আমরা ৪ জন একরূপ গুছাইয়া লইলাম। কিন্তু এইখানে একবার গাওনা বন্ধ হইয়া সঙের পালা আরম্ভ হইল। বঙ্কে এক বর্ষীয়[illegible] বাবুর কি একটা জামা ঝোলান ছিল, কালী বাবু তাই সরাইতে গিয়া বলিয়াছিলেন "এটা কি তোমার জামা?" আর যাবি কোথা? ব[illegible] একেবারে উস্তং পুস্তং মহারাগ—রাগের উপর বক্তৃতা। কালী বাবু হয় চু[illegible] করিয়া থাকিতে বা একটু বিনয় দেখাইতে পারিতেন, তা না করিয়া জবাব দিলেন, 'তাতে হয়েছে কি?' সঙের পালা চলিল, কয়জন হিন্দুস্থানী আরোহী ছিলেন, তাঁহারা কিন্তু একটা কথা বলিয়া পালা ভাঙ্গিয়া দিলেন। বলিলেন, "বাবু সাহেব! স্বদেশীর দিনে এমন করিতে নাই।" স্বদেশীর জয় হইল ও পালা একরূপ বন্ধ হইল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

[illegible] এক ঘণ্টা পরে নাটোরে পৌঁছিল। আমি জানিতাম নাটোরের সন্দেশ ভাল। এত বয়স হইল, কিন্তু কোথায় কোন্ জিনিস্ ভাল পাওয়া যায় সেটা আমার মুখস্থ আছে। মানকরে কদ্‌মা, মোকামায় মাখন—এ সকল এখনও ভুলি নাই। অচ্যুতকে বলিলাম—নাটোরের সন্দেশ কিনিতে; তাহা [illegible]যোগ হইল।

[illegible] বড় গ্রীষ্ম, আমরা সকলেই জানালাগুলি খুলিয়া দিয়াছিলাম, আমি কেবল আমার মাথার কাছের দুটী বন্ধ করিয়াছিলাম। ঘুমাইয়া পড়িয়াছি—ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি মহা ঝড় বৃষ্টি চলিতেছে, ঘরগুলি সমস্ত বিষম ঠাণ্ডা হইয়াছে; আমাকে একটু সর্দ্দি লাগিয়াছে। সকলেই জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। আবার নিদ্রা—নিদ্রাভঙ্গে দেখা গেল ভোর হইয়াছে। একটু বেলা হইলে আমরা শিলিগুড়ি পৌঁছিলাম। এ রেল শেষ হইল।

[illegible]শিলিগুড়ি হইতে অতি ছোট রেল। বড় বড় মালপত্র আমরা প্রথম হইতেই ব্রেকে দিয়াছিলাম—সঙ্গে অল্প স্বল্প ছিল; তাহা নাকি কাড়িয়া লইবে; তা করিতে হইল না, আমরা একরূপ সচ্ছন্দেই বসিলাম। শিলিগুড়ি হইতে শুকনা; এইখান হইতে প্রকৃত হিমালয় আরম্ভ হইল; বিরাট ব্যাপার—বিরাট বন—কিরূপে বর্ণনা করিব বুঝিতে পারিতেছি না।

[illegible]সে গোচারণের মাঠ আর নাই।

অমল শ্যামল তৃণে ঢাকা ধরাতল,
বহুদূর ভোরপুর সবুজ কেবল;

তাহাও আর নাই। তিউর, বা পরেশনাথও আর নাই—

পাহাড়ীর ঢালু গায় চরে গাভীদল

সে সকল কিছুই নাই।

[illegible]হিমালয় প্রদেশের বনভূমি—গাছ পালা, লতা পাতার—সমুদ্র,—লিখিতে

যাইতেছিলাম, সমুদ্র যে সম ধরাতল। গাছ পালা লতা পাতার অনন্ত বি
জটিল সংঘটন। সমুদ্র দেখিলে অনন্তের আভাস পাওয়া যায়; সুনীল আ
শেও অনন্ত—অনন্ত কোমলতা; নক্ষত্রপুঞ্জ খচিত পরিষ্কার আকাশেও অনন্ত
অনন্ত সুন্দর—মধ্যে মধ্যে বিদ্যুদ্দাম স্ফুরিত গভীরা ত্রিযামার মসীময়ী
বিকট শব্দে শব্দায়মানা নভঃস্থলীতেও অনন্ত—সে অনন্ত কে যেন
এক রূপ বিরাটতর অনন্ত সান্ত করিয়া রাখিয়াছে; হিমালয় প্রদে
বনভূমি সেইরূপ—যেন মহান্ অনন্তদেবের বিরাট মায়াময় খেলাঘর।
খেলা বুঝি আর কোথাও নাই! বিশাল ক্ষুদ্রকে আশ্রয় দিয়াছে, আলি
করিয়াছে, মাথায় তুলিয়াছে। কত শত বিশাল শাল্মলী তরুর পাদ
সহস্র আয়ত চক্ষু মেলিয়া ধুস্তূরা চাহিয়া আছে বন্যলতা পুঞ্জীকৃত
লইয়া শাল্মলীর বক্ষঃ বেষ্টন করিয়া আছে; আর বন্য বেগ্‌নোলিয়ার
রাশি লাল ফুল বিছাইয়া শাল্মলীর কাঁধে চড়িয়া মাথায় ছাতা ধরিয়া
উৎকটে কোমলে, বিশালে সুন্দরে—কি অপূর্ব্ব মাখামাখি!

এমন বিশৃঙ্খলায় শৃঙ্খলাও আর কোথাও দেখি নাই। বিশৃঙ্খলা
কি শৃঙ্খলাপূর্ণ বলিব,—তাহা বুঝিতেই পারি না। সমুদ্রের তরঙ্গে
বৈচিত্র; আকাশে বায়ুভরে বৈচিত্র—এই এক রূপ, আবার পর
অন্যরূপ। বনভূমির বৈচিত্র অন্যরূপ। ছোট বড় বৃক্ষ,—সূক্ষ্ম
পদে, উরুতে, কটিদেশে, বক্ষে, বাহুতে, স্কন্ধে জড়াইয়া লইয়া,—
নিথর, অনড়, অসাড় দাঁড়াইয়া আছে। নাইবা থাকিল—পবন-বেগ,
থাকিল চলৎ-মেঘ, আপনাদের গাম্ভীর্য্যে, স্থৈর্য্যে, সৌন্দর্য্যে,
আপনারা ভোর হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—এই এক বৈচিত্র। দাঁ
আছে—কোথায়? পর্ব্বতের শিরোদেশে, স্কন্ধে, সানুদেশে, অধি
উপত্যকায়, গুহায়, গহ্বরে, খালে, জোলে, পাতালে। সর্ব্বত্রই
সৌন্দর্য্য, সর্ব্বত্রই বনস্পতির রাজ্য। যিনি বনপতি না বলিয়া, ব
বলিতে ব্যাকরণের ছলনায় উপদেশ দিয়াছেন,—তিনি ধন্য—তিনি
সত্যই এই বনস্পতিগণের পরিচয় পাইয়াছিলেন। হসন্ত দন্ত্যসয়ে কি
মহিমাই প্রকাশ পাইয়াছে।

এই বনস্থলীতে, কায়ব্যূহময়ী বিভীষিকা, কায়ব্যূহময় সৌন্দর্য্যে

আলিঙ্গনে ধরিয়া রাখিয়াছে। যেন অর্দ্ধ নারীশ্বর। সুন্দরে চিত্তবিনোদন
হয়, বিভীষিকায় সন্ত্রাস জন্মে, কিন্তু সুন্দর বিকটের বিচিত্র সম্মিলনে হৃদয়ে
অপূর্ব্ব আনন্দ হয়।

তুমি আমি সকলেই সরলের প্রশংসা করি, সরলতা ভালবাসি। ভাল-
বাসি সরলা কামিনীর রূপ, অদন্ত শিশুর মধুর হাসি, ফুলের সুগন্ধ, ফলের
মিষ্টতা; ভালবাসি প্রেমের অশ্রু, দয়ার দ্রাবকতা; ভালবাসি সরলের
সরলতা। এই বনভূমিতে বনস্পতিমণ্ডলীর বিলাস-লীলা কিন্তু বড়ই জটি-
লতাময়ী। শাখায় শাখায়, শাখায় লতায়, লতায় লতায়—ক্ষুপেতে, গুল্মেতে
লতায়, পাতায়, এমন জটিলভাবে জড়াজড়ি, তলভূমিতে এতই জঙ্গল, যে
সেই জটিলতায়, সেই জঙ্গলে হাতীর উপর হাতী, তার উপর হাতী থাকি-
লেও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জটিল জঙ্গলময়ী বনভূমি দিনেই
অদৃশ্যস্পৃশ্যরূপা, অন্ধকার নিশীথে কি বিভীষিকাময়ী। মনে করিতেও
অঙ্গ কণ্টকিত হয়।

কিন্তু এখন এই যে গাড়ী চলিয়াছে—আমরা নিস্পন্দভাবে বনভূমি
দেখিতেছি, এখন ইহা কি অপূর্ব্ব শোভাই না ছড়াইতেছে! শ্রীভগবানের
লীলা রহস্যময়ী; তিনি স্তন্য পান করিতে করিতে রাক্ষসী পূতনার বধ সাধন
করেন; তিনি নারীহস্ত-সেবিত কুঙ্কুম-চন্দনে শোভিত হইয়া কংসদৈত্যের
বিনাশ সাধন করেন; তাঁহার শঙ্খনাদে বিশ্বপরিপূরিত, তাঁহার চক্রে বিশ্ব
ঘূর্ণায়মান, তাঁহার গদায় সন্ত্রস্ত এবং তাঁহার পদ্মের সৌরভ পিযূসপানে
সকলেই পুলকিত। ধন-ধান্যপূর্ণ শোভাময় রাজ্যও যেমন তাঁহার—এই
ঘন বিজন-কানন, শাল্মলী, শাল, শিশু, চম্পক, কদম্ব, কোবিদার,—চিনানী
পানী, লীম্পতিয়া পূর্ণ নিবিড় অরণ্যও তাঁহারই লীলাখেলার বিচিত্র
বোটানিকাল গার্ডেন। বলিহারি ইহার বৈচিত্র, বলিহারি ইহার জটিলতা—
বলিহারি সুন্দরে বিকট,—বিকটে সুন্দর। এই নিবিড় অরণ্যানী ভেদ
করিয়া, পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়া, ফিরিয়া ঘুরিয়া দার্জ্জিলিঙ্গ-হিমালয় রেলগাড়ী
ছুটিয়াছে। ৺তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'দার্জ্জিলিঙ্গ প্রবাসীর পত্রে'
বলিতেছেন, "রেলগাড়ী আরোহী লইয়া গর্ভবতী ললনার মত হেলিয়া দুলিয়া
মন্থর গতিতে চলিতে আরম্ভ করিল।" এটি ১৮৯৫ সালের কথা—এখন এই

১৯০৮ সালে, ভূমিকর্ষণকারী আতসবাজীর মত—শোঁ শোঁ শব্দ করিতে করিতে ছুটিতে লাগিল। আর যদি কোন ললনার উপমা দেওয়াই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, আজি কালি কলিকাতায় যেমন ট্রাম গাড়ীর নীচে কিছু শব্দ হইলে ফিরিঙ্গী রমণী ঘাগরা গুটাইয়া, উর্দ্ধশ্বাসে ট্রামের বিপরীত দিকে বেগে ছুটিতে থাকেন, সেইরূপ ভাবেই ট্রেন চলিতে লাগিল।

বিশ্বপতির এই বিপুল বিরাট—বিশ্ব-কাননের মধ্য দিয়া, ক্ষুদ্র মানব তাহার বেশ বাহাদুরি দেখাইয়াছে। গাড়ীত নয় যেন বাজিকরের বাজি, এই ঘুরিতেছে, এই ফিরিতেছে, এই ধনুকের মত হইয়া চলিয়াছে, এই তীরের মত ছুটিয়াছে, এই চাকার মত হইয়া ঘুরিয়া আসিল, এই পীপড়ার সারির মত পর্ব্বত-গাত্রে আস্তে আস্তে উঠিতেছে—বাজিকরের বাজি বাতীত আর কি বলিব? মানুষ যে বড় বাজিকরের বেটা—ছোট বাজিকর;—মানুষ তাহার প্রমাণ এইখানে একরূপ করিয়াছে। তবে মধ্যে মধ্যে গাড়ী এত ধার দিয়া দৌড়িতে থাকে যে মনে হয়, এইবার বুঝি মানুষের বাহাদুরি শেষ হইল; আমরা মারা পড়িলাম। সোমবার প্রায় বেলা ১১টার সময় আমরা কর্শিয়ং ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। সমুদ্র সমতল হইতে আমরা প্রায় ৫০০০ ফুট উর্দ্ধে উঠিয়াছি। সেই দিনই আমাদের দার্জ্জিলিঙ্গ যাইবার কথা ছিল। কিন্তু আমাদের পিতাপুত্রের তাহা হইল না। শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্র পাঠক ষ্টেশনের কর্ম্মচারী, ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন; তিনি আমার সুপরিচিত হইলেও আমি তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। তিনি পরিচয় দিয়া, আমাদের যত্ন পূর্ব্বক নামাইয়া লইলেন। বহুপূর্ব্বে তাঁহার পিতা গোয়ালন্দে কর্ম্ম করিতেন। ঢাকা যাতায়াতের অবসরে তাঁহার বাসায় দৌরাত্ম্য করিতাম, সুতরাং শরচ্চন্দ্রের বাসায় যাইতে কিছু কুণ্ঠা বোধ করিলাম না—বুঝিলাম, আতিথ্য-রোগ পুরুষ পরম্পরা চলে। শ্যাম বাবু কালী বাবু আমাদের ছাড়িতে নেহাইত নারাজ, তবে একেবারে বারণ করিতেও পারিলেন না। তাঁহাদের গাড়ী ছাড়িয়া দিল, আমরা জিনিসপত্র লইয়া শরচ্চন্দ্রের বাসার পার্শ্বে একটী খালি বাড়ীতে আসিলাম। শরতের সুন্দর আতিথ্যে স্নানাহারের পর নিদ্রা। দিবা নিদ্রার পর শরীর ভার ভার গলায়

সর্দ্দি হইল; প্রায়শ্চিত্ত করিতে বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইলাম, পথশ্রম, দূরদেশে ভ্রমণ—শারীরিক কষ্ট, অর্থ নষ্ট—সকলই সার্থক হইল। আমি কর্শিয়ংএর গির্জার নিম্ন প্রদেশ হইতে এই সোমবারের শুভ বৈকালে—কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রভৃতি হিমালয়ের পাঁচটী শৃঙ্গ দেখিতে পাইলাম—রজত তাম্বুর মত ঝক্‌মক্ করিতেছে। পরদিন প্রাতঃকালে আবার সেই স্থানে গিয়া সেই অপূর্ব্ব বিচিত্র দৃশ্য দেখিলাম; মনে করিলাম আর দার্জ্জিলিং না গেলেও চলে, গৌরীশঙ্কর দর্শন আমার ভাগ্যে নাই।

মঙ্গলবার, সেই দিন, সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া আবার সেই মেল ট্রেন ধরিলাম। অপরাহ্নের পর দার্জ্জিলিং পৌঁছিলাম। স্বাস্থ্যাবাসের লোক আমাকে আদর করিয়া, মুটেনিকে দিয়া জিনিসপত্র লইয়া, সঙ্গে লইয়া চলিল। পরে বুঝিয়াছি, সে আদর ভ্রম ক্রমে করিয়াছিল। কেননা আমাদের জন্য স্থান সঙ্কুলান করা ভার হইয়া উঠিল। শেষে একটা নিতান্ত অপকৃষ্ট একতালা ঘরে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর হিসাবে ভাড়া দিয়া রহিলাম। তিন দিন পরে প্রথম শ্রেণীতে আসিয়াছি। এ ঘর অবশ্য উপর তলায়, এবং বড় সড়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; আলোক বাতাস বেশ আছে।

কুচবিহারের মহারাজ ৫০,০০০৲ টাকা মূল্যের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড দান করাতে এই স্বাস্থ্যাবাসের পত্তন হইয়াছে। রঙ্গপুরের রাজা গোবিন্দলাল রায় ৯০,০০০৲ টাকা, এবং রঙ্গপুর জেলার ডিম্‌লের রাজা জানকীবল্লভ সেন ঐরূপ অর্থ দান করাতে এই সুবৃহৎ ভবন হইয়াছে, আরও বহুতর লোক, এজন্য দান করিয়াছেন। স্থানটী কিন্তু ভাল নহে। ষ্টেশনের নিকটেই বটে, কিন্তু ষ্টেশন হইতে ৫।৬ তলা নিম্নে, এবং প্রায় চারি দিকেই উচ্চ পাহাড় ও বৃক্ষরাজিতে বেষ্টিত; খোলা হাওয়া প্রায়ই পাওয়া যায় না। স্বাস্থ্যাবাসের এইরূপ অবস্থান, একটী মহা বিড়ম্বনা বলিতে হয়।

আর এক বিড়ম্বনা—ইহার নিষ্ঠাচার হিন্দু-বিভাগ, (Orthodox-Hindu Department) Orthodox শব্দে নিষ্ঠাচার লিখিয়া ঠিক করিলাম কি না, বলিতে পারি না, তবে এই বিভাগে নিষ্ঠাচার কিছু নাই, তাই বলিতেছি। সন্ধ্যা আহ্নিকের ব্যবস্থা ইত্যাদি কিছুইত নাই। পলাণ্ডু পর্য্যন্ত মাংসে প্রত্যহ চলিতেছে। আর আচমনী, অনাচমনীয়—সে সকল বিভাগের কোন

গোলযোগই নাই। তবে লেপ্‌চ ম্লেচ্ছ পাহাড়ীর দেশে একটা হোটেলে আসিয়া কোনরূপ হিন্দুয়ানির দাবি করা, নিতান্ত অসঙ্গত; কিন্তু নামটা Orthodox আছে বলিয়াই এত কথা, নতুবা Heterodox Hindu department বলিলেই সকল গোল মিটিয়া যাইত; শুনিতেও বেশ অনুপ্রাস হইত।

আচারের কথা ছাড়িয়া দিলে স্বাস্থ্যাবাসে আহারের বন্দোবস্ত বেশ ভাল; চিকিৎসার জন্য বেশ সুযোগ্য ডাক্তার আছেন, ভাল ঔষধালয় আছে। ডাক্তার বাবুকে ফীচ্‌ দিতে হয় না, ঔষধের মূল্য লাগে না। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু হরিমোহন চন্দ্রের উদ্যোগেই এই স্বাস্থ্যাবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এখনও তিনি এই স্বাস্থ্যাবাসের তত্ত্বাবধারক শ্রেণীর সম্পাদক এবং প্রত্যহই ইহার পরিদর্শন করিয়া থাকেন। তিনি বলেন, যে এই স্বাস্থ্যাবাসটী আর একটু বিস্তৃত করিয়া দিতে পারিলে, তিনি তাঁহার জীবন সার্থক মনে করিবেন; কথাটী পরম সত্য, স্বাস্থ্যাবাসই তাঁহার প্রাণের স্বরূপই বটে।

খুলনা জেলার দৌলতপুর কলেজের ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধারক একজন অধ্যাপক। সেইরূপ তত্ত্বাবধানে হরিমোহন বাবু যদি এই স্বাস্থ্যাবাসের একটী বিভাগ খুলিতে পারেন, তাহা হইলে, ধন্য হইতে ধন্যতর হইবেন।

দার্জিলিংয়ের বোটানিকাল বাগান দেখিবার জিনিস। পার্ব্বতীয় প্রদেশের বিস্তর মহীরুহ এইখানে জন্মিয়াছে; অপূর্ব্ব শৃঙ্খলায়, এবং শোভায় বর্দ্ধিত হইতেছে; এরূপ কলিকাতার নিকট শিবপুরেও নাই। ভারতবর্ষে বোধ করি আর কোথাও নাই। সমতল ভূমিতে অপূর্ব্ব উপবন, একরূপ পদার্থ, আর এই উচ্চে নীচে, শিখরে, গহ্বরে বনস্পতির বৃক্ষরাজির ক্ষুপ গুল্মের খেলা, আর এক কাণ্ড। এখানে খোদার কার্য্যের উপর মানুষ খোদকারি করিয়াছে। মহেশের মহৈশ্বর্য্য অসীম; মানবের এই সসীম ঐশ্বর্য্যে মানবেরও গৌরব করিবার আছে। মোটের উপর দার্জিলিং সহরটাই সর্ব্বত্র খোদার উপর খোদগারি। পর্ব্বত শিখরের উপর সৌধ চূড়া। তবে অন্যান্য সহরে যেমন মানবের কৃত্রিমতাই বেশী বেশী এখানে সেরূপ নহে; স্বভাবের শোভাই জাজ্বল্যময়ী—মানব, নোক্তাচুনী করিয়াছে মাত্র। ছোট লাটের বাড়ী, বর্দ্ধমানের মহারাজের বাড়ী, (Mall) মল নামক ছোট চৌরঙ্গী

এ সকলই মানবের ঝাড় বুটি করিবার পরিচয়। কিন্তু দার্জিলিংয়ে স্বভাবকে পরাস্ত করিবার কোন উপায় নাই। যতই বাড়ী কর, চূড়া বনাও স্বভাবের মেঘমালা আসিয়া মূহুর্ত্তে সে সকল ঢাকিয়া ফেলিবে। বুঝাইবে মানব গর্ব্ব অসার।

দার্জিলিঙ্গে মেঘের খেলা বড়ই মহিমাময়ী। আমাদের দেশের মেঘ আমাদের হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ; হতে পারে দেবতার মায়া, হতে পারে স্বর্গের ছায়া, হতে পারে তুলার বস্তা, হতে পারে বাষ্পরাশি, যাহাই হৌক, মেঘ আমাদের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; দূরে, দুর্ল্লভ, অস্পৃশনীয়। সেখানে মেঘ কেবল দর্শনীয় মাত্র। এখানে মেঘ অসীম হইলেও, বিরাট হইলেও, লীলাময় হইলেও, ছায়াময় হইলেও, আমাদের নিতান্ত ঘরের লোক। ঘরে আসিতেছে, কাপড় শুকাইতে দেয় না, এই অন্ধকার করে, এই রৌদ্রের তেজ বাড়াইয়া ঝক্‌ ঝক্‌ করিতেছে। এই আমাকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে, এই আমা হইতে চলিয়া গিয়াছে। এই নাচিতেছে, এই ধীর গম্ভীর হইয়া নীচর দাঁড়াইয়া আছে। যাহাই হৌক,—মেঘ কিন্তু আমাদের ঘরের লোক। দেখিলে আনন্দ হয়, আবার ব্যবহারে রাগ হয়; ঘরের লোকের সঙ্গেও ত সেইরূপ হইয়া থাকে। এই মেঘের লীলাখেলার বর্ণনা করা অসাধ্য, বঙ্গ সরস্বতী আমাকে মার্জ্জনা করিবেন, বোধ করি বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর রস্কিনের লেখনীতে মেঘমালার বর্ণনা পাঠ করিয়াছি, বাঙ্গালায় সেরূপ লেখা অসম্ভব। আর রস্কিন স্বভাবের চিত্রকর, আমি সে বিচিত্র তুলিকা কোথায় পাইব? বাস্তবিক এখানে আসিয়া কবি হইতে ইচ্ছা হয়! এই সেই অস্ত্যুত্তরস্যাংদিশি—দেবতাত্মা হিমালয়নাম নাগাধিরাজ—কিন্তু সে সরস্বতীর বরপুত্র সকল কোথায়?

হিমালয় প্রদেশে আসিয়া কবি বেহারীলাল চক্রবর্ত্তীর সারদামঙ্গলে হিমালয় বর্ণন শতবার মনে পড়িতেছে, কিন্তু মিলাইয়া উঠিতে পারিতেছি না,

বিশ্ব যেন ফেলে পাছে,
কি এক দাঁড়ায়ে আছে!

কথাগুলি বেশ! কিন্তু এরূপ ভাবত কোথাও দেখিতে পাই না! বরং এরূপ দেখিতে পাইলাম।

পূর্ণিমা।

ওই কি হে ধব ধব
তুঙ্গ তুঙ্গ শৃঙ্গ সব
ঊর্দ্ধমুখে ধেয়ে গেছে ফুড়িয়া অম্বর।
দাঁড়াইয়া পাদদেশে
ললিত হরিত বেশে
নধর নিকুঞ্জরাজি সাজে থরে থর!

এটীও বেশ মিলান যায়;—

কিবে ওই মনোহারী
দেবদারু সারি সারি
দেদার চলিয়া গেছে কাতারে কাতার।
দূর দূর আল বালে,
কোলাকুলি ডালে ডালে,
পাতার মন্দির গাঁথা মাথায় সবার।

সকল ভুল মিলাইতে পারি, আর নাই পারি,—পাঠক একবার চক্রবর্ত্তীর হিমালয় বর্ণন পাঠ করিবেন; আমার লিখিতে না পারার ক্ষোভ রহিল, আপনাদের কেন ক্ষোভ থাকিবে। আমার অনুরোধ রক্ষা করুন, আর অদ্য আমাকে বিদায় দিউন। আজি জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি পূর্ণিমা, আগামী কল্য একবার আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে, পর্ব্বতে মেঘের খেলা দেখিয়া মেঘদূত-কারকে স্মরণ করিব, লিখিতে পারিব না। মঙ্গলবারে পুনর্যাত্রা আরম্ভ করিব মনে করিতেছি। কনিষ্ঠ পুত্র সঙ্গে আসিয়াছে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহার লেখা অভ্যাস একটু আধটু আছে, পাঠক তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই পাইয়াছেন, সেই ভাল করিয়া দার্জ্জিলিং দেখিয়াছে, আষাঢ়ে তাহাকে দিয়া দার্জ্জিলিং ও ঘুম বর্ণনা লেখাইব মনে করিতেছি।

জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাসংক্রান্তি।
দার্জ্জিলিং।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

দেশভ্রমণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বপত্রে তোমাকে তসর-চাষ সম্বন্ধে কয়েকটা সংবাদ দিয়াছি। ইতিমধ্যে আমরা তসর-চাষ ও খাসমহল সম্বন্ধে শিক্ষা শেষ করিয়াছি। ২।৩ দিনের মধ্যে আমরা মফস্বল পরিদর্শনে বাহির হইব। এ দেশের মফস্বল ও পল্লীগ্রামের যাবতীয় কথা পরে জানিতে পারিবে। এই জেলার রাজ্য-শাসন সংক্রান্ত কয়েকটী কথা আজ লিখিতেছি।

এই জেলায় চারি প্রকার Estate আছে। (১) "সরাইকেলা" ও "খরসোয়ান" নামে দুইটী স্বাধীন রাজ্য (Political State)। (২) "পোড়া-হাট" জমিদারী। ইহার জমিদারকে জমীর জন্য গবর্ণমেণ্টকে কোনরূপ কর দিতে হয় না; এটী Revenue-free State। তবে সরকারী পুলিশের খরচার দরুণ, গবর্ণমেণ্টকে বাৎসরিক ২,১০০টাকা দিতে হয়। (৩) "ধলভূম" রাজ্য। এই স্থানের জমিদারকে রাজা বলে; ঘাটশীলা ধলভূমের প্রধান নগর। ২ বৎসর যাবৎ এই রাজ্য ঋণগ্রস্ত (Encumbered) হওয়ায়, ডেপুটী কমিশনার ইহার তত্ত্বাবধানের ভার লইয়াছেন। ধলভূম হইতে গবর্ণমেণ্ট বাৎসরিক ৪,২০০ টাকা, জমীর কর স্বরূপ পাইয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন পুলিশ-কমিশন ও নানাবিধ সেস্ তথা হইতে আদায় হয়। পোড়াহাট ও ধলভূমের রাজা জাতিতে ক্ষত্রিয়। (৪) গবর্ণমেণ্ট খাসমহল "কোলহান" রাজ্য।

১৮২০ খৃষ্টাব্দ হইতে কোলেরা ইংরাজের সম্পর্কে আসিয়াছে। তৎকালে সিংভূম, নিকটবর্ত্তী ছোটনাগপুর রাজ্যের পলাতক দুর্বৃত্ত দস্যুগণের আশ্রয় স্থল বলিয়া বিবেচিত হইত। সিংভূমের লারকা অর্থাৎ যুদ্ধব্যবসায়ী কোলগণ পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে প্রায়ই লুণ্ঠনাদি হত্যাকাণ্ড করিয়া, সেই সকল স্থানের অধিবাসীদিগকে নানারূপে উৎপীড়িত করিত। সরাইকেলা ও খরসোয়ানের রাজাগণ পোড়াহাটের অধিকার হইতে, নিজেরা পৃথক হইয়া, বিস্তৃত ভূমির উপর আধিপত্য করিলেও, সিংভূমের অন্যান্য সকল অংশই এক

প্রকারে পোড়াহাটের রাজার অধীনে ছিল। লারকা কোলগণ, তাঁহাদিগের আসুরিক ব্যবহারে, রাজার কণ্টকস্বরূপ হইয়া উঠিল। গবর্ণমেন্ট এই প্রকার লুণ্ঠনাদি দুর্বৃত্তাচরণ দমন করিবার অভিপ্রায়ে, পোড়াহাটের রাজার সহিত সখ্য-স্থাপন করিলেন এবং তাঁহাকে কয়েকটী সর্ত্তে আবদ্ধ করিয়া, তাঁহাকে এবং সরাইকেলা ও খরসোয়ানের অধিপতিকে সৈন্য সাহায্য করিয়া, কোলগণকে বশ্যতা স্বীকার করাইলেন। কোলেরা ১৮২১ সালে, এই প্রথমবার, প্রতি লাঙ্গলের হিসাবে আট আনা করিয়া জমিদারকে খাজনা দিতে লাগিল। কিন্তু এইরূপ বন্দোবস্ত বেশী দিন চলিল না; কারণ রাজাগণ কোলদিগকে তাঁহাদের অধীনে রাখিতে পারিলেন না। ১৮৩০ সাল হইতে ১৮৩৬ সাল পর্য্যন্ত দেশের চারি দিকে যুদ্ধবিগ্রহাদি উপস্থিত করিয়া রক্তে দেশ প্লাবিত করিয়াও, অধিপতিগণ স্ব স্ব কর আদায় করিতে পারিলেন না। ইংরাজ রাজও এইরূপ একটী সুযোগ খুঁজিতে ছিলেন। আবার তিনি আসরে নামিলেন; এবার আর সেই পূর্ব্বের বন্ধুভাব নাই; নিজের কাজ গুছাইয়া লইলেন। উক্ত তিনটী অধিপতির রাজ্য হইতে ২৩টী কোল "পির" অথবা পরগণা, এবং ময়ূরভঞ্জ রাজ্য হইতে ৪ পির, পৃথক করিয়া লইয়া, সরকার বাহাদুর, নিজের সম্পূর্ণ অধীনে, কোল্হান নামে একটী রাজ্য স্থাপনা করিলেন। গবর্ণমেন্টের এই policy, আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কি বুঝিব? তোমাদের বাঙ্গালি ইতিহাস লেখক গবর্ণমেণ্টের এই প্রকার ব্যবহারকে "Good stroke of policy" বলিলেও, আমি যখনই ইতিহাসে গবর্ণমেণ্টের রাজ্য বিস্তার (Annexation) সম্বন্ধে কোন কথা পড়ি, তখনই কমলাকান্তের উক্তিটী মনে পড়ে,—Right of Conquest যদি একটা right হয়, তবে Right of theft, কি একটা right নয়?" এই রাজ্যে এ কথার মীমাংসা হইতে পারে না।

কয়েকখানি গ্রাম লইয়া এক একটী "পির" বা পরগণা হয়। "মান্কি" পিরের প্রধান ব্যক্তি। প্রত্যেক গ্রামে একজন করিয়া সর্দ্দার বা মোড়ল থাকে। এখানে গ্রামের মোড়লকে "মুণ্ডা" বলে। গ্রামের মুণ্ডাগণ, সেই পিরের মান্কির অধীনে। মুণ্ডাগণ গ্রামের প্রজাদিগের নিকট হইতে খাজানা আদায় করিয়া, মান্কিকে প্রদান করে। মান্কি মুণ্ডাদিগের

মারফৎ খাজনা আদায় করিয়া, বৎসরে দুই কিস্তিতে জেলার ট্রেজারীতে দাখিল করে। যথাসময়ে কিস্তির টাকা জমা দিতে না পারিলে, ডেপুটী কমিশনার ইচ্ছা করিলে, মান্কির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করিয়া লইতে পারেন। মুণ্ডাও সময়ে মান্কিকে খাজানা দিতে না পারিলে, তাহারও দশায় ঐরূপ ঘটে। এই মান্কি ও মুণ্ডারা গ্রামের সকল বন্দোবস্ত করে। মান্কিগণ পিরের প্রধান পুলিশ কর্ম্মচারী; মুণ্ডারা ইহার অধীনে পুলিশের নিম্নকর্ম্মচারী। মুণ্ডা প্রজাদিগের নিকট হইতে খাজানা আদায় করে বলিয়া শতকরা ১৬৲ টাকা কমিশন পায়। মান্কিও সেইরূপ পিরের সকল খাজানা কালেক্টরীতে দাখিল করে বলিয়া শতকরা ১০৲ টাকা কমিশন পায়। মুণ্ডার কার্য্যের সহায়তা করিবার জন্য, প্রত্যেক মুণ্ডার এক জন করিয়া "তসিলদার" ও এক জন করিয়া "ডাকুয়া" নামে চাকর থাকে। তসিলদার টাকা আদায় দরুণ শতকরা ২৲ টাকা হিসাবে কমিশন পায়। এইরূপে শতকরা ২৮৲ টাকা খরচা করিয়া বাকি ৭২৲ টাকা খাজানা ট্রেজারীতে পৌঁছায়। মান্কি ও মুণ্ডাগণ হিন্দি বলিতে পারে ও সামান্য হিন্দি লেখা পড়া জানে। হিন্দি এই জেলার Court language লেখাপড়া জানা না হইলে, মান্কি কিম্বা মুণ্ডাগিরি মেলে না। গবর্ণমেণ্ট এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দেশীয় কোলদিগের দ্বারা আজ কাল বেশ সুশৃঙ্খলে রাজ্য শাসন করিতেছেন। সরকারের শাসনে আসিয়াও কোলেরা প্রথম প্রথম খাজানা দিতে অস্বীকার করিত। বলিত "সরকারকে খাজানা দিব কেন? এ জমি ত সব সূর্য্যদেবের। আমরা সেই জমি বাপ পিতামহের আমল হইতে চাষ বাস করিয়া আসিতেছি। জমিতে লাঙ্গল দিবার পূর্ব্বে, আমরা দেবতার নিকট একটী করিয়া মুরগি বলী দিয়া থাকি। তিনি সেই মুরগি পাইয়া বরাবর সন্তুষ্ট আছেন।" এখনও এমন ২।৩ জন কোল দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা বুঝিতে পারে না যে কেন তাহারা সরকারকে খাজানা দিবে। কিন্তু রুলের গুঁতা তাহাদিগকে সেই কথা বুঝাইয়া দেয়।

১৫ই আগষ্ট, বৃহস্পতিবার ঠিক চারিটার সময়, ঘোর বারবেলার মধ্যে আমি ও সামন্ত, গো-যানে চাঁইবাসা ছাড়িলাম। যে দুই তিন খানি

ঘোড়ার গাড়ী আছে, তাহারা চাঁইবাসা হইতে চক্রধরপুরে আরোহী লইয়া যাইতেই সময় পায় না। আর আমরা কাঁচা পথেও ঘুরিব, সুতরাং পুস্‌পুস্‌ও পাওয়া গেল না। মঙ্গলবার রাত্রে আমাদের যাত্রা করিবার কথা ছিল। কিন্তু এই বর্ষাকালে, ৮।১০ দিন ধরিয়া মফস্বলে, বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতে কোন গাড়োয়ানই রাজি হয় না। গাড়ী পাওয়া দায় হইল। সব্ ডেপুটী সাহেবকে সেই কথা জ্ঞাপন করিলাম। তিনি পুলিশের সব্ ইন্‌স্পেক্টরকে তৎক্ষণাৎ লিখিত কড়া হুকুম দিলেন যে আমাদের গাড়ী ঠিক করিয়া দেওয়া হউক। চারি দিকে লাল পাগড়ী ছুটিল। বুধবারে কয়েকখানা গাড়ী হাজির করিল বটে, কিন্তু একটাও গাড়োয়ান দেখিলাম না। প্রহারের চোটে তাহারা গাড়ী গরু ফেলিয়া প্রাণভয়ে পলাইয়াছে। গাড়োয়ান বিহীন শকট লইয়া কি করিব। আবার আপিসে গিয়া গাড়ীর দুর্দ্দশার কথা জানাইলাম। এবার নাজিরের উপর গাড়ী ঠিক করিয়া দিবার হুকুম হইল। লাল পাগড়ির পরিবর্ত্তে, চাপরাসধারী পেয়াদা, পিওন প্রভৃতি প্রায় ২০।২৫ জন কাছারীর লোক গাড়ী পাকড়াও করিতে চারি দিকে বাহির হইল। মিলিটারী forceএ কোন ফল হয় নাই, এবার সিভিল force কাজ করিল। বৃহস্পতিবার প্রায় ৩টার সময় গাড়োয়ান সমেত গো-যান হাজির করিল। গাড়োয়ান একজন যজ্ঞোপবীতধারী রজপুত ব্রাহ্মণ।

আমরা মফস্বলে যে সকল গ্রামে যাইব, পূর্ব্ব হইতে স্থির হইয়াছিল, সেই সকল গ্রামের মুণ্ডা ও মান্‌কিকে পূর্ব্ব হইতে, আমাদের গমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করাইয়া, কাছারী হইতে পরোয়ানা পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাহারা যেন আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করে।

চাঁইবাসা হইতে বাহির হইয়া ৫ ক্রোশ দূরে জোড়াপুকুর নামে এক ক্ষুদ্র গ্রামে আমাদের Halt করিবার কথা। রাত্রি ৮।৯ টার মধ্যে তথায় পৌঁছান উচিত ছিল। কিন্তু আমাদের গরু একেবারে চলে না। এক মাইল আসিতে ১ ঘণ্টা লাগিল; একবার ভাবিলাম ফিরিয়া যাইব; কিন্তু ফিরিলাম না! গরুগুলি অনেক মারধর খাইয়া, সমস্ত পথ গালি খাইতে খাইতে, প্রায় ৮টা রাত্রে জোড়াপুকুর হইতে ৩ ক্রোশ দূরে এক গ্রামে আমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিল। এই গ্রামে ৮।১০ ঘর বসতি। গরু একেবারে

অচল; শুইয়া পড়িতেছে। সেই গ্রামের মুণ্ডাকে ডাকাইয়া আনাইলাম; আমরা সরকারের লোক তাহাকে বুঝাইলাম। বলিলাম আমাদের গরু তাড়াইয়া জোড়াপুকুর লইয়া যাইবার জন্য গ্রাম হইতে কুলি দিতে হইবে। সরকারী লোকের হুকুম অগ্রাহ্য করিবার সাধ্য কি? মুণ্ডা সেই রাত্রে চারি জন কুলি অর্থাৎ গ্রামের প্রজা সংগ্রহ করিয়া দিল, তবে বলিল যে জোড়াপুকুর পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারিবে না, তথা হইতে ১॥০ দেড় ক্রোশ দূরে এক গ্রাম পর্য্যন্ত তাহারা পৌঁছাইয়া দিবে। ৪ জন কুলি, স্বয়ং মুণ্ডা ও আমাদের গাড়োয়ান, এই ৬ জনে গরু তাড়াইয়া, গাড়ী ঠেলিয়া, সেই দেড় ক্রোশ দূরের গ্রামে হাজির করিল। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত মুণ্ডা গিয়া সেই গ্রামের মুণ্ডাকে বলিল, সরকারী বাবুরা হাজির, এখনই ৪।৫ জন প্রজা দিতে হইবে। প্রায় ১ ঘণ্টা পরে ৩।৪ জন কুলি পাওয়া গেল। তাহারা বহু পরিশ্রম করিয়া, গাড়ী ঠেলিয়া প্রায় রাত্রি ১২টার সময় জোড়াপুকুরে পৌঁছাইয়া দিল। বোধ হয় বলিতে হইবে না যে, সরকারী লোককে সরকারের প্রজা কুলিগণকে পারিশ্রমিক কিছু দিতে হয় নাই। তাহারা সরকারী লোকের নিকট হইতে কিছু লইতে নারাজ। রাত্রি ঝিম ঝিম করিতেছে; গভীর রাত্রি; ঘোর অন্ধকারে পৃথিবী আচ্ছন্ন,—আমরা জোড়াপুকুরের Road cess বাঙ্গালায় গিয়া উপস্থিত। তখন কোথায় তোমার মুণ্ডা আর কোথায়ই বা আমাদের মান্‌কি? বাঙ্গালা একজন চৌকিদারের জিম্মায় থাকে। এই বাঙ্গালার চৌকিদার ৭০।৮০ বৎসরের এক বৃদ্ধ, বাঙ্গালায় দাওয়ায় শুইয়া বর্ষার দারুণ শীত লাগায়, আগুণ পোয়াইতেছিল। সেই বৃদ্ধের সাহায্যে, গ্রামের মুণ্ডাকে ডাকাইলাম, মান্‌কির দেখা পাওয়া গেল না, সে ভিন্ন গ্রামে থাকে। রাত্রি প্রায় ১টার সময় মুণ্ডা, ডাকুয়া, তসিলদার ও গ্রামের ৩।৪ জন প্রজা আসিয়া সেলাম দিল। আমাদের সহিত আহার্য্য কোন সামগ্রী ছিল না; সেই ১০টার সময় চাঁইবাসায় আহার করিয়াছি, পথে ক্রোশখানেক হাঁটিয়াছি; আর প্রায় সমস্ত পথ গরু তাড়াইয়াছি, ক্ষুধার তেজ কিঞ্চিৎ অধিক। মুণ্ডাকে আহার্য্য সামগ্রীর জোগাড় করিতে হুকুম করিলাম। সে যথা আজ্ঞা বলিয়া দলবল হইয়া প্রস্থান করিল। তাহাদের ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া, চৌকি-

দারকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম, মুণ্ডা তখন গ্রামের বাড়ী বাড়ী এক এক মুঠা করিয়া চাল সংগ্রহ করিতেছে; সেই চাল সংগ্রহ করা হইলে ফিরিবে। প্রায় এক ঘণ্টা পরে, ৫ মিশিলি (৫ মিশিলি কেন, ২০।২৫ বিলানি) মোটা রক্তবর্ণ চাল, অর্দ্ধ পোয়া আন্দাজ কুল্‌তির ডাল, একটু লবণ ও ২টা হাঁড়ি লইয়া, তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কাঠ পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালায় মজুত ছিল। প্রাতে মান্‌কিকে সঙ্গে লইয়া আসিতে বলিয়া, সে রাত্রের মত মুণ্ডাকে বিদায় দিলাম। বিনা মসলায় কেবল লবণ দেওয়া কুল্‌তির ডাল ও সেই ২০ মিশালি চালের ভাত আমাদের গাড়োয়ান রন্ধন করিল,—আমরা হাসিমুখে, অতি তৃপ্তির সহিত তাহাই ভোজন করিলাম। এমন তৃপ্তিপূর্ব্বক বোধ হয় জীবনে আর কখনও খাই নাই। Hunger is the best sauce. আমরা ভোজনে বসিয়াছি, এমন সময় মুরগি ডাকিয়া উঠিল। তখন রাত্রি প্রায় চারিটা। কোলেরা প্রত্যেকেই মুরগি পুষে। ইহারা দেবতার নিকট মুরগি ও শূকর বলি দেয়। ইহাদিগের অধিকাংশ দেবতাই, ভূত ও দানব। কঠিন পীড়া হইলেও ইহারা ঔষধাদি ব্যবহার না করিয়া দেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে, তাঁহার উদ্দেশে মুরগি বলিদান করে। কোনরূপ ঔষধপত্র ব্যবহার করে না বলিয়া, কঠিন পীড়া হইতে ইহারা প্রায়ই উদ্ধার পায় না। এ দেশের লোকেরা সময় সংক্রান্ত কোন কথা বলিতে হইলে, হয় প্রাতে মুরগি ডাকা, না হয় সন্ধ্যা, সূর্য্যাস্ত, এই দুই বিষয়ের উল্লেখ করে। আমরা ঘড়ী-ছুট হইয়া কোল-দর্শ ভুক্ত হইয়াছি। সুতরাং মুরগির ডাক শুনিয়া বুঝিলাম রাত্রি শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই; এবং যথার্থই কুল্‌তি হজম হইতে না হইতেই, রাত্রি প্রভাত হইল। প্রাতে দেখিলাম গ্রামখানি নেহাৎ ছোট নয়; ২০।২৫ ঘর লোকের বাস আছে। গ্রামের এক ধারে আমাদের বাঙ্গালা। গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার গরু চলিবে কি না। সে বলিল গরু সমস্ত রাত্রি ঘাস খাইয়াছে (অল্প পরেই শুনিলাম, একজন প্রজার জোয়ার ক্ষেত উজাড় করিয়াছে) এখন প্রাতে খুব চলিবে।

গো-যান করিয়া পুনরায় আমরা অগ্রসর হইলাম। জোড়াপুকুর হইতে (পরে জানিলাম) ৫॥ ক্রোশ দূরে গামারিয়া গ্রামে আমাদের যাইবার কথা

এক মাইল গরু বেশ চলিল, পরে আর চলে না। জোড়াপুকুর হইতে গামারিয়া, পথের দুই পার্শ্বে কেবল নিবিড় জঙ্গলপূর্ণ পাহাড়। পথিমধ্যে একখানিও গ্রাম নাই যে মুণ্ডার নিকট অন্বি করিয়া কুলি জোগাড় করিয়া গরু তাড়াইতে তাড়াইতে গামারিয়া পৌঁছিব। এই পথে রাত্রে গাড়ী চলে না। জঙ্গলে বড় বাঘ। এরূপ জঙ্গল পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। স্বভাবের দৃশ্যগুলি অতি মনোহর নয়নরঞ্জক,—দুই ধারে কেবল ছোট ছোট পাহাড়; পাহাড় হইতে কুল কুল রব করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলি প্রবাহিত হইতেছে। পাহাড়ের চতুর্দ্দিকে কেবল জঙ্গল। জঙ্গলের অধিকাংশ গাছই শাল গাছ। সেই জন্য জঙ্গল অতিশয় নিবিড় হইলেও, গাছের তলার জমিটী বেশ পরিষ্কার, যেন কে ঝাট দিয়া আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। দৃশ্য খুব মনোহর বটে; কিন্তু কেবল Scenery দেখিলে পেট ভরে কি? কবি এই সকল স্থানের দৃশ্য দেখিয়া, দৃশ্যের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিতে পারেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের সে অদৃষ্ট কোথায়? বরং এ সকল সুখকর দৃশ্য ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। প্রায় ১টার সময় গাড়ী হইতে নামিলাম; গরু একেবারেই অচল। সঙ্গে জিনিস-পত্র অনেক। গাড়োয়ানকে একটী মুটে খুঁজিতে পাঠাইলাম। আমরা মুটের জন্য অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় একটী কোলকে মাঠ হইতে তথায় আসিতে দেখিলাম। আমাদের মোট লইয়া গামারিয়া গেলে, তাহাকে আট আনা পয়সা দিব বলিলাম, সে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। এমনি হাসির ধুম যে হাসির চোটে তাহার দুই পাটি দাঁত বাহির হইয়া পড়িল। তাহার দাঁত দেখিয়া কালিদাসের কাল মেঘের কোলে, সাদা বকের দলের উপমার কথা হঠাৎ মনে উদয় হইল। আমরা তাহার হাসির অর্থের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিলাম না। পরে শুনিলাম আট অর্থে কোল-ভাষায় দুই;—দুই আনা মজুরী পাইবে শুনিয়াছিল বলিয়া, তাহার ঐরূপ হাসির ঘটা। যাহা হউক, অনেক চেষ্টা করিয়া একটী মুটে জোগাড় করিয়া তাহার মাথায় কতক মোট চাপাইয়া দিয়া, নিজেরাও কতক কতক ঘাড়ে করিয়া পদব্রজে গামারিয়া অভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলাম। গাড়ী ও গাড়োয়ানকে সেই স্থান হইতে বিদায় দিলাম।

একটু অগ্রসর হইয়াই দেখিলাম, মাইল ষ্টোনে ১৬ মাইল লেখা আছে। অর্থাৎ এখনও ৫ মাইল চলিলে, গামারিয়ায় পৌঁছিব। সে দিন আকাশ বেশ নির্ম্মল; আকাশে মেঘের কণামাত্রও দৃষ্ট হয় না; পাহাড়িয়া সূর্য্য সে দিন তীব্র তেজ বর্ষণ করিতেছিলেন। বেলা প্রায় ২টা। তখনও পর্য্যন্ত পেটে কিছুই পড়ে নাই; ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে পথ চলিতে লাগিলাম। ঝাড়া হাত পা হইলে, পথ হাঁটিতে অত কষ্ট হইত না; ঘাড়ে আমাদের এক একটা বোঝা। অতি কষ্টে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। পাহাড় পর্ব্বত, বন জঙ্গল, নদী ঝরনা, এবার—একেবারে অসহ্য চক্ষুশূল বোধ হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে বনের ভিতর, রাস্তার ধারে থোলো থোলো বুনো ফল পাকিয়া আছে। মনে করিলাম সেই ফল খাইয়া Breakfast করি। ক্ষুধা অসহ্য হইলেও সেই ফল গ্রহণ করিতে সাহস হইল না। এই ভাবে আড়াই ক্রোশ পথ চলিয়া প্রায় চারিটার সময় গামারিয়ার বাঙ্গালায় আসিয়া উপস্থিত। দেখিলাম জেলার বাঙ্গালি ডিষ্ট্রীক্ট এঞ্জিনিয়ারের পূর্ব্বেই তথায় আগমন হইয়াছে। এঞ্জিনিয়ারের চাকর বামুন ছাড়া বাঙ্গালায় অপর কেহ ছিল না। বাঙ্গালার দাওয়ায় উভয়ে আক্রান্ত হইয়া শুইয়া পড়িলাম;—একখানা কম্বল পাতিয়া শুইবারও শক্তি নাই। এমন সময় এঞ্জিনিয়ার বাবুর বাঙ্গালায় আবির্ভাব হইল। তিনি আসিয়াই আমাদিগকে জেরা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই বাঙ্গালায় থাকিবার জন্য কোন লিখিত হুকুম আমাদের নিকট আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার কথায় বুঝিলাম, লোকটা আমাদিগকে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। আমরা ভুলিবার ছেলে নয়; তাহার চেষ্টা বৃথা হইল। লোকটা আমাদের সম্মুখে বসিয়া ধূম পান করিতে লাগিল; আমাদের তখন পর্য্যন্ত আহারাদি হয় নাই শুনিল, তবুও তাহার কোনরূপ ভাব বৈলক্ষণ্য দেখিলাম না। বুঝিলাম ভদ্রসন্তান কুলি খাটাইতে খাটাইতে, ভদ্রতা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে।

আমরা বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় সেই স্থানের Forest বিভাগের Deputy Ranger, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মজুমদার মহাশয়, এঞ্জিনিয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাঙ্গালায় আসিলেন। তিনি আসিয়া আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া, ২।১টা কথার পরেই, তখনও আমাদের আহারাদি

হয় নাই শুনিয়া, বাড়ী হইতে চাল ও ডাল আনাইয়া দিলেন। তাঁহার মুখে শুনিলাম যে সেই গ্রামে এক খানি মুদিখানার দোকানও আছে। এঞ্জিনিয়ার কষ্ট করিয়া এ কথাটীও আমাদের বলে নাই। সন্ধ্যার প্রাক্কালে, Breakfast করিলাম। ত্রৈলোক্য বাবু বেশ অমায়িক লোক। বিদেশে আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে এতটা যত্ন পাইব, আমরা কখনও আশা করি নাই। এই বৈচিত্র্যময় সংসারে সকল প্রকারের মনুষ্যই দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে এঞ্জিনিয়ারের দলের লোকও অনেক, আবার অনেক ত্রৈলোক্য বাবুও দেখিতে পাওয়া যায়। অন্ধকার আছে বলিয়াই আলোক বুঝিতে পারি, দুঃখ আছে বলিয়াই সুখ উপভোগ করিতে পারি।

পরদিন মধ্যাহ্নে আহারাদি করিয়া, আর একখানি গো-শকট ভাড়া করিয়া, গামারিয়া হইতে ৫॥ ক্রোশ দূরে জগন্নাথপুরে যাইবার জন্য রওনা হইলাম। জগন্নাথপুর যাইতে পথে ৪টী নদী পাওয়া যায়। এই নদীগুলির উপর সেতু নাই। আমরা পথিমধ্যে বেশ বৃষ্টি পাইলাম। যাহা হউক এবার গাড়ীখানি বেশ চলিতেছে, আমরা সন্ধ্যার সময় ভিজিতে ভিজিতে জগন্নাথপুরের বাঙ্গালায় পৌঁছিলাম। বি, বোড়ুয়া কোম্পানীর দুই জন কর্ম্মচারী, তাঁহাদের কর্ম্মস্থান কেঞ্চোড় যাইবার পথে, এই বাঙ্গালায় আসিয়া উঠিয়াছেন। এখানে আসিয়া আমরা আর একজন ত্রৈলোক্য বাবু পাইলাম। ইনিও এই স্থানের Deputy Ranger, নাম শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু। কয়দিন তাঁহার নিকট অতি যত্নে ছিলাম। তিনি আমাদিগকে ছাড়িতে চাহেন না। জঙ্গলের মধ্যেও এইরূপ উদার লোকের সাক্ষাৎ পাইব, ইহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। জগন্নাথপুর একখানি গণ্ডগ্রাম। গ্রামে প্রায় ২০০।৩০০ ঘর বসতি। কয়েকখানি মুদির দোকান ও দুইখানি কাপড়ের দোকান আছে। এখানে একটী Middle Vernacular স্কুল ও একটী পোষ্ট অফিস আছে। তাই তোমাকে পত্র লিখিতে পারিতেছি। বেশ উচ্চ বিস্তৃত সমতল ভূমির উপর এই গ্রাম অবস্থিত। চাঁইবাসা হইতে এই স্থানের জল বায়ু ভাল।

আজ কয়দিন কেবল কোলদিগের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। লোকগুলা অত্যন্ত গরিব। বৎসরের মধ্যে ৯।১০ মাসও ইহারা এক বেলা পেট

ভরিয়া খাইতে পায় না। অনেক সময় ইহারা অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছের কচি পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে। যখন বটফল পাকে, তখন দুই মাস ইহারা কেবল বটফল খায়। ইহাদের দুর্দ্দশা দেখিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। চাল এ দেশে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অধিবাসীরা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, অথচ প্রতি বৎসর রাশিকৃত চাল বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। পুরুষদিগের শরীর বাঙ্গালী অপেক্ষাও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ক্বচিৎ দুই একটা বলিষ্ঠ কোল দেখিতে পাওয়া যায়। "হাড়িয়া" নামে পচাই খাইয়া ইহারা অনেক সময় নেশায় ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া পড়িয়া থাকে। হাড়িয়া কোলেদের Food & Drink উভয়ই। এই নেশায় ইহাদিগকে মাটি করিতেছে। নিজের গ্রাম ও তাহার গ্রামের নিকটে যে গ্রামে হাট বসে, এই দুই স্থান ছাড়া ইহারা সংসারের কোন খবরই রাখে না। তবে আজ কাল চাঁইবাসার কথা অনেকের কাণে ঢুকিয়াছে। লোকগুলি অত্যন্ত নিরীহ ও সরলপ্রকৃতি বিশিষ্ট। চুরি, ডাকাতি, এ দেশে একেবারেই হয় না। কৃষিকার্য্য ইহারা প্রায় কিছুই জানে না। দেশে অত্যন্ত জলাভাব, ছেঁচ দিয়া শস্য রক্ষা করিবার কোন উপায় নাই। অনাবৃষ্টি হইলে, দেবতার নিকট মুরগি বলি দিয়া, তাঁহার কোপ উপশমিত করিবার চেষ্টা করে। তাহাতেও বৃষ্টি না হইলে, গাছের পাতা, বুনো গুল্ম খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। ইহাদের অবস্থা দেখিয়া আমাদের মনে কষ্ট হইলেও, ইহারা কিন্তু কষ্টকে কষ্ট বলিয়া মনে করে না; ইহারা একপ্রকার বেশ সুখেই আছে।

আজ ৪।৫ দিন জগন্নাথপুরে আছি। সেই যে শনিবারে বৃষ্টি নামিয়াছে, আজও বৃষ্টি ছাড়ে নাই; অনবরত প্রবল ধারায় জল পড়িতেছে। পথের নদীগুলি বর্ষা সমাগমে ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। আমার বেটি নদীগুলির উৎপত্তি স্থান, এই স্থানের অতি নিকটে। পাহাড় হইতে গভীর গর্জ্জন করিয়া ভীমবেগে নদীতে জল নামিতেছে। কাহার সাধ্য পার হয়। নদীতে জল কমিলে, আমরা এখান হইতে ডেরা তুলিব। এ কয়দিন এখান হইতে ডাক যাইতেছে না।

শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার।

ত্রিগুণ ও ত্রিদোষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্লেষ্মা—শ্বেতবর্ণ জলীয় দ্রব্য বিশেষ। ইহা আস্বাদনে মধুর রস। কিন্তু বিকৃত হইলে লবণাস্বাদ হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদবেত্তারা—শ্লেষ্মার যেরূপ স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা লেখা যাইতেছে।

শ্লেষ্মা—গুরু, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, শীতল ও মৃদু। গুরুতা গুণ আছে বলিয়া—

শ্লেষ্মার স্বরূপ।

শ্লেষ্মা আমাদের শরীরের ভার রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। ইহার স্নেহ গুণে দেহ স্নিগ্ধ থাকে। আমাদের সন্ধি সকল—শ্লেষ্মার পিচ্ছিলতা গুণেই আটকাইয়া থাকে। এই জন্যই আমাদের অস্থি হইতে মাংস খসিয়া যায় না। মাংসপেশীতে শ্লেষ্মার পিচ্ছিলতা আছে বলিয়া, উহারা শরীরের বাঁধুনী দৃঢ় রাখিতে পারে। শ্লেষ্মা—তমোগুণাত্মক, আলস্য ও নিদ্রা ইহার সহচর। তমোগুণের সংহার শক্তিও শ্লেষ্মায় বর্ত্তমান। শ্লেষ্মার প্রকোপ না হইলে মানুষ মরে না।

শ্লেষ্মা অপ্রকৃত অবস্থায় যখন স্বীয় গুরুত্ব গুণে বায়ুর স্রোত সকল অত্যন্ত রুদ্ধ করিয়া ফেলে, এবং শৈত্যদ্বারা যখন পিত্তের তাপ অত্যন্ত কমাইয়া দেয়, তখন মৃত্যু মানুষের নিকটবর্ত্তী হয়।

শ্লেষ্মাও নামভেদে স্থানভেদে এবং কার্য্যভেদে পাঁচ প্রকার বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঐ পঞ্চ শ্লেষ্মা—আমাশয়, হৃদয়, কণ্ঠ, মস্তক ও সন্ধিস্থান যথাক্রমে শরীরের এই পঞ্চ স্থান আশ্রয় করিয়া থাকে। আমাশয়স্থ শ্লেষ্মার নাম "ক্লেদক"। ভক্ষিত দ্রব্য আমাশয়ে আসিয়া পড়িলে, ক্লেদক শ্লেষ্মাই তাহার জমাট ভাঙ্গিয়া দেয় এবং নিজ রসে তাহা সিক্ত করিয়া ফেলে। শ্লেষ্মাকর্ত্তৃক ভুক্ত দ্রব্যের এরূপ অবস্থা না হইলে, পিত্তাগ্নি তাহাকে পরিপাক করিতে পারিত না। সুশ্রুত এই শ্লেষ্মা ও পিত্তের ক্রিয়া

ক্লেদক শ্লেষ্মার স্থান ও কার্য্য।

সম্বন্ধে একটী সুন্দর উপমা দিয়াছেন। তিনি বলেন—"চন্দ্র যেমন সূর্য্য ক্রিয়ার আধার, শ্লেষ্মা তেমনি পিত্ত ক্রিয়ার আধার।" কথাটা একটু ভাল করিয়া বুঝা যাউক। পুরাকালে—আর্য্য জ্যোতিষিগণ চন্দ্রকে সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। * সেই উপমান অনুসারেই সুশ্রুত শ্লেষ্মাকে পিত্তাগ্নি এবং ভুক্তদ্রব্যের মধ্যস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

চন্দ্র এই বিশাল জগৎকে অমৃত রসে আপ্লুত করিয়া রাখিয়াছেন, সূর্য্য স্বীয় কিরণ দ্বারা সেই রস উত্তাপিত করিয়া সমস্ত পদার্থকে পরিপাক করিতেছেন। সুতরাং চন্দ্র, সূর্য্য ক্রিয়ার আধার; চন্দ্র না থাকিলে—পদার্থের পরিপাক হইত না, সূর্য্যের তীক্ষ্ণ কিরণে সমস্তই দগ্ধ হইয়া যাইত।

পিত্তও সেইরূপ—শ্লেষ্মাকে উত্তপ্ত করিয়া ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাকে সহায়তা করে। শ্লেষ্মাদ্বারা আচ্ছন্ন না থাকিলে, ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইত না; পিত্তের উত্তাপে একেবারেই দগ্ধ হইয়া যাইত। এস্থলে উপমাণ এবং উপমেয়ের সম্বন্ধ বিবেচনা করিতে গেলে শ্লেষ্মাকে পিত্তক্রিয়ার আধার বলাই সম্ভব।

বক্ষস্থলস্থিত "অবলম্বক" নামক শ্লেষ্মা—বাহুদ্বয় ও মস্তকের সন্ধিদেশ দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া থাকে। "রসন নামক শ্লেষ্মা—কণ্ঠ দেশ অধিকার করিয়া জিহ্বাকে সর্ব্বদাই সিক্ত করিয়া রাখে, ইহার সাহায্যেই আমরা মধুরাদি ষড়বিধ রসের আস্বাদন বুঝিতে পারি। "স্নেহন" শ্লেষ্মা মস্তকে থাকে; আমরা যে সকল তৈলাদি মর্দ্দন করি—তাহার দ্বারা স্নিগ্ধ হইয়া "স্নেহন" শ্লেষ্মা আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়কে সাহায্য করে। আর আমাদের সন্ধিস্থানে যে "শ্লেষ্মন" নামক শ্লেষ্মা আছে, তাহার সাহায্যে আমাদের সন্ধি সকল আটকাইয়া থাকে।

অবলম্বক, রসন, স্নেহন ও শ্লেষ্মণ শ্লেষ্মার স্থান এবং কার্য্য।

শ্লেষ্মা প্রকৃতিস্থ থাকিলে, আমাদের দেহ স্নিগ্ধ, সুদৃঢ় ও সবল থাকে। শ্লেষ্মবাহিনী শিরাও—আমাদের শরীরে ১৭৫টী আছে। এই সকল শিরাগুলি—স্পর্শে শীতল, গৌরবর্ণ বিশিষ্ট এবং স্থির।

আলিঙ্গণার্থক "শ্লিষ" ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয় করিয়া শ্লেষ্মা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

* ছাদকো ভাস্করস্যেন্দুরধঃস্থো ঘনবদ্ভবেৎ।

এতক্ষণে বায়ু পিত্ত এবং কফের কার্য্য আমরা কতকটা আয়ত্ত করিতে পারিলাম। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ কেন যে এই বায়ু পিত্ত কফের সাম্যভাবকে স্বাস্থ্য বলিয়াছেন, তাহাও কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিলাম।

বায়ু, পিত্ত, কফ কুপিত হইলে—শীঘ্রই রসরক্তাদি সপ্ত ধাতুকেই দূষিত করিয়া ফেলে, এই জন্যই আয়ুর্ব্বেদে ইহারা "ত্রিদোষ" নামে অভিহিত হইয়াছে। আমরা যে, কোনও মনুষ্যকে কৃশ দেখি, কাহাকেও বা স্থূল দেখি, এ সবও এই বায়ু পিত্ত কফের কার্য্য। প্রাণী মাত্রেই—এই ত্রিদোষের মধ্যে যে কোনও একটীর প্রকৃতি লইয়া ভূমিষ্ট হয়। পিতা মাতার শুক্র শোণিতে যে' যে' দোষের আধিক্য থাকে গর্ভস্থ শিশুর প্রকৃতিও সেই দোষের অনুরূপ হইয়া থাকে। এই জন্যই মনুষ্যগণ জন্ম হইতেই কেহ বাত প্রকৃতি, কেহ পিত্ত প্রকৃতি, কেহ বা কফ প্রকৃতির হইয়া থাকে। এইরূপে বাতাদি দোষ, পৃথক ভাবে বা দুইটী অথবা সমস্ত একত্র হইয়া সপ্ত প্রকার প্রকৃতি জন্মায়। যথা—(১) বাতপ্রকৃতি, (২) পিত্তপ্রকৃতি, (৩) শ্লেষ্মপ্রকৃতি, (৪) বাতপিত্তপ্রকৃতি, (৫) বাতশ্লেষ্মপ্রকৃতি, (৬) পিত্তশ্লেষ্ম প্রকৃতি, এবং (৭) বাতপিত্তশ্লেষ্ম প্রকৃতি। যাহার শরীরে বায়ুর প্রাধান্য লক্ষিত হইবে, সে বাতপ্রকৃতি, এইরূপ পিত্তের প্রাধান্যে পিত্তপ্রকৃতি, শ্লেষ্মার প্রাধান্যে শ্লেষ্মপ্রকৃতি, উভয় দোষের প্রাধান্যে দ্বন্দজপ্রকৃতি ইত্যাদি বুঝিতে হইবে।

বায়ুর রুক্ষগুণ আছে বলিয়া—বায়ুপ্রকৃতির মনুষ্যগণের শরীর অত্যন্ত শীর্ণ এবং শিরাজালে পরিপূর্ণ হয়। ইহাদের হস্ত পদ ও দেহ রুক্ষ এবং ফাটা ফাটা হইয়া থাকে। ইহারা যখন চলিয়া যায়, তখন পা মট মট করিতে থাকে। বাতপ্রকৃতির পুরুষগণ স্ত্রীলোকের অত্যন্ত অপ্রিয় হয়।

বাতপ্রকৃতিক মনুষ্য।

বায়ুর লঘুতা হেতু, ইহারা অল্পবল, অল্পায়ু এবং অল্প শুক্রবিশিষ্ট হইয়া থাকে। বায়ুর চাঞ্চল্যে বাতপ্রকৃতির মনুষ্যের বুদ্ধি, দৃষ্টিশক্তি, কার্য্য, গতিশক্তি এবং মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়। ইহারা জিতেন্দ্রিয় হয় না, এক স্থানে থাকিতে ভালবাসে না, কাহারও সহিত বন্ধুত্ব রাখিতে পারে না—কাহাকে বিশ্বাস করে না, নিজেও কাহারও বিশ্বাসের পাত্র হয় না। ইহারা অনেক কথা

কয়, কোনও বিষয়ের দৃঢ়তা রাখিতে জানে না। বায়ুর শীঘ্রকারিতা গুণে ইহাদের মনে শীঘ্রই দুঃখ, অভিমান, উৎসাহ, ক্রোধ, চিন্তা, ভয় এবং ইচ্ছা উপস্থিত হয়। ইহারা শীঘ্র শিক্ষা করে, আবার শীঘ্রই ভুলিয়া গিয়া থাকে। বায়ু শীতল, এই জন্য বাতপ্রকৃতির পুরুষেরা—শীত সহ্য করিতে পারে না, অত্যন্ত কম্প অনুভব করে, উষ্ণ দ্রব্য ভালবাসে।

মিথ্যাবাদীত্ব, অভিমানিতা, নাস্তিকতা এবং বিলাস-প্রিয়তা প্রভৃতি রাজসিক ও তামসিক লক্ষণ, বাতপ্রকৃতির মনুষ্যে লক্ষিত হয়। কোনও কোনও বৈদ্যকাচার্য্য বলেন—বাতপ্রকৃতির পুরুষ চোর হয় এবং সর্ব্বদাই পাপ কর্ম্মে রত থাকে। ইহাদের গলার আওয়াজ অত্যন্ত ক্ষীণ, কর্কশ ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া থাকে। ইহারা কাহারও প্রতি সদ্ব্যবহার করে না, দরিদ্র হয়, নিদ্রাকালে উড়িয়া যাইতেছি এইরূপ স্বপ্ন দেখে। বাতপ্রকৃতির পুরুষ অতি নিকৃষ্ট, ইহারা অকৃতজ্ঞ, দুষ্টবুদ্ধি, বহুভাষী, কামুক, অহঙ্কারী এবং লোকনিন্দুক হইয়া থাকে।

পিত্ত উষ্ণ বলিয়া, পিত্তপ্রকৃতি মনুষ্য উষ্ণ সহ্য করিতে পারে না, ইহাদের দেহ স্বভাবতই উষ্ণ স্পর্শ হইয়া থাকে। ইহারা নিদ্রাবস্থায় অগ্নি, বিদ্যুৎ ও উল্কা প্রভৃতি তৈজস পদার্থ স্বপ্নে নিরীক্ষণ করে। রৌদ্র লাগিলে কিম্বা মদ্যপান করিলে ইহাদের চক্ষু লালবর্ণ হইয়া উঠে। শীতল দ্রব্য

পিত্তপ্রকৃতিক।

পুষ্পমাল্য, চন্দনাদি সুগন্ধি দ্রব্য এবং স্ত্রী লোককে ইহারা বড় ভালবাসে। পিত্তে তীক্ষ্ণতায়—পিত্তপ্রকৃতির মনুষ্যগণ তীক্ষ্ণ পরাক্রমী, সাহসী এবং অভিমানী হয়। ইহাদের বুদ্ধি, স্মরণশক্তি, পরিপাকশক্তি সমস্তই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। ইহারা সহসা নত হইতে চাহে না, শরণাগতকে পরিত্যাগ করে না, ক্রুদ্ধ হইলে কাহারও ক্ষতি না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। ভয়ঙ্কর তৃষ্ণার্ত্ত এবং অত্যন্ত পেটুক হয়। ইহাদের চুল শীঘ্রই পাকিয়া যায়, মাথায় টাক পড়ে, শরীরে অত্যন্ত তিলচিহ্ন থাকে, ক্ষুধা হয় এবং রোগের যন্ত্রণা একেবারেই সহিতে পারে না।

পিত্ত পূতিগন্ধময়, পিত্তপ্রকৃতির পুরুষদেরও—গাত্রে, মুখে এবং বগলে ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ হয়। পিত্তের তরলতায় পিত্তল পুরুষের শরীর শিথিলভাবাপন্ন

হইয়া থাকে। ইহাদের মাংস শীঘ্রই লোল হইয়া যায়; পিত্তের সারকতাগুণ থাকায় ইহাদের মল মূত্র এবং ঘর্ম্ম প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়।

কোনও কোনও গ্রন্থকার বলেন—পিত্তপ্রকৃতির পুরুষ মধ্যমায়ুবিশিষ্ট আশ্রিত বৎসল, তেজস্বী, যোদ্ধা, সঙ্গতবক্তা এবং নিঃশঙ্ক হইয়া থাকে। ইহাদের শরীর প্রায়ই গৌরবর্ণবিশিষ্ট এবং হস্ত পদ ও চক্ষু তাম্রাভ হয়।

পুরুষের মধ্যে শ্লেষ্মপ্রকৃতির পুরুষই উৎকৃষ্ট। কফের স্নিগ্ধশক্তি থাকায়, কফপ্রকৃতির মানুষেরা—শ্রীমান, স্নিগ্ধাঙ্গ এবং প্রিয়দর্শন হইয়া থাকে। ইহাদের বক্ষঃস্থল বিশাল, চুল ঘন এবং বাহু দীর্ঘ হয়। কফের গুরুত্বগুণে ইহারা স্থূলশরীর বিশিষ্ট, ধীরগতি এবং অত্যন্ত বলবান হইয়া থাকে। ইহাদের স্বভাব গম্ভীর হয়। শ্লেষ্মার পিচ্ছিলতাগুণ থাকায়, শ্লেষ্মপ্রকৃতির

শ্লেষ্মপ্রকৃতিক।

পুরুষ—বিলম্বে বুঝিতে পারে, কিন্তু চির দিন মনে করিয়া রাখিতে পারে। ইহাদের সন্ধি সকল সুদৃঢ় এবং অস্থি সকল গূঢ়ভাবে থাকে অর্থাৎ বাহির হইতে দেখা যায় না। ইহারা ক্ষুধা তৃষ্ণা ও ক্লেশে কাতর হয় না। ইহাদের মনে দুঃখ এবং ক্ষোভাদি বিকার বহু বিলম্বে উদিত হইয়া থাকে। শ্লেষ্মার মৃদুতায় ইহারা অল্পভাষী এবং অল্প ক্রোধী হয়। শ্লেষ্মার মাধুর্য্যগুণে শ্লেষ্মপ্রকৃতির লোকেরা—অধিক শুক্রবিশিষ্ট, অত্যন্ত রমণেচ্ছু, নারীজাতির প্রিয় এবং সরল চিত্ত হইয়া থাকে। শ্লেষ্মায় তমোগুণ অধিক থাকায়, শ্লেষ্মপ্রকৃতির পুরুষ, অত্যন্ত নিদ্রাশীল, আলস্যযুক্ত, অনুযোগী এবং দীর্ঘসূত্রী (কুড়ে) হয়। দয়া, কৃতজ্ঞতা, আশ্রিত বাৎসল্য, ভক্তি, পরলোকাদিতে শ্রদ্ধা, সদসদ্বিবেচনা, বিনয়, অস্পৃহা প্রভৃতি সাত্ত্বিকগুণ, শ্লেষ্মপ্রকৃতি পুরুষের সহচর। ইহাদের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী, শত্রুতা—প্রচ্ছন্ন এবং মতি অচঞ্চল হইয়া থাকে। ইহারা নিষ্ঠুর কথা কহে না, নিষ্ঠুর কার্য্য করে না, অধিক আহার করে না, নির্লজ্জ হয় না, অসত্যের আদর করে না। শ্লেষ্মার শৈত্যগুণে, শ্লেষ্মল পুরুষেরা উষ্ণ ভালবাসে। ইহারা দাতা, দূরদর্শী এবং সৌভাগ্যশীল হইয়া থাকে। শ্লেষ্মা জলীয় পদার্থ বলিয়া শ্লেষ্মপ্রকৃতির পুরুষ উগ্র স্বভাব হয় না, ইহারা জলাশয়, জলচর, মেঘ অথবা পদ্ম প্রভৃতি জলীয় কুসুম স্বপ্নে সন্দর্শন করে।

বাহুল্য ভয়ে মিশ্রপ্রকৃতির পুরুষের লক্ষণ উল্লিখিত হইল না। কৌতূহলী পাঠক, প্রয়োজন হইলে—স্বয়ংই মিলাইয়া দেখিতে পারিবেন। যাহার শরীরে দুই দোষের লক্ষণ লক্ষিত হইবে, সে মিশ্রপ্রকৃতি, এবং যে ব্যক্তি এই ত্রিদোষের লক্ষণে ভূষিত—তাহাকে সান্নিপাতিক প্রকৃতি বলিয়া স্থির করিবেন।

বাতপ্রকৃতির পুরুষেরা প্রায়ই বাতজ পীড়ায় পীড়িত হইয়া থাকে, এইরূপ পিত্তপ্রকৃতিক পুরুষের পিত্তজ ব্যাধি এবং কফজপ্রকৃতিতে কফজ ব্যাধি হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বায়ু পিত্ত ও কফ এই তিনটী সমানভাবে থাকিলে, আমাদের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু ইহাদের বৈষম্যভাব সকল রোগের কারণ। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে—বায়ু পিত্ত ও কফের তিনটী অবস্থা এবং তিন প্রকার গতি উল্লিখিত হইয়াছে। সেই তিন প্রকার অবস্থা এই—

১। সমতা।
২। ক্ষয়।
৩। বৃদ্ধি।

যে অবস্থায় বায়ু পিত্ত কফ—সমানভাবে থাকিয়া, আমাদের শরীরকে রক্ষা করিয়া থাকে, উহাদের সেই অবস্থাকে "সমতা" বলা যায়। আর যে অবস্থায় উহাদের শক্তি অল্প হইয়া যায়, তাহার নাম ক্ষয়াবস্থা। বৃদ্ধি অবস্থায় ইহাদের কার্য্য অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়ে। সুতরাং এই দুই অবস্থায়—ইহারা বহু রোগ উৎপাদন করিতে পারে।

জগতের সমস্ত পদার্থ যেমন সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না, জগতের সমস্ত ব্যাধিও সেইরূপ—বায়ু পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষের অবলম্বন ভিন্ন থাকে না।

বায়ু ক্ষয় হইলে—মন্দ চেষ্টতা, অল্পভাষিতা, অল্প হর্ষ এবং সংজ্ঞাহীনতা এই সকল উপসর্গ উপস্থিত হয়। পিত্ত ক্ষয় হইলে—শারীরিক তাপ কমিয়া যায়, অগ্নিমান্দ্য ঘটে, এবং শরীর বিবর্ণ হইয়া যায়। শ্লেষ্মারক্ষায়—দেহ রুক্ষ হয়, এবং অন্তর্দ্দাহ, আমাশয়, বক্ষঃ, কণ্ঠ ও মস্তকে শূন্যতা, সন্ধিবন্ধন শিথিল, অত্যন্ত পিপাসা, দুর্ব্বলতা, এবং নিদ্রানাশ হইয়া থাকে।

বায়ু বৃদ্ধি পাইলে—শরীরস্থ চর্ম্ম রুক্ষ ও কর্কশ হয়, ঘন ঘন গাত্রস্পন্দন হইতে থাকে, উষ্ণ দ্রব্য সেবনের প্রবল ইচ্ছা হয়, উৎসাহের অভাব ঘটে, নিদ্রা একেবারেই হয় না। মল অত্যন্ত কঠিন হইয়া যায় এবং শরীর কৃশ ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়।

পিত্ত বৃদ্ধি পাইলে—শরীর, নেত্র, মূত্র ও মল—পীতবর্ণ হইয়া যায়। দেহের তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, ইন্দ্রিয় সকল দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, শীতল দ্রব্য সেবনে অত্যন্ত ইচ্ছা হয় এবং মূর্চ্ছা হইতে থাকে।

কফ বর্দ্ধিত হইলে—গাত্র স্তব্ধ (অসাড়) হয়, শারীরিক তাপের অভাবে শরীর অত্যন্ত শীতল হইয়া যায়, চর্ম্ম শুভ্রবর্ণ হয়, অবসন্নতা, তন্দ্রা এবং নিদ্রা অতিশয় রূপে হইয়া থাকে।

কিসে এই ত্রিদোষ কুপিত হয়, কিসেই বা উহারা শান্ত হয়, কুপিত হইলেই বা কি কি রোগ উৎপন্ন করিতে পারে, বারান্তরে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

শ্রীব্রজবল্লভ রায়।

নদীয়ায় যবনাধিকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হুসেন সাহের পরবর্ত্তীকালে সের সাহ নামক একজন দুর্দ্ধর্ষ আফগান প্রথমে বঙ্গদেশ পরে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুনকে পরাস্ত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। সের সাহ রাজকার্য্যে সুদক্ষ হইলেও অত্যন্ত হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। এমন কি তাহাদের জাতি ধর্ম্ম হানিকর আইনাদি প্রচলন করিয়াছিলেন। এই সকল আইনের মধ্যে "হিন্দু প্রজা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর দিতে অশক্ত হইলে মুসলমান শাসনকর্ত্তা ইচ্ছা করিলে তাহার মুখে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিতে পারিবেন, এবং ইসলাম ধর্ম্মের সমুজ্জ্বল মহিমা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত হিন্দু প্রজা ঘৃণা না করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য, *

* When the collector of the Dewan asks them (the Hindus) to pay the tax, they should pay it with all humility and submission. If the collector wishes to spit into their mouth, they should open

ইত্যাদি আইন প্রচলন দ্বারা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র হিন্দুর ধর্ম্মনাশ করিয়া মুসলমান করিয়া যান। ইহাই এতদঞ্চলে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান সংখ্যাধিক্যের প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হয় †।

সের সাহের মৃত্যুর পর তদ্বংশীয় কয়েক জন গৌড়ে শাসনকর্ত্তা হন। রাজনীতিবেত্তা মোগল-কুল-রবি সুচতুর আকবর সাহ সমগ্র হিন্দুস্থান করতলগত করিয়া সেনাপতি মুনিম খাঁকে এবং তোডরমল্লকে বাঙ্গালার পাঠান শাসনের মূলোচ্ছেদ করিতে প্রেরণ করেন। এই সময়ে গৌড় অত্যন্ত মারিভয় উপস্থিত হয়; লক্ষ লক্ষ লোক এই লোকক্ষয়কর ব্যাধির দারুণ কবলে কবলিত হওয়ায় প্রাচীন গৌড় একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়ে। আকবরের সেনাপতি মুনিম খাঁও এখানে আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং আকবর সাহ তাঁহার স্থানে হুসেনকুলী খাঁ নামক একজন দক্ষ সেনাপতিকে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তোডরমল্লের সাহায্যার্থ প্রেরণ করেন। সুচতুর তোডরমল্ল দিল্লী হইতে সৈন্য সাহায্য প্রাপ্ত হইলে তাঁহার সৈন্যসংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিবার মানসে বঙ্গদেশস্থ জমিদারবর্গের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন। তাহার ফলে তদানীন্তন নদীয়ার অন্তর্গত চতুর্বেষ্টিত দুর্গস্বামী কায়স্থকুলভূষণ রাজা কাশীনাথ রায় তোডরমল্লের সহিত মিলিত হন এবং মোগলের পক্ষ হইয়া পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধে অতুল বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এই চতুর্বেষ্টিত দুর্গ এক্ষণে নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, এ সাধারণতঃ চৌবেড়িয়া নামে খ্যাত। ইহা বর্ত্তমান বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রে

their mouths without the slightest fear of contamination so that the collector may do so. The object of such humiliation and spitting into their mouths is to prove the obedience of the infidel subject under protection and promote, if possible, the glory of the Islam the true religion and to show contempt to false religions.

Von. Noha's Akbar.

এই বর্ব্বরোচিত আইন মহামতি আকবরের সময় রহিত হয়।

† The existence of a large Musalman population in the distr (Nadiya) is accounted for by wholesale forcible conversions at period anterior to the Moghul Emperors during the Afghan supremac

Hunter's. S. Account Vol. II p. 51.

ওয়ের গোপালনগর ষ্টেশন হইতে ৭ সাত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। * চতুর্বেষ্টিত দুর্গ যখন প্রাসাদ, পরিখা ও অগণিত জনপূর্ণ ছিল, তখন সন্নিহিত বনগ্রামও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। পূর্ব্বে চতুর্বেষ্টিতদুর্গ ও রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া পুণ্যসলিলা যমুনা প্রবল বেগে প্রবাহিতা ছিলেন; সেই দুর্গপাদচারিণী বিশালকায়া যমুনাও এক্ষণে ক্ষীণ রজত রেখার ন্যায় অতি মৃদু গতিতে প্রবাহিতা। কোথাও আবার সেই সূক্ষ্ম প্রবাহেরও অভাব দাঁড়াইয়াছে। গুণগ্রাহী বাদসাহ আকবর সেনাপতি তোডরমল্লের নিকট বঙ্গবীর রাজা কাশীনাথের অসাধারণ যুদ্ধকৌশল ও অপূর্ব্ব বীরত্ব কাহিনী শ্রবণ করিয়া এবং পাটনা অবরোধের সময় স্বচক্ষে উহা প্রত্যক্ষ করিয়া পাটনা অধিকারের পর প্রকাশ্য দরবারে রাজা কাশীনাথকে সমর-সিংহ এই গৌরব জনক উপাধি ও বাদসাহী ঝাণ্ডা, নাগরা, পাল্কী ও অশ্ব গজাদি প্রদান পূর্ব্বক নানারূপে সম্মানিত করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই যখন কুলী খাঁ ও তোডরমল্লের সম্মিলিত বিপুল মোগলবাহিনী নারায়নপর শেষ পাঠান নরপতি দায়ুদ খাঁর পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল তখনও রাজা সমরসিংহ সানন্দচিত্তে সর্ব্ব প্রথমে তোডরমল্লের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং নিজের স্বাভাবিক বীরত্ব ও সাহস প্রদর্শন করিয়া বাঙ্গালা হইতে পাঠান রাজ্য উচ্ছেদের ও মোগল রাজত্ব সংস্থাপনের বিশেষ সহায়তা

* পণ্ডিতাগ্রগণ্য সুলেখক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, আই, সি, এস্, মহোদয় যখন বনগ্রামের সব ডিভিসনাল অফিসার ছিলেন, তখন বহু অনুসন্ধানে এই চতুর্বেষ্টিত দুর্গস্বামীর বীরত্বকাহিনী সংগ্রহ করিয়া তাহাই অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার সুবিখ্যাত উপন্যাস "বঙ্গবিজেতা" প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানকালে চৌবেড়িয়াতে পূর্ব্ব সমৃদ্ধির কোনরূপ চিহ্নমাত্র বিদ্যমান নাই। চতুর্বেষ্টিত স্থানটীর মধ্যে এক্ষণে রাজার বাগান, কুল বাড়ী ও সেহালাপাড়া নামে তিনটী ম্যালেরিয়া পীড়িত ক্ষুদ্র পল্লী বিদ্যমান আছে। তাহারা তাহাদের নামের সহিত যেন একটা পূর্ব্বস্মৃতির আভাসমাত্র বহন করিতেছে। এই চতুর্বেষ্টিত দুর্গ এখানে সাধারণতঃ রাজা সতীশের দুর্গ বলিয়া খ্যাত। সতীশ ইছাপুরের জমিদার ও সমরসিংহের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার বংশ অদ্যাপি ইছাপুরে বিদ্যমান। ইছাপুর চৌবেড়িয়া হইতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী। এই চৌবেড়িয়া সুপ্রসিদ্ধ নীলদর্পণ প্রণেতা ৺ দীনবন্ধু মিত্র রায় বাহাদুরের জন্মস্থান।

করেন। মহাবীর্য্যশালী রাজা সমরসিংহের শেষ জীবন অতি শোকাবহ। বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে বিজিত হইলে কুলী খাঁর উপর কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত বঙ্গের শাসন ভার অর্পণ করিয়া রাজা তোডরমল্ল সম্রাট আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিল্লী গমন করেন। এই সুযোগে সমরসিংহের কতিপয় কৃতঘ্ন কর্ম্মচারী সমরসিংহের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য এক ভীষণ ষড়যন্ত্র করে। রাজবিদ্রোহ-অপবাদে তদানীন্তন বঙ্গের সুবেদারের অদ্ভুত বিচারে সমরসিংহের শিরশ্ছেদন হইয়াছিল। কিছুদিন পরে তোডরমল্ল বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করিলে সমরসিংহের মহিষী তাঁহার নিকট বিচার প্রার্থিনী হন। রাজা তোডরমল্ল, চতুর্বেষ্টিত দুর্গে বঙ্গবিজয়ের ঘোষণাস্বরূপ এক বিরাট দরবার আহ্বান করেন এবং সমর-সিংহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীগণের প্রাণ দণ্ডের আদেশ দেন। এই দরবারে সমস্ত বঙ্গদেশ মোগল সম্রাটের শাসনাধীন বলিয়া ঘোষিত হয়। এত দিনে বাঙ্গালায় স্বাধীন পাঠান রাজত্ব শেষ হইয়া বাঙ্গালা প্রত্যক্ষভাবে মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। রাজা তোডরমল্লই বাঙ্গালার মোগল সম্রাটের প্রথম প্রতিনিধি। তিনি সমগ্র বঙ্গদেশ জরীপ জমাবন্দী করিয়া রাজস্বের সু-বন্দোবস্ত করেন ও আশ্‌লী জমাতুমারে বঙ্গদেশকে ১৯টী সরকারে ও ৬৮২টী মহলে বিভক্ত করেন। তোডরমল্লের আশ্‌লী জমায় ১০,৬৯৩,০৬৭৲ আকবরসাহী টাকা রাজস্ব আদায় হইত। পূর্ব্বোক্ত ১৯টী সরকারের মধ্যে ১১টী গঙ্গার উত্তর ও পূর্ব্বে ৮টী গঙ্গার পশ্চিম এবং ভাগীরথীর সঙ্গমস্থানের নিকট অবস্থিত, তন্মধ্যে সরকার সপ্তগ্রাম ১টী। জেলা নদীয়া তখন সরকার সপ্তগ্রামের অধীন ছিল। এই সপ্তগ্রাম সরকার তখন বহুদূর বিস্তৃত ছিল; ইহার উত্তর সীমা পলাশী, দক্ষিণ সীমা হাতিয়াগড় এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম কপাতক (কপোতাক্ষ নদী ?) হইতে ভাগীরথীর উত্তর তীর লইয়া বিস্তৃত ছিল। ইহার অধিকাংশ মহল বর্ত্তমান নদীয়া ও ২৪ পরগণার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে এই সুবিস্তীর্ণ সরকারের বার্ষিক রাজস্ব ছিল ৪১৮,১১৮৲ আকবরী টাকা, বন্দর ও হাটের আয় ছিল ৩০,৩০০৲ টাকা, ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে আয় ২৯৭,৭৪১৲ টাকা বলিয়া উল্লিখিত আছে *।

* Grant's Analysis of the Bengal Finances.

পাঠানগণ বিজিত হইলেও তাহাদিগকে মোগলগণের করতলগত রাখা দুঃসাধ্য হইল। সুযোগ পাইলেই বাঙ্গালার ভূস্বামীগণ দিল্লীশ্বরের অধীনতা অস্বীকার করিতেন। তাঁহারা নামে দিল্লীশ্বরের অধীন হইলেও কার্য্যত তাঁহারাই দেশের প্রকৃত রাজা ছিলেন। এইরূপে স্বাধীন ভূস্বামীগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহাদের মধ্যে দ্বাদশ জন প্রধান ছিলেন, তাঁহারা সাধারণতঃ দ্বাদশ ভৌমিক নামে খ্যাত। এই সকল স্বাধীন ভূস্বামী-গণের মধ্যে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যই সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। মোগলগণ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ বিজিত হইলে পাঠান রাজের একজন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী বহু পাঠান সর্দ্দারের ও স্বীয় ধন রত্নাদি সহ সুন্দরবনের মধ্যে লুক্কায়িত থাকেন; তাঁহার নাম বিক্রমাদিত্য। তিনি এই জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গম প্রদেশে ক্রমে বল সঞ্চয় করিয়া তদানীন্তন ভূস্বামীগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেন। সুবিখ্যাত পদকর্ত্তা বসন্ত রায় ইঁহার খুল্লতাতপুত্র এবং বঙ্গের শেষ বীর—বীরচূড়ামণি প্রতাপাদিত্য ইঁহার পুত্র। এই প্রতাপাদিত্য আকবরের শেষ জীবনে তাঁহার অতি দুর্দ্ধর্ষ ও দুর্দ্দমনীয় শত্রু হইয়া উঠেন। তিনি চট্টগ্রামের ও আরাকানের রডা-প্রমুখ পর্ত্তুগীজদিগকে আপনার গোলন্দাজ সৈন্য মধ্যে নিযুক্ত করিয়া পুরী হইতে নোয়াখালি পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ অধি-কার করেন। নদীয়ার দক্ষিণ অংশ কাঞ্চননগর বর্ত্তমান কাঁচড়াপারা এবং জগদ্দল প্রভৃতি স্থানও তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। এখনও জগদ্দলে তাঁহার গড় ও প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে ও রাজার পুকুর নামে পুষ্করিণী তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এতদ্ব্যতীত তাৎ-কালিক নদীয়ার অপরাপর স্থানেও তাঁহার অধিকারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে প্রতাপের রাজ্যলাভের পূর্ব্ব হইতেই কুশদহের অন্তর্গত জলেশ্বর ও ইছাপুরে কাশীনাথ রায় নামে একজন ধনশালী ব্যক্তি বাস করিতেন। নদীয়া প্রভৃতি কয়েকখানি পরগণা ইঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর ইছাপুরের চৌধুরীগণের পূর্ব্বপুরুষ ও খড়দহ মেলের সিদ্ধান্তী থাকের রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ সেই জমিদারীর অধিকাংশ ভোগ করিতেছিলেন। প্রতাপ তাঁহাদের নিকট কর প্রার্থনা করিলে সিদ্ধান্ত-বাগীশ দিতে অস্বীকার করায় প্রতাপ তাঁহাকে শাসন করিবার

মানসে সসৈন্যে গোবরডাঙ্গার নিকট প্রতাপপুর নামক স্থানে আসি শিবির সন্নিবেশ করেন। এক্ষণে সিদ্ধান্তবাগীশ সবিশেষ ভীত হ প্রতাপের শরণাপন্ন হন। দয়ালু প্রতাপ ব্রাহ্মণের কাতরোক্তিতে তাঁহা জমিদারী গ্রহণ করিলেন না তবে যে স্থানে তাঁহার শিবির সন্নিবেশি হইয়াছিল সেই স্থানটুকু গ্রহণ করিয়া আপনার নামে উহার প্রতাপপুর না রাখিলেন। এই স্থানটুকু গ্রহণের কারণ এই শুনা যায় যে প্রতাপ নি অধিকার ব্যতিত অন্যত্র আহার করিতেন না। এই গ্রামখানি অদ্যা বিদ্যমান আছে। এখান হইতে প্রত্যাগমন কালে তিনি হালিস কুমারহট্ট, জগদ্দল প্রভৃতি স্থান অধিকার করেন। প্রতাপকে দমন করিব জন্য দিল্লীশ্বর আকবর সাহ পুনঃ পুনঃ তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করে কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপ পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া বাঙ্গালী মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এই সময় সম্রাট আকবর মৃত্যুমুখে পতিত হই তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর দিল্লীর সম্রাট হন। জাহাঙ্গীরও প্রতাপের বিরু তাঁহার সুযোগ্য সেনাপতি অম্বররাজ মানসিংহকে বাঙ্গালায় প্রেরণ করে মানসিংহ বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে বাঙ্গালায় আগমন করতঃ নদীয়া রা বংশের পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের সহায়তায় এবং প্রতাপের কতি কৃতঘ্ন আত্মীয় ও কর্ম্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতায় বহু কষ্টে প্রতাপকে পরা করিয়া বন্দী করিয়া লইয়া যান। দিল্লীর পথে পবিত্র কাশীধামে বী প্রতাপের জীবলীলার অবসান হয়।

এই সময়ে অন্যান্য যে সমস্ত বঙ্গীয় ভূস্বামী অত্যাচারী মুসলমান শাস কর্ত্তার বিপক্ষে মস্তকোত্তলন করিয়াছিলেন, নদীয়ার অন্যতম বিখ্যা ভূস্বামী দেবগ্রামস্থ কুম্ভকার বংশীয় রাজা দেবপাল তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কালের কঠোর নিষ্পেষণে এই কুবেরের সদৃশ ধনশালী, শক্তিমান ভূস্বামী বিস্তীর্ণ প্রাসাদ, বিপুলা পুরী ও সুগভীর পরিখাদি ধ্বংস হইয়া সাধারণে "দে পাঁর ঢীবি" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহা এক্ষণে বেঙ্গ সেণ্ট্রাল রেলওয়ের মাঝেরগ্রাম নামক ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দক্ষি অবস্থিত। দেবগ্রামস্থিত এই পর্ব্বতাকৃতি ধ্বংসাবশেষের প্রতি দৃষ্টিপা করিলে সহৃদয় দর্শকমাত্রেরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠে। এখনও ইতস্ত বিক্ষিপ্ত এনামেলের ইট কারুকার্য্যময় প্রস্তরাদি ও প্রাসাদের পরিখা প্রান্তে অবস্থিত চারিটী উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ (যাহার গঠন প্রণালী দেখিলে পূর্ব্বে শত্রু সৈন্যের গতিবিধি পর্য্যালোচনার নিমিত্ত স্থাপিত বলিয়া অনুমিত হয়) এবং অসংখ্য পুষ্করিণী, বিশেষতঃ, শোকাবহ স্মৃতি বিজড়িত রাজান্তঃপুর সংলগ্ন সুবিস্তীর্ণ সরোবর স্বতই প্রাণের অন্তস্তলে একটা বিষাদের চিত্র অঙ্কিত করে *।

রাজা দেবপাল সম্বন্ধে নানাবিধ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে; তাহাদের মধ্যে কতটুকু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে তাহা অবধারণ করা সুকঠিন। বহু অনুসন্ধানেও আমরা এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। সুকবি ভারতচন্দ্র তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে মানসিংহের আখ্যায়িকার মধ্যে স্বর্গগমনোদ্যত ভবানন্দ মজুমদারের সহিত দেবী অন্নদার কথপোকথনচ্ছলে নবদ্বীপ রাজবংশের যে ভবিষ্যচিত্র অঙ্কিত

---

* "This is said to be the fort of a Mohjan Raja, who on going out to fight a battle, carried with him a pigeon giving his Ranis orders, that they should watch for the return of the pigeon. If he won the battle, he would return himself, if he lost he would loose the pigeon, whose return would intimate to the Ranis the loss of battle, and if they had any regard for the honor, they would destroy themselves. He won the battle but the pigeon got loose by accident and returned to the Raja's palace, whereupon the Ranis drowned themselves and their treasure in the "Khirki" tank behind the palace. The Raja hastned home but arrived too late to save the Ranis, whereupon in despair he drowned himself also in the tank. The tank has stone "ghats" all round and is covered on three sides with ruins of brick buildings, four high circular towers stood at the four corners of the oblong fort, which is of earth. Outside the fort are the ruins of several large temples which appear to be of great interest and of some antiquity, as evidenced by the size of the bricks. They are the only pre-Mahomedan ruins seen or heard of in the District."

"List of Ancient Monuments &c."
Published by the Government of India.

করিয়াছেন অর্থাৎ বাজপেয়ী মহারাজ রাজেন্দ্র বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্রের রা রাজসভায় বসিয়া ভারতচন্দ্র নদীয়া রাজবংশের যে অতীত কাহি দেবীর মুখ হইতে ভবিষ্যৎ বাণীরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে দে গ্রামের রাজবংশ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কতিপয় পংক্তি পরিদৃষ্ট হয়। ঐ কয়েকটী হইতে ইহাই প্রতীতি হয় যে দেবপালবংশ ধ্বংস হইলে তাঁহা বিশাল সম্পত্তি, কি সূত্রে জানি না, ভবানন্দ মজুমদারের পৌত্র রা রাঘবের অধিকারভুক্ত হয়। যথা—

"গোপালের পুত্র হবে বড় ভাগ্যধর।
রাঘব হইবে নাম রাঘব সোসর॥
দেগাঁয় আছিল রাজা দেপাল কুমার।
পরশ পাইয়াছিল বিখ্যাত সংসার॥
আমার কপটে তার হয়েছে নিধন।
রাঘবেরে দিব আমি তার রাজ্যধন॥"

ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের চাকদহ ষ্টেশন হইতে তিন ক্রোশ পূ মুখে যাইলে কামালপুর নামে একখানি গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রাম প্রাচীন নদীয়ার মধ্যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। বহু ভট্টাচার্য্য পণ্ডি এখানে বাস করিতেন; সেজন্য অনেকে এখনও ইহাকে ভট্টাচার্য্য কামালপুর বলিয়া থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ বনমালী বিদ্যাসাগর মহাশয় এই স্থানে জ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র গ্রামখানি পশ্চাতে রাখিয়া আরও কিয়দ্দূ অগ্রসর হইলে স্বচ্ছসলিল থলসিয়ার বিল দৃষ্টিপথে পতিত হয়; এই বিলে নিকট সরাবপুর নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম বিদ্যমান আছে। এই গ্রামে মধ্যস্থিত ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দিরের অভ্যন্তরে যে মৃত্তিকা প্রথিত হস্তপরিমি লিঙ্গমূর্ত্তি দৃষ্ট হয় উহাই সাধারণতঃ পোড়া মহেশ্বর নামে খ্যাত। ভগ্নাবশে মন্দিরের ভিত্তি ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত মৃত্তিকাস্তূপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উহা যে পূর্ব্বে ইষ্টকনির্ম্মিত বহু গৃহ প্রাঙ্গণ ও চত্বর বেষ্টিত সমৃদ্ধিশালী দেবালয় ছিল তাহা স্পষ্টই লক্ষিত হয়। সেই স্তূপ সকল এক্ষণে জঙ্গলাকীর্ণ ও শ্বাপদ সঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছে।

কথিত আছে এ স্থানের অবস্থা হীন হইয়া পড়িলে একদা এক গোঁ

সন্ন্যাসী এই পাষাণময় লিঙ্গমূর্ত্তির মস্তকদেশে একখানি স্পর্শমণি লুক্কায়িত জানিতে পারিয়া এই শিবমন্দিরে আসিয়া বাস করিতে থাকে। একদিন ঐ কপটাচারী ভাবিল যদি চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ঐ লিঙ্গমূর্ত্তি উত্তপ্ত করা যায়, তবে ঐ মণি মস্তক হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে; পাছে দগ্ধ করিলে লিঙ্গমূর্ত্তি গ্রামবাসীগণকে মন্দির রক্ষার্থে আহ্বান করেন সেই আশঙ্কায় এক চাতুরী অবলম্বন করিল। সে বহু কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া ঐ মন্দিরে সঞ্চয় করিল এবং উপর্য্যুপরি কয়েক রাত্রি ভীষণ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া স্বয়ং ঐ অগ্নিকুণ্ডমধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক "কে কোথায় আছ গ্রামবাসি! দেখ পামর সন্ন্যাসী আমায় দগ্ধ করিতেছে" ইত্যাদি আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। গ্রামবাসীগণ প্রথম প্রথম কয়েক রাত্রি ঐ ভয়ঙ্কর চিৎকারে আকৃষ্ট হইয়া মন্দিরে আগমন করিয়াছিল; কিন্তু প্রত্যহ সন্ন্যাসীকে এইরূপ চিৎকার করিতে শুনিয়া শেষে তাহাকে উন্মাদগ্রস্ত স্থির করিয়া আর কেহ সে বিষয়ে মনোযোগ করিত না। এক দিন ঐ সন্ন্যাসী লিঙ্গমূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে স্তূপাকারে কাষ্ঠ সজ্জিত করিয়া অগ্নি প্রদান করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন অগ্নি ভীষণাকার ধারণ করিল তখন লিঙ্গমূর্ত্তি হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ বিনির্গত হইতে লাগিল, কিন্তু গ্রামবাসীগণ উহা উন্মাদগ্রস্ত সন্ন্যাসীরই কার্য্য বিবেচনায় সে কথা কেহ শুনিয়াও শুনিল না, সন্ন্যাসীর এই পৈশাচিক কার্য্যে বাধা দিতে কেহই অগ্রসর হইল না। দেখিতে দেখিতে সেই উজ্জ্বলমণি পাষাণ মূর্ত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে নিপতিত হইল। এতদিনে সন্ন্যাসীর মনস্কামনা পূর্ণ হইল। সেই অমূল্য নিধি ঝুলির মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া রাত্রি থাকিতে থাকিতে সন্ন্যাসী তথা হইতে প্রস্থান করিয়া দেবগ্রামে উপস্থিত হইল। তখন দেবগ্রামে বহু কুম্ভকারের বাস ছিল। সন্ন্যাসী ঐ গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেবপাল নামক একজন কুম্ভকারের গৃহে অতিথি হইল এবং ঝুলিটী ঐ কুম্ভকারের কুটীর প্রান্তে ঝুলাইয়া রাখিয়া স্নানার্থ গমন করিল। তখন বর্ষাকাল—হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় কুম্ভকারের জীর্ণ চাল হইতে জল পড়িয়া ঐ ঝুলিটী সিক্ত হইতে লাগিল এবং স্পর্শমণি সংস্পর্শে ঐ জলধারা অপূর্ব্ব গুণ প্রাপ্ত হইয়া গৃহস্থিত যে কোন ধাতবপদার্থের সংস্পর্শে আসিতে লাগিল তাহাই সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইল। এই

অত্যদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া কুম্ভকার যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল এ
সাগ্রহে সন্ন্যাসীর অসাক্ষাতেই তাহার ঝুলিটী অনুসন্ধান করায় সেই অমূ
নিধি প্রাপ্ত হইল এবং এক নিভৃত স্থানে উহা লুক্কায়িত রাখিয়া পুনরা
স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিল। সন্ন্যাসী স্নানান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দে
যে তাহার এত কষ্টের এত সাধনার ধন অপহৃত হইয়াছে। তখন
আকুলপ্রাণে দেবপালের শরণাপন্ন হইয়া মণি প্রত্যর্পণের নিমিত্ত সকা
পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিল কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথ হইয়া এক
যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া এই বলিয়া পূর্ণাহুতি দিল, "যেন ঐ মহামণিই দেবপা
সর্ব্বনাশের মূল হয়—আর যেন অচিরাৎ সে নির্ব্বংশ হয়—ও সেই গ্রামে
কখন কোন কুম্ভকার আসিয়া বাস না করে—করিলে সেও যেন সব
নির্ব্বংশ হয়।" দেবপাল সেই স্পর্শমণির গুণে ক্রমে কুবের সদৃশ ধনশা
হইয়া উঠিলেন এবং নিজ বাসগ্রাম অধিকার করিয়া ইন্দ্রপুরী সদৃশ প্রাসা
মন্দিরাদি নির্ম্মাণ এবং সুবৃহৎ সরোবরাদি খনন করাইয়া স্বীয় নামে
গ্রামের "দেবগ্রাম" নাম করণ করিলেন। ক্রমে ঐ ক্ষুদ্র গ্রাম নগর
আকার ধারণ করিল এবং দেবপাল একজন ক্ষমতাশালী ভূম্যধিকা
হইয়া উঠিলেন।

শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক।

দ্বারকার পথে।

(৩)

গাড়ী আবার ছুটিল। ভড়োচ হইতে খানিকটা পিছাইয়া আসি
অন্য পথ অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। মধ্যে মধ্যে দুই একটী
ষ্টেসনে নামিয়া এদিক ওদিক দেখিতেছি। চিরদিন যে ভাটিয়া সুন্দরীর
লাবণ্যের কথা শুনিয়া আসিতেছি আজি সেই ভাটিয়া রমণীর দুই এক
নয়নপথের পথিক হইতেছে। ধূনার ধূমে পাকান মর্ত্তমান রম্ভার
দেখিয়াছেন—সেইরূপ গৌরবর্ণা; দুধে আলতার অভাব—গড়ন পিটন

ার উপায় নাই। চাহিয়া চাহিয়া দেখাও ত ভদ্র রীতির বিরুদ্ধ।
শ্রেণীতে অনেকগুলি অপরিচিত বাঙ্গালী ভদ্রলোক দেখিয়া তাঁহা-
দেখিতে গিয়া সহসা নিমেষকাল যে দৃষ্টি পড়িয়াছিল তাহারই
টুকু। পাঠক পাঠিকা আমাকে মাফ করিবেন তবে সাহিত্য সেবক
সংসারে নূতন দ্রব্য আনিতে পারগ। আমার সাফাই না হয়
। বোধ হয় ইঁহাদের মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা নাই। অলঙ্কারের মধ্যে
ছড়াছড়ি—নানা আকারের নানাবিধ মুক্তা। সে যাহাহৌক বাঙ্গালী
র মধ্যে এক জন পরিচিত বাঙ্গালী দেখিতে পাইলাম। তিনি আমার
দ্বারকা যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন, সব ঠিকঠাক হইয়া গেল, এমন
হঠাৎ বরদা ষ্টেসনে গাড়ী থামিলে—তিনি বলিলেন বন্ধুবর্গের অনু-
তিনি দ্বারকা যাইতে অপারগ। মিত্র লাভের সব আশা ফুরাইল।
বরদা ষ্টেসনে গাড়ী পৌঁছিবার পূর্ব্ব হইতেই আমরা দূর হইতে একটী
—পিতল কি সুবর্ণের জানি না—দেখিতে পাইতেছিলাম, সূর্য্যকিরণে
টী ঝক্ ঝক্ ঝলসিতেছিল। লোকমুখে শুনিলাম বরদারাজ গুইকুমারের
রাটীর গুম্বজের কলস। তখন বুঝিলাম কলসটী পিতলের নহে সুবর্ণের
। যে সকল বাঙ্গালী বরদা রাজ্য দর্শন বা ভ্রমণ করিতে আসিয়া-
ছিলেন, তাঁহারা দলে দলে নামিয়া গেলেন। গাড়ীতে বাঙ্গালীর মধ্যে
আমরা দুই মূর্ত্তি রহিয়া গেলাম। মনকে প্রবোধ দিলাম যে অগ্রে দ্বারকা
দর্শন পরে অন্য কথা—আমি এখন তীর্থযাত্রা করিতেছি, আমি এখন
ভবঘুরের মত—যাহা ইচ্ছা তাই করিতে পারিব না।

ক্রমে গাড়ী আসিয়া আমেদাবাদ সহরে পঁহুছিল, আমাদিগকে এই
স্থানে গাড়ী বদল করিতে হইবে। সুতরাং নামিয়া বিশ্রাম করিতে গেলাম।
আমেদাবাদ সহর প্রকাণ্ড সহর। আর এই সহরের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর।
সহরে প্রবেশ করিতে হইলে গেট দিয়া যাইতে হয়। শুনিলাম ১৬ গেট
আছে। নব্বইটী কাপড়ের কল আছে—সব দেশী লোকের হাতে। গুজরাটে
প্রবেশ করিয়া অবধি রেলের দুই ধারে যে ক্রমাগত তুলার চাষ দেখিয়া
আসিতেছিলাম আর প্রায় প্রতি রেল ষ্টেসনের নিকট একটী করিয়া তুলার
কল (Cotton mill) দেখিয়া আসিতেছিলাম—এক্ষণে, এই ৯০টী কলের

কথা শুনিয়া তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম। বুঝিলাম এ অঞ্চলের লোক বঙ্গবাসীর মত বাক্যবীর নহে, ইহারা কর্ম্মবীর। একজন ব্যারিষ্টারের মুন্সী তাহার সাহেব অর্থাৎ ব্যারিষ্টারকে লইতে আসিয়াছিলেন। তিনি ট্রেণে বোম্বাই হইতে আসিবেন। মুন্সীজীর মুখে সহরের অনেক সংবাদ শুনিলাম। তিনি সহর দেখিবার জন্য নিতান্ত জিদ করিতে লাগিলেন। আমি কিছুতেই রাজি হইলাম না। দ্বারকানাথকে স্মরণ করিয়া সহরে মায়া কাটাইলাম। যাহাহৌক বলিয়া রাখি এই একটী সহরে ৯জ ব্যারিষ্টার আছেন। সহরটী একটী প্রকাণ্ড সহর আকারেও বটে ভারীমে বটে, বহু লোক বাস করে—বিদেশীর সংখ্যাই বেশী। সহর সব বিলাতী ভাবাপন্ন। দালাল, ঠিকাদার, কমিশন এজেণ্ট বা আড়তদার, এজেণ্ট সব্ এজেণ্ট, সওদাগর ইত্যাদি ইত্যাদিতে সহর একেবারে পরিপূর্ণ। যেখানে কান পাত ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়া কথা বার্ত্তা নাই। আমাদের দেশে বলিয়া "কৃষ্ণা" মিলের নাম শুনিয়াছি। এক সময় কৃষ্ণা মিল না থাকিলে বাঙ্গালীর স্বদেশী বয়কট ব্রত নিশ্চয়ই ভঙ্গ হইত। কৃষ্ণা মিল, ভগবতী মিল, বোম্বাই প্রভৃতি সহরের অন্যান্য মিল আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া যথেষ্ট ধন্যবাদ পাইয়াছেন ও লৌহসিন্দুক স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রায় পরিপূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এত লাভের পর এত দেখিয়া শুনিয়া আমরা কেবল একটী মাত্র মিল "বঙ্গলক্ষ্মী" স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছি উপেন্দ্রনাথ সেন দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়গণের স্থান প্রত্যেক বাঙ্গালী নর নারীর হৃদয় শতদলে। সে যাহা হৌক একটী মিল বাঙ্গালী খুলিয়াছেন বটে, কিন্তু বাঙ্গালী Cotton mill তুলার কল অর্থাৎ তুলার বীচি বাহির ঝাড়া পেঁজা পরিষ্কার করণ গাঁইট বাঁধা এই সব কার্য্যের জন্য এদেশে এখনও রীতিমত তুলার চাষও আরম্ভ হয় নাই ও তুলার কল একটীও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। বি, এন, আর রেলের মেন কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া গাড়ীতে এক রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতঃকালে দুই ধারে মুখ বাড়াইলেই এই তুলার কল দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বিলাসপুর কাম্‌তী, নাগপুর এ সব স্থানেত ঐরূপ কল ছাইয়া ফেলিয়াছে। তুলার চাষ না হইলে ঐরূপ কলের প্রয়োজনীয়তা বুঝা যাইবে

তাহা আমরা বুঝি। বাল্যকালে দেখিয়াছি প্রত্যেক লোকের বাটীতে কাপাসের গাছ। উঠানে—পাঁদাড়ে আশে পাশে যেখানে সেখানে সকলেরই কাপাস গাছ ছিল। গাছ না থাকিলে কাপড় হইবে কোথা হইতে? সকলেইত আর দিগম্বর সাজিতে পারে না, সকলেইত আর দিগম্বর সাজিবার অধিকারী নহে। পিতামহী কাটিতেন সূতা—নুটী বাড়ীতে হইত আমাদের অর্থাৎ ছেলেদের কাপড় "মুচেন" আর কর্ত্তাদের জন্য হইত "তেঁতেন" মিহি সূতার কাপড়। বিধবারা মুচেন পরিতেন সধবারা উপর দিকে আবার তেঁতেন পরিতেন। ভাল চাওত কাপাসের চাষ কর, একা না পার দল বাঁধ, কোম্পানী কর সেয়ার খোল। কেন কয়লার ব্যবসাত বেশ চালাইতেছ—আবেগে অনেক বার্ কথা লিখিয়া ফেলিলাম, এটী আমার রোগ, দোষ, কিন্তু কেহ কেহ বলেন ওটী "বিদ্যার" গুণ—গুণ হয়ে দোষ হল—বিদ্যার বিদ্যায়।

আজ কাল ভয়ে দেশের বন্ধু বলিয়া অনেকে পরিচয় দেওয়া বন্দ করিয়াছেন। আমি কিন্তু আবশ্যকীয় কথা সব বলিব—শত্রু হই বন্ধু হই আপনারা দেখিয়া লইবেন। কি মুটের অত্যাচার!!! সেত মোর দেশের লোক—এখানে তার নাম "মজুর"—সারা গুজরাটে সে "মজুর", কিন্তু বড়ই অত্যাচার। যাহা সেখানে আধ আনায় হয়, এখানে তাহা চারি আনা, সিকি ছাড়া কথা নাই মোট নামাইল—সিকি দাও আবার তুলিবে—সিকি দাও, নূতন গাড়ীতে উঠিয়া এমনই একটা মজুরের সঙ্গে আমার ঝগড়া বাধিল; তুমুল। আমার পক্ষ অবলম্বন করিয়া কথা কহিলেন যে ব্যক্তি তিনি সুরত সহরে কংগ্রেস দেখিতে গিয়াছিলেন—ফিরিতেছেন। ইংরেজী জানেন। তিনি যাইবেন বড়বান্ সহরে (Wadhun লোকে উচ্চারণ করেন যেন ঠিক বর্দ্ধমান) তিনি যখন আমার পক্ষ অবলম্বন করিয়া মোটের কথা তুলিলেন তখন মুটিয়া ইংরেজী ঝাড়িতে লাগিল। বুঝিলাম আধ আধ লেখা পড়া জানা লোক অথচ ফালসো অহংকার নাই, ষ্টেসনে মজুরের কাজে পরিশ্রম নাই অথচ বেশ দু পয়সা উপায় আছে দেখিয়া ঐ পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। যখন আইনের কথা উঠিল তখন—সিকি ছাড়িবার পাত্র নন বুঝিয়া—মজুর মহাশয় তর্জ্জন গর্জ্জন ত্যাগ করিয়া

মিনতিসূচক স্বরে বলিলেন, "বাবু বড় লোক কিছু নিচ্চি—আপনি আইন্নে কথা ছাড়ুন না"। এই বলিয়া উদরে হাত বুলাইল। তখন সেই ব্যক্তি আমাকে বলিলেন ইহার পর আর তর্ক চলে না।

সেই ব্যক্তির সহিত আলাপ হইলে পরম পরিতুষ্ট হইলাম—কংগ্রেস ও স্বদেশীর কথা উঠিল দেখিলাম তরঙ্গ বেশ লাগিয়াছে। আমার পাশের গাড়ীতে একটী স্ত্রীলোক ছিল। তাহাকে কি বলিয়া বর্ণনা করিব? আমেজান (Amazon), তাড়কা, কুম্ভীনশী, না নবীন তপস্বিনীর জগদম্বা। ঝাড়া ৬ ফিট আর তার উপর মোটা। ভদ্রলোকটী স্ত্রীলোকটীকে দেখাইয়া বলিলেন—"দেখুন ইহারা স্বামী স্ত্রী। (দেখিলাম যেমন দেব তেমনি দেবী—বেশ সাজন্ত বটে।) ইহারা মেষ-পালক। অনেক সময়ে এই সকল স্ত্রীলোককে একা বাঘের সঙ্গে লড়িতে হয়। প্রায়ই বাঘ পরাজিত হয়। ইহাদের হাতে যদি একটা লাঠি বা কুঠার রহিল ত বাঘের আর নিস্তার নাই। ইহাদের বল বীর্য্য সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কথা সকলেই জানে। ইংরেজও জানে। আপনারা জানেন না।"

ইহারই মুখে গীর্ণার পাহাড়ের বিবরণ, প্রভাসের বিবরণ, পোর বন্দরের ও দ্বারকার বিবরণ জ্ঞাত হইলাম। মুখে মুখে টাইমটেবেল বলিয়া দিলেন। এ দেশের লোক বেশ সহৃদয়, আমাকে বিশ্রাম করিবার জন্য অর্থাৎ শয়ন করিবার জন্য গাড়ীর সকলেই অনুরোধ করিলেন ও স্থান পরিষ্কার করিয়া দিলেন। বলিলেন যথাসময়ে আমাকে তুলিয়া দিবেন। সহৃদয়তার কথা যখন উঠিয়াছে—তখন একটা বড় কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমেদাবাদ সহরে আছেন শ্রীযুক্ত অম্বালাল শেখরলাল। ইনি বরদা রাজ্যে চীফ জষ্টিস ছিলেন। ইহার উপাধি "দেওয়ান বাহাদুর।" ইনি ৩০ জন বাঙ্গালীকে নিজ খরচায় আমেদাবাদ সহরে রাখিয়া কল কারখানা সম্বন্ধে শিক্ষা দান করিতেছেন। এই সকল বাঙ্গালী ছাত্র কল সম্বন্ধে জুতা সেলাই চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সমস্ত অবশ্যজ্ঞাতব্য সকল কথাই শিক্ষা করিবেন ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে দেশে ফিরিতে পারিবেন বা ইচ্ছা করিলে তথা কার্য্য করিতে পারিবেন। উপযুক্ত বেতন পাইবেন, বলাই বাহুল্য, দেওয়ান বাহাদুর এক বৎসর ৩০টী ছাত্র লইয়া ক্ষান্ত হন নাই,

বছর বছর কয়েক বৎসর লইয়াছিলেন। এখন ছাত্র লওয়া বন্দ আছে, তাদের একটা হেস্তনেস্ত হইলে তবে নূতন ছাত্র লইবার বন্দোবস্ত হইবে। দেওয়ান বাহাদুর অম্বালালের হৃদয়টা বড় উদার। ইনি কংগ্রেসের একজন বড় পাণ্ডা, ঐরূপ লোক থাকায় কংগ্রেস মহিমান্বিত তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আবার গাড়ী চলিয়াছে। এ রেল ছোট রেল, মিটার গেজ। যাহারা প্রশস্ত পথের রেলে চাপিয়াছে, তাহাদের পক্ষে এ ছোট রেল বড়ই কষ্টকর কিন্তু উপায়াভাবে বড় ছোট সকলকেই এই পন্থা অবলম্বন করিতে হইতেছে। যাহারা মালগাড়ীর ব্রেকভানে কখনও ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারা কষ্টের অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন—হেঁচকা টানে প্রাণ বাহির। যাঁহারা বঙ্গদেশ হইতে একেবারে দ্বারকা আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা রাজপুতানা মালব রেলওয়ে হইয়া একেবারে আমেদাবাদে আসিবেন। যাহা হৌক মধ্য রাত্রিতে আমরা বড়বন্ ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে আবার গাড়ী বদল। পরিচিত বন্ধুটী বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। আমরাও মোট মোটারী লইয়া আবার গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। সেই মিটারগেজ রেল সুতরাং ভাজনা খোলা হইতে অগ্নিতে গমন—কিন্তু এ গাড়ীতে উঠিয়া বড় আনন্দ হইল। গাড়ীশুদ্ধ লোক সাধু, একটী কাবুলী দম্পতী ছাড়া আর আমরা ছাড়া। আরও একজন ছাড়া জুনাগড়ের নবাবের পুলিসের একজন কর্ম্মচারী। সাধুগণকে জিজ্ঞাসায় জানিলাম আপাততঃ তাঁহারা সকলেই দ্বারকা চলিয়াছেন, তার পর সেখান হইতে কেহ কচ্ছ মাণ্ডবী যাইবেন, কেহ হিংলাজ (হিঙ্গুলা) যাইবার জন্য করাচী যাইবেন। করাচী হইতে ১২৫ ক্রোশ উট-সওয়ারে যাইতে হয়। কেহ বলিলেন যাইবেন নারায়ণ সরোবর। নারায়ণ সরোবর এখানে—এই প্রদেশে, শুনিয়া প্রাণে বড় সুখ হইল, তখন মানস চক্ষে চারিটী সরোবর একবার দেখিয়া লইলাম। প্রথমটী হইতেছে মানস সরোবর—হিমালয়ের উত্তরাংশে তিব্বত প্রদেশে। দ্বিতীয়টী বিন্দু সরোবর—উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের নিকট। তার পর পম্পা সরোবর। নাসিক হইতে যাইতে হয়। ইহারই নিকট গঙ্গাপুরে গোদাবরীর উৎপত্তি স্থানে ৭টী জলপ্রপাত আছে। ভব-

ভূতির উত্তররামচরিতে—রামচন্দ্রের মুখে এই পম্পা সরোবরের যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে। রামচন্দ্র তখন সীতাকে অন্বেষণ করিতেছেন। চক্ষু হইতে একটী অশ্রুধারা বহিয়া গিয়াছে আর একটী নূতন অশ্রুধারা প্রবাহিত হইবার পূর্ব্বে মূহুর্ত্তমাত্র কালে রামচন্দ্র এই পম্পার শোভা দর্শন করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। তার পর চতুর্থটী হইতেছে নারায়ণ সরোবর—এই ভূজ প্রদেশে। ভূজনগর হইতে ৩ দিন ক্রমাগত গো-শকটে যাইতে হয়।

আমাদের গাড়ীতে আরও একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলাম, একজন অন্ধ ৺দ্বারকা যাইতেছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তিনি হাইদরাবাদ হইতে আসিতেছেন—পাঠক মহাশয় ব্যাপার বুঝুন! আমাদের নিজের উপর একটা ঘৃণা হইল।

শেষ রাত্রিতে একটু বেশ শীত বোধ হইল। সুরত সহরে আদৌ শীত ছিল না। ভোরের সময় আমরা ঢোলা জংসনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে আবার গাড়ী বদল। নূতন গাড়ী লাগিয়াই ছিল। মোট-ঘাট সেই গাড়ীতে রাখিয়া আমরা প্রাতঃকৃত্য সারিলাম। হিন্দু ব্রাহ্মণ তপ্ত চা বিক্রয় করিতেছে। তদ্রূপ মুসলমানে বিক্রয় করিতেছে। আর সাহেবদের জন্য হোটেল ও চার ব্যবস্থা ত আছেই। এখানে একটী নূতন দৃশ্য দেখিলাম। অর্থাৎ তিনটী হোটেল—একটী সাহেবদের, একটী মুসলমানদের আর একটী হিন্দুদের। ব্রাহ্মণের রান্না ভাত ডাল তরকারি স্নান করিয়া তপ্ত তপ্ত খাইয়া লইতে পারেন। ভাল ব্রাহ্মণ সারস্বত ব্রাহ্মণ। আর একটী নূতনত্ব এখন হইতে আরম্ভ হইল পবন-চরকীতে কূপ হইতে জল তোলা। সুতরাং ষ্টেসনে জলের কল আছে।

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

দার্জ্জিলিং।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার সকাল ৬টার সময় আমাদের গাড়ী শিলিগুড়ি ষ্টেসনে আসিল। এখানে নামিয়া Darjeeling Himalayan Railwayর গাড়ীতে চড়িলাম। গাড়ীগুলি খুব ছোট। কতকটা হাবড়া আমতা রেলের মত। প্রতি গাড়ীতে ৫।৬ জন বসিতে পারে; কিন্তু লেখা আছে "আট জন বসিবে।" গাড়ী বেশ জোরে চলিতে লাগিল। ষ্টেসনের নিকটে অনেক কদম গাছ আছে। তাহাতে অনেক ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। রেলের ধারে শাল প্রভৃতি নানা গাছ দেখিতে পাওয়া গেল। গাছগুলি প্রায় ৪।৫ তোলা হইবে। গাড়ী অধিক অগ্রসর হইলে দুই ধারে ঘন নিবিড় বন দেখা গেল। American forest প্রভৃতির ছবি দেখিলে এই বনের কতকটা ধারণা করা যাইতে পারে। এইবার গাড়ী পাহাড়ের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। চারি ধারে পাহাড়, একটুও সমতল ভূমি নাই। ষ্টেসনগুলি পাহাড়ের গায়ে। দূর হইতে অনেক উপরে ষ্টেসন দেখা যায়। গাড়ী ঘুরিতে ঘুরিতে উপরে উঠিতে লাগিল। প্রায়ই আঁকিয়া বাঁকিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। পাহাড়ের উপর দিয়া, অরণ্যের ভিতর দিয়া গাড়ী বৃহৎ অজগর সর্পের ন্যায় উঠিতেছে। পাহাড়ের মধ্যে মধ্যে ঝরণা। স্থানে স্থানে গাড়ী ঝরণা হইতে জল লইতে লাগিল। রেলের দুই পার্শ্বের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। এ দৃশ্য না দেখিলে ভাল করিয়া বুঝা যায় না। কতকগুলি বৃক্ষে সুন্দর প্রস্ফুটিত পুষ্প দেখা গেল। এ দেশের সকল বাড়ীই পাহাড়ের গায়ে। কোন দুইটী বাড়ী এক সমতলে নাই। এক এক সময় গাড়ী কোথা দিয়া কোথায় আসিল দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। এক স্থানে রেল প্রায় গোল হইয়া গিয়াছে। গার্ডগাড়ী যখন নীচে, তখন এঞ্জিন ঠিক তাহার উপরের একটী পুলের উপর।

গাড়ী ক্রমে কারসিয়ং আসিল। আমরা এখানে নামিলাম। ষ্টেসনে সাহেবদের হোটেল আছে। এদেশে স্ত্রীলোকেরা মোট বহে। তাহাদের নিকট খানিকটা 'নেয়ার' ও তাহার দুই মুখে বাঁধা একটী দড়ী থাকে।

তাহারা কপালে সেই 'নেয়ার' দিয়া পিঠের উপর জিনিসপত্র ফেলিয়া, সেই দড়িতে আটকাইয়া অনায়াসে লইয়া যায়। ইহারা খুব ভারি দ্রব্যও এইরূপে লইয়া যায়। হিন্দি অল্প বুঝে, পুরুষেরা ইহাদের অপেক্ষা ভাল বুঝে ও বেশ বলিতে পারে। ইহাদের অনেকেরই রং ফর্শা। সকলেরই নাক বসান। ঘাগরা পরে, জামা গায়ে দেয়, হাত বাহিরে রাখিয়া জামার উপর একটা কাপড় বাঁধে, মাথায় একটী পুরু কাপড় দিয়া তাহা পিঠের দিকে ঝুলাইয়া দেয়। ইহাদের সকলেরই খালি পা। পুরুষেরা কোট পেণ্টুলুন পরে, মাথায় টুপি দেয়। ইহাদেরও অনেকের পা খালি থাকে। ইহারাও স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় মোট বহে। এখানকার বাড়ীগুলি কাঠ, পাথর, টিন ও কাচ দিয়া নির্ম্মিত। অনেকগুলি বাড়ীর দেওয়াল কতকটা পাথরের, বাকি অংশ কাঠের। জানালা কাচের ও কাঠের। সকল বাড়ীর ছাতে টিন মারা। এখানে বাড়ী তৈয়ার করিতে অনেক খরচ পড়ে। কতকগুলি নানাপ্রকার বিলাতি দ্রব্যের দোকান আছে। তরকারী প্রভৃতি অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য শিলিগুড়ি হইতে আনাইতে হয়। একখানি হিন্দুস্থানী ময়রার দোকান আছে। খাদ্যদ্রব্য আনাইতে অনেক খরচ পড়ে। সোমবার আহারাদির পর বেড়াইতে বাহির হইলাম। ষ্টেসন হইতে Dow-hill নামক একটী পাহাড় উঠিয়াছে। এই পাহাড়ের গায়ে একটী বেশ চওড়া রাস্তা আছে। সেই রাস্তা ধরিয়া উঠিতে লাগিলাম। এ রাস্তা রেলের মত ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়াছে। এ দেশের অধিকাংশ রাস্তাই এইরূপ। রাস্তার ধারে মাঝে মাঝে বাড়ী আছে। এ রাস্তা 'গুম' হইয়া দার্জিলিঙ্গে গিয়াছে। 'গুম' ষ্টেসনের পর দার্জিলিং ষ্টেসন। প্রায় ২ মাইল এই রাস্তা ধরিয়া গিয়াছিলাম। সেখানে গবর্ণমেণ্টের 'ট্রেণিং কলেজ' ও একটী বালিকা বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়টী দেখিতে বেশ সুন্দর। কারসিয়ংএ সাহেব ভিন্ন অন্য কোন জাতির জন্য বিদ্যালয় নাই। এ সকল পাহাড়ে বাঘ নাই তবে সাপ থাকা সম্ভব। এখানে এক প্রকার ধুতুরা ফুল দেখিতে পাইলাম। সেগুলির গন্ধ মিষ্ট। ফুলগুলি লম্বে প্রায় ১ ফুট। পাহাড়ের গায়ে স্থানে স্থানে চা বাগান দেখিতে পাওয়া যায়। রেল হইতে অনেক চা গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। চা গাছের

ছোট ছোট ঝোপ সারিবন্দি করিয়া বসান। ঝোপগুলির উপরিভাগ গোল করিয়া ছাঁটা।

বৈকালে পুনরায় বেড়াইতে বাহির হইলাম। কারসিয়ং হইতে রেল যে রাস্তা দিয়া গিয়াছে এবার সেই রাস্তা দিয়া যাইতে লাগিলাম। এই রাস্তার ষ্টেসন হইতে অল্পদূরে একটী বড় হোটেল আছে। ইহার নাম Clarendon Hotel. গাড়ী এই হোটেলের নিকট থামে। এই হোটেল ছাড়াইয়া একটু দূরে যাইয়া একটী ছোট ঝরণা দেখিতে পাইলাম। এই ঝরণাটীর জল পাহাড়ের গা হইতে বাহির হইতেছে; উপর হইতে পড়িতেছে না। শীতকালে, বর্ষাকালে একইভাবে জল পড়িতে থাকে। এই ঝরণার জল এখানকার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী। এখানকার অধিবাসী বাঙ্গালীরা ঔষধের মত এ জল ব্যবহার করেন। এই ঝরণা দেখিয়া ফিরিয়া আসিলাম। কারসিয়ংএ বাঙ্গালার কয়েকজন মহারাজা ও বড় জমীদারের বাটী আছে; কাকিনার কুমার মহিমারঞ্জনের রাজভবন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। মঙ্গলবার প্রাতে ষ্টেসন হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখিতে পাইলাম। বেশ পরিষ্কার দেখা গেল। তুষার ধবলিত শিখরে সূর্য্য কিরণ পতিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছিল। পর্ব্বতের স্থানে স্থানে রৌদ্র পড়ে নাই, সেই স্থানগুলি নীলবর্ণ দেখাইতেছিল। কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখর দেশ কাঞ্চন বরণ ধারণ করিয়াছিল। আহারাদির পর আবার দার্জিলিং মেলে উঠিলাম।

গাড়ী ক্রমে উপরে উঠিতে লাগিল। পরে গুমে আসিয়া পৌঁছিল। গুম সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। ইহা সমুদ্র হইতে ৭৪০৭ ফিট উপরে। দার্জিলিং কয়েক শত ফিট নামিয়া যাইতে হয়। দার্জিলিং ষ্টেসনের নিকটে Lowis Jubilee Sanitarium (লুইস জুবিলি স্যানিটেরিয়াম্)। আমরা এই স্যানিটেরিয়ামে থাকিলাম। বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইলাম। রেল রাস্তা হইতে উপরে উঠিলে Mall (মল) নামক বেড়াইবার স্থান। মলে উঠিবার রাস্তায় অনেকগুলি দোকান আছে। সাহেবদের Whiteaway Laidlaw প্রভৃতি কয়েকটী বড় দোকান আছে। দোকানগুলির পর Mall। এখানে উঠিবার আরও রাস্তা আছে। Observatory Hill নামক পাহাড়ের চারি ধার দিয়া Mall নামক বেড়াইবার রাস্তা গিয়াছে। এই রাস্তার ধারে

লাট সাহেবের বাটী। ইহার নাম Shrubbery. ভিক্‌টোরিয়া পার্ক্‌ও এই রাস্তার ধারে। এই পার্কে অনেক সাহেব বৈকালে বেড়াইতে আসেন। কালা গোরা সকলেই এই পার্কে বেড়াইতে পারেন। শনি ও মঙ্গলবারে এই পার্কের ভিতর 'ব্যাণ্ড' বাজে। লাট সাহেবের বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে একটী বড় 'ওক' গাছ আছে। আজ মল বেড়াইয়া ফিরিয়া আসি। পথে বৃষ্টি হয়। এখানে প্রায়ই এই সময়ে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়। সূর্য্য ভাল করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না।

বুধবার প্রাতঃকালে আমরা এখানকার Botanical Garden ও Museum দেখিতে গেলাম। উচু নিচু জমির উপর এই বাগান। বাগানটী দেখিতে অতি সুন্দর। এই বাগানের মধ্যে Museumএ দুটী ঘর আছে। তাহাতে নানা প্রকার প্রজাপতি, সাপ, পাখী ইত্যাদি আছে। বাগানের ভিতর একটী কাচের ঘরে নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিয়া আছে। আমরা আহারাদির পর লিবং দেখিতে যাই। লিবং এখানকার ইংরাজ-সৈনিকদের একটী প্রধান আড্ডা। বাজারের উত্তর দিয়া লিবং রোড (Lebong Road) গিয়াছে। এই রাস্তা ধরিয়া বরাবর যাইতে লাগিলাম। রাস্তার বামপার্শ্বে কাছারি দেখিতে পাইলাম। আমরা কাছারির ভিতর যাই নাই। আরও অধিকদূর অগ্রসর হইয়া আমাদের দক্ষিণ পার্শ্বে বালিকা-বিদ্যালয় ও গোরস্থান দেখিতে পাইলাম। ইহার পার্শ্বেই বার্চহিল নামে একটী পাহাড়। আরও অধিকদূর অগ্রসর হইয়া আমাদের বাম পার্শ্বে St. Joseph's College দেখিতে পাইলাম। কলেজবাড়ী পাথরের। দার্জিলিঙ্গের মধ্যে এই বাড়ীটী বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এ কলেজটী সাহেবদের জন্য। ষ্টেসন হইতে এই কলেজটী প্রায় ৩ মাইল। ক্রমে লিবংএ আসিয়া পৌঁছিলাম। রাস্তা হইতে বারিকগুলি অনেক নিম্নে। এখানে প্যারেড্ করিবার জন্য অনেকটা জমি সমতল করা হইয়াছে। এইরূপ বিস্তৃত সমতল ভূমি দার্জিলিঙ্গে আর নাই। বারিকগুলি ছোট ছোট পাহাড়ের গায়ে। এখানে ভুটিয়াদের নিকট ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যায়। বারিক-গুলির নিকট আমাদিগকে যাইতে দিল না। সেই স্থান হইতে অল্পদূরে একটী খুব উচ্চ পাহাড়। তাহার মাথায় কতকগুলি বাড়ী দেখিতে পাওয়া

যায়। এইটী ভুটিয়া বস্তি। সেখানে শুনিলাম ভুটিয়াবস্তির ভিতর দিয়া যাইলে অল্প পথ যাইতে হয়; সময়ও অল্প লাগে। আমরা লিবং রোডে উঠিয়া আসিলাম। এই রাস্তা পর্য্যন্ত উঠিতে কষ্ট হয়। এখানে এইরূপ কষ্ট অতি অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিবার পরই দূর হয়। আবার উঠিতে লাগিলাম। এবার অনেক উচুতে উঠিতে হইল। ক্রমে ভুটিয়াবস্তির ভিতর আসিয়া পড়িলাম। আমরা আরও উঠিতে লাগিলাম। ক্রমে Mallএ আসিয়া পৌঁছিলাম। অল্প সময়ের মধ্যে আমরা ফিরিতে পারিয়াছিলাম। ভুটিয়াবস্তির ভিতর দিয়া লিবং যাইয়া লিবং রোড দিয়া ফিরিয়া আসিলে কষ্ট হয় না।

বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে ষ্টেসনের নিকট আসিয়া কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখিতে পাইলাম। কারসিয়ং হইতে আরও ভাল করিয়া দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। আমরা Observatory hillএ বেড়াইতে যাইলাম। পাহাড়টী অল্পই উচু। কুয়াসা না হইলে দার্জিলিং সহর এই পাহাড়ের উপর হইতে বেশ সুন্দর দেখায়। দার্জিলিঙ্গে প্রায়ই Mountain fog (কুয়াসা) দেখিতে পাওয়া যায়। শাদা মেঘ কোন কোন পাহাড়ের গা হইতে উঠিতেছে। সময়ে সময়ে শাদা মেঘ ও কুয়াসা এত বেশি দেখা দেয় যে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। মনে হয় সম্মুখে ও পার্শ্বে অনন্ত সমুদ্র। সমুদ্র নীল কিন্তু মেঘ শাদা। এই পাহাড়কে এ দেশের লোকেরা মহাকাল ডেরা বলে। কথিত আছে মহাকাল নামক এক ঋষি এই পর্ব্বতের একটী গহ্বরের ভিতর দিয়া তিব্বতে গিয়াছিলেন। সেই গহ্বর বা গুহাটী এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাহাড়ে উঠিয়া একটী বসিবার স্থান আছে। তাহার পাশ দিয়া লোহার রেলিং দেওয়া পাথরের সিঁড়ি নামিয়াছে। অল্প নামিলেই গুহাটী দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ স্থানে দুর্জ্জয়লিঙ্গ নামে এক শিব আছেন। কেহ কেহ বলেন যে এই শিবের নাম হইতে দেশের নাম দার্জিলিঙ্গ হইয়াছে। এখানে একটী কাঠের বাক্স আছে। বোধ হয় তাহাতে দূরবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্র আছে। একটী পাহাড়ের মানচিত্র আছে। কোন্ পাহাড় কত উচ্চ তাহাও লিখিত আছে। শিবের সম্মুখে কিছু দূরে বৌদ্ধ-দিগের একটী চৈত্য আছে।

বৈকালে আমরা জলা পাহাড়ে বেড়াইতে যাই। এই পাহাড়ের উপরে

গোরাদের বারিক আছে। পাহাড়ে উঠিবার রাস্তার পার্শ্বে কুচবিহারের মহারাজার রাজভবন দেখিতে পাইলাম। পাহাড়ের উপর হইতে একটী রাস্তা গুম পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। আমরা এই রাস্তা ধরিয়া নামিলাম। জলা পাহাড়ের উপর হইতে সিঞ্চল পাহাড় দেখিতে পাওয়া গেল। সিঞ্চল এখানকার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পর্ব্বত। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে এই পাহাড হইতে 'গৌরীশঙ্কর' (Everest) দেখিতে পাওয়া যায়। শরৎকালে সিঞ্চল হইতে সূর্য্যোদয় একটী দেখিবার জিনিস। আমরা অকলাণ্ড রোড দিয়া গুমে নামিয়া আসিলাম। গুম হইতে ফিরিয়া আসিতে রাত্রি হইয়া গেল। দার্জ্জিলিঙ্গের নিকটে আসিয়া সহরের দীপাবলী দেখিতে পাওয়া গেল। আলোগুলি এখানে ওখানে আকাশের তারার ন্যায় ফুটিয়া রহিয়াছে। দেখিতে অতি সুন্দর।

শুক্রবার দিন সকাল হইতে বৃষ্টি হয়। সকাল বেড়াইতে যাইতে পারি নাই। বৈকালে বাজার হইয়া Mallএ যাই। বাজারটী ছোট নয়। ষ্টেসনের নিকটেই বাজার। দেশী ও বিলাতী জিনিসের অনেকগুলি দোকান আছে। Tibetan Curios প্রভৃতি দোকানে, এ দেশের লোকেরা যে সকল দ্রব্য বিক্রয়ার্থে লইয়া আসে, তাহা ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিবার জন্য রাখা হয়। এদেশের লোকেরা নানা প্রকার পশুচর্ম্ম, ভোজালি, মধু, মোটা গায়ের কাপড়, সুন্দর সুন্দর মৃতপ্রজাপতি প্রভৃতি বিক্রয় করিবার জন্য লইয়া আসে। বাঙ্গালীদের দুই একটী বড় দোকান আছে। তরকারির বাজারে কপি, কলাইশুটি, নানা প্রকার শাক, আলু, এক প্রকার পাহাড়ি সিম, কাঁচা আলুবোখারা প্রভৃতি প্রত্যহ বিক্রয় হয়। এখানে রবিবারে হাট বসে। কোন জিনিসই কলিকাতা অপেক্ষা এখানে বেশী সুলভে পাওয়া যায় না। ভুটিয়ারা দুধ বিক্রয় করে। তাহাদের পিঠে একটী করিয়া বড় বাঁশের চোং থাকে, তাহাতেই দুধ থাকে। বাজারে মুটে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদের মধ্যে অনেকে স্ত্রীলোক। ইহারা কপালে বাঁশের বোনা চওড়া ফিতা দেয় ('নেয়ার' দেয় না) তাহাদের পিঠে এক প্রকার লম্বা ঝুড়ি থাকে। এখানকার স্ত্রীলোকেরা ছোট ছেলেদের পিঠে বাঁধিয়া লইয়া যায়। বাজারে চাল ডাল প্রভৃতির কতকগুলি দোকান আছে।

শনিবার দিন গুমে বেড়াইতে যাই। এখানে ষ্টেসনের নিকট বৌদ্ধ কুটানিদের একটী মঠ আছে। মঠের আকৃতি মন্দিরের মত নহে, বাড়ির মত কিন্তু একটী চূড়া আছে। উপাসনা গৃহের সম্মুখে বারান্দা। বারান্দার বাম দিকে একটী ছোট ঘর। উপাসনা গৃহে ঢুকিবার দরজার সম্মুখে বেদী। বেদীতে ধাতুনির্ম্মিত বৌদ্ধমূর্ত্তি। মূর্ত্তির সম্মুখে বৌদ্ধচৈত্য। সেইগুলির সম্মুখে এক সারি প্রদীপ। বার জন পুরোহিত পূজা করিতেছেন। প্রত্যেকের সম্মুখে পুঁথি রাখিবার কাঠের চৌকী। পুঁথিগুলি খুব বড়। সকলে এক সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন। মাঝে সাঝে এক সঙ্গে তিনবার করিয়া হাততালি দিতেছেন। প্রত্যেক পুরোহিতের নিকট কাঠের একটী করিয়া ঘটীর মত পাত্র আছে। পাত্রগুলিতে একটী করিয়া নল ও একটী করিয়া ছিদ্র আছে। একজন লোক গরম চা ঐ পাত্রে ঢালিয়া দিতেছে। পুরোহিতেরা নল দিয়া টানিয়া মাঝে মাঝে চা খাইতেছেন। প্রত্যেক পুরোহিতের হাতে মালা জড়ান আছে। এক জনের নিকট একটী শাঁখ আছে। মন্দিরে খুব বড় একটী কাঁসর আছে। বারান্দার বাঁ দিকের ঘরে একটী বড় কাঠের চোং আছে। চোংএর উপর দিকে একটী লোহার ডাণ্ডা আছে। চোংটীর দুই মুখই বন্ধ। ইহার নীচে দিকেও লোহার ডাণ্ডা আছে। এক জন স্ত্রীলোক দড়ি দিয়া নীচেকার ডাণ্ডা ঘুরাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে চোংটী ও তাহার মাথার উপরকার ডাণ্ডা ঘুরিতেছে। দুইটী ছোট ঘণ্টা ঝোলান আছে। উপরকার ডাণ্ডাটী সেই ঘণ্টা দুটীতে লাগিতেছে। অতি মধুর শব্দ হইতেছে। বাহিরে একজন লামা আছেন। তাঁহার হাতে একটী ছোট চোং। তিনি তাহা ঘুরাইতেছেন। আমরা এই মঠ দেখিয়া দার্জ্জিলিঙ্গে ফিরিয়া গেলাম।

রবিবার দিন সকালে হাট দেখিতে গেলাম। বেলা বাড়িলে হাটে বেশী লোক আসে। বাজারের রাস্তার দুই ধারে হাট বসে। হাটে নানা-প্রকার তরকারী, ভোজালি, প্রজাপতি, চা কাটিবার ছুরি, ওক ও চা গাছের লাঠি, বেতের লাঠি প্রভৃতি বিক্রয় হয়। বৈকালে Victoria Water-fall দেখিতে গেলাম। এই ঝরণাটীকে এ দেশের লোকেরা 'কাকঝোরা' বলে। স্যানিটেরিয়াম হইতে নীচে নামিতে লাগিলাম। পথের ধারে এখানকার

High School. এই বিদ্যালয়ে বাঙ্গালীরা ও এদেশের অধিবাসীরা পড়ে। এ দেশের অধিবাসীরা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারে না। ঝরণার নিকটবর্ত্তী স্থানটী অতি নির্জ্জন। প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া অনেক উপর হইতে ঝরণার জল বেগে পতিত হইতেছে।

সোমবার বার্চ হিল দেখিতে যাইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বার্চ হিল লিবং রোডের ধারে। স্থানটি খুব নির্জ্জন। নানা প্রকার বৃহৎ বৃক্ষ এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার অধিকাংশ বৃক্ষ নানা প্রকার শৈবাল আচ্ছাদিত। পাহাড়ের উপরে বেড়াইবার রাস্তা আছে।

এইবার সহরের কথা কিছু বলিব। সহরে বিদ্যালয়, ঔষধালয়, হাঁসপাতাল, জেল, কাছারি, স্যানিটেরিয়াম্, লাট সাহেবের বাড়ী, মহারাজাদিগের প্রাসাদ প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর বাড়ী আছে। সহর হিসাবে দার্জ্জিলিঙ্গে দেখিবার বিশেষ কিছুই নাই। স্বভাবের উপর মনুষ্য যে কি আধিপত্য লাভ করিয়াছে ইহাই দেখিবার বিষয়। এখানে সকল রাস্তার আরম্ভে সাইন বোর্ডে সেই রাস্তার নাম এবং তাহার উপর যে সকল বাড়ী আছে সেইগুলির নাম লেখা আছে। সহরের অনেকগুলি ঝরণা অনেক দূর হইতে বাঁধাইতে হইয়াছে। কোন কোন পাহাড়ের স্থানে স্থানে পাথর দিয়া বাঁধাইতে হইয়াছে। এখানে ঘোড়া, রিক্স নামক এক প্রকার ঠেলাগাড়ী, ডাণ্ডী নামক যান, ভাড়া পাওয়া যায়। ডাণ্ডীতে একজন লোক বসে। তিনজনে ডাণ্ডী কাঁধে করিয়া লইয়া যায়।

এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। অসংখ্য পর্ব্বত, অসংখ্য জলপ্রপাত, নানা প্রকার বনস্পতি দেখিলে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতা মনুষ্য উপলব্ধি করিতে পারে। এখানে মেঘের খেলা অদ্ভুত। আমরা এক দিনও একটী তারা আকাশে দেখিতে পাই নাই। পূর্ণিমার রাত্রে পূর্ণচন্দ্র দেখিতে পাইয়াছিলাম; কিন্তু তাহা মেঘমুক্ত নহে। এখানে বিদ্যুতের প্রভা দেখিতে পাওয়া যায় না। বজ্রের শব্দও শুনা যায় না। সূর্য্যের মাঝে মাঝে দেখা পাওয়া গিয়াছিল। সূর্য্যের উদয় বা অস্ত দেখিতে পাই নাই। আকাশে কোন দিনও লাল মেঘ দেখিতে পাই নাই।

ফিরিবার বেলা, আমরা মঙ্গলবার দিন ১০টার সময় গাড়ী চাপিলাম।

দার্জ্জিলিং ষ্টেসন ছাড়াইয়া আসিয়া আকাশের গায়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখিতে পাইলাম। তাহার নীচে ও উপরে মেঘ। কারসিয়ং ষ্টেসন ছাড়াইয়াই বহু দূরের শস্যশ্যামল সমতল ভূমি দেখিতে পাইলাম। এ দৃশ্য অতি সুন্দর। অনন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের ন্যায় দেখাইতেছিল। দুইটী নদী সূক্ষ্ম রৌপ্যসূত্রের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে নামিতে লাগিলাম। বৈকাল ৫টার সময় শিলিগুড়িতে আসিয়া পৌঁছিলাম।

চুঁচুড়া। শ্রীঅচ্যুতচন্দ্র সরকার।

আমাদের কথা।

দার্জ্জিলিঙ্গের পথে গুম্ ষ্টেসনের নিকট ভুটিয়াদিগের বৌদ্ধ মঠে, সেদিন অপরাহ্নে যখন বৈকালিক স্তব পাঠ শুনিতেছিলাম, তখন একটা কথা লক্ষ্য করিয়াছিলাম—বৌদ্ধ মঠাধারীদিগের স্তব গীতির সুর এবং তাল অনেকটাই ৺বৈদ্যনাথের নিকটস্থ সাঁওতালদিগের মত। তাল—পাহাড়ীদের পটতাল। সুর কি তাহা ঠিক বলিতে পারিব না,—তবে একজন মুসলমান ভিক্ষুক, মঠের বাহিরে, অথচ অতি নিকটে বসিয়া মুলতানে গজলের মত গাহিতেছিল, ভিতরের বাহিরের সুরে বিশেষ গরমিল হইতেছিল না। যাঁহারা সাঁওতালের নাচ দেখিয়াছেন, গান শুনিয়াছেন, তাঁহারা—'কিন্ধিয়া ঘেনা ঘেনা ঘা', এই বোলে মাদল বাজিতে ও এইরূপ তালে সাঁওতাল সাঁওতালনীকে নাচিতে গাহিতে শুনিয়াছেন, স্মরণ করিবেন। প্রায় ঠিক সেইরূপ তাল ও সুরে বৌদ্ধ পুরোহিতগণ সম্মুখস্থ বিরাট গ্রন্থ হইতে স্তব পাঠ করিতেছিলেন। কোথায় হিন্দু সভ্যতা পরিবেষ্টিত সাঁওতাল ভূমি,—আর কোথায় হিন্দুস্থানের সীমান্তের তিব্বত প্রান্তের দার্জ্জিলিং প্রদেশ? তবু সুরে তালে—এত মিল কেন? পাহাড়ের সহিত এই সুর তালের কোন সম্বন্ধ আছে না কি? বোধ হয় আছে। এই সকল দূর দেশের কথা ভাবিতে ভাবিতে, আমি নিকটের কথাও ভাবিতেছি—আমাদের বাঙ্গালির বা বঙ্গদেশের তাল বা ছন্দেরও ত বৈশেষিকত্ব আছে। আছে বৈ কি? ভাষা বল, গান বল, তাল বল, ছন্দ বল সকলই দেশ কাল পাত্র লইয়া

নিয়মের অধীন। অনিয়মে, বা অকস্মাৎ কোন কিছুই হয় না। আমাদের বাঙ্গালির ভাষায়, গানে, তালে, ছন্দে, আমাদের বাঙ্গালার জল বায়ুর ছাপ আছে, বৌদ্ধ যুগের, বা মুসলমান সময়ের, অথবা ইংরেজ অধিকারের ছাপ আছে, আর পাত্রের-বাঙ্গালির-আভিজাতিক ছাপ আছে; এই সমস্ত ছাপের গুণে বা রীতির ভঙ্গিতে, প্রাকৃতিক বলের তাড়নায়, বাঙ্গালির ভাষা গান তাল ছন্দ সকলই হইয়াছে। পোষাক পরিচ্ছদ রীতি নীতির কথা বলিতেছি না; নতুবা ঐ সকলে যে ঐরূপ ছাপ নাই—এ কথা কেহ বুঝিবেন না।

আর বঙ্গ শব্দে 'বাঙ্গাল' দেশ—এমনটাও কেহ বুঝিবেন না। বাঁকুড়া, বীরভূমি, বর্দ্ধমান, রঙ্গপুর, দিনাজপুর—এ সকলই বঙ্গদেশ। আসামে আমাদেরই অক্ষর; মিথিলায়ও এক শ্রেণীর মধ্যে এই বঙ্গাক্ষর; উড়িষ্যায় ছাঁদ বিভিন্ন হইলেও—সেও এক প্রকার বঙ্গাক্ষর; এইরূপ বঙ্গাক্ষর যে সকল দেশে প্রচলিত আছে—সেই সমস্ত ভূখণ্ডকে বঙ্গদেশ বলিতেছি।

সমগ্র হিন্দুস্থান মধ্যে এই বঙ্গদেশের এবং এই দেশবাসী বাঙ্গালি জাতির বৈশেষিকত্ব, অতি প্রাচীন কাল হইতে স্বীকৃত আছে।

নাগর, কায়তী প্রভৃতি যে সকল অক্ষর বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে বঙ্গাক্ষর অতি প্রাচীন। তন্ত্রের ধ্যানে এই অক্ষরমালারই (ত্রিকোণ কুণ্ডলীযুক্ত 'ক' ইত্যাদি) বর্ণনা। নেপালে ১৫০০ বৎসরের পুঁথিতে বঙ্গাক্ষর ব্যবহৃত আছে।

আলঙ্কারিকেরা গৌড়ীয় বলিয়া একটী প্রাচীন রীতির উল্লেখ করেন। এই রীতি সমাসবহুলা বলিয়া প্রসিদ্ধ। অষ্টাদশ প্রকার প্রাকৃতের মধ্যে গৌড়ী বলিয়া একটী ভাষার উল্লেখ আছে।

কাজেই বাঙ্গালার বিশেষত্ব বহু কাল হইতে স্বীকৃত।

গৌড়ীয় রীতি—সমাসবহুলা—তবে কি আমরা স্বভাবে বেশী জটীল? বা আড়ম্বর প্রিয়?

বাঙ্গালার অক্ষরে কোণ বেশী। তবে কি আমরা বেশী খোঁচ ভালবাসি? না অক্ষরগুলি সুস্পষ্ট করিবার জন্য আমরা অধিকতর কোণী করিয়াছি,—তবে কি আমরা সুস্পষ্টতা ভালবাসি?

বঙ্গাক্ষর সুস্পষ্ট, লিখিতে সুকর, এবং ধ্যান সঙ্গত বলিয়া বীজকবচের

উপযোগী। রাজা রাধাকান্ত দেব, জগতের জন্য অভিধান প্রণয়ন করিয়া, যে বুদ্ধিতে উহা বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত করেন, এই পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া, যদি সেই বুদ্ধি তাহার পর সময়ের সংগ্রহকার ও প্রকাশকগণের মধ্যে থাকিত, তাহা হইলে, ভারতের সর্ব্বসাধারণের গ্রাহ্য অক্ষরের জন্য আমাদিগকে কোন ভাবনাই ভাবিতে হইত না। বঙ্গাক্ষরের ন্যায়ত জয় হইত, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালির গৌরব অধিকতর বর্দ্ধিত হইত। আমরা হেলায় হারাইয়াছি, এখনও কত কি হারাইতেছি।

আমাদের গানের তালের, বা কবিতার ছন্দের যে বৈশেষিকত্ব তাহাও বোধ হয় আমরা হারাইতে বসিয়াছি।

বাঙ্গালির গানের বৈশেষিকত্বের বিশেষ পরিচয় বাঙ্গালির কীর্ত্তনাঙ্গে। উড়িষ্যায়, বা আসামে, যে কীর্ত্তনাঙ্গ, সে সমস্ত আমাদেরই—ঐ সকল দেশও বঙ্গদেশের মধ্যেই ধরিয়াছি। বঙ্গের বহুদূরে ব্রজমণ্ডলে বা দ্বারকায়, দক্ষিণে পাণ্ডুরপুরে, যে সকল কীর্ত্তনাঙ্গ আছে, সে সমস্তই বাঙ্গালা হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের পর গিয়াছে। এই কীর্ত্তনাঙ্গ গীতি রীতি—জগতে অতুলনীয়। সুরের মোহিনীশক্তি কীর্ত্তনে যেমন আছে—এমন কোন গানে নাই। শোকের করুণ-রস-বিস্তারে বোধ করি, মহরমের মরসিয়া গান সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু কীর্ত্তন সর্ব্বরসে সমান। শান্তি, আদি, করুণ, মধুর, বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য সকল ভাবেই কীর্ত্তনের মোহিনী শক্তি অসামান্য। বাল বৃদ্ধ—ধনী দরিদ্র—জ্ঞানী অজ্ঞানী—ইতর ভদ্র—সর্ব্ব শ্রেণীর মিশ্রিত সংঘ মধ্যে যিনি কোন দিন কীর্ত্তনের লীলাখেলা দেখিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা আর অধিক কি বলিব? আর যিনি বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীর এই গৌরবের বিষয় প্রত্যক্ষ করেন নাই—তাঁহাকেই বা কি বলিয়া বুঝাইব? তিনি নিতান্ত অভাগ্যবান্, তাঁহার জন্য আমাদের দুঃখ হয়। তিনি একটু চেষ্টা করিলেই ভাগ্য পরীবর্ত্তন করিতে পারেন। যে গানে,—করুণার ক্রন্দন, উল্লাসের উৎসাহ, প্রেমের পূর্ণতা, ভক্তির দ্রাবকতা—সমান ভাবে স্ফুরিত হয়, বড়ই দুঃখের বিষয়, সেই গানের আদর শিক্ষিত মধ্যে ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। প্রসিদ্ধ সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ, সুযোগ্য শিক্ষক শ্রীযুক্ত রসময় মিত্র, রঙ্গপুরের উকীল ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত বরদা-

প্রসাদ বাকৃচি প্রভৃতি জন কতক খ্যাতনামা ব্যক্তি আজও কীর্ত্তনের চর্চ্চা করেন বলিয়া, এখনও কীর্ত্তন দাঁড়াইয়া আছে, নতুবা শিক্ষিতের কাছে কীর্ত্তনের কোন পরিচয়ই থাকিত না। দেশে হরিসভা অনেক আছে বটে, ভক্তিমান্ লোকেরও যে একেবারে অভাব হইয়াছে, এমন নহে; নব্য-সম্প্রদায়ের যুবকের মধ্যে যে কীর্ত্তন গানের একেবারে চর্চ্চা নাই, তাহাও নহে; তবু কীর্ত্তনের যে আদর আছে, এমন কথা বলিতে পারি না। কলিকাতার অনেক সভা সমিতিতে আদ্যন্তে সঙ্গীত হইয়া থাকে, কিন্তু কোথাও কীর্ত্তনাঙ্গ গান শুনিয়াছি, এমন মনে হইতেছে না। সুকণ্ঠ গায়িকায় সক্ করিয়া একটু আধটু ঢপের গান শিক্ষা করে, তাহাকেই অনেক ভদ্রলোক কীর্ত্তন বলিয়া জানেন, কিন্তু সে ত কীর্ত্তনের অপভ্রংশ মাত্র। জয়দেবের লম্বা তালের গান রীতিমত পত্তন দিয়া গাইতে পারেন, এমন গায়ক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়,—উচ্চ অঙ্গের আদর নাই বলিয়া। ঐ সকল গানের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কারিগরির আমি অতি অল্পই বুঝিতে পারি, কিন্তু যে টুকু বুঝি তাহাতেই মনে হয়, না জানি কতকালের সাধনার পর, গানে তাল ও রাগের ঐরূপ সম্মিলন ও স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। ঐরূপ অবয়ব হইয়াছে,—অন্তত আট শত বৎসর পূর্ব্বে—তবে এই বাঙ্গালি জাতি কত দিনই না এইরূপ সঙ্গীতের চর্চ্চা করিতেছে। কে বলিল, বাঙ্গালায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভদ্রলোকের বাস ছিল না?

কীর্ত্তনের সুরের বিশেষত্ব আর একটু বিশেষ করিয়া বলিব। পাঠক মহাশয় ক্ষমা করিবেন। বিশেষ সুরজ্ঞ পাঠকগণ। আমি তাঁহাদের শিক্ষার জন্য লিখিতেছি, এমন মূর্খ আমাকে মনে করিবেন না।

সুর মোটামুটি দুই প্রকার—খাড়া সুর, আর কোরাল বা ঘোরাল সুর। খাড়া বা সোজা সুর—ঐ পাপিয়া তুলিতেছে, উহু,—উহু—উহু—হুউ—[সত্য সত্যই পাপিয়া ডাকিতেছে, আষাঢ়ের শেষ ভাগে এমন বাদলের দিনে, এত পাপিয়া পূর্ব্বে শুনিতাম কি?] আর ঐ ঘোরাল সুরে, গালভরা গলায় কৃষ্ণ গোকুলে বলিতেছে,—কু বলাম্, কো বলাম্—কু। খাড়া সুর-গুলির নাম দেওয়া হইয়াছে, সা, রি, গা, মা, পা, ধা, নি এবং উহাদেরই কোন কোনটীর কোমল বা তীব্র। আর ঘোরাল সুরগুলির নাম, মীড় বা

মূর্চ্ছনা। সেতারের একটী ঘাটে তারের উপর বামহস্তের আঙ্গুল দিয়া চাপিয়া সেই তারে দক্ষিণহস্তের একটী অঙ্গুলির মেজাপ দিয়া টং করিয়া বাজাইলে, সেইটীকে খাড়া সুরের আওয়াজ বলা যায়; আর বামহস্তের আঙ্গুলটী কেবল চাপিয়া না রাখিয়া তারে চাপিয়া টানিয়া ধরিলে, এবং আঘাত করিলে যে ভাঁওও করিয়া আওয়াজ বাহির হয়, তাহাকে মীড় বা মূর্চ্ছনা বলে।

এই মীড় বা মূর্চ্ছনাই হিন্দু সঙ্গীতের জান এবং বিশেষত্ব। রাগ রাগিণীর যে স্ফুরণ, খাড়ব, ওড়ব বলিয়া ভেদ—তাহা এই মূর্চ্ছনা লইয়া। গলায় হোক, যন্ত্রে হোক, এই মূর্চ্ছনা সাধিতে না পারিলে, হিন্দু সঙ্গীত শেখা যায় না। সকল দেশের সঙ্গীতেই অল্প বিস্তর মূর্চ্ছনা আছে, হিন্দু সঙ্গীতে বড় বেশী আছে, এই জন্যই বলিতেছি মূর্চ্ছনাই হিন্দু সঙ্গীতের জান ও বিশেষত্ব। হারমোনিয়ম্ পায়ানোতে বিশেষ দক্ষ লোক নহিলে মূর্চ্ছনা কোন রূপ বাহির করা যায় না। সুতরাং হিন্দু সঙ্গীত শিখিতে হইলে, প্রথম হইতেই তানপুরার সঙ্গে গলা সাধা ভাল, তাহাতে ঘোরাল সুর শিক্ষা হয়।

বাঙ্গালির মধ্যে প্রথম পোলিসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কলিকাতার জগদীশ নাথ রায়। তিনি বিশেষ শিক্ষিত ব্যক্তি এবং বিশেষ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। বঙ্গদর্শনের প্রথম বৎসর 'সঙ্গীত' শীর্ষক তিনটী প্রবন্ধ ধারাবাহিক লেখেন। প্রথম প্রবন্ধ হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি:—"মনুষ্য কণ্ঠের সহজ সাত সুর, তাহার কোমল ও তীব্র এবং সুরাণী সকল গণিলে অভাবতঃ ২৪টী সুর হয়। এবম্প্রকার কল্পনা প্রসূত সুর সমুদায় কোন বাঁধা যন্ত্রেরই আয়ত্ত হইতে পারে না। দেশীয় গীতের জন্য হারমোনিয়াম্ প্রভৃতি বাগযন্ত্র প্রস্তুত করিতে হইলে, তাহাতে অভাবত (প্রত্যেক গ্রামে) ২৪টী সুর রাখা উচিত। তাহা হইলে তদ্দ্বারা দেশীয় গীত বাদিত হইবার সম্ভাবনা। য়ুরোপীয় যন্ত্রে (প্রত্যেক গ্রামে) কেবল ১২টী মাত্র সুর হয়, অতএব তাহাতে দেশীয় গীতের দশা নারদের ত্রিতন্ত্রী নিঃসৃত ভগ্নাঙ্গ রাগ রাগিণীর দশার ন্যায় হইয়া উঠে।"

এই মূর্চ্ছনাই হিন্দু সঙ্গীতের বিশেষত্ব। অন্য সঙ্গীতেও মূর্চ্ছনা আছে; তবে হিন্দু সঙ্গীতে বেশী বেশী আছে। তাহার মধ্যে আবার কীর্ত্তন সঙ্গীতে অত্যন্ত বেশী আছে।

এই গেল সুরের কথা—এখন তালের কথা মোটামুটি কিছু বলিতে হইতেছে। গানে যেমন তাল, পদ্যে তেমনই ছন্দ। যেমন লঘু, গুরু বা মাত্রাভেদ লইয়া তাল, তেমনিই লঘু, গুরু বা মাত্রাভেদ হইয়া ছন্দ; তালে যেমন বিরাম আছে, ছন্দে সেইরূপ যতি বা বিরাম; তালে যেমন লয় বা কাল আছে, ছন্দেও সেইরূপ কাল বা লয় আছে।

প্রথমেই বলিয়াছি পাহাড়ীদের তাল, প্রায়ই পটতাল—'কিন্ধিয়া ঘেনা ঘেনা ঘা'। সেইরূপ অল্প সংখ্যক অক্ষরের ছন্দ লইয়া আদিমকালের কাব্য হইয়া থাকে। আমরা প্রাকৃত ভাষার কথা কহিতেছি; সংস্কৃতের নহে, বৈদিকী ভাষার একেবারে নহে। যাঁহারা বেদ বা বৈদিকী ভাষা, বা বৈদিক মন্ত্র—নিত্য বলিয়াছিলেন, তাঁহারা অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী,—আর যাঁহারা বেদ চাসার গান বলেন, তাঁহারা নিতান্ত স্থূলদর্শী। আমরা বেদের ভাষা বা ছন্দ লইয়া কোন কথা বলিতেছি না; প্রাকৃত ভাষার কথাই বলিতেছি। প্রাকৃত ভাষায় প্রথমে ছাট ছোট ছন্দ দেখা যায়।

দীনেশ বাবু বহু গবেষণা করিয়া বঙ্গের আদি যুগের অনেকগুলি ডাকের কথা এবং খনার বচন সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার প্রায় সকলগুলিই ছোট ছোট ছন্দের। এইখানে দুই চারিটী উদ্ধৃত করিব।

দুষ্টা নারী।

(১)

ঘরে আথা, বাহিরে রাঁধে।
অল্প কেশ, ফুলাইয়া বাঁধে॥
ঘন ঘন চায়, উলটি মাড়।
ডাক বলে—এ নারী ঘর উজাড়॥

(২)

নিয়ড় পোখরি, দূরে যায়।
পথিক দেখিয়ে, আউড়ে চায়।
পর সম্ভাষে বাটে থিকে।
ডাক বলে, ঘরে না টিকে॥

শিষ্টা গৃহিণী।

রাঁধে, বাড়ে, গায়ে না লাগে কাতি। (কালি)
অতিথ দেখিয়া মরে লাজে।
তবু (ব্যস্ত) তার পূজার সাজে॥
সুশীলা, শুদ্ধ বংশে উৎপত্তি।
মিঠা বোল, স্বামীতে ভকতি॥
রৌদ্রে কাঁটা কুটায় রাঁধে।
খড় কাট বর্ষাকে বাঁধে॥
কাঁখে কলসী পানীকে যায়,
হেট মুণ্ডে কাহকো না চায়॥
যেন যায়, তেন আইসে।
বলে ডাক, গৃহিণী সেই সে॥

এইরূপ নীতি কথা, গৃহস্থালির কথা, এবং চাস বাসের কথা লইয়া ডাকের কথা। তিব্বতে 'ডাকার্ণব' পুস্তকে নাকি এই সকল সংগৃহীত আছে। খনার বচনে এইরূপ কথাও আছে, উপরন্তু জ্যোতিষের আর্য্যা আছে।

বাঙ্গালার কাব্যের প্রধানতঃ দুই ভাগ। ছড়া ও গান। ডাকের কথা। খনার বচন—কেবল ছড়া মাত্র। এই প্রাচীন সময়ে গানে কিরূপ ছন্দ ব্যবহৃত হইত তাহা আমরা বলিতে পারি না।

দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন—"তিরুমলায় উৎকীর্ণ শিলালিপি পাঠে জানা যায়, মহারাজ রাজেন্দ্র চোল বাঙ্গালা দেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজয় করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র চোল ১০৬৩ হইতে ১১১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের পিতা মাণিকচাঁদ। এই মাণিকচাঁদের গান গ্রিয়ার্সন সাহেব প্রথমে ছাপান।" তৎপূর্ব্বের কোন বাঙ্গালা গান আমরা জানি না। সে গানও ছড়ার মত বটে, তবে নিশ্চয়ই সুরে তালে গীত হইত। আর

"তুড়্ তুড়্ করিয়া ময়না হুঙ্কার ছাড়িল।"

এইরূপ পংক্তিগুলি বার বার থাকাতে মনে হয়—ওগুলি গানের ধুয়া হইবে।

মাণিকচাঁদের গান হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।

না যাইও, না যাইও রাজা! দূর দেশান্তর।
কারে লাগি বান্দিলাম শীতল মন্দির ঘর।
বান্দিলাম বাঙ্গলা ঘর নাহি পড়ে কালি।
এমন বয়সে ছাড়ি যাও, আমার বৃথা গাবুরাণী *।
জীয়ব জীবন ধন আমি (কন্যা) সঙ্গে গেলে।
রাধিয়া দিমু অন্ন, ক্ষুধার কালে।
পিপাসার কালে দিমু পানী।
হাসিয়া খেলিয়া পোহামু রজনী।

* * *

গ্রীসকালে বদনত দিমু দণ্ড পাখার বাও।
মাঘ মাসে শীতে ঘেষিয়া রমু গাও॥

পুত্র 'গোবিন্দচন্দ্রের গান'ও প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে অনেক আধুনিক কথা মিশ্রিত হইয়াছে।

গোবিন্দচন্দ্রের গানের নমুনা।

অভাগী দুনারে রাজা সঙ্গে করি লহ।
দেশান্তরে যাব আমি, কর অনুগ্রহ।
তুমি যোগী হইবে, আমি হইব যোগিনী।
রান্ধিয়া বিদেশে যোগাব অন্ন পানি।
বসিয়া থাকিও তুমি বনের ভিতরে।
আনিব মাগিয়া ভিক্ষা আমি ঘরে ঘরে॥

* * *

নারী পুরুষ দুই হয় এক অঙ্গ।
শিব বটে যোগীয়া, ভবানী তার সঙ্গ॥

* * *

খসাইয়া পেলে হার কেয়ুর কঙ্কণ।
অভিমানে দূর করে যত আভরণ॥

* গাবুরাণী = যৌবন।

পুঁছিয়া পেলিল সব সিঁতার সিন্দুর।
নাকের বেসর পেলে, পায়ের নূপুর॥
রাজার চরণে পড়ে জড়ায়ে কুন্তল।
মোরা সবে যাব রাজা দেশান্তরে চল॥

বাঙ্গালায় উজ্জ্বল রসের করুণ গীতি, দেখা যাইতেছে,—সেই কালেও বেশ সুন্দর ভাবে ফুটিয়াছিল।

এই সকল গীতি কাব্য পয়ারে রচিত; বাঙ্গালায় পয়ার কতকাল ধরিয়া আছে, তাহা ঠিক বলা যায় না, খনার বচন বা ডাকপুরুষের কথা যেমন ছিল, সেই সময়ে সর্ব্বরূপ পয়ারও ছিল বলিয়া বোধ হয়। তবে ওই-গুলি ছোট ছন্দে রচিত বলিয়া, অগ্রবর্ত্তী—একথা বলিতেও আমরা নারাজ নহি।

যে সময়ে মাণিকচাঁদ ও গোবিন্দচন্দ্র বাঙ্গালার এক দেশে রাজা—সেই সময়ে বঙ্গে সেন রাজাদিগের রাজত্ব চলিতেছে। এই সেন রাজাদিগের শেষ রাজার সময়ে শ্রীজয়দেব ঠাকুর। জয়দেবের গীত-গোবিন্দে রাগ অঙ্গের ভজনের, এবং সুরের ও তালের কায়দার—এক রূপ চরমোৎকর্ষ হইয়াছিল বলিলেই হয়; অল্প সময় মধ্যে এইরূপ পরিণতি হয় নাই। বহু-কালব্যাপী অনুশীলনে হইয়াছিল। সুতরাং মাণিকচাঁদ প্রভৃতির সময়ে যে শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা অল্প পরিমাণ ছিল, বা ম্রিয়মান হইয়াছিল, এমন কথা আমরা বুঝিতে পারি না; তাহার বিপরীতই বুঝি।

সকল পণ্ডিতেই বলিয়াছেন যে বাঙ্গালা ভাষা ভারতের অন্য সকল প্রাকৃত ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃতের বড় কাছা কাছি। সুতরাং বাঙ্গালা প্রধানত অনার্য্য নিবাস ছিল, এ কথার কোন মূল্য নাই। আবার জয়দেবের ভাষা বাঙ্গালা ভাষার এত কাছাকাছি, যে জয়দেবের সময়ে বাঙ্গালা ভাষা সাঁও-তালির মত একটা বুলি ছিল, তাহাও মনে করিতে পারা যায় না; বাঙ্গালা সেরূপ বুলি থাকিলে, সংস্কৃত তাহার কাছাকাছি হইতে যাইবে কেন? বাঙ্গালায় মুসলমান আসিবার বহুপূর্ব্বে এই দেশ সুসভ্য অধিবাসীর সুশৃঙ্খল জনপদ ছিল; তাহারা সুর-তাল-লয়ে গানের বিশেষ অনুশীলন করিত।

কাণ্যকুব্জ হইতে যদি কিছু পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ কায়স্থের কতক কতক আসিয়া

থাকেন, তাঁহারা কতক কতক মাত্র—কেন না বাঙ্গালার কীর্ত্তনাঙ্গ গানও কনোজিয়ার নহে। এ যে বাঙ্গালির জিনিস বাঙ্গালায় উঠিয়াছিল, বাড়িয়াছিল, এবং জয়দেবের সময় বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল,—এরূপ উৎকর্ষ যে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অনুচরবর্গের ক্রমাগত সোৎসাহ অনুশীলনেও সে উৎকর্ষ ছাড়াইয়া অদ্যাপি বাঙ্গালার কীর্ত্তন উঠিতে পারে নাই।

শ্রীমৎ আচার্য্য প্রভুর খেতুরের মহা মহোৎসবে যে অপূর্ব্ব কীর্ত্তনাঙ্গের সৃষ্টি হয়, এবং রেণেটি বা রাণীহাটি বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই অদ্ভুত সুর লহরীর আমরা অবমাননা করিতেছি না, আমরা কেবল মাত্র বলিতেছি গীতগোবিন্দের রসরাগ তাল মান কীর্ত্তনাঙ্গের এক দিকের চরমোৎকর্ষ।

আমরা বাঙ্গালি হইয়া বাঙ্গালিকে এবং বাঙ্গালা দেশটীকে বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র। আমরা বলি, যাঁহারা মনে করেন, হাজার বার শ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ছোট নাগপুরের মত অসভ্য অধিবাসী পূর্ণ ছিল, তাঁহারা ভ্রান্ত; তাহা হইলে ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে গীত গোবিন্দ হইত না, আর কনৌজ হইতে ব্রাহ্মণ উপনিবেশ আসিয়া ওরূপ তান-লয়পূর্ণ গীতি কাব্যের সূচনাও করিতে পারিত না।

যেমন হিন্দু সঙ্গীত পৃথিবীর অন্য সঙ্গীত অপেক্ষা বিশেষরূপে অধিকতর মূর্চ্ছনাপূর্ণ, বঙ্গের কীর্ত্তনাঙ্গ সেইরূপ ভারতের অন্যরূপ সঙ্গীত অপেক্ষা বিশেষরূপে অধিকতর মূর্চ্ছনাপূর্ণ। কীর্ত্তনে গড়ানে সুর এত বেশী যে ভাল খেয়ালী বা ধ্রুপদীকেও কীর্ত্তন শিখিতে গেলে কষ্ট পাইতে হয়, সময় লাগে।

সুরে যেমন গীতগোবিন্দের চরমোৎকর্ষ, তালে ছন্দেও সেইরূপ।

পদ্যমাত্রকেই পয়ার বলা হইত। তবে গানের বেলা পয়ার কথাটা লিখিত হইত না; তাল এবং সুর লেখা থাকিত। ছড়াতে পয়ার বলিয়া চিহ্ন থাকিত; ডাকের কথার বা খনার বচনের ছড়াগুলি ছোট ছন্দের পয়ার বটে। প্রকৃত পয়ার মাণিকচাঁদের গানের ছড়ায় আমরা সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাই। জয়দেবে এই পয়ার পাওয়া যায়। বাঙ্গালা পয়ারের জোর ছিল বলিয়াই পয়ার জয়দেবের সংস্কৃতে স্থান পাইয়াছে। জয়দেবের ভাষা প্রাকৃত ও সংস্কৃতের মধ্যবর্ত্তিনী।

জয়দেবের পয়ার—

সরস মসৃণমপি মলয়জ পঙ্কং।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কং॥
দিশি দিশি কিরতি সজল কণজালং।
নয়ন নলিনমিব বিদলতি নালং॥
নয়ন বিষয় মপি কিশলয় তল্পং।
গণয়তি বিহিত হুতাশ বিকল্পং॥
ত্যজতি ন পাণি- তলেন কপোলং।
বালশশিনমিব সায়মলোলং॥
হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামং।
বিরহ বিহিত মরণেব নিকামং॥

এইটী চতুর্থ সর্গের গীতাংশ। এইরূপ ষষ্ঠের, সপ্তমের, নবমের এবং একাদশের অনেকগুলি গীতে দৃষ্ট হইবে। সকল স্থলেই দুই চরণ, শেষে মিল, চরণের মধ্যে যতি, এবং তের চৌদ্দ বা পনর অক্ষরে এক এক চরণ। দুই চরণে ২৬ হইতে ৩০ অক্ষর। জয়দেবে তিন চারিটী ত্রিপদীর গান আছে। একটী ভঙ্গ বলিতে হয়ঃ—

দিনমণি মণ্ডল খণ্ডন ভবমণ্ডন মুনিজন মানস-হংস ইত্যাদি—

ধীর সমীরে, যমুনা তীরে বসতি বনে বনমালী।—আর একটী—তৃতীয়টী—

ইহ রসভণনে কৃত হরিগুণনে মধুরিপু পদসেবকে
কলিযুগচরিতং ন বসতু দুরিতং কবি-নৃপ জয়দেবকে।

আর একটী সেই প্রসিদ্ধ—

স্মরগরল খণ্ডনং সমশিরসি মণ্ডনং দেহি পদ পল্লবমুদারং

এ কথা যদি ঠিক হয়, যে রসের পরিপোষণের জন্য ছন্দের বিস্তৃতির প্রয়োজন তাহা হইলে, সভ্যতার বৃদ্ধি সহকারে রসগ্রাহিতা বৃদ্ধি পায়, রসের পরিপোষণার্থ ছন্দেরও অবয়ব বৃদ্ধি পায়। শেষের উদ্ধৃত চরণে ২৬টী অক্ষর আছে; শ্লোকটীতে সুতরাং ৫২ অক্ষর। কিন্তু কেবল অক্ষর দেখিলে হয় না, ছন্দও বড় হওয়া চাই, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাত্রা বড় হওয়া আবশ্যক

এবং লয় বিলম্বিত হওয়া চাই। নিম্নে ভারতচন্দ্রের ছন্দ, মাত্রা এবং লয় লক্ষ্য করিবেন :—

প্রভাত হইল বিভাবরী,—
বিদ্যারে কহিল সহচরী ;—
"সুন্দর পড়েছে ধরা," শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা ;
সখী তুলে ধরাধরি করি।

৪৬ অক্ষরে ছন্দ, দীর্ঘ স্বর অনেকগুলি আছে ; বিলম্বিত লয়ে পাঠ করিলে, করুণ রসে ভোরপুর হয়।

মধুসূদনের মেঘনাদ বধে, মেঘনাদের মৃতদেহ সমক্ষে শ্মশানে রাবণের শোকোচ্ছ্বাস পাঠ করিবেন। ছন্দ সাধারণ পয়ার হইলেও, বিলম্বিত লয়ে পাঠ করিলে, সেইটী কিরূপ চিত্তদ্রাবক শোক গাথা! অমিত্রাক্ষর ছন্দের গুণ এই যে, সাধারণ ছন্দে কবিতা আবদ্ধ থাকিলেও সে আপনার ইচ্ছামত চলিতে, উঠিতে নামিতে পারে,—ছন্দ ২৮ অক্ষরের, কিন্তু শত অক্ষরের পর পূর্ণ চ্ছেদ বা আকাঙ্ক্ষা শেষ হইলেও ক্ষতি হয় না। শোক গীতিতে এইরূপ প্রলম্বিত সংসর্পণ অতি প্রয়োজনীয়।

গীতগোবিন্দে তালের বিস্তৃতি অতি অদ্ভুত! দশকোশী ধরা গান বিলম্বিত লয়ে মহা ভাবুকের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ শেষ করে ; তালের গতিতে ভাবকে কুঞ্চিত বা সংযত হইতে হয় না।

জয়দেবের প্রসিদ্ধ "বদসি" গীতি এই কথার জাজ্বল্য উদাহরণ।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্ত-রুচি-কৌমুদী হরতি দরতিমিরমতি ঘোরং।
প্রিয়ে চারুশীলে! মুঞ্চময়ি মানমনিদানং॥

যাঁহারা জয়দেবের 'বদসি' বড় তালে গীত হইতে শুনিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন,—সাঁওতালের বা ভুটিয়ার "কিন্ধিয়া ঘেনা ঘেনা ঘা" হইতে ঐ তালের কায়দা—কত কালের সাধনায় লব্ধ হইয়াছে। সেই সাধনার অসাধারণ ফল এখন কি ঔদাসীন্যে, অবহেলায় নষ্ট করিতে হইবে? তোমরা স্বদেশী হইয়াছ, এই কি দেশের প্রতি মমতা? জগতের অতুল্য স্বদেশী নিধি হেলায় হারাইবে?

কদমতলা, চুঁচুড়া। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

সৈয়দ-চাঁদা।

বিষয় কর্ম্মে লিপ্ত, আদালত বিচরণকারী, হুগলি জেলাবাসী বর্ষীয়ানের পক্ষে—হুগলির "সইচ্চাঁদের ঘাট" না জানা একটা গুরুতর অপরাধ, সন্দেহ নাই। কি করিয়া এই ঘাটের নামান্তর, রূপান্তর ও ভাবান্তর হইল তাহা আবার জানিবার কথা। সইচ্চাঁদের সিন্নির সৃষ্টি কি করিয়া হইল তাহা জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? হুগলির ইতিহাস লেখকগণের মধ্যে আধুনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে দুই-এক জন স্মিথ সাহেবের ঘাটের কথা উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাও ধারাবাহিক রূপে নহে। আমাদের পূর্ণিমার 'হুগলি কাহিনী' লেখক "সইদ চাঁদ" সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নাই বলিয়া আমার মনে হয়। এই সকল কারণে ও এই দারুণ বৃষ্টির সময় আমি সৈয়দচাঁদকে সেলাম করিয়া লেখনী সঞ্চালন আরম্ভ করিলাম। ভরসা করি পাঠক পাঠিকা পাঠে আনন্দ পাইবেন। অন্ততঃ 'আষাঢ়ে' গল্পের আনন্দ—স্থির নিশ্চয়।

হুগলিতে কাছারী ছিল। জমিদারী কাছারী নহে ইংরেজের বিচারালয়—যেখানে দেওয়ানী ফৌজদারী, কালেক্টরীর মোকদ্দমা উভয়পক্ষের শুনানি হইয়া "রায়" প্রকাশ হয়। আমার একজন বন্ধু বলেন কাছারী শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ—কাছা + অরি = কাছারি। লিখিবার সুবিধা বলিয়া কেহ কেহ দীর্ঘ ঈকার ব্যবহার করেন। হাঁসিবেন না—নজীর আছে—"পরিবর্ত্তন" অক্ষয় বাবুর হাতেই "পরীবর্ত্তন" হইয়াছে। বিচারালয় কাহার শত্রু?—অর্থাৎ যেখানে পাণ্টালুন, ইজের পায়জামা পরিয়া যাইতে হয়—ইহাদের কাহারও কাছা নাই।

ইংরেজী লেখক হেল্‌প্‌স্ বলিয়াছেন যে Man nature is the same as boy nature. এ কথার যাথার্থ্য, আমি পদে পদে অনুভব করিয়াছি ও বর্ত্তমানে করিতেছি ও নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে করিব। মানুষ—নাম রাখিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত—কেহ ভাল কাজ করিয়া, কেহ বা মন্দ কাজ করিয়া। কোন কাজটীকে আবার দশে মন্দ বলেন শতে ভাল বলেন—এইরূপ মতভেদ হয়। সে যাহা হৌক একজন ছোট লাট হুগলি দেখিতে আসিলেন। তিনি হুকুম

দিলেন যে হুগলির কাছারী চুঁচুড়ায় উঠিয়া যাইবে। কেন? না, গোয়াদ ঘরে কাছারী করা ভাল দেখায় না, চুঁচুড়ায় বৃহৎ গোরাবারিক পড়িয়া আছে সেইখানে কাছারী উঠিয়া যাইবে। রাজার হুকুম! তল্পী তল্পা লইয়া সকলেই চুঁচুড়ায় ছুটিলেন। ১৮৯৭ সালের ১৫ই জুন সোমবার প্রথম চুঁচুড়ায় কাছারী খোলা হইল। শনিবার দিন—একাদশীর দিন—মহরমের মাটীর দিন ভয়ানক ভূমিকম্প হইল, কিন্তু তাহাও ঠেকাইতে পারিল না। বারিকের একাংশ ভূকম্পে পড়িয়া গিয়াছিল—কিন্তু, তাহাতেও রক্ষা হইল না। জজ ব্রাড্‌বরি রাজাজ্ঞা মান্য করিলেন। শত বৎসরের উপর ধরিয়া যে হুগলিতে কাছারী হইতেছিল সে হুগলি মাটি হইল।

হুগলির পুরাতন কাছারী বাটী ১৮০৪ সালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে বাটী পড়িয়া রহিল না। গোরাবারিকে যে নর্ম্মাল বিদ্যালয় ও মডেল বিদ্যালয় (পরে ট্রেণিং স্কুল), নর্ম্মাল স্কুলের পুস্তকাগার, ছাত্রাবাস প্রভৃতি ছিল; সেই সকল উঠিয়া আসিল—পুরাতন কাছারী বাটীতে। এখনও আছে। আরও আছে—স্কুল সমূহের পরিদর্শকের আপিষ। ইহাদেরও বড় কর্ত্তা ছোট কর্ত্তা আছেন। তাঁহাদেরও অবস্থিতি এইখানে। কাছারীর হৈ হৈ শব্দময় অশান্তিপূর্ণ হুগলি, মিথ্যা কথার ঝুড়ি মাথা হইতে ভাগীরথীর জলে ফেলিয়া দিয়া শান্তিময় টোল-চৌবাড়ীতে পরিণত হইল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে হুগলি যে শান্তি উপভোগ করিতে বসিয়াছে সে শান্তি নাগরিক শান্তি নহে তাহা স্বাভাবিক, সুতরাং হুগলি শীঘ্র একটী বনে পরিণত হইবে। দেখা যাউক কাহার কথা ফলে।

"সৈয়দ-চাঁদের ঘাট"—এই নাম কেমন করিয়া হইল পরে বলিতেছি। কিন্তু এই সৈয়দ চাঁদের ঘাটেরই আরও একটী নাম হইয়াছে—সেটী হইতেছে স্মিথ সাহেবের ঘাট বা সংক্ষেপে "স্মিথ ঘাট"। মিউনিসিপাল আপিষে খাতা পত্রে এই ঘাট Smith's Ghat বলিয়া পরিচিত। স্মিথ সাহেব বড় বে রোকা হাকিম ছিলেন তাঁহার নামে একটা ছড়া আছে—ছোট লোকে বলিত—

ইস্‌মিথ সাহেবের ঘানী।
অদ্দেক তেল অদ্দেক পানী॥

এই যে "পানী" শব্দ ইহার অর্থ চক্ষুজল বা অশ্রু। স্মিথ সাহেব সৈয়দ

চাঁদের ঘাটের ইতিহাস বোধ হয় জানিতেন তাই ঐ স্থানে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া একটী পরম রমণীয় ঘাট প্রস্তুত করাইলেন। টাকাটা যোগাইল গোরী সেন অর্থাৎ ভাস্তাড়ার এককড়ি সিংহ প্রমুখ জমীদারগণ। কত টাকা চাঁদা উঠিয়াছিল জানিবার উপায় আছে, কিন্তু জানিয়া আর লাভ কি? কালক্রমে ঘাটের জল সরিয়া তফাতে যাওয়ায় ঘাটটী একটী বিড়ম্বনার মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। ময়মনসিংহের রাণী বামাসুন্দরী এখানে গঙ্গাবাসিনী হইয়াছিলেন। তাঁহার দত্ত টাকায় ঘাটের সুমুখের মাটিটা কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়ায় গঙ্গার জল আবার ঘাটের নব আবিষ্কৃত (পূর্ব্বে বৃত্তিকাগত) ঘাটের ধাপে আসিয়া উপস্থিত হয়। আবার কতকটা বুজিয়াছে। এখন কেবলমাত্র বর্ষাকালে ঘাটের ধাপে গঙ্গার জল পাওয়া যায়।

সৈয়দ চাঁদের ঘাটের (বা স্মিথ ঘাটের) মাহাত্ম্য আছে। কিম্বদন্তী বলেন এই ঘাটে বা নিকটবর্ত্তী স্থানে কাহাকেও কুমীরে ধরে না। ফকীরের মাহাত্ম্য কুমীরেরাও স্বীকার করে।

বর্ত্তমান পোষ্ট আপিষ বা ডাকঘরের সাম্‌নে চক রাস্তার উপর ডাহিন দিকে একটী স্থানে একজন তেজঃপুঞ্জ ফকীর বসিয়া থাকিত। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় আজ কাল নহে তাহা শতাধিক বৎসরের উপরের কথা। ফকীর কোথা ছিল কেহ জানিত না—কে আনিল তাহা কেহ জানিত না। কেনই বা আসিল, উদ্দেশ্যই বা কি, তাহা কেহ জানিত না। তিনি সর্ব্বদা বসিয়া জপ করিতেন। দেখিলে ভয় হয়—তাঁহার চক্ষু, তাঁহার জটা, তাঁহার পোষাক। ফকীর কাহারও সঙ্গে কথা কহিতেন না। এ কথা ঠিক কি না পরে বিবেচনা করা যাইবে।

বর্ত্তমান এমামবাড়ীর সন্নিকট একটী স্থানে একাকিনী বাস করিত একটী ময়রার মেয়ে। তাহার নাম "চন্দ্রা" লোকে কিন্তু তাহাকে "চাঁদা" "চাঁদা" বলিয়া ডাকিত। ময়রাণী কাহারও সঙ্গে মিশিত না আপনার ভাবে ভোর হইয়া থাকিত, বিড় বিড় করিয়া কি বকিত, জিজ্ঞাসা করিলে কাহাকেও জবাব দিত না। সে যে একেবারে লোকের সহিত কথা কহিত না এমন নহে, আবশ্যক হইলে নিজ প্রয়োজন বশত লোক জনের সঙ্গে দুই কথা কহিত।

ফকীরের আগমনের কিছু দিন পরে দেখা গেল চাঁদা ময়রাণী ফকীরের কাছে আসিয়া বসিতে লাগিল। সে নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী লইয়া ফকীরের কাছে আসিত। খাদ্য সামগ্রী ফকীরের সুমুখে ধরিয়া দিয়া নিজে তফাতে বসিত যতক্ষণ না ফকীর চক্ষু খুলিত ততক্ষণ চাঁদা ফকীরের মুখ পানে চাহিয়া চাহিয়া বসিয়া থাকিত। তাহাতে কোন কোন দিন সমস্ত দিন কাটিয়া যাইত।

ফকীর ধ্যানমগ্ন—চাঁদা সুমুখে বসিয়া—ফকীরের বদনমণ্ডলে ধীর স্থির সংলগ্ন দৃষ্টি—খাবার লইয়া বসিয়া আছে—এ দৃশ্য নিত্য দেখা যাইত। ক্রমে নিজের খাবারগুলি আনিয়া চাঁদা ফকীরকে দিতে আরম্ভ করিল। দিনের পর দিন মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল। সৈয়দ ও চাঁদার ব্যবহারও সমভাবে চলিয়াছে। ফকীরের কাছে লোকে যাহা কামনা করে তাহা প্রাপ্ত হয়। ক্রমে ফকীরের যশ দেশরাষ্ট্র হইল। ফকীরের সঙ্গে সঙ্গে চাঁদার নামও জাহির হইল। লোকে চাঁদাকে সমান ভক্তি করিতে লাগিল।

* * * * *

একদিন প্রাতঃকালে অতি প্রত্যুষে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ফকীর স্ব-স্থানে আসিয়া বসিলেন। যেন বড়ই আনন্দিত। হা হা করিয়া বার বার হাস্য করিলেন, তার পর কোমর বাঁধিয়া এক ছুটে আসন-স্থান হইতে গঙ্গা তীরে আসিয়া—এখন যেখানে ঘাট—সেই স্থানে আসিয়া ফকীর পুঙ্গব লাফাইয়া জলে পড়িলেন। ঐ যে ডুবিলেন সেই ডুবিলেন—আর উঠিলেন না। কাতার দিয়া লোক দাঁড়াইয়া গেল। সকলের মুখে ঐ কথা। কত অনুসন্ধান হইল কেহ খুঁজিয়া পাইল না। আজ ফকীরের আসন শূন্য।

আজ ফকীরের আসন শূন্য। আজ চাঁদার ফকীর সৈয়দের আসন শূন্য। রাস্তার লোক দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে শূন্য আসন দেখাইয়া দিতেছে। যাহার প্রাণে যাহা আসে সে তাহা বলিতেছে।

যথা সময়ে—দুই প্রহরের পর, থালায় খাবার সাজাইয়া—লোটায় জল লইয়া চাঁদা ময়রাণী আসিয়া ফকীরের আসন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখিল——ফকীরের আসন শূন্য।

খাবার লইয়া বাত্যাহত কদলীর ন্যায় চাঁদা ময়রাণী বসিয়া পড়িল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে, তাহার জিহ্বা ও ওষ্ঠ শুষ্ক। কাষ্ঠ চক্ষে জল নাই।

একজন পথিক বলিল "চাঁদা তোর ফকীর আজ সকালে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছে।"

কথা শুনিয়া চাঁদা চমকাইয়া উঠিল। উঠিয়া দাঁড়াইল। আবার বসিল আবার দাঁড়াইল। নিমেষ নিমেষ মধ্যে ইতি কর্ত্তব্য স্থির হইল। চাঁদা খাবার ও লোটা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ধীর গম্ভীর পদবিক্ষেপে চাঁদা ভাগীরথীর কূল সন্ধানে চলিল।—সঙ্গে শত শত লোক কৌতূহলী হইয়া চলিল।

চাঁদা ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইয়া কাহাকে প্রণাম করিল—দুইবার প্রণাম করিল। তার পর খাবারগুলি—থালা সহ গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিল। তার পর জলশুদ্ধ লোটা জলে ফেলিয়া দিল। তার পর কোমর বাঁধিয়া গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল। লোকে ধরিল না—নিবারণ করিল না। চিত্রার্পিতের ন্যায় অবাক হইয়া কেবল দেখিতে লাগিল। চাঁদার প্রপাত স্থানে সবেগে বীচিচক্র খেলিতে লাগিল। ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর ও ক্ষীণতমে পরিণত হইল, দূরে অতি দূরে গঙ্গাবক্ষে মিশাইয়া গেল—জলে জল মিশাইয়া গেল। কেবল হু হু করিয়া দক্ষিণ বায়ু বহিতে লাগিল—যেন দিক্ দক্ষিণ আবেগে দীর্ঘ উষ্ণ শ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। জোয়ার হইয়া গেল—ভাঁটা হইয়া গেল—আবার জোয়ার হইল। বীচিচক্র আর নাই।

* * * * *

মুসলমানেরা সমবেত হইয়া জাল সাহায্যে মৃতদেহ খুঁজিতে লাগিলেন। সহসা ভারী ঠেকিল। তুলিয়া দেখে ফকীর ও চাঁদা পরস্পরে সুদৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া আছে—প্রাণবায়ু বহু পূর্ব্বে উভয় দেহ ত্যাগ করিয়াছে।

* * * * *

বিস্তর চেষ্টা হইল—আলিঙ্গন শিথিল হইল না—ভাঙ্গা ত দূরের কথা। হিন্দুরা বলিয়াছিলেন চাঁদার দেহ দগ্ধ হইবে। বুঝিলেন বৃথা প্রয়াস। উভয়ের একত্রে গোর হইল। এখনও সে গোর বর্ত্তমান—এখনও সৈয়দ চাঁদের

আস্তানা বর্ত্তমান। সৈয়দ এখনও স্বীয় পরিচয়ে চাঁদার নাম ব্যবহার করিতে দিতেছেন। ঘাটের নাম হইল সৈয়দ চাঁদের ঘাট। খুব মাহাত্ম্য উভয়ে এখন দেব দেবী—লোকে সিন্নি দেয়। বিপদে উদ্ধার হইয়া মোকদ্দমা জিতিয়া লোকে সিন্নি দেয়, মঙ্গল কার্য্যেও লোকে সিন্নি দেয়। সিন্নি ছড়াইয়া দেওয়া হয়, বালকেরা কুড়াইয়া লয়।

* * * * *

বলিতে পারেন, মৃত ফকীর কি করিয়া চাঁদা কন্যাকে আলিঙ্গন করিলেন?

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

শিক্ষার সুবিধার জন্য ছাত্র কর্ত্তৃক

দেশভ্রমণ।

জগন্নাথপুর হইতে চাঁইবাসায় ফিরিয়া তোমাকে পত্র দিবার সময় পাই নাই। চাঁইবাসায় একদিন মাত্র বিশ্রাম করিয়া, কাল রাত্রি তিনটার সময় ঘাটশীলায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

চারি দিন পরে বৃষ্টি ছাড়িলে, বুধবারে আহারাদি করিয়া পুনরায় গো-যানে আমরা জগন্নাথপুর হইতে বাহির হইলাম। এবার আমরা ৩ জন; যতীন বাবুর পুত্র সুশীলও আমাদের সহিত চাঁইবাসা আসিবার জন্য বাহির হইল। নদীগুলাতে তখনও ভীমবেগে জল নামিতেছে। কোন গতিকে ৩টী নদী পার হইলাম। চতুর্থ নদীটী অতিশয় বৃহৎ, এবং সেই নদীতে তখনও বুকভোর জল প্রবল বেগে নামিতেছে। তাহার উৎপত্তি স্থান পাহাড়গুলি, সেই স্থানের অতি নিকটেই। তখনও নদীর উন্মত্ততা ছুটে নাই, ভীমবেগে গর্জ্জন করিয়া চলিয়াছে। যতীন বাবু আমাদের সহিত দুই জন চাপরাসি দিয়াছিলেন—তাহারা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে ২০।২৫ জন

কুলি ধরিয়া আনিল। তাহারা গরু ও গাড়ী অতি কষ্টে পার করিয়া দিল। এখন আমাদের উপায় কি? আমরা কি করিয়া পার হইব? সুশীল বালক, তাহাকে কাঁধে করিয়া পর পারে লইয়া গেল। জলে না নামিয়া কুলির সাহায্যে পার হইতে হইবে, আমরা স্থির করিলাম; কিন্তু যদি তাহারা জলের স্রোতে আমাদিগকে ফেলিয়া দেয়? Who is to bell the cat? কে আগে পার হইবে? শেষে সামন্ত পার হইতে রাজি হইল। ছয় জন লোকে, তাহাকে মড়ার মত কাঁধে করিয়া পার করিয়া দিল; কিন্তু সে ভয়ে জড়সড় হইয়া কুঁজা হইয়া ছিল বলিয়া, তাহার পিছনের কাপড় একেবারে ভিজিয়া গেল। তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার শিক্ষা হইল। আমাকে যখন তাহারা ঘাড়ে চাপাইল, তখন আমি প্রকৃত মড়ার মত শরীরটাকে কঠিন করিয়া তক্তার মত পড়িয়া রহিলাম। এইরূপ ভাবে আমাদিগকে নদী পার করিয়া দিয়া, কোলেরা গ্রামে ফিরিয়া গেল। আমরাও অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

৫টার সময় গামারিয়ায় পৌঁছাই। ত্রৈলোক্য বাবুর নিকট বিদায় লইলাম। তিনি বলিলেন পথে বাঘের ভয়, জোড়াপুকুর পৌঁছিতে রাত্রি হইবে, আপনারা আজ এই স্থানেই থাকুন; আমরা তাঁহার কথায় সম্মত না হইয়া, অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সন্ধ্যার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে, পথিমধ্যে সব্ ডেপুটী বাবুর সহিত দেখা হইল। তিনি সে দিন গামারিয়ায় Halt করিয়া, পরদিন জগন্নাথপুরে মোকর্দ্দমা করিতে যাইবেন। তিনিও আমাদিগকে বাঘের ভয় দেখাইলেন ও জোরে গাড়ী হাঁকাইয়া, বিশেষ সতর্কতার সহিত সেই বন অতিবাহিত করিতে উপদেশ দিলেন। আমরা পরস্পরে বিদায় গ্রহণ করিলাম। পথের দুই পার্শ্বের জঙ্গল ক্রমেই নিবিড় হইতেছে। গামারিয়া হইতে ৬ মাইল গিয়া জঙ্গল অতিশয় গভীর। পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম সেই স্থানে প্রায়ই রাত্রে বাঘ বাহির হইয়া থাকে। ঠিক সন্ধ্যার সময় আমরা বনের সেই নিবিড় অংশে প্রবেশ করিলাম। চারিদিন ক্রমাগত বৃষ্টির পর, সে দিন আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে, চতুর্দ্দশীর চাঁদ আকাশে উদিত হইয়া, বনপথে সহস্র ধারায় কিরণ বিতরণ করিতেছেন। আমরা চন্দ্রালোকে বেশ মনের সুখে গমন করিতেছি। সেই এক ক্রোশ জঙ্গল অতিক্রম

করিতে পারিলে, আর কোন ভয়ের আশঙ্কা নাই, এই কথা পরস্পর বলাবলি করিতেছি। গাড়োয়ানকে জোরে গাড়ী হাঁকাইতে বলিলাম। সামন্তকে বলিতেছি আজ বাঘ বাহির হইবার প্রশস্ত দিন;—চারি দিন বৃষ্টির দরুণ তাহারা আহার অন্বেষণে বাহির হয় নাই, আর আজ আকাশ ছাড়িয়াছে, চাঁদ উঠিয়াছে, জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে, আজ বাঘ নিশ্চয়ই বাহির হইবে। আর দেখ "যেখানে সন্ধ্যা হয়, সেইখানেই বাঘের ভয়; আমরাও ঠিক বাঘের বনে প্রবেশ করিলাম, আর সন্ধ্যাও হইল" ইত্যাদি নানা কথা বলিতে বলিতে আমরা একটু চুপ করিলাম। আমি গাড়োয়ানের ঠিক পশ্চাতে গাড়ীর সম্মুখে বসিয়া আছি; সামন্ত ও সুশীল গাড়ীর মধ্যে। সুশীল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সামন্তও অন্যমনস্ক ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। গাড়োয়ান জোরে গাড়ী হাঁকাইতে হাঁকাইতে, সহসা গরুর দড়ি ধরিয়া টানিয়া, গাড়ীর চলন অনেকটা বন্ধ করিল; এবং আমাকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে একটু দূরে কি দেখাইয়া বলিল "বাবু, দেখ্‌তা নেহি ক্যা একঠো খাড়া হ্যায়" আমি সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম; চোখে বরাবরই কম দেখি, প্রথমে ভাল নজর হইল না, পরে দেখিলাম রাস্তার ঠিক পার্শ্বে, গাড়ী হইতে ৮।১০ হাত মাত্র দূরে, শাল গাছের গোড়ায়, আমাদের দিকে লক্ষ্য করিয়া এক মধ্যমাকারের বাঘ দাঁড়াইয়া আছে। বাঘটা খুব বড় না হইলেও আমাদের মত একটা লোককে অনায়াসে লইয়া যাইতে পারে। গাড়োয়ান একেবারে গাড়ী থামাইল। আমাকে প্রাণপণে চীৎকার করিতে বলিল। আমি ও গাড়োয়ানে বাঘের প্রতি তীব্র লক্ষ্য রাখিয়া, বিকট গগনভেদী চীৎকার করিতে লাগিলাম, পরে সামন্তও চীৎকারে যোগ দিল; সুশীল ছোকরা ঘুমাইতেছিল, আমাদের বিকট চীৎকারে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; সে বুঝিল কোনও বিপদ উপস্থিত, ভয়ে কাঁদ কাঁদ হইয়া, ঘুমের ঘোরে, এক অস্বাভাবিক ভীতিজনক আওয়াজ করিয়া উঠিল। বনমধ্যে ভয়ানক চীৎকার ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। বাঘ বেগতিক দেখিয়া, মুখ ফিরাইয়া ধীরপদবিক্ষেপে বনের মধ্যে চলিয়া গেল। আমরাও নিশ্বাস ফেলিয়া ভগবানকে স্মরণ করিলাম। পরে গাড়োয়ানের মুখে শুনিলাম, সেই সময়েই আর একটী বাঘকে কিঞ্চিৎ দূরে চলিয়া যাইতে সে দেখিয়াছে। তাহারা

শীকারান্বেষণে জোড়ে বাহির হইয়াছিল। মনে ভাবিয়াছিলাম, জগন্নাথপুর যাইবার পথে যে সকল কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহাতেই বুঝি বৃহস্পতিবার-বারবেলার যাত্রার ফলভোগ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সে ভ্রম কাটিতে অধিক বিলম্ব হইল না। ভগবানের কৃপায় ও গুরুজনদিগের আশীর্ব্বাদে এ যাত্রা পরিত্রাণ পাইলাম। ইহার জন্য কাহাকে ধন্যবাদ দিব, অদৃষ্টদেবীকে, না আমার এই শ্রুতিমধুর কণ্ঠধ্বনিকে? রাত্রে জোড়াপুকুরে অবস্থিতি করিয়া, পরদিন প্রাতে ৯টার সময় চাঁইবাসায় ফিরিলাম।

তথায় একদিন মাত্র বিশ্রাম করিয়া, মাষ্টার মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া, স্কুলের ছাত্রগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, মাষ্টার মহাশয়ের দৌহিত্র নির্ম্মলচন্দ্রের নিকট হইতে কি বলিয়া বিদায় লইব, স্থির করিতে না পারিয়া, আসিবার সময় তাহাকে কোন কথা না বলিয়া, নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, চাঁইবাসা পরিত্যাগ করিলাম। তুমি আমাকে যেরূপ যত্ন ও স্নেহ কর, নির্ম্মল তাহার অধিক যত্নে আমাকে চিরদিনের মত তাহার নিকট বাধিত করিয়া রাখিল। আর মাষ্টার মহাশয়, আমি তাঁহাকে পিতৃতুল্য ভক্তি করি, তাঁহার যত্ন ও ভালবাসা আমি জীবনে ভুলিব না।

ঘাটশীলায় আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এখানে আর কোল নাই। এই স্থানের লোকেরা আমাদের বাঙ্গালা কথাও বুঝিতে পারে। ঘাটশীলার লোকেরা প্রায়ই বাঙ্গালির মত। সিংভূম জেলায় তিন প্রকার ভাষা চলিত আছে। ধলভূমের অধিবাসীরা প্রায়ই বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলে; সরাইকেলার লোকেরা অধিকাংশই উড়িয়া, তাহারা উড়ে ভাষা বলে; আর কোল্‌হানের কোলগণ, তাহাদের হো ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে। ঘাটশীলা স্থানটী ভারি মনোরম; এই স্থানের জমি চাঁইবাসা প্রভৃতি অঞ্চলের জমি অপেক্ষা অধিক উর্ব্বরা। ধলভূমের স্থানে স্থানে এমন সুন্দর জমি আছে, যে হুগলি ও বর্দ্ধমান জেলার জমি বলিয়া ভ্রম হয়। যে সুবর্ণরেখা নদীগর্ভস্থ স্বর্ণরেণু, দূর দেশান্তরের লোকের নিকটেও চির-পরিচিত, ইংরেজ-বালক মাতৃমুখে যে নদীর ঐশ্বর্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মাতা, সে Better Land কোথায়? "Where the river wanders o'er sands of gold"—সেই স্থানে কি? সেই পুণ্যতোয়া স্রোতস্বিনী সুবর্ণরেখা

পর্ব্বতগাত্র ধৌত করিয়া, সুবর্ণবালুকা বুকে করিয়া, ঘাটশীলার পার্শ্ব দিয়া কল কল নাদে, নাচিতে নাচিতে চলিয়াছেন। ঘাটশীলার কোলেই সুবর্ণ-রেখা; অপর পারেই গভীর জঙ্গল ও পর্ব্বত আরম্ভ হইয়াছে। বনের কোলে কোলে, পর্ব্বতের গাত্র বহিয়া নদী যাইতেছে, নদীতটে দাঁড়াইয়া দেখিলে দৃশ্য অতি চমৎকার। এই দুঃখময় জগৎ যখন অসহ্য বোধ হয়, তখন একবার এই স্থানে আসিয়া উপবেশন কর, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দেখ, ঈশ্বরের মহিমা বুঝিবার চেষ্টা কর, তোমরা সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইবে। বাড়ী যাইবার জন্য প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, নতুবা আরও কয়েক দিন, এ স্থানে থাকিয়া ঈশ্বরের কারখানা বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। সেদিন সন্ধ্যার পর আমি ও সামন্ত নদীর তটে, পাথরের উপর বসিয়া আছি; ২।১ দিনের মধ্যে বাড়ী ফিরিবার ইচ্ছা। অথচ এই কৈলাস তুল্য স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতেও ইচ্ছা করে না, এইরূপ নানা কথা মনে মনে তোলাপাড়া করিতে করিতে, হঠাৎ প্রাণের আবেগে, আবৃত্তি করিলাম,—

" But here will sigh thine alder tree,
And here thine aspen shiver ;
And here by thee will hum the bee,
For ever and for ever.

A thousand suns will stream on thee,
A thousand moons will quiver ;
But not by thee my steps shall be,
For ever and for ever."

সামন্তও অন্যমনস্ক হইয়া স্বভাবের শোভা দেখিতেছিল, আমার আবৃত্তি শুনিয়া তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে বলিল "অজর, তোমার মুখে এই প্রথম ইংরেজী পদ্যের আবৃত্তি শুনিলাম; চিরদিনই ত বাঙ্গালা পদ্যের Recitation শুনিয়া থাকি।" আমি বলিলাম, বাঙ্গালা পদ্য শুনিবে? বলিয়াই আবৃত্তি করিলাম,

" তেয়াগিবে দীর্ঘশ্বাস তব তীরে তরুগণ
কাঁপিবে বৃক্ষের পত্র তব কূলে অনুক্ষণ,
গুণ গুণ অলিকুলে
করিবে তোমার কূলে,

পাখীগণ করিবে ও কূলে কূলে বিচরণ;
চিরতরে দাও মোরে বিদায় এখন।

পড়িবে তোমার বক্ষে সহস্র রবির কর,
ভাঙ্গিবে গড়িবে জলে লক্ষ লক্ষ শশধর;
সব(ই) সম ভাবে রবে,
সমান বাতাস ব'বে,
আমি শুধু ভ্রমিব না তোমার ও তীর'পরে,
তটিনী! বিদায় মাগি আজি চিরতরে!"

সামন্ত আবৃত্তি শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়া বলিল, "বাঙ্গালায় অনুবাদ, Tennysonএর Original ছাড়াইয়া গিয়াছে; ভারি মধুর লাগিল।" তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে; আমরা দুই জনে তথা হইতে গাত্রোত্থান করিলাম।

শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার।

মৃত্যুর পর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে বলিলেন "হে ভগবান যদি কর্ম্মযোগ অপেক্ষা বুদ্ধিযোগ (জ্ঞানযোগ)ই শ্রেষ্ঠ, আর ইহাই আমার অভিপ্রেত তবে আমাকে কি জন্য ঘোর (যুদ্ধরূপ) কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ? কখনও কর্ম্ম প্রশংসা কখনও জ্ঞান প্রশংসা এইরূপ বিমিশ্র বাক্যে আমার বুদ্ধি যেন মোহিত করিতেছ; যাহাতে আমি শ্রেয়ো লাভ করিতে পারি, এমন একটী নিশ্চয় করিয়া বল।" ইহার উত্তরে ভগবান বলিলেন—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরাপ্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥ ৩
ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ ৪

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈ গুণৈঃ॥ ৫
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ ৬
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥ ৭
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্য কর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্যেদ কর্ম্মণঃ॥ ৮
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোয়োং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গ সমাচর॥ ৯

* * * *

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ু রিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥ ১৬।

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অনঘ এই লোকে দুই প্রকার নিষ্ঠা (মোক্ষ পরতা) আমি পূর্ব্বে (পূর্ব্বাধ্যায়ে) কহিয়াছি। জ্ঞানযোগের দ্বারা সাংখ্য দিগের এবং কর্ম্মযোগ দ্বারা যোগীদিগের নিষ্ঠা। ৩।

লোকে কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থা লাভ করিতে পারে না; (আসক্তি ত্যাগ ব্যতীত) কেবলমাত্র সন্ন্যাসেই (কর্ম্ম ত্যাগেই) সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। ৪।

কোন অবস্থায় ক্ষণমাত্রও কেহ কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না; প্রকৃতিজ (সত্ত্বাদি) গুণ সকলকেই অবশ করিয়া কর্ম্ম করায়। ৫।

যিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল স্মরণ করিয়া থাকেন সেই বিমূঢ়াত্মাকে কপটাচার বলা যায়। ৬।

হে অর্জ্জুন যিনি কিন্তু মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করেন, ফল-কামনাহীন তিনি বিশিষ্ট অর্থাৎ প্রশস্ত যোগ্য হয়েন। ৭।

তুমি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর; যেহেতু কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা ভাল; কর্ম্মশূন্য হইলে তোমার শরীর যাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না। ৮।

বিষ্ণুর আরাধনার্থ কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কর্ম্ম করিলে এই লোক কর্ম্মবন্ধন (কর্ম্মেবদ্ধ) হয়; অতএব হে কৌন্তেয় বিষ্ণু প্রীত্যর্থ নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। ৯।

* * * * *

এইরূপে প্রবর্ত্তিত চক্র ইহলোকে যে অনুবর্ত্তন না করে, হে পার্থ, ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপজীবন সে বৃথা জীবিত থাকে। ১৬।

শ্রীভগবান আবার বলিয়াছেন।

কর্ম্মনৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥ ২০

জনকাদি মহাত্মারা কর্ম্ম দ্বারাই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। লোক সকলের স্বধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের প্রতিও দৃষ্টি রাখিয়া তোমার কর্ম্ম করা উচিৎ। ২০।

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥ ২২

হে পার্থ আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই; কেন না ত্রিলোকে আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই। তথাপি আমি কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছি। ২২।

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ॥ ৩১।

আমার বাক্যে শ্রদ্ধাবান্ ও দোষ দৃষ্টিবিহীন যে সকল মানব আমার এই মত নিত্য অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাও কর্ম্মকারী হইয়াও, সকল কর্ম্ম হইতে মুক্ত হয়েন॥ ৩১।

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ॥ ৩২।

যাহারা, কিন্তু, দোষমাত্রদর্শী হইয়া আমার এই মত অনুষ্ঠান করে না, বিবেকহীন তাহাদিগকে সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ় ও নষ্টহৃদয় বলিয়া জানিবে। ৩২।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতে র্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥ ৩৩

জ্ঞানবান্ও স্বীয় প্রকৃতির অনুসরণ করেন; সুতরাং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কি করিবে? ৩৩।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫।

সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্মাপেক্ষা সদোষ স্বধর্ম্ম শ্রেয়; স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ। ৩৫।

তারপর শ্রীভগবান গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে এই কথা বলিয়াছেন।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১১
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥ ১২
চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩
ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভি র্ন স বধ্যতে ॥ ১৪
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈ রপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মাণি তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫

যাহারা আমাকে যে ভাবে ভজন করে (অর্থাৎ সকাম বা নিষ্কাম) আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই ভজন করি। হে পার্থ মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমারই পথ অনুবর্ত্তন করে (যার যেমন মতি তার তেমনি গতি হয়) ১১।

এই মনুষ্য লোকে কাম্য কর্ম্মের সিদ্ধি প্রার্থীরা আমাকে ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের ভজনা করেন কিন্তু তাহাদের সিদ্ধি অনিশ্চিত। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মজনিত সিদ্ধি শীঘ্র নিশ্চয়ই জন্মে। ১২।

আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ দ্বারা চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহার কর্ত্তা হইলেও আমাকে অব্যয় ও অকর্ত্তা বলিয়া জানিও কেন না আমার আসক্তি নাই। ১৩।

কর্ম্ম সকল আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না; কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই এই প্রকারে যিনি আমায় জানেন তিনি কর্ম্মে বদ্ধ হন না। ১৪।

এইরূপ তত্ত্ব জানিয়া পূর্ব্বকালীন জনকাদি মুমুক্ষুগণও কর্ম্ম করিয়াছেন, অতএব তুমিও পূর্ব্বতনগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্ব পূর্ব্বকালে কৃতকর্ম্মই কর। ১৫।

তার পর দেখুন পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথম শ্লোকেই শ্রীভগবান বলিতেছেন,

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥

কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মোক্ষদায়ক; তন্মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগই উৎকৃষ্টতর বা শ্রেষ্ঠ।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩
সাংখ্যযোগৌ পৃথক্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪
যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫

অর্থাৎ—

তাঁহাকেই নিত্য সন্ন্যাসী বলিয়া জানিও যাঁহার দ্বেষও নাই আকাঙ্ক্ষাও নাই হে মহাবাহো, তাদৃশ দ্বন্দ্বাতীত পুরুষ আনন্দসহকারে সংসার আসক্তি হইতে মুক্ত হয়েন। ৩

বালকবৎ অজ্ঞেরাই জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগকে পৃথক্ বলিয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিতেরা (জ্ঞানিগণ ও যোগিগণ) বলেন না। একমাত্র সাধন (উভয়ের মধ্যে যে কোন একটী) সম্যক্‌রূপে অবলম্বন করিলে উভয়েরই ফল (মোক্ষ) প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৪

জ্ঞানিগণ যে স্থান (মোক্ষ) লাভ করেন; কর্ম্মযোগীরাও তাহাই প্রাপ্ত হন। যিনি সাংখ্য ও যোগকে এক রূপে দেখেন, তিনিই সম্যক্ দর্শন করেন। ৫

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা। ১০
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্মকুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১

পরব্রহ্মে কর্ম্ম সমাধানপূর্ব্বক কর্ম্ম জন্য ফল কামনার আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যিনি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, পদ্মপত্র যেমন জলমগ্ন হইয়াও জলে

নির্লিপ্ত থাকে, তদ্রূপ সেই কর্ম্মানুষ্ঠানকারী পুরুষ কর্ম্মরাশি মধ্যে নিমগ্ন হইলেও কর্ম্ম জন্য পাপপুণ্যে নিত্য নির্লিপ্ত থাকেন। ১০

যোগিগণ ফল কামনায় সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত শরীর দ্বারা (স্নানাদি দ্বারা) মনের দ্বারা (ধ্যানাদি) বুদ্ধিদ্বারা (তত্ত্বনিশ্চয়াদি দ্বারা) এবং কেবল ইন্দ্রিয়াদির দ্বারাও (শ্রবণ কীর্ত্তনাদি) কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ১১

তৎপরে শ্রীভগবান ৫ম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে বলিয়াছেন—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯

সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্ব্বলোক মহেশ্বর এবং সর্ব্বভূতের সুহৃৎ স্বরূপে আমাকে অবগত হইয়া তিনি (জীব) শান্তি (মুক্তি) লাভ করেন।২৯

* * * * *

তার পর ষষ্ঠাধ্যায়ে—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ ॥ ১
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসন্ন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্মকারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩

শ্রীভগবান কহিলেন, যিনি কর্ম্মফলের অপেক্ষা না করিয়া অবশ্য "কর্ত্তব্য" বলিয়া বিহিত কর্ম্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী (একাধারে)। নিরগ্নি (অগ্নিসাধ্য ইষ্টাদি কর্ম্মত্যাগী) বা অক্রিয় (অনগ্নিসাধ্য পূর্ত্তাদি কর্ম্ম-ত্যাগী) তাঁহার মত যোগী নহেন। ১

হে পাণ্ডব, পণ্ডিতগণ যাহাকে সন্ন্যাস বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তাহাকেই তুমি যোগ বলিয়া জানিও; কারণ প্রথমতঃই সঙ্কল্পের (কামনার) সন্ন্যাস (ত্যাগ) না করিলে কেহই যোগী হইতে পারেন না। ২

তপস্বিভ্যোঽধিকোযোগী জ্ঞানিভ্যোপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥ ৪৬

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭

এইরূপ কর্ম্মযোগী পুরুষ তপস্বিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মিগণ (সকাম উপাসকগণ) হইতেও শ্রেষ্ঠ আমার অভিমত। অতএব অর্জ্জুন তুমি যোগী হও অর্থাৎ সেই কর্ম্মযোগের অনুসরণ কর। ৪৬

শ্রদ্ধাবান্ যে ব্যক্তি মদ্‌গতচিত্ত দ্বারা আমাকে ভজনা করেন, তিনি সকল যোগীদের মধ্যে যুক্ততম (অতি শ্রেষ্ঠ যোগী) এবং ইহাই আমার অভিমত। ৪৭

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

নদীয়া-কাহিনী।

দেবপাল নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। মুসমলানগণকে তিনি প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়—বঙ্গদেশ তখন মুসলমান অধিকৃত, মুসলমানগণের প্রতাপ তখন অপ্রতিহত। বহুদিন শান্তির ক্রোড়ে বিলাস স্রোতে ভাসমান থাকিয়া তাহারা অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল, এমন কি স্ত্রীলোকগণের উপর অত্যাচার করিতে কুণ্ঠা বোধ করিত না। রাজা দেবপাল এই সকল উচ্ছৃঙ্খলতা অমার্জ্জনীয় মনে করিতেন, তাই তিনি কঠোর হস্তে তাঁহার নিজ অধিকারভুক্ত মুসলমান-গণের এই সকল অত্যাচার দমন করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় তদানীন্তন বঙ্গেশ্বরের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয় এবং কয়েকবার কয়েকটী ক্ষুদ্র সংঘর্ষে তিনি মুসলমান সৈন্যগণকে বিধ্বস্ত করেন। প্রতিহিংসাপরায়ণ নবাব এই রূপে একজন ক্ষুদ্র ভুঁইয়ার নিকট পরাস্ত হওয়ায় দারুণ হিংসানলে প্রজ্ব-লিত হইয়া দেবগ্রামের চতুষ্পার্শ্বে বহু সৈন্য সমাবেশ করিলেন। দিল্লীশ্বরের বিনানুমতিতে এক জন ভুঁইয়ার সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাহার রাজ্য

বিধ্বস্ত করিলে পাছে সম্রাটের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইতে হয়, সেই ভয়ে বঙ্গেশ্বর দেবগ্রাম অবরোধ পূর্ব্বক রাজা দেবপালের বিরুদ্ধে বহু গ্লানিকর কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া দিল্লীদরবারে দূত প্রেরণ করিলেন এবং দিল্লীশ্বরের আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজা দেবপালও বঙ্গেশ্বরের এই অযথা অত্যাচারের প্রতিবিধান মানসে দিল্লীর খাস দরবারে আরজ করিতে গমন করিলেন। গমনকালে তিনি জয় ও বিজয় নামে দুইটী বার্ত্তাবহ কপোতকে সঙ্গে লইয়া বলিয়া যান যে "যদি এই শ্বেতকায় জয় আমার আসিবার পূর্ব্বে প্রত্যাগমন করে—তবে সকলে জানিও যে আমি দরবারে জয়লাভ করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছি, কিন্তু জয়ের পরিবর্তে যদি কৃষ্ণকায় বিজয় প্রত্যাবর্ত্তন করে তবে জানিও আমার নিধন হইয়াছে। তখন সকলে দুর্দ্দান্ত মুসলমান হস্তে আত্মরক্ষার উপায় করিও।" নবাব প্রেরিত দূত ও দেবপাল উভয়ে একই সময়ে দিল্লীশ্বরের সমীপে উপস্থিত হন। দিল্লীশ্বর দেবপালের তেজগর্ব্বব্যঞ্জক বপু, অসীম সাহস, নির্ভীক ভাব ও উদার চরিত্র দেখিয়া তাঁহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হন ও তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বঙ্গেশ্বরকেই মুসলমানগণ কৃত অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতে পরামর্শ দিয়া দেবপালকে এক ফরমান দ্বারা মহারাজ উপাধি ভূষিত করিয়া কয়েকখানি পরগণার স্বামীত্ব প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দেন। মহারাজা দেবপাল এইরূপে দিল্লীর দরবারে অপ্রত্যাশিতরূপে সাফল্য ও সম্মান লাভ করিয়া বঙ্গাভিমুখে রওনা হন এবং কপোতবাহী দাসকে শ্বেতকায় জয়কে মুক্ত করিয়া দেবগ্রাম অভিমুখে প্রেরণ করিতে আদেশ করেন। ঐ কপোতবাহী দাস বঙ্গেশ্বরের দূতের নিকট বহু অর্থ উৎকোচ লইয়া জয়ের স্থলে বিজয়কে মুক্তি প্রদান করে। দেখিতে দেখিতে শিক্ষিত কপোত শনৈঃ শনৈঃ দেবগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়। রাজা দেবপালের পৌরজনবর্গ সেই অশুভ দর্শন কৃষ্ণকায় কপোতকে প্রত্যক্ষ করিয়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন এবং রাজা দেবপালের নিধন নিশ্চয় বুঝিয়া মহিলাগণ দুর্দ্দান্ত মুসলমান হস্ত হইতে আপনাদের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য সকলে অপূর্ব্ব বেশভূষা ও অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া প্রাসাদ প্রাঙ্গণস্থিত স্বচ্ছসলিলা খিড়কী

পুষ্করিণীতে ও সাগর দিঘীতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। তখন পুরুষগণ কৃপাণ হস্তে গড়ের দ্বার মোচন করিয়া প্রচণ্ড বেগে সেই মুসলমান সৈন্য ব্যূহের মধ্যে পতিত হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে সেই মুষ্টিমেয় হিন্দু-সেনা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। তখন মুসলমানগণ বিনা ক্লেশে সেই অরক্ষিত পুরী প্রবেশ করিয়া যেখানে যাহা পাইল অপহরণ ও ধ্বংস করিল। এ দিকে মহারাজা দেবপাল মহোল্লাসে শূন্যে কত অট্টালিকা রচনা করিতে করিতে আগমন করিতেছিলেন, এক্ষণে দূর হইতে মুসলমানগণের বিজয় নিনাদ শুনিয়া ও স্বীয় পুরী তাহাদের অধিকৃত দেখিয়া বজ্রাহতবৎ সেই স্থানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছান্তে দ্রুত অশ্ব চালনা করিয়া পুরী প্রবেশ করিলেন এবং আপনার শরীর রক্ষক সেনা কয়জন ও স্বয়ং কিয়ৎকাল অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া শত শত মুসলমান সেনা ধ্বংস পূর্ব্বক আপনিও নিহত হইলেন। এইরূপে বঙ্গের আর একটী রত্ন আপনার পূর্ণজ্যোতি বিকীরণ না করিতেই অকালে কালের অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইলেন এবং এইরূপে সেই দুর্ম্মুখ সন্ন্যাসীর দারুণ অভিসম্পাত কার্য্যে পরিণত হইল।

এইরূপে বাঙ্গালার ভুঁইয়া রাজাগণ একে একে মোগল শাসনাধীনে আসিলেন বটে কিন্তু রাজ্যশাসন সম্বন্ধে মুসলমানগণের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক রহিল না। তদানীন্তন ভূস্বামীগণ রাজ্যের সর্ব্ব প্রকার শাসন কার্য্য স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ কেবল নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন ও সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদে কালাতিপাত করিতেন।

এইরূপে নদীয়া সে সময়ে আদৌ মুসলমান শাসনাধীন থাকিলেও উহা প্রত্যক্ষত কৃষ্ণনগরাধিপতিগণের শাসনাধীন হইল। মানসিংহকে বাঙ্গালা বিজয়ে সহায়তার পুরস্কারস্বরূপ ভবানন্দ মজুমদার সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে বহু সম্মান ও এক ফরমান দ্বারা ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে নদীয়া, মহৎপুর, মারূপদহ, লেপা, মুলতানপুর, কাশিমপুর, কয়েশা, মসুণ্ডা প্রভৃতি চতুর্দ্দশ পরগণার স্বামীত্ব প্রাপ্ত হইয়া রাজ্যশাসনে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময় হইতে নদীয়া, তদ্বংশীয়গণের দ্বারা স্বাধীনভাবে শাসিত হইতে থাকে। ভবানন্দ বাগোয়ান হইতে মাটিয়ারিতে রাজধানী স্থাপনা করেন।

তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্ত্তে মধ্যম পুত্র গোপালকে তাঁহার বিষয়ের অধিকারী করিয়া যান। গোপাল, বাদসাহের নিকট হইতে শান্তিপুর, সাহাপুর, ভালুকা, রাজপুর প্রভৃতি পরগণার জমিদারী স্বত্ব প্রাপ্ত হন। জ্যেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ নিজ বুদ্ধিবলে স্বতন্ত্রভাবে কুশদহ ও উখুড়া পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হন, কিন্তু তিনি অল্প বয়সে প্রাণত্যাগ করায় তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা গোপাল অধিকার করেন। গোপালের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাঘব মাটিয়ারি হইতে রেউই নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কথিত আছে এই রেউই ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহ খড়িয়া নদীর উপরে শ্যামল বৃক্ষাদি শোভিত মনোরম স্থান ছিল এবং সেই সময়ে এখানে দলে দলে মৃগ ও ময়ুর বিচরণ করিত। অদ্যাপি এই সকল মৃগের দু চারিটী বংশধর কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী আড়বন্দি প্রভৃতি গ্রামের প্রান্তরে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তখন এই স্থানে বহুসংখ্যক গোপ বাস করিত এবং তাহারা সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসক ছিল। রাজা রাঘবের পুত্র রুদ্ররায় এই রেউইয়ের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণনগর নাম করণ করেন। তাঁহার সময়ে নদীয়া রাজ্য অতি বিস্তীর্ণ আকার ধারণ করে। তিনি এই সুবিস্তীর্ণ ভূমির রাজস্ব হিসাবে বিংশতি লক্ষ মুদ্রা মোগল সরকারে কর প্রেরণ করিতেন। কথিত আছে এই সময়ে তদানীন্তন বাদসাহ রেউইতে মৃগাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় শুনিয়া এখানে মৃগয়ায় আসিতে মনস্থ করেন। কিন্তু রাজা সসৈন্য বাদসাহের আগমনে দরিদ্র প্রজাগণের উপর অত্যাচারের আশঙ্কা করিয়া বহু মুদ্রা অঙ্গীকার পূর্ব্বক বাদসাহকে নিরস্ত করেন *।

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত টাবরনিয়ার সাহেব ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিতে আগমন করিয়া উক্ত বৎসর ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে নদীয়ায় উপস্থিত হন। তিনি তদানীন্তন নদীয়াকে জনসঙ্কুল বৃহৎ নগর বলিয়া

* Early in ye morning we passed by a village called Sreenagar and by 5 o'clock this afternoon (October, 1682) we got as far as Rewee—a small village belonging to Woodoy Roy, a Jamindar that owns all the country on that side of the water almost as far as Orea against Hughly. It is reported by ye country people that he pays

লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার বর্ণনায় দেখা যায় গঙ্গার জোয়ার এ সময়ে ...য়া পর্য্যন্ত আসিত। কিন্তু এখন উহা কালনা পর্য্যন্ত আসিয়া থাকে *।

...re than twenty lacks of Rupees per annum to ye king, rent for ...at he possesses and that about two years since he presented ...ve a lack of rupees to ye Mogoul and his favourite, to divert ...s intention of hunting and hawking in his country, for fear of ...s tenants being ruined and plundered by the Emperor's lawless ...d unruly followers. This is a fine pleasant situation, full of great ...ady trees, most of them tamrins, well stored with peacocks and ...otted deer like our fallow deer. We saw two of them near the ...er side on our first landing.

Hedge's Diary Vol. I, p. 39.

...ৎকালীন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর Agent and Governor of their affairs ...Bay of Bengal and of the British Factories (November 25, 1681) ...Mr. Hedges এর দৈনিক রোজনামচা হইতে আমরা পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশটী ...হণ করিয়াছি। উক্ত বিবরণীতে আমরা তদানীন্তন নদীয়াধিপতির নাম ...াইতেছি "উদয় রায়" কিন্তু আমরা "ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতম্" সংস্কৃত ...বং Translation by W. Pertsch, Published at Berlin in 1852, ...W. W. Hunter's Statistical Account of Nadya, স্বর্গীয় কার্ত্তিকেয় রায় ...লিত ক্ষিতীশ গ্রন্থাবলী এবং কৃষ্ণনগরের বর্ত্তমান মহারাজা ক্ষিতীশচন্দ্র ...নুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের ইংরাজীতে লিখিত ...ক সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রেরণ করিয়াছেন, তৎসমুদায় প্রামাণিক বিবরণে ...দানীন্তন কৃষ্ণনগরাধিপতির নাম পাইয়াছি "রুদ্র রায়"। এখন কোন্ ...মটী বাস্তবিক তাহা অবধারণ করা সুকঠিন। মতান্তরে এই রেউই গ্রাম ...বং তৎসন্নিহিত প্রদেশ সমূহ তখন পাটুলীর ভূস্বামী উদয় রায়ের জমিদারী-...ক্ত ছিল। নদীয়ার রাজাগণ, কি সূত্রে জানি না, ঐ গ্রাম খানি প্রাপ্ত ...ন এবং তথায় রাজধানী স্থাপনা করেন। বংশবাটীর স্বনাম প্রসিদ্ধ ...রাজাগণই পূর্ব্বে পাটুলীর রাজা নামে খ্যাত ছিলেন। পাটুলী অগ্রদ্বীপের ...ন্নিহিত একখানি গ্রাম এবং পূর্ব্বে নদীয়ার এলেকাধীনই ছিল। নদীয়ার ...ত গ্রামই তখন পাটুলীর রাজ্যান্তর্গত ছিল। পরে তাঁহারা পাটুলী হইতে ...তাঁহাদের রাজধানী স্থানান্তরিত করিলে নদীয়াবাসীর স্মৃতি হইতে তাঁহারা ...ক্রমে ক্রমে দূরে পড়িয়াছেন।

* On the 19th February 1666, I passed a large town called Nadiya, ...nd it is the furthest point to which the tide reaches.

Tavernier's Travels in India, vol. I, p. 133.

এই সময়ে সুবিখ্যাত সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার নবাব পদে অধিষ্ঠিত। ইঁহার রাজত্বকালে ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে জবচর্ণক নামক সাহেব সুতানুটি নামক স্থানে ইংরেজদের একটী কুঠী স্থাপন করেন। সুতানুটী কলিকাতার একটী অংশ, সুতরাং এই সময় হইতে কলিকাতার প্রথম সূত্রপাত বলিতে হইবে। এই সায়েস্তা খাঁর শাসনকালেই টাকায় আট মণ চাউল বিক্রয় হইত, তিনি এই ঘটনায় গৌরবান্বিত হইয়া স্পর্দ্ধার সহিত ঢাকা নগরীতে এক সুবৃহৎ তোরণ নির্ম্মাণপূর্ব্বক উহা বদ্ধ করেন ও উহার উপর লিখিয়া দেন "যে রাজা আমার শাসনের ন্যায় সুশাসনে প্রজা শাসন করিয়া দেশ মধ্যে টাকায় আট মণ চাউল বিক্রয় করাইতে পারিবেন, তিনিই যেন এই তোরণ দ্বার উদ্ঘাটন করেন।" আমরা জানি না, সে তোরণ দ্বার কবে কোন অসার দাম্ভিক কর্ত্তৃক অপসারিত হইয়াছে। কিন্তু আন্তরিক দুঃখের সহিত স্থিরনিশ্চয় বলিতে পারি তাঁহার সময় হইতে একমাত্র নবাব সুজার সময় ব্যতীত অদ্যাবধি টাকায় আট মণ দূরের কথা টাকায় বার সের চাউলও বিক্রয় হয় না।

সায়েস্তা খাঁর পরে বঙ্গ মসনদে ইব্রাহিম খাঁ উপবিষ্ট হয়েন। ইহার সময়ে ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে শোভা সিংহ নামে বর্দ্ধমানের এক জন জমিদার, বর্দ্ধমানাধিপতি রাজা কৃষ্ণরামের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে এবং রোহিম খাঁ নামক আফগান সর্দ্দারের সহিত মিলিত হইয়া রাজা কৃষ্ণরামের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক তদীয় প্রাসাদ অধিকার করে। বর্দ্ধমান রাজকুমার জগৎ রায় পলায়ন পূর্ব্বক নদীয়া রাজ রামকৃষ্ণের শরণ লয়েন। শোভা সিংহ ও রোহিম খাঁর সম্মিলিত শক্তি এই সময়ে হুগলি অধিকার করে, কিন্তু ওলন্দাজগণের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া সপ্তগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এই স্থান হইতে শোভাসিংহ তাহার সৈন্যের অধিকাংশ রোহিম খাঁর অধীনে নদীয়া ও মুরশিদাবাদ অধিকার নিমিত্ত প্রেরণ করে *। এবং স্বয়ং বর্দ্ধমানাধিপতির কুমারী কন্যার রূপে আকৃষ্ট হইয়া বর্দ্ধমান যাত্রা করে এবং সুরাপানে মত্ত হইয়া রাজকুমারীর ধর্ম্মনাশ করিতে উদ্যত হইলে তেজস্বিনী বর্দ্ধমান রাজকুমারী ছুরিকাঘাতে কামোন্মত্ত পশু

* Vide Memoirs of the Mogoul Empire by Eradut Khan p. 330.

হনন করেন। তাহার নিধনের পর তাহার ভ্রাতা হিম্মত সিং তাহার অভিষিক্ত হইয়া ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে রাজমহল হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত অধিকার পূর্ব্বক দেশে অরাজকতা আনয়ন করে। এই গোলযোগে ইংরেজ-কলিকাতায় ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে "ফোর্টউইলিয়ম" নামকরণ করিয়া তাহাদের দুর্গ দৃঢ়তর রূপে স্থাপনা করে এবং ওলন্দাজেরা চুচুড়ায় ও ফরাসীরা চন্দননগরে আত্মরক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া লয়। তদানীন্তন বাদসাহ ঔরঙ্গজেব বাঙ্গালায় শান্তিস্থাপনার্থ তাঁহার প্রিয় পৌত্র শাহজাদা আজিম ওসানকে বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে এদেশে প্রেরণ করেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন যে শোভাসিংহ নিহত হইয়াছে এবং নবনিযুক্ত সুবেদার জবরদস্ত খাঁ বিদ্রোহ অনেক দমন করিয়াছেন সুতরাং নিজে বর্দ্ধমানে থাকিয়া দেশস্থ সমস্ত ভূম্যাধিকারীর সহিত প্রীতি বিনিময় ও আনন্দোৎসব করিতে থাকেন। এই সময় তদানীন্তন নদীয়াধিপতি রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য স্থাপিত হয়। বাদসাহজাদা যখন বর্দ্ধমানে থাকিয়া এইরূপে উৎসবাদিতে মগ্ন, সেই সময়ে বিদ্রোহীরা আবার শক্তি সঞ্চয় করিয়া নদীয়া লুণ্ঠন করে *।

এই সময়ে নদীয়া রাজবংশ কি মুসলমান শাসনকর্ত্তা কি য়ুরোপীয় শাসনকর্ত্তা সকলের নিকটেই বিশিষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাৎকালিক কলিকাতার ইংরেজ প্রতিনিধি ভাদা সাহেবের সহিত নদীয়ারাজ রামকৃষ্ণের বিশেষ প্রণয় স্থাপিত হয়, এমন কি তিনি নদীয়ারাজের শাসন কার্য্যার্থ স্বার্দ্ধ দ্বিসহস্র শস্ত্রনিপুণ সৈন্য কৃষ্ণনগরে থাকিতে অনুজ্ঞা করেন †।

শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক।

* Thus while the Prince was amusing himself at Burdwan, receiving the congratulations of the Zemindars and principal men of the province, the rebels again collected in great force and had the audacity, not only to plunder the districts of Nuddeah and Hooghly, but to encamp within a few miles of Burdwan.

Memoirs of the Mogoul Empire by Eradut Khan. p. 345.

† Ram Krisna lived happily at Krisnagar for a long time, and any matter of interest of which he gave notice to the grandson of

দ্বারকার পথে।

(৪)

বার বার ইচ্ছা হইল ঢোলা জংসনে স্নান করিয়া লই। কতক্ষণ পরে গাড়ী ছাড়িবে তদন্ত করিয়া যখন জলের কল দেখিতে গেলাম তখন কল বন্দ হইয়া গেল। আর উপায় নাই—আবার জংসন না আসিলে আর উপায় নাই। গন্তব্য স্থানে পঁহুছিয়া স্নানাহার করিব এ প্রত্যাশায় থাকিতে সমস্ত দিন উপবাস করিয়া থাকিতে হয়। তারপর ট্রেণ প্রায়ই দেরি করিয়া ফেলে দেখিয়া আসিতেছি তারপর এই ভোরে ঢোলা—আর টাইমটেবিল অনুসারেই পোরবন্দরে পঁহুছিবার কথা সন্ধ্যার পর। ভাবিয়া চিন্তিয়া সঙ্গীকে বলিলাম "এইবার জটিলেশ্বর (সেখানকার বানান ও উচ্চারণ জিটেলশ্বর) জংসনে পঁহুছিলে স্নান ও আহার করিয়া লইতে হইবে—নহিলে বুঝিতে পারা যাইবে না। আর সেখানে যথেষ্ট সময় এক ঘণ্টা—দুজনে স্নান আহার করিয়া লইতে পারিব। ভাল ব্রাহ্মণ রান্না ভাত উপস্থিত-উপস্থিত ত্যাগ করিতে নাই।" সঙ্গী বলিলেন খাইতেই হইবে—নতুবা উপায় নাই। যে খাবার সঙ্গে ছিল সে সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে,—এই বলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে বন্ধু যে আধারে খাবার ছিল সেই আধার দেখাইয়া দিলেন। আমরা বেঞ্চের এক পার্শ্বে ছিলাম—অপর পার্শ্বে একটী মুসলমান দম্পতী অধিকার করিয়াছিলেন—সঙ্গে একটী বালিকা বোধ হয় এক কি দেড়

the Sultan of Delhi, who resided at Janhagira was executed without fail by the latter who scarcely having got notice of it gave his instructions in a letter of answer.

Ram Krisna also lived in friendship with Vada Shahib, who at that time was Governor of the Southern foreigner (*i. e.* English in Calcutta). The latter, therefore, showed likewise continual friendship towards him and placed a garrison of two thousand five hundred soldiers who were skilled in the use of all kinds of weapons and missiles in Krisnagar to execute the plans of Ram Krisna. p. 39 of W. Pertsch's Kshitish Vansabali Charitam. Published at Berlin.

বৎসর বয়স। বালিকার পেটের অসুখ—আর মাথা মুণ্ড কি বলিব—গাড়ী আসিতেছিল—আর দণ্ডে ৩ বার। সঙ্গে জল নাই—মাটি নাই। সুতরাং কামাল জমিতেছিল। খাবার ত মাথার উপর দুর্গন্ধে তিষ্ঠান ভার। আমার কষ্ট দেখিয়া একজন সাধু বলিলেন (সাধুরা আমাদের ত্যাগ করেন নাই) সাধু আপনি এইখানে—দূরে আসিয়া বসুন—নইলে আপনার অসুখ করিবে। তিনি স্থান ছাড়িয়া দিয়া আমার স্থানে আসিতে প্রস্তুত আমি কিন্তু তাঁহাকে স্থান ত্যাগ করিতে দিলাম না। তাঁর কাছে গিয়া বসিলাম। বন্ধুকেও সেই খানে নিকটে একটু স্থান করিয়া দেওয়া হইল।

আরাম করিয়া বসিলে পর একজন সাধু হাসিয়া বলিলেন "কাল রাত হইতেই আপনার যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়াছে—যেমন এ শ্রেণীতে আসিয়াছিলেন তার ফল ভোগ করুন।" আমি হাসিয়া বলিলাম অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে অদৃষ্টে কি ঘটিত তাই বা কে জানে।

যাহাহৌক গত রজনীর যন্ত্রণার কথাটা একটু বলা ভাল। সত্যের খাতিরে—সাহিত্যের খাতিরে, ভবিষ্যৎ ভ্রমণকারীর খাতিরে। তবে রসটা বীভৎস মনে হয়—হইলই বা?—একটা রস ত বটে—সব কটা রস ত আস্বাদন করা চাই? এত বড় ভূমিকাতে পাঠক বোধ হয় শিহরিয়া উঠিয়াছেন। আমিও যতক্ষণ পারিয়াছিলাম চুপ করিয়াছিলাম—তবে যখন শিহরিয়া উঠিলাম তখনই কামরা খুঁজিতে লাগিলাম। বন্ধু তখন নিদ্রিত—রাত্রি শেষ রাত্রি। একজন সাধুই সাহায্য করিলেন। যেমন কামরায় ঢুকিতে যাইব দেখিলাম একজন কাবুল সীমন্তিনী স্বীয় কন্যাকে লইয়া দ্বারে শয়ন করিয়া আছে। জাগ্রত কাবুল—নায়ক গম্ভীর স্বরে বলিল "মেয়ে মানুষ শুইয়া, যেন গায়ে পা দিও না।" প্রত্যেক মুহূর্ত্ত তখন আমার পক্ষে মূল্যবান। তবুও "আমি কি কানা" একটা জবাব দিয়া লাফাইয়া একেবারে ঘরের মধ্যে পা দিলাম। ওঃ হরি! ঘরের নর্দ্দামাটীর মুখ আবদ্ধ। জমা-সলিলে পা ডুবিয়া গেল—আদুড় গায়ে শুধু পায়ে গিয়াছিনু। অমনি বিদ্যুৎ প্রভাবে শরীর বার বার কাঁপিয়া উঠিল। সহ্য করিয়া অন্ধকারেই গন্তব্য স্থান অনুসন্ধান করিয়া বসিয়া পড়িলাম। কিন্তু হায় অদৃষ্ট! কাবুল কান্তা সেই সময় জাগিয়া উঠিয়া দ্বারের সুমুখেই

বসিল। কিন্তু রোধিবে কে? পেটের অসুখের শব্দ—রোধিবে কে? মনে মনে সঙ্গীকে আমেদাবাদে বেশী দুধ দিবার জন্য গালি পাড়িতে লাগিলাম। ওদিকে গাড়ী মধ্যে আমার উপর তীব্র সমালোচন চলিল—শ্রেষ্ঠ সমালোচক দেখিলাম কিন্তু সেই কাবুলী।

ইতোমধ্যে সাধু-মহাত্মা দেখিলাম আমার সঙ্গীকে উঠাইয়াছেন। তিনি উঠিয়া দুটা একটা আছাড় খাইয়া নিদ্রা-জড়ীভূত কণ্ঠে বলিলেন (খুব মিহি সুরে বলিলেন) জল নাই। বলিয়া রাখি, বন্ধুর গলায় সরু মোটা দুইটী স্বর খেলে। এখন মিহির উপর খাপে বলিলেন "জল নাই"। আমি তার স্বরে বলিলাম—তখন আর লজ্জা নাই—প্রভাত পর্য্যন্ত কি আমার এই স্থানে অজ্ঞাত বাস হইবে? সেই মিহি সুরে জবাব হইল "পারেন ত সেকেণ্ড ক্লাসে যান—আর উপায় নাই। ষ্টেসনে জল পাইবার যো নাই।" আমি তখন কাবুল-কান্তাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া একটু স্থান পাইলাম ও বাহিরে আসিয়াই কাটের আগড় এক পাশে ঠেলিয়া দিয়া (ইহাই তৃতীয় শ্রেণীর দরজা) প্লাটফরমে নামিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে সেকেণ্ড ক্লাস অন্বেষণে ছুটিলাম। বলা বাহুল্য, গাড়ী তখন ষ্টেসনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ঘণ্টা দেওয়া শুনিয়া একটা সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিয়া পড়িলাম। দেখিলাম ন স্থানং তিল ধারয়েৎ। বিছানার স্থান ত দূরের কথা ঘরের মেজেতে শয্যা পাতিয়া ঠেসাঠেসি করিয়া লোকে শুইয়া আছে। দুই জন নিমেষে দেখিলাম মিলিটেরি ম্যান অর্থাৎ সৈনিক পুরুষ—হাতিয়ার খুলিয়া রাখিয়াছেন। মনে করিলাম জুনাগড় কাছে বোধ হয় সেই রাজ্যের সৈনিক পুরুষ। যাহা হোক যাওয়া দায়—স্থান নাই কোন মতে নিঃশব্দে চোরের ন্যায় জলের ঘরে ঢুকিলাম। ঘটি নাই—কিছু নাই। কোন গতিকে কাজ সারিয়া পরিষ্কার হইলাম। প্লাটফরম হইতে ধূলা লইয়া গিয়াছিলাম। এখন ভাবনা ট্রেণে বড় চোরের উপদ্রব কেহ যদি উঁকি মারিয়া দেখিতে পায়—শুধু পা আদুড় গা—হয় গুলি করিবে না হয় চোর বলিয়া ধরাইয়া দিবে। গাড়ী থামিবে মনে করিয়া কোন গতিকে দ্বারের নিকট আসিলাম। গাড়ী থামিল না—সে রাস্তা, ষ্টেসন আসে নাই—আবার চলিতে লাগিল আমি আবার যথা স্থানে গিয়া লুকাইলাম শেষে ভাবিলাম ভয় খাই কেন প্রকাশ্য

ভাবে গিয়া বেঞ্চেতে বসি না। ষ্টেসন আসিলে নামিয়া যাইব, জিজ্ঞাসা করে সব বলিব। যাহাহৌক একবার অন্যমনস্কে আমি কাশিয়া ফেলিয়াছিলাম—সেই কামরার মধ্যে। উপরকার শয্যা হইতে এক ব্যক্তি তখনই মস্তকোত্তলন করিল। চারি দিক দেখিল—আবার লেপ মুড়ী দিল। আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম। এইবার গাড়ী পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে ছলনা আরম্ভ করিল। থামে থামে হয় আবার চলিতে আরম্ভ করে, আবার জোরে চলে। ৩।৪ বার এই ভাব হইল। এ দিকে আমার আঙ্গুল জমিয়া বরফ হইয়াছে। গায়ে আর সাড় নাই শীতে গা কাঁপিতেছে। মনে হইল আর দ্বারকা যাইতে হইবে না—গাড়ীতেই বাতশ্লেষ্মা বিকার হইবে। যাহাহৌক শেষে বিরক্ত হইয়া ও সাহসে ভর করিয়া আসিয়া দ্বারের নিকট এক খানি বেঞ্চের পার্শ্বে এক জনের পদতলে বসিয়া পড়িলাম। যখন সত্য সত্যই ষ্টেসনে গাড়ী থামিল, তখন নামিয়া আসিয়া আমাদের গাড়ী খুঁজিতে লাগিলাম। সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে গাড়ীও চিনিতে পারি না কেহ সাড়াও দেয় না, এ দিকে গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করিতেছি এমন সময় সেই অন্ধ সাধুটী বলিলেন, "বাবুজী এই কামরা।" অন্ধ যেন হারা-যষ্টী পুনঃপ্রাপ্ত হইল, আমি ছুটিয়া গিয়া আগড় ঠেলিয়া গাড়ীতে উঠিয়া সঙ্গীকে রাগের ভরে তিরস্কার করিলাম। তখন একজন পুলিষ কর্ম্মচারী ও একজন সাধু আমাকে ভাল করিয়া বিছানা করিয়া দিয়া শোয়াইয়া লেপ চাপা দিল। কতক্ষণ বাদে ঘুমাইয়া পড়িলাম, পরে প্রাতে ঢোলা জংসনে পঁহুছিলাম। এই বীভৎস অভিনয়ের পর হইতেই আমার গা ঘিন্ ঘিন্ করিতেছিল—স্নান করিবার জন্য প্রাণ ব্যস্ত হইয়াছিল। শৌচ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া লেপ চাপা দিয়া একটু আরাম বোধ করিলে কে যেন কানে কানে বলিল "সাধুদের সব সমান—বিষ্ঠা চন্দনে সমান জ্ঞান, একটা সামান্য পরীক্ষায় হারিয়া গেলে।" তখন বুঝিলাম সাধু হওয়া কি কঠিন।

ঢোলা জংসন হইতে গাড়ী ছাড়িলে হাওয়ার জোর ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল; প্রবলতর হইতে প্রবলতম হইতে লাগিল। দেখিলাম গরুগুলি এক একটী অবতার এমন প্রকাণ্ড এমন সুদৃঢ় গঠন এমন শৃঙ্গের শোভা এমন বিশালের উপর শান্ত ভাব। রাস্তার দু ধারে যত গাভী ও মহিলা

দেখিলাম—দেখিলাম সবই এক ছাঁচের। মনে হইল, গরু ও গোপী দেখিয়া মনে হইল শ্রীকৃষ্ণের রাজ্য বটে। রৈবতকে (গীর্ণার পাহাড়—অধুনা জুনাগড়) তিনি যে বিহার করিতেন তাহার আর ভুল নাই। গরু ও স্ত্রী দেখিলেই মালুম। গরুগুলি বেশ যত্নে আছে গায়ে মোটা কাপড় দিয়া গা-ঢাকা। মাঠের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখি প্রকাণ্ড প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে কোথাও দূরে—অতি দূরে আকাশের গাত্রে গাঢ় জমাট মেঘের মত দিঙ্মণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া শৈলমালা দণ্ডায়মান। শৈলমালার অস্তিত্বের প্রমাণ-স্বরূপ অনেকগুলি ছোট রৌপ্য সূত্রাকারা সূক্ষ্মা নির্ঝরিণীর উপর দিয়া গাড়ী লাফাইয়া লাফাইয়া যাইতেছে। যেমন আমাদের দেশে সেখানে সেইরূপ টেলিগ্রাফ তারের উপর ফিঙ্গা (খুকুমণির ফিঙ্গ, ফিঙ্গেটী বাবুইহাটী) বসিয়া গম্ভীর ভাবে ভাবিতেছে এই তারই ভারত-শাসন করিতেছে। দোয়েল বুলবুলি কোথাও খানিক খানিক গাড়ীর সঙ্গে যেন বাজী রাখিয়া ছুটিতেছে। যে দিকে চাহিয়া দেখ সেই দিকেই ধূ ধূ করিতেছে অনুর্ব্বর প্রান্তর। বিশ ত্রিশ বিঘা জমীর মধ্যে একটু কাঠা দশেক উর্ব্বর—মানুষ ছাড়ে নাই সেই টুকুই খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া তুলার চাষ লাগাইয়া দিয়াছে। মাঠের মধ্যে ঐরূপ তুলার চাষ আর কোথাও বা কলাই মুগ। আকাশও অনুর্ব্বর বৃষ্টির বড়ই অভাব।

সমগ্র দেশটীর নাম "কাটি'বার" বরদার গুইকুমার হইতেছেন মিত্ররাজা তাঁহারই অধীনে অনেকগুলি ছোট ছোট পাত্র রাজ্য আছে। গণ্ডালের ঠাকুর সাহেব; পোর বন্দরের রাণা; জুনাগড়ের নবাব; জামনগরের জাম; মোরভির ঠাকুর, ভবনগর ইত্যাদি। ইহারা সকলে গুইকুমারকে কর দেন এবং তাঁহারই অধীনে সামন্ত রাজা। ইংরেজ সরকার ইহাদের এইরূপ সম্পর্ক বজায় রাখিয়াও ইহাদিগের স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তবে ইহাদের প্রত্যেকের জন্য এক এক জন পোলিটিকাল রেসিডেন্ট নাই। গুইকুমারের জন্য যিনি বরদায় অবস্থিতি করেন—তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা। তবে রাজকোটে—সকলকার জন্য—বরদায় তাঁহার অধীনে পোলিটিকাল কর্ম্মচারী আছেন তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ করদ ও মিত্ররাজ্যে যেরূপ হয় সেইরূপেই। কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও প্রত্যেক

টী এক একটী সম্পূর্ণ রাজ্য—রাজ্যে যাহা থাকে সে সবই আছে। র পোলিটিকাল রেসিডেন্টের কিরূপ মান তাহা পরে বলিব। ফিরিবার তাহা দেখিয়াছিলাম।

ইংরেজের নয়নে কিন্তু দুইটী রাজ্য বিশিষ্ট। জামনগর ও জুনাগড়। নগরের বর্ত্তমান জাম বা শাসনকর্ত্তা হইতেছেন রণজীৎসিংহজী। ইনি তে লেখা পড়া শেষ করিয়াছেন এবং এখানে ও বিলাতে ক্রিকেট খেলিতে য়াছেন। এমন শিখিয়াছেন যে তাঁহার মত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। তের বড় বড় খেলোয়াড়কে তিনি শুধু পরাজিত করিয়াছেন এমন ; দেশ বিদেশের, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, কেপ প্রভৃতি স্থান হইতে হারা তাঁহার সহিত খেলিতে গিয়াছিলেন সকলেই হারিয়া আসিয়াছেন। রেজ ক্রিকেট বড় ভালবাসেন ; বলেন রণস্থলে তাঁহাদের যে এত শৌর্য্য র্য্য তাহার কারণ হইতেছে তাঁহাদের ক্রিকেট খেলা। ইটন, রগ্‌বী প্রভৃতি দ্যালয়ের ক্রীড়াস্থলেই ইংলণ্ডের ভবিষ্যতের সমর-বীরের ভবিষ্যতের ক্ষেত্র (অর্থাৎ ওয়াটারলু প্রভৃতি)-জয়লাভ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এ হেন ক্রিকেটের অদ্বিতীয় বীর রণজিৎ ইংরেজের কত আদরের জিনিষ তাহা সহজেই অনুমিত হয়। আর দ্বিতীয় বিশিষ্ট রাজ্যটী জুনাগড়। ভারতের কুত্রাপি সিংহ পাওয়া যায় না কেবল জুনাগড়ের গীর্ণার পাহাড়ে সিংহ পাওয়া যায়। জগদম্বা স্বয়ং তথা বিরাজ করেন এই জন্য সেখানে গীর্ণার পাহাড়ে সিংহ ও প্রকৃত সাধু পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সাধু পুরুষে ইংরেজের দরকার নাই, তাঁহাদের দরকার সিংহে। তাই নূতন বড় লাট লেই একবার জুনাগড়ে আসিয়া সিংহ শীকার করেন। তখন একটা ও ব্যাপার ঘটে—রাজ্যশুদ্ধ হৈ চৈ। তাঁর আসা—তাঁর থাকা—আর তাঁর যাওয়া—শেষ না হইলে আর কোন কার্য্যই হয় না। তখন বড় বড় হয়, বড় বড় বক্তৃতা হয়—আর বড় বড় সিংহ ধরা পড়ে কি না—ত অদৃষ্টের কথা, তাই জুনাগড়ের এত মান।

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

মোতি-কুমারী ।

(গল্প)

(১)

[এমন ঘোর স্বদেশীর দিনে, একটী নিতান্ত বিদেশী গল্প বিদেশী লেখা গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া আমি তোমাদিগকে উপহার দি… তাহাতে তোমাদের লাভ আছে। আমি দেখিয়াছি, তোমরা স্বদেশী গ… পড়িতে পড়িতে কেবলই ভাবনা কর—'এটা কার উপর হইল? গ্রন্থকা… কার উপর আক্রমণ করিলেন?'—আমার এ লেখায় সেরূপ কিছু ভাবিবা… অবসরই পাইবে না, কেন না পূর্ব্বেই বলিয়াছি এটী সম্পূর্ণ বিদেশী। মা… ঘামাইয়া আক্রমণের লক্ষ্য স্থির করিতে হইবে না, এই হইল—তোমাদে… লাভ; আর আমারও লাভ বড় কম নহে—আমাকে এই বাঙ্গালার ভাগীরথী… উপর বিরাট পাথুরে কেল্লা সৃষ্টি করিতে হইবে না, ঔরঙ্গজেবের অন্তঃপুরে… তাড়িত আলোক সাজাইতে হইবে না, রাধা গোয়ালার গুণ গ্রাম ব… কুমারীতে সন্নিবেশিত করিতে হইবে না; বিদেশীদের কথা বিদেশী … বলিয়াছেন, আমি প্রায় ঠিক সেইরূপ ভাবেই বলিব। আর পূর্ণিমা… স্বত্বাধিকারীদের ত বিষম লাভ—পূর্ণিমায় গল্প দেওয়া হইতেছে—তাঁহাদে… হৃদয়ে আহ্লাদ আর ধরে না। Haggard সাহেবের Pearl Maide… হইতে গল্পটী সংকলিত। গল্পটিতে 'অনেক ভূতপূর্ব্ব' অদ্ভুত আছে ব… কিন্তু এখন যে দিন কাল পড়িয়াছে, অদ্ভুত বলিয়া যে কিছু আছে এ… বোধই আর করা যায় না। তবে রোমের কথা, য়ুদীদের কথা, আদি… খৃষ্টানদের কথা পড়িলে ক্ষতি কি?]

উনিশ্‌শো বৎসর পূর্ব্বে য়ুদীদেশে যীশুখৃষ্টের জন্ম হয় এ কথা সকলে… জানেন। কিছুকাল ধর্ম্মোপদেশ দিয়া, শত্রুহস্তে মহা লাঞ্ছিত হইয়া, যী… স্বর্গ গমন করেন। সেই সময়ের সেই দেশের একটী গল্প বলিব। য়ুদী জাতি… তখন দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। অতি অল্প সংখ্যক যীশুর ঈশ্বর… বিশ্বাসবান্। নবধর্ম্মের নববলে তাহারা বলীয়ান্। কিন্তু অধিক সংখ্য… য়ুদী যীশুকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিত না; তাঁহাকে ভণ্ড বলিয়া জানি… এবং নব সম্প্রদায়ের স্বজাতিকে স্বধর্ম্মত্যাগী মূঢ় বলিয়া ঘৃণা করিত, লাঞ্ছ…

…ত, যন্ত্রণা দিত। রোম রাজ্যের এবং রোমানদের তখন প্রবল প্রতাপ। …ই প্রতাপে রোম্যানরা তখন মহা দর্পিত। য়ুদী জাতিকে উৎসন্ন দিবার …ও রোম তখন বদ্ধপরিকর হইয়াছে। য়ুদী জাতি বলিয়া নয়, রোম …র অসীম সাম্রাজ্যের চতুর্দ্দিকস্থ সভ্য অসভ্য সকল জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র …লনা করিতেছে, তাহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিতেছে, তাহাদের দেশ উৎসন্ন …িতেছে। তৎকালে য়ুদী ভূমিতে স্ত্রী পুত্র বিহীন ঈষানী নামে একটী ক্ষুদ্র …্যাসী সমাজ ছিল। তাহারা চাষবাস করিত, আতিথ্য করিত, ভগবানের …জনা করিত, কিন্তু বিবাহ করিত না, কোন নারীর মুখ দেখিত না; …কোন স্ত্রীলোক অতিথি হইলে মুখ ফিরাইয়া তাহার সহিত কথা কহিত …কিন্তু অতিথিশালায় তাহাদিগকে স্থান দিত, আহার দিত, রক্ষা করিত। …এই ক্ষুদ্র নিরীহ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ও রোমের প্রতাপে বিকম্পিত ছিল।

…নিকটস্থ ফিনিসিয়া দেশের টায়র নগরে বেনোনি নামে একজন মহা …ধনবান্ য়ুদী বণিক্ বাস করিতেন। তাঁহার র‍্যাচেল নামে এক কন্যা ছিল। …সিরিয়া দেশের গ্রীকবংশজ ডিমাস্ নামক এক যুবকের সহিত তাহার বিবাহ …হয়। ডিমাস্ ও র‍্যাচেল উভয়েই নবধর্ম্ম অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং …সেই জন্য বেনোনির বিষনয়নে পড়েন। বেনোনির চক্রান্তে জামাতা …ডিমাস্ রোমান প্রতাপের পেষণে প্রাণে নষ্ট হইল। রোমের সম্ভ্রান্ত …লোকেরা এমন কি সম্রাটেরাও বন হইতে সদ্যোধৃত সিংহ, শার্দ্দূলের সহিত …নিরাশ্রয় নিরস্ত্র মনুষ্যের সংগ্রাম দেখিতেন। সিংহ ব্যাঘ্রে নিরুপায় মনুষ্যকে …ছিঁড়া ছেঁড়া করিয়া ভক্ষণ করিত। সমবেত সহস্র সহস্র লোকে সেই …ভয়ানক নৃশংস দৃশ্য মহা আনন্দে দর্শন করিত, হো হো করিয়া হাস্য করিত, …চটা চট করিয়া করতালি দিত।—অতি গর্ব্বে হত লঙ্কা—সে রোম আর …আজ নাই; রোমান জাতি জগৎ হইতে বহুদিন বিলুপ্ত হইয়াছে। এইরূপে …ডিমাসের প্রাণ নষ্ট হয়। তখন র‍্যাচেল গর্ভবতী ছিলেন। শত শত য়ুদী, …খৃষ্টানীর সঙ্গে র‍্যাচেলকে এইরূপে বধ্যভূমি বা ক্রীড়াভূমিতে আনা হইল। …সিরিয়া দেশীয়া সম্ভ্রান্ত আরব জাতীয়া প্রভুপরায়ণা একটী দাসী র‍্যাচেলের …সঙ্গ লইয়াছিল। সেও খৃষ্টান কিন্তু আরবের অধ্যবসায় তাহার রক্তে ছিল। …সে র‍্যাচেলকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল। প্রতিজ্ঞা করিয়া…

ছিল নিজের প্রাণ দিয়া ও অপরের প্রাণ লইয়াও র‍্যাচেলকে রক্ষা করিবে। স্বীয় বসন মধ্যে বিমলার মত শানিত অস্ত্র লইয়াছিল। তাহার নাম নেহুস্তা।

রোমের কৈশরের অধীনে আগৃপা তখন ঐ দেশের রাজা। সেই বিস্তীর্ণ ক্রীড়াভূমি বা বধ্যভূমির প্রাঙ্গন পার্শ্বস্থ সমুজ্জ্বল সিংহাসনে আগৃপা যেমন উপবেশন করিলেন অমনি মহা বেদনায় ব্যথিত হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। নকিব ফুকরিয়া বলিয়া দিল সেইদিন আর ক্রীড়া হইবে না, রাজা পীড়িত। দর্শকমণ্ডলী মহা বিক্ষুব্ধ হইয়া অত্যন্ত বিশৃঙ্খলভাবে চারিদিকে দৌড়াইতে লাগিল। নেহুস্তা সুযোগ পাইয়া একজন প্রহরীকে হত্যা করিয়া একটী গুপ্ত দ্বার দিয়া দুর্গমধ্য হইতে গোলেমালে র‍্যাচেলকে লইয়া পলায়ন করিল। পলায়ন করিয়া একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে গমের গোলা ছিল, সেইখানে দুই জনে লুকাইয়া রহিল। সেই গোলার অধিকারী আনয়ার নামক একজন মহাজন। তাহাকে সেই প্রহরী-মারা ছুরীর ভয় দেখাইয়া র‍্যাচেলের উদ্ধারসাধন করিল। নেহুস্তা ও র‍্যাচেল জাহাজে চড়িয়া মিসর যাত্রা করিল। মহা ঝঞ্ঝাবাতে সমুদ্রগর্ভস্থ শিলায় লাগিয়া জাহাজ চূর্ণ বিচূর্ণ হইল। নাবিকেরা কেহ নৌকা-যোগে পলায়ন করিল, কেহ সমুদ্র গর্ভে প্রাণত্যাগ করিল। ভাঙ্গা জাহাজে চড়ার উপর র‍্যাচেল একটী কন্যা সন্তান প্রসব করিলেন। নেহুস্তাকে বলিলেন "এই কন্যার নাম রাখিলাম মিরিয়াম্। এটী খৃষ্টান কন্যা খৃষ্টান হইল। খৃষ্টানধর্মে ইহাকে প্রতিপালিত করিও; খৃষ্টান ভিন্ন অন্য কোন বরের সহিত বিবাহ দিও না। আমার অঙ্গের সঙ্কেত কবচ আমার মামা আইথিয়্যালকে দেখাইলে তিনি ইহার প্রতিপালনের ভার লইবেন। তিনি সন্ন্যাসীক্ষেত্রে থাকেন। নেহুস্তা আমাকে যেরূপ প্রতিপালন করিয়াছ, ইহাকেও সেইরূপ করিও।" ভগবানের নাম করিতে করিতে র‍্যাচেলের মৃত্যু হইল। তাঁহার সদ্গতি লাভ হইল। মৃতদেহ ভাঙ্গা জাহাজে রাখিয়া, জাহাজে আগুন লাগাইয়া দিয়া, মৃতের ভীষণ সৎকার করিয়া, সদ্যোজাত মিরিয়ামকে ক্রোড়ে করিয়া শৈলময়ী বেলাভূমি ছাড়াইয়া, নেহুস্তা নিকটস্থ গ্রাম অভিমুখে গেল। তাহার সঙ্গে কিছু অর্থ ছিল। র‍্যাচেলও কিছু দিয়াছিল

...নান্ জাহাজ হইতেও কিছু সংগ্রহ করিয়াছিল। গ্রামে গিয়া একটী ...বৎসা দুগ্ধবতী রমণীকে রক্ষিকারূপে ও তাহার স্বামীকে রক্ষকরূপে ...নান্য অর্থদানে নিযুক্ত করিয়া সেই সন্ন্যাসভূমির দিকে চলিল।

সন্ন্যাসক্ষেত্র একরূপ আনন্দ মঠ, তবে আনন্দ কাননে বিদ্রোহীর দল থাকিত, সন্ন্যাসক্ষেত্রে নিরীহ ধর্ম্মপরায়ণ কৃষকমণ্ডলী বাস করিত। নিরীহ বলিতে নির্জীব ক্লষ্টের জীব নহে। ইহারা বলিষ্ঠ, বীর্য্যবান্, তেজস্বী, কর্ম্মপরায়ণ, শ্রমকষ্ট সহিষ্ণু, অধ্যবসায়শীল, আত্মরক্ষায় পটু, সকলে এক মত হইয়া কাজ করে, আপনারা চারিপাঁচ সহস্র হইলেও নির্দ্দিষ্ট শত সংখ্যক বয়োবৃদ্ধের পরামর্শ মত কার্য্য করে, গান শিক্ষা করে, বাণ শিক্ষা করে, ভাস্কর্য্য, তক্ষণ সকলি শিক্ষা করে। আর সকল কার্য্যই ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া করে।

আইথিয়্যাল সন্ন্যাসক্ষেত্রের নিকটস্থ মালভূমিতে কর্ষণ করিতেছিলেন। মিরিয়্যামের নব রক্ষক তাঁহাকে গিয়া সংবাদ দিল "যে একটী নবপ্রসূতা কুমারী লইয়া একজন বর্ষীয়সী তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে।" আইথিয়্যাল হাল বলদ রাখিয়া কৃষকের সঙ্গে গেলেন, মুখ ফিরাইয়া নেহুস্তার সহিত কথা কহিলেন। সঙ্কেত কবচাদি দেখিয়া তাহার সকল কথা বিশ্বাস করিলেন। তাঁহাদিগকে সেই স্থানে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিতে বলিয়া রক্ষককে সঙ্গে লইয়া গ্রামে গেলেন। কিছু খাদ্য ও পেয় তাহার হস্তে পাঠাইয়া দিলেন। আইথিয়্যালের প্রার্থনা মত বিস্তীর্ণ সভাগৃহে শত বৃদ্ধ সমবেত হইলেন। আইথিয়্যাল তাঁহার ভাগিনেয়ীর ও ভাগিনেয়ী পুত্রীর সমস্ত বিবরণ সভাসমক্ষে বিবৃত করিলেন; কি করা কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসু হইলেন। সন্ন্যাসী সভায় ঘোর তর্ক বিতর্ক হইল। শেষে স্থির হইল আশ্রিত প্রতিপালনের অপেক্ষা আর ধর্ম্ম নাই—সুতরাং বর্ষীয়সী দাসী এবং নবপ্রসূতা কুমারীকে প্রতিপালন করিতেই হইবে। অতিথিশালার এক ভাগে একটী ক্ষুদ্র উদ্যান পরিবেষ্টিত প্রকোষ্ঠে তাহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল; অন্ন বস্ত্রাদি তাহারা যথোপযুক্ত পাইবে, কন্যাটীকে বিবাহকাল পর্য্যন্ত উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে। খৃষ্টান সৎপাত্রে বিবাহ দিয়া অথবা বিবাহকাল উত্তীর্ণ হইলে, তাহাকে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া ঈষানী সম্প্রদায় কুমারীর

এবং কুমারীর প্রাচীনা রক্ষিকার চিরজীবনের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করিবেন। আপাতত কিছু কালের জন্য দুগ্ধবতী ধাত্রীও থাকিল। এইরূপে মিরিয়্যাম্ সহস্র সন্ন্যাসীর হৃদয়সিংহাসনে অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে অধিষ্ঠিত হইলেন।

(২)

ঐ সময়ে হিলিয়্যাল নামে একজন সম্ভ্রান্ত য়ুদী ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে রোম্যানদিগের পক্ষ অবলম্বন করিতেন বটে কিন্তু সেই জন্যই রোম্যানরা তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া হত্যা করে এবং তাঁহার প্রভূত ধন সর্ব্বস্ব অধিকার করিয়া লয়। তৎপূর্ব্বেই হিলিয়্যাল পত্নীর মৃত্যু হইয়াছিল। সুতরাং হিলিয়্যালের একমাত্র পুত্র ক্যালেব শৈশবে নিরাশ্রয় ও নিঃস্ব হইয়া পড়িল। সন্ন্যাসীরা তাহাকেও স্থান দিল ও প্রতিপালন করিতে লাগিল। মিরিয়্যাম্ কেবল এক পাল অশীতিপর বৃদ্ধ লোকের সহিত বাস করিত এক জন সমবয়সী পাইয়া আহ্লাদে আট খানা হইল। তাহারা দুই জনে কত খেলাই খেলিতে লাগিল। ক্যালেব বড় সুন্দর ছেলে, কাল কাল চোক, আর কাল কাল কোঁকড়া কোঁকড়া চুল কাঁধে ঝল ঝল করিতেছে। একটু রাগিলে চোক দিয়ে যেন আগুণের ফিন্‌কি বেরোয়। যা ধরে তা ছাড়ে না, যা ছাড়ে তা আর ধরে না। ছেলেটীকে নেহুস্তার ভাল লাগিল না। কাল মণি নেহুস্তাকেও তার কেমন কেমন লাগিল। মিরিয়্যাম্ ক্যালেবকে ভালবাসিত কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুরদের বা নেহুস্তাকে যত ভালবাসিত, তত ভালবাসিত না। ক্যালেব কিন্তু মিরিয়্যাম্‌কে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে লাগিল। যাহাহৌক, এইরূপে তাহারা একত্রে খেলা ধূলা করিতে করিতে কিশোর কিশোরী হইল।

য়ুদীরা তাহাদের প্রধান মন্দিরে পশু বলিদান করিত। এই যজ্ঞার্থ তাহারা ঈষানীদের নিকট কর চাহিল। পশুবলীর সঙ্কুলান জন্য কর দিতে ঈষানীরা অস্বীকার করিল। য়ুদী মঠাধ্যক্ষের আদেশ মত ঈষানীদের গ্রাম লুট করিয়া শস্যাদি লইয়া গেল। লুণ্ঠনকারীদিগের এক জনের সহিত ক্যালেবের কলহ হইল। সে ক্যালেবের স্কন্ধে আঘাত করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু সে যখন গ্রাম হইতে বনান্তর দিয়া যায় তখন কোন গুপ্ত মানব

প্রেরিত তীক্ষ্ণ শরাঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। একটা মহা গণ্ডগোল হইল ঈষানীরা বিদ্রোহী বলিয়া রোম্যান্‌দিগের কাছে এত্তালা হইল। একজন যুবক রোম্যানকর্ম্মচারী সাধারণত ঈষানীদিগের আচরণ ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষতঃ গুপ্তহত্যা সম্বন্ধে তদারক করিবার ভার পাইলেন।

কর্ম্মচারীর নাম মারকস্; তাঁহার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ। যুবা বড় দীর্ঘও নহে, বড় হ্রস্বও নহে; একটু যেন কৃশ কিন্তু চাল চলন খুব চালাকের মত। চক্ষু ঈষৎ কটা; হাসিলে অল্প অল্প দাঁত দেখা যায়, চেহারা দেখিলেই মনে হয় লোকটী বুঝি সৈন্যাধ্যক্ষ অথচ বেশ কোমল প্রকৃতির। প্রথম দর্শনে মিরিয়্যাম্ বুঝিল যে জগতের মধ্যে এই যুবককেই সে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসে। ক্যালেবের উপরে মারকসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়িল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ক্রমে বিষদৃষ্টিতে পরিণত হইল। ক্যালেবও মারকসের উপর বিদ্বেষ পোষণ করিতে লাগিল। দুই জনই কিন্তু মিরিয়্যাম্‌কে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে লাগিল। যে দেশে কুমারী বড় করিয়া অর্থাৎ কিশোরী বা যুবতী করিয়া বিবাহ দিবার রীতি আছে, সে দেশে এই দশাই ঘটে। অর্থাৎ দুই যুবক এক যুবতীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া পরস্পরের প্রতি পরস্পর বিদ্বেষভাব বহন করে। কি গ্রীক্, কি রোম্যান, কি য়ুদী, কি বিলাতী, কি জর্ম্মান, কি ফ্রেঞ্চ এই সকল জাতির পনোর আনা গল্প পুস্তকে ঐ কথার ওড়ন পাড়ন লইয়াই কাহিনী। ঐ কথাই জান, ঐ কথাই মজ্জা। আমরা এই গল্পে সেই মজ্জার সূত্র এখন দেখিতে পাইতেছি।

চারি জন শিক্ষকে মিরিয়্যাম্‌কে শিক্ষা দিত। একজন ছাঁচ গালাই, তক্ষণ ও ভাস্কর্য্য শিখাইত। মিরিয়্যাম অতি সুন্দররূপে ঢালাই করিতে পারিতেন, মর্ম্মর প্রস্তরে অতি সুন্দর মূর্ত্তি সকল খোদিত করিতেন। মারকস্ অতিথি হইয়া এই সকল খোদকারী দেখিলেন; তাঁহার মূর্ত্তি খোদিত করিতে মিরিয়্যামকে অনুরোধ করিলেন। মিরিয়্যাম জ্ঞান বৃদ্ধগণের অনুমতি লইয়া খোদিত করিতে লাগিলেন।

উদ্যানের নিভৃত স্থানে, ঝিলের ধারে, লতামণ্ডপে বসিয়া মারকস্ সিটিং দেন অর্থাৎ প্রতিমূর্ত্তির আদর্শভাবে বসিয়া থাকিতেন। মিরিয়্যাম্ কাজ করিত বটে কিন্তু দুই জনে কত গল্প গুজব করিত, কত মনের কথা

কহিত, আর ক্যালেব মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া দেখিয়া তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিত।

অন্য সময়ে মারকস্ খুনের তদারক করেন; ঈষানীদের আচরণ সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখেন এবং নোট করেন। গুপ্ত সন্ধানে প্রকাশ পাইল যে ক্যালেবই গুপ্তহত্যাকারী। এ কথার কাণাঘুসাও হইল। এক দিন মিরিয়্যাম্ ধরিয়া বসিল, যে, ক্যালেবকে অব্যাহতি দিতে হইবে। ক্যালেবকে দোষী সাব্যস্ত রাখিয়া তাহাকে কোনরূপে বাঁচাইতে মারকস্ স্বীকার করিলেন। ক্যালেব দূর হইতে আড়ি পাতিয়া এই ব্যাপার দেখিয়াছিল। বড় দূর হইতে বলিয়া কিছুই শুনিতে পায় নাই। হতভাগা উল্টা বুঝিল যে তাহারই বিরুদ্ধে মারকস্, মিরিয়্যাম্ ও নেহুস্তা একটা ষড়যন্ত্র করিতেছে। সে গোপনে মারকসের সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিতে আসিল। যুদ্ধে তাহার হাতের কয়টা আঙ্গুল কাটা গেল। ক্যালেব পরাস্ত হইল; অপমানিত হইল; মারকস তাহাকে তাহার প্রাণ দান করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। ক্যালেব সন্ন্যাসীদের গ্রাস হইতে অবশ্য পলায়ন করিল। ক্যালেব জেরুজিল্যামে গেল। যে বৃদ্ধানারী তাহাকে ঈষানীদের বাড়ী রাখিয়াছিলেন, তাঁহার বাড়ীতে আশ্রয় লইল। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল তদীয় পুত্র ক্যালেবকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন। রোমের অধ্যক্ষের নিকট ক্যালেব অভিযোগ করিলেন। যে তাঁহার পিতৃত্যক্ত সম্পত্তি এক দল যুদী অন্যায় অধিকার করিয়া তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছে। সম্পত্তির উদ্ধার হইলে সে রাজকোষে প্রভূত শুল্ক দান করিয়া এক মাস মধ্যে সেই নিঃস্ব বালক প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হইল।

(৩)

ক্যালেব বালক কাল হইতেই চঞ্চল চিত্ত, উচ্চাভিলাষী, তেজস্বী, বলবান ও যুদ্ধপ্রিয় ছিল। এখন প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়া দূরাকাঙ্ক্ষায় ফুলিয়া উঠিল। যুদীজাতির সৈন্যাধ্যক্ষ হইব, যুদী ভূমি হইতে রোম্যানদিগকে যুদ্ধ করিয়া তাড়াইয়া দিব, আপনি যুদী ভূমির রাজা হইব— এই সকল দূরাকাঙ্ক্ষা ক্যালেব গোপনে হৃদয়ে পোষণ করিতে লাগিল আর রাজা হইয়া মিরিয়্যাম্‌কে বিবাহ করিয়া তাহাকে রাণী করিব এ কথাও তাহার হৃদয়ে সর্ব্বদা ফুটিয়া উঠিত।

ক্যালেব টায়ার নগরীতে চলিল; সেখানে আপনার নষ্ট সম্পত্তি উদ্ধার করিবে আর বৃদ্ধ ধনী সওদাগর বেনোনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে। বেনোনী মিরিয়্যামের মাতামহ। মিরিয়্যামের পিতা নাই, মাতা নাই, মাতামহই এখন তাহার রক্ষক। ক্যালেবের মত তিনি জাতিতে এবং ধর্ম্মে যুদী। ক্যালেব চাহিলে বেনোনী ক্যালেবেরই সহিত মিরিয়্যামের বিবাহ দিতে পারেন, কেনই বা না দিবেন? বেনোনী এক দিন অপরাহ্নে নিত্যকার্য্য শেষ করিয়া সমুদ্রতীরস্থ প্রশস্ত ভবনে বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই সময়ে ক্যালেব গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। মিরিয়্যামের সহিত সে যে একত্র ঈষানী ভূমিতে লালিত পালিত হইয়াছিল এবং মিরিয়্যাম্ সম্ভবত যে বেনোনীর আত্মীয়া সে কথা ও আরও নানা কথা গল্প গুজব করিয়া চলিয়া গেল। পরক্ষণেই মারকস্ দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহার সহিত বেনোনীর মিরিয়্যাম্ সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা হইল। বেনোনীকে মারকস স্পষ্ট বলিলেন "আপনি যদি মিরিয়্যামের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্যালেবের সহিত তাহার বিবাহ দেন, তাহা হইলে মহা অনর্থপাত হইবে।" বেনোনী রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতেছেন, ইচ্ছা করিলে মারকস তখনি তাঁহাকে রোমে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইতে পারেন। বেনোনী স্পষ্টত বলিলেন যে মিরিয়্যামের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার বিবাহ দিবেন না। মারকস চলিয়া গেলে আপন মনে বলিতে লাগিলেন "ক্যালেব যুদী হইলে কি হয়, সে পাজি তাহার সহিত মিরিয়্যামের বিবাহ দিব কেন, তাহা অপেক্ষা এই রোম্যান যুবক শতগুণে ভাল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী—সমজদার।

ভারতী-চরণে—

অশ্রুমালা।

মা গো! কাননবাসিনী, আনন্দদায়িনী,
অভাগা জননী তুমি!
তবু তোমারি প্রসাদে জীবন্ত বাড়ন্ত,
নিখিল-জগত-ভূমি!
সেই তোমারি কোলে মা! প্রতাপ, কিরীটী,
নেচেছিল রণসাজে;—
ছিল ব্যাস, কালিদাস, বাল্মীকি কবি,
কবিতা-কানন-মাঝে;—
আজো সেই বীণা-ধ্বনি উঠে বিশ্বমাঝে
আকুলিয়া মনপ্রাণ,—
সে ত তোমারই গুণ গান!
আজো তোমারি শিরেতে বিজয় মুকুট,
ধরিয়াছে হিমগিরি!
তব তপোবনে সদা উঠে সামগান,
সুর তালে ধীরি ধীরি!
তাই সোণার দুয়ারে, হেরিয়া উষারে,
পিক মধুগান গায়;
আর সাঁঝের বেলায় শাঁখের সুতানে,—
অমঙ্গল দূরে যায়!
তব বক্ষোপরি বহে ক্ষীর-নীর ল'য়ে
জাহ্নবী, যমুনা ধারা;—
সে যে পবিত্র-পীযূষ-ঝারা!
মা গো! তোমারি বিমল শারদ আকাশে,
ঝরে যে চাঁদনী-সুধা;—

স্নানিয়া জুড়ায় কাতর পরাণ,
ঘুচে যায় মনক্ষুধা!
তোমারি কুঞ্জে মালতী, যুথিকা,
মল্লিকা, বেলা ফুটে;
শ্বেত-সোহাগিনি! তাহাতে আবার
নীল অলিকুল জুটে?
রাতুল-চরণ ক্ষালয়ে জলধি,
পূত-নীলনীর আনি,—
তোমারি চরণ,—মানি!
মা গো মানস-সরসে অচ্ছোদ উরসে,
পদ্মো-পত্রে চারুগাঁথা!
কোমল বিমল তোমারি আসন,
রয়েছে কেমন পাতা!
সুগিত মরাল নিতি কেলি ক'রে,
মৃণাল তুলিয়া খায়;
সুনীল গগণে তারকার মালা,
মিটি মিটি মিটি চায়!
আকুল পরাণ কা'র পদে চায়
লুটাইতে নিরন্তর,—
তোমারি চরণ'পর!
পরবাসে ভ্রমি চাই পূজিবারে
তোমার পবিত্র-ভূমি!—
তপ্ত উষ্ণ অশ্রু দিব উপহার
তোমার চরণ-চুমি!
তব তরে মন সদা উচাটন,
তব দরশন লাগি;
দূরে রাখি সদা হই গো সকলে
বিষম-বিষাদ-ভাগী!

তাই আপনা ভুলিয়া, ছাড়িয়া বৈভব,
সকলি ত্যজিতে চায়!—
শুধু তোমারে যদি সে পায়!

কত সুকবি তোমাকে দেয় উপহার,—
রুচির ভাবের মালা;
কিন্তু আমি অকিঞ্চন— আছে মাত্র মোর
অশ্রুসিক্ত হৃদি-জ্বালা!

শুধু সন্তান ভাবিয়ে লও মা জননি!
অভাগার উপহার;—
সেই জ্বালায় গ্রথিত উষ্ণ-অশ্রুমালা,
কি আছে বল গো আর?

ধর অশ্রুবিন্দু মোর রাতুল-চরণে,—
জুড়াক জীবন-জ্বালা!
পর পাদপদ্মে অশ্রুমালা!

হিন্দুসমিতি, চুঁচুড়া। শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

গণেশ মামা।

বিজাতীয় শিক্ষার দোষে আমরা অনেক জিনিস হারাইয়াছি ও হারাইতেছি। কত দিকে কত যে কি হারাইয়াছি তাহার তালিকা করা দুরূহ কার্য্য। আজ উহার ভিতর একটা মাত্র জিনিসের কথা বলিব। আমরা অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে এমন যে আমাদের গণেশ মামা তাহাকেও হারাইয়াছি। কথাটা ভাল করিয়া বলিতে হইলে আগে গণেশ মামার বর্ণনাটা দরকার। গণেশ মামা জাতিতে ডোম, আমাদের প্রতিবাসী, ঠিক আমাদের পাশ

ছিল না, তবে আমাদের প্রজাদের আত্মীয়। গণেশ মামার আকৃতি বর্ণনা না করিলে তাহার প্রকৃতি ভাল বুঝা যাইবে না। তাহার দেহ খর্ব্বাকার তবে এত খর্ব্বাকার নয়, যে তাহাতে তাহাকে কিছু একটা বিকৃত মনুষ্য বলিয়া মনে হইবে। বেশ গোল গাল, হৃষ্ট পুষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তন্মধ্যে উদর দেশ অপেক্ষাকৃত কিছু বিশেষ পুষ্ট, তাহার উপর বাল্যকালে প্লীহা যকৃতের নির্য্যাতনে গোটাকতক শিল মোহরের ন্যায় দাগও ছিল। রংটা খুব কাল নয়, চলনসহি শ্যামবর্ণ। শ্যামবর্ণ বলিতে প্রকৃতপক্ষে যাহা বুঝায় তাহা নহে, তবে সাধারণতঃ লোকে যাহাকে শ্যামবর্ণ বলে গণেশ মামার রংটা তাহাই, তবে তাহাকে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলা যায় না। তাহা তিনি আমার গণেশ মামা হইলেন ত কি হইল? গণেশ মামার সদাই প্রফুল্লানন। কখনই তাঁহাকে বিশেষ চিন্তিত বা দুঃখিত হইতে দেখা যাইত না। সদাই সহাস্য বদন। আমরা যে সময়ে তাঁহাকে দেখিয়াছি তখন যৌবন ছাড়াইয়া গিয়াছে। আমার আন্দাজে বোধ হয় আমাদের জ্ঞান হইয়া তাঁহাকে অন্যূন চল্লিশ বৎসর বয়স্ক দেখিয়াছি পরে আমরা যেমন বড় হইয়াছি সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও বয়স অবশ্যই বাড়িয়াছে, কিন্তু বড় একটা তাঁহার শারীরিক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইত না। একই রকম তাঁহাকে প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়। সেটা আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম সন্দেহ নাই। মামার বরাবরই কাল কাল চুল ছিল, তবে তাহা তত ঘন নয়। এইত গেল তাঁহার শারীরিক আকৃতি। এখন একবার তাঁহার পরিবারিক অবস্থাটার সমালোচনা করা যাউক। পরিবার মধ্যে তাঁহার এক মাত্র স্ত্রী, পুত্র কন্যা কিছুই ছিল না। বোধ হয় মোটেই হয় নাই। তবে তাঁহার যত্ন করিবার পাত্র অনেক ছিল। কয়েকটা বিড়াল ও কুকুর ছিল, তাহা লইয়া গণেশ মামা সদাই ব্যস্ত। তাঁহার আত্মীয় কুটুম্বগণ শূকর পুষিত, কিন্তু তিনি তাহা করিতেন না। তাহাদিগকে অপবিত্র জ্ঞান করিতেন কিনা জানি না। আর তাঁহার পরিবারভুক্ত সমস্ত ডোমপাড়া, কেবল ডোমপাড়া কেন, ভদ্রপল্লীর এমন কেহ ছিল না, যাহাকে গণেশ মামা নিজ পরিবারভুক্ত মনে না করিতেন, অথবা যিনি গণেশ মামাকে নিজ পরিবারভুক্ত মনে না করিতেন। গণেশ মামা বিশেষ কোন কার্য্য করিতেন

না। অথচ তাঁহার অবকাশ বড় কম ছিল। তাঁহার সংসার চালাইতেন তাঁহার স্ত্রী। তিনি সূতিকাগৃহে ধাত্রীর কার্য্য করিতেন এবং বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতেই তাঁহাদের দুইজনের, মায় কুকুর বিড়াল সকলের সচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। গণেশ মামা নিজ আত্মীয় কুটুম্বগণকে বড়ই ভালবাসিতেন, কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা তিনি উচ্চ জাতীর সহিত থাকিতে ভালবাসিতেন। বোধ হয় বহুকাল হইতে ভদ্রলোকের সংসর্গে থাকিয়া তাঁহার কথাবার্ত্তা, আচার ব্যবহার বড়ই ভাল হইয়াছিল। এমন কি হঠাৎ তাঁহার কথা বার্ত্তা শুনিলে তাঁহাকে কেহ ডোম বলিয়া বুঝিবার যো ছিল না। সময়ে সময়ে পুরাণের আখ্যায়িকা দুই একটাও বলিতেন, এবং কখন কখন এক আধটা সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

এত কথা বলিলাম, কিন্তু এখনও গণেশ মামার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হইল না। গণেশ মামা আমাদের সকলকে বড় ভালবাসিতেন, আমরাও তাঁহাকে বড় ভালবাসিতাম। এক দিন এইরূপ বর্ষার দিন আমরা দুই সহোদরে ভিজিতে ভিজিতে বিদ্যালয় হইতে তাঁহার কুটীরের সম্মুখ দিয়া বাটী আসিতেছিলাম। বৃষ্টি তত বেশী নয় কিন্তু আমাদের গাত্রে যাহা কিছু বস্ত্রাদি ছিল তাহা দ্বারা পুস্তকাদি বেশ করিয়া জড়াইয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে যাইতেছিলাম। ভিজিতে যে একটু আমোদ হইতেছিল সে কথা বলা বাহুল্য। ছাতা আমাদের সঙ্গে ছিল না। এই অবস্থায় যেমন গণেশ মামার ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি, অমনি গণেশ মামা ঘরের দাওয়া হইতে গুরু গম্ভীর স্বরে ধমক দিয়া ডাকিলেন, আমরাও বিনা বাক্য ব্যয়ে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। তাঁহার কথার অবাধ্য হইবার আমাদের সামর্থ্য ছিল না। আমাদের বস্ত্রাদি সমস্ত ভিজিয়া গিয়াছে তাহার উপর বিদ্যালয়ের ফেরত উদরানলও প্রজ্বলিত, গণেশ মামা তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন, করেন কি? ছেলেদের কষ্ট দেখিলে তিনি বড়ই কষ্ট বোধ করিতেন। কিন্তু তাঁহার একটী মাত্র তাল পাতার টোকা সম্বল, তিনি আমাদের দুই ভাইকে সেই টোকাটী দিয়া, নিজে গামছা মাথায় দিয়া এবং আমাদের ভিজা জুতা প্রভৃতি লইয়া সঙ্গে সঙ্গে বা

পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া দিয়া আসিলেন। এইরূপ যত্ন যে সেই একদিন মাত্র করিয়াছিলেন তাহা নয়, ইহা তাঁহার নিত্য ক্রিয়া ছিল। রাত্রিতে লণ্ঠন দিয়া বাটীতে পঁহুছিয়া দেওয়া তাঁহাকে প্রতিনিয়তই করিতে হইত। আমাদের সকলের বিশেষতঃ বালকগণের কষ্ট দেখিলে, তাঁহার বড় কষ্ট হইত। তিনি তাহারই জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। আমাদের কোথাও কাহার নিমন্ত্রণ থাকিলে, গণেশ মামা নিশ্চয়ই সঙ্গী হইবেন। ছাতা জুতার তত্ত্বাবধান করা তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। তিনি বলিতেন তোমাদের জুতার দিকেই মন পড়িয়া থাকে, স্বচ্ছন্দে আহার করিতে পার না। সে ভাবনাটা তোমাদের না থাকে তাহা আমি দেখিব। পরে আমাদের ভুক্তাবশিষ্ট আহার্য্য তাঁহাকে দিলেই তিনি পরম সন্তুষ্ট। এইরূপে যখন তিনি কোন কর্ম্মবাড়ী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন, বিস্তর আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেন, তাহা যে তিনি সস্ত্রীক ভোজন করিতেন বা কেবল কুকুর বিড়ালকে খাওয়াইতেন তাহা নহে। সমস্ত ডোমপাড়ার আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকে বণ্টন করিয়া ভোজন করাইতেন। তিনি বলিতেন আমি এমন করিয়া না আনিলে ইহারা ভদ্রলোকের ভাল খাদ্যের আস্বাদ জানিবে কেমন করিয়া। গণেশ মামা আমার স্বর্গীয় মাতামহ মহাশয়কে ছোট খুড়া বলিতেন, কাজেই আমাদের মাতুল হইতেন। সময়ে সময়ে আসিয়া আমাদের বাটীতে কে কেমন আছে জানিয়া যাইতেন ও তাঁহার ছোট খুড়ার সহিত আলাপ করিতেন। প্রতিবাসী সকলের সঙ্গেই তাঁহার এই ভাব। সকলেই তাঁহাকে আত্মীয় মনে করিতেন এবং তিনিও সকলকে আত্মীয় মনে করিতেন। আমাদের এই পরম প্রীতিভাজন গণেশ মামা আর নাই। গণেশ মামার দেহাবসান হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে দেখিতেছি, গণেশ মামার ভাবেরও অভাব হইয়াছে। আর সমাজ মধ্যে সে পরস্পর আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব বা প্রীতি কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। সে প্রতিবাসীর ভালবাসাটুকু একেবারেই লোপ পাইয়াছে। সে গণেশ মামা, সে ভুলে মাসী, সে কৈবর্ত্ত কাকা, সে কামার দাদা, সে তাঁতি পিসী সকলেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এখন বাঁচিয়া আছেন জনকয়েক মায়া মমতা শূন্য, স্বার্থান্বেষী বাবু ও তাঁহাদের পরিবারবর্গ। এই যে সামাজিক বিপ্লব ঘটিল ইহার জন্য

দায়ী কে? কাহার দোষে এ সদ্ভাবের অভাব ঘটিয়াছে? চিরন্তন প্রথানুসারে দোষ পরের স্কন্ধে চাপাইতে পারিলেই আমরা নিশ্চিন্ত হই, শুধু নিশ্চিন্ত কেন একটু সুখীও হই, তাই বলি এটা অপর জাতীয় লোকের সংস্পর্শ দোষে, বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে ঘটিয়াছে; যেন আমাদের নিজের কোন দোষ নাই। বৈদেশিক পণ্ডিত বলিতেছেন যাহাদের ভিতর এত জাতিভেদ তাহাদের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্দ কেমন করিয়া আসিতে পারে, ব্রাহ্মণেরা চির দিন প্রাধান্য করিয়া আসিয়াছেন, তাহা সমাজ আর কত দিন সহিবে, সেই জন্য অপর জাতিরা এক্ষণে মাথা তুলিয়াছে, ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করে না, কাজেই পরস্পরের ভিতর সদ্ভাবের বিলয় ঘটিতেছে। কথাটা কি ঠিক? ব্রাহ্মণ প্রাধান্য করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সে কিসে? বল বীর্য্যে নয়, ধন ধান্যে নয়, সুখ সম্পদে নয়, ভোগ বিলাসে নয়। ব্রাহ্মণ চিরদিন নির্বীর্য্য, নিরীহ, গরিব, দুঃস্থ ও ত্যাগী। তবে সেকালেও দুই একটা ব্যাভিচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন এখনও আছেন সংখ্যায় বাড়িয়াছেন মাত্র। ব্রাহ্মণের প্রাধান্য, জ্ঞানে। সে যাহা হউক ব্রাহ্মণ কখন কাহাকেও অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা করিয়াছেন কি? কখন কাহারও প্রতি স্নেহ মমতা শূন্য ব্যবহার করিয়াছেন কি? কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন কি? তবে গরিব ব্রাহ্মণের উপর সকল দোষ আরোপ করিলে চলিবে কেন। দোষ এখনকার স্বার্থপরতাযুক্ত ইংরাজী শিক্ষিত লোকের। ইহারা কেমন এক রকম স্ব স্ব প্রধান ভাবে চলেন তাহাতে সমাজে শৃঙ্খলাও থাকে না বন্ধনও থাকে না। বৃদ্ধ প্রতিবাসীকে যদি গুরু লোক বলিয়া না মানিবে তিনি তোমাকে স্নেহ করিবেন কেন? বিচারালয়ে দেখিলাম এক জন প্রতিবাসীকে অপর প্রতিবাসীর সন্তানগণ জ্যেষ্ঠতাত বলেন, হাকিম মহাত্মা তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইহাদের ভিতর অবশ্যই একটা কিছু সম্পর্ক আছে, নচেৎ পরের ছেলে জ্যেঠা মহাশয় বলিবে কেন? এ বিজাতীয় ভাব এখন অনেকের মস্তিষ্কাধিকার করিয়াছে। ইহা একটা শোচনীয় ব্যাপার। ইহার ফল বড়ই বিষম। যাহাদের দেখিয়া আমরা এই সামাজিক ব্যবস্থা শিখিতেছি তাহারা ভিন্ন ধাতুর লোক। তাহারা বড় ভাইকে দাদা বলে না, নাম করিয়া ডাকে, বড় ভগ্নীকে দিদি বলে না, নাম ধরিয়া ডাকে। ছেলে বেলা যখন

নিতান্ত নাচার, বাপকে বাবা বলে, কিন্তু একটু বয়স হইলেই বাপ শাসন কর্ত্তা হইলেন ও মাতা ধাত্রীর স্থান পাইলেন। আর ভাই ভগ্নী পিতা মাতার পরিবার মধ্যে ত স্থান নাই। আমরা কি সেই স্বার্থাবদ্ধ জাতির অনুকরণে আমাদের মন সংকীর্ণ করিব। না আমাদের পল্লীবাসীকে জাতি নির্ব্বিশেষে আমাদের আপনার করিব, পরে যতই বয়স অধিক হইবে, প্রীতির প্রসার হইবে, হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত হইবে, ক্রমে গ্রাম শুদ্ধ লোককে আপনার বলিয়া, পরে সমস্ত স্বদেশবাসীকে আপনার বলিতে পারিব। বোধ হয় এই ভাবের চরম সীমা সমস্ত জগৎকে আপনার করা এবং তৎপরে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আত্মার সহিত নিজের অভেদ জ্ঞান। যাহা হউক কিন্তু এই সদ্ভাব শিক্ষার প্রথম পথ সেই গণেশ মামা।

আজ কাল অনেকের মুখে দেশী বা স্বদেশী ভাবের কথা শুনিতে পাই। কিন্তু সকল স্বদেশীর ভিতর স্বদেশী মনটা বড় ভালবাসি, স্বদেশী জিনিস অপেক্ষা স্বদেশী হৃদয়টা বড় প্রীতিপ্রদ। তাই ভাবিতেছি—এই স্বদেশী আন্দোলনের ফলে যদি আবার আমার সেই গণেশ মামাকে পাই তাহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কিছুই নাই। প্রাণ খুলিয়া অকপটে স্বার্থশূন্য হইয়া প্রতিবাসীকে, স্বদেশবাসীকে ভালবাসিতে যিনি পারেন, তিনিই প্রকৃত স্বদেশী বা দেশভক্ত। আজ কাল আমাদের সমাজ নাই বলিলেই হয়, পূর্ব্ব সমাজের ভগ্নাবশেষ যাহা আছে, তাহার মাল মশলা লইয়া এই স্বদেশী-ভাবে আবার সমাজ করিতে পারিলে, বোধ হয় আমরা আবার আমাদেরই পূর্ব্ব মত হইব। এখনকার যুবকগণ যদি প্রতিবাসীকে জাতি ও অবস্থা নির্ব্বিশেষে আপনার বলিয়া মনে করিতে শিখেন, তাহা হইলেই মঙ্গল। ইহার কিন্তু একটা অন্তরায় আছে। সেটা ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজ শিক্ষক। ইংরাজী শিক্ষায় পরস্পর অধীনতাটা ভারি খারাপ জিনিস, স্বাধীনতাটা পাওয়া চাই শিখাইতেছেন, এবং ইংরাজী শিক্ষা চক্ষে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন তোমরা কিসে অপর অপেক্ষা ছোট, বৈদ্য ও কায়স্থের ভিতর, শূদ্রমাত্রেরই ভিতর কেমন একটা বিরোধ ঘটাইতেছেন, সকলেই প্রাধান্য লাভের আশায় উত্তেজিত, ফলে হৃদয়ের সদ্ভাব নষ্ট হইতেছে। ইংরাজ-রাজ এখনও বুঝিতেছেন না, যে তাঁহাদের এই কুশিক্ষার

ফল কতদূর গড়াইবে। আজ প্রতিবাসীকে মানিবে না, কাল পিতা মাতাকে মানিবে না, তার পর যে শাসনকর্ত্তাকে মানিবে না এমন কি ঈশ্বর পর্য্যন্ত মানিবে না তাহার ইহা অঙ্কুর মাত্র। সেই জন্য বলি আবার আমার গণেশ মামার মৃত দেহে জীবন সঞ্চার করাইয়া দেশ ভক্তির ভাবটা পুনরুজ্জীবিত করিলে হয় না?

শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

সমালোচনা।

বৈশাখে পূর্ব্ব "বৎসরের কথা" বলিবার অবসরে, আমরা কয়েকখানি মাসিক পত্রের সমালোচনা করি। বলিয়াছিলাম, "সুখের বিষয় এই যে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্য বাঙ্গালায় পাঁচ সাত খানি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইতেছে। মহাজন বন্ধু অনেক দিন হইতে চলিতেছে। * * সাধারণত দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইয়া থাকে"।

মহাজনবন্ধু আমরা আষাঢ় পর্য্যন্ত পাইয়াছি। সম্পাদক পাকালোক তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে কোন কোন প্রবন্ধে একটু আত্মম্ভরিতার ছায়া আবার কোথাও বিশেষ অনবধানতা দেখা যাইতেছে। সম্পাদক ফাল্গুন চৈত্রের খণ্ডে বালকগণকে 'উদ্দেশ্য স্থির করিতে' পরামর্শ দিয়াছেন। বড় ভাল কথা। এই সংখ্যায় আর এক স্থানে বলিয়াছেন "ব্যবসা ও বাণিজ্য এক কথা নহে। স্বদেশে বা ঘরে দোকান করাকে ব্যবসায় বলে, জাহাজে পণ্য দ্রব্য বোঝাই দিয়া তাহা বিদেশে লইয়া গিয়া বিক্রয় করাকে বাণিজ্য বলে।" চাষ এবং ব্যবসায় করিলে, "পরমায়ু বৃদ্ধি, জীবন-সংগ্রাম নাই, অল্পে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। ইহাতে "দেশের অবস্থা হীনপ্রভ হইবে, বন্দর থাকিবেনা, পল্লীগ্রামের মত দেশ হইবে। আর বাণিজ্যে,

বিলাস আছে; টাকা আছে * * ভয়ানক জীবন সংগ্রাম, কেবল 'নাই' 'নাই' শব্দ, বাসনা অতিরিক্ত।" সম্পাদকের অবশ্য বাণিজ্যের দিকেই টান; তিনি বলেন, এই পন্থায় জ্ঞানের উচ্চ সীমায় যাওয়া যায়, চাষ ও ব্যবসায়ে জ্ঞান নাই।" এই শেষ কথাটা যদিও আমরা ঠিক বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু ও কথা লইয়া গোল তুলিব না। ধরিলাম, ঐরূপ ঐ দুই পন্থাই আছে। আমরা প্রবৃত্তি ও পাত্র বিশেষে, ঐ দুই পন্থাই কি অবলম্বন করিতে পারিনা? আমার বোধ হয়, সচ্ছন্দে পারি। মনে করুন, একদল যুবক মনে করে, যে আচার ধর্ম্মের অঙ্গ, মনে করে সন্তোষ ও শান্তি জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, মনে করুন, তাহারা আরও মনে করে, যে বিদেশে বাণিজ্য করিতে গেলে আচার ভ্রষ্ট কাজেই ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইতে হয়; তাহারা যদি জীবন সংগ্রামে ঝাঁপিয়া না পড়িয়া, অল্পে সন্তুষ্ট হইতে শিক্ষা করে, চাষ বাস ব্যবসায় করে, এবং শান্ত, শিষ্ট, ও দীর্ঘজীবী হয়,—তাহাতে বঙ্গদেশের ক্ষতি কি? বলিতে পার, তবে ও পন্থায় কে যাইবে? বাঙ্গালায় হিন্দুর অর্দ্ধেক মুসলমান, বিদেশে গিয়া বাণিজ্য করিতে মুসলমানের আচারে বাধে না; মুসলমান (বা ব্রাহ্ম) এই জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হউন, বাহির হইতে আনিয়া দেশের ধন বৃদ্ধি করিতে থাকুন, ঐরূপ উন্নতি তাঁহাদেরই হউক। দেশের অবস্থা হীনপ্রভ হইবে কেন, বন্দর গুলি উঠিয়া যাইবে কেন? বাস্তবিক হইতেছেও তাই। এই হুগলি জেলায়, বাব্‌নান্ ও জনাই অঞ্চলের মুসলমানেরা অষ্ট্রেলিয়ায় ব্যবসায় (খুড়ি! বাণিজ্য) করিয়া, বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। তবে আমাদের দেশের কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই শান্তি প্রয়াসী, তাই উহারাই আবার বৃদ্ধ বয়সে, চাষ করিতেছে, গ্রামে ব্যবসায় করিতেছে।

বাস্তবিক দেশ শুদ্ধ লোক জাতি, কুল, ধর্ম্ম, আচার খোয়াইয়া বিদেশে বাণিজ্য করিয়া দেশের ধন বৃদ্ধি কর, এ উপদেশ সমীচীন নহে। দেশ যখন আচারী, অনাচারী—উভয়েরই, তখন আচারবান্ হিন্দু সন্তান 'ভব ঘুরে' নাই হইল। ধন বৃদ্ধি করিতে না পারিয়া যদি শান্তি বৃদ্ধি করিতে পারে, তাহাতে দেশের মঙ্গল? না অমঙ্গল? শান্ত, শিষ্ট, সংযমী, অল্পে সন্তুষ্ট হইয়া, হিন্দু সন্তান যদি আপনার চাষবাস লইয়া, গ্রাম লইয়া, জেলা লইয়া

থাকে,—তাহা হইলে বাঙ্গালার শ্রী ফিরিয়া যাইবে; জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া, অস্বাস্থ্যকর জলে ভরিয়া, দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, এমন দিনে দেশের দিকে গতি মতি হইলে, দেশ রক্ষা হইবে; নাই বা হইল উন্নতি। উন্নতি আগে? না রক্ষা আগে? আগে রক্ষা হৌক, তবে উন্নতির কথা ভাবিও। তুমি বলিবে ধন বৃদ্ধি না হইলে, রক্ষা অসম্ভব; আমি তোমার কথায়,—তোমাকেই বলি, ধন বৃদ্ধি হইলে, নগর বন্দরের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, কলিকাতার বৃদ্ধি হইলে দেশের কি? আর ধন বৃদ্ধি কিছু আমরা বন্ধ করিতে বলি না; বলি কেবল, যাহার পন্থায় বাধে না, প্রবৃত্তিতে কুলায়, সে তাহাই করুক। কিন্তু যে সংযমী হইতে চায়, তাহাকে বিল্‌গ্রামী হইতে বলিবে কেন? তা বলিও না—ওরূপ উপদেশ জাতি নাশা, হিন্দুর সর্ব্বনাশা। হিন্দুর হিন্দুত্ব বজায় থাকিলে, সংযমীর সংযম থাকিলে, অল্পে সন্তুষ্টি থাকিলে, তবে জগতে শান্তি থাকিবে—নতুবা কেবলই 'নাই' 'নাই' আর মারামারি।

এই যে সকল কথা আমরা তুলিতেছি, এগুলি মহাজন বন্ধুর বিরোধে বলা নয়; মহাজন বন্ধু ইচ্ছা করিয়া এক পীঠ দেখাইতেছেন, আমরাও ইচ্ছা করিয়া অন্য পীঠ দেখাইলাম। ইহার পরে যে দুইটি কথা বলিতেছি, তাহা কিন্তু মহাজন বন্ধুর প্রকরণ পদ্ধতির বিরোধে। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'চাঁইবাসা' প্রবন্ধ—'বন্ধুর' কলঙ্ক। শেষের পাঁচ পংক্তি ছাড়া সমগ্র প্রবন্ধ পূর্ণিমা হইতে গৃহীত, কিন্তু অস্বীকৃত; আর যেখানে অদল বদল করিয়াছেন, সেখানে দেব গড়িতে বানর হইয়াছে। এটা সম্পাদকের ভয়ঙ্কর অনবধানতা। 'ভারত মহিলার' সমালোচনা করিতে গিয়া সম্পাদক হক্ না হক্ প্রবাসী সম্পাদককে গালি দিয়াছেন। ইহাতে বিষম রুচি বিকার প্রকটিত হইয়াছে; আর ভারত মহিলাকে প্রবাসী অপেক্ষা সকল বিষয়ে উৎকৃষ্ট বলায়, সত্যের অবমাননা হইয়াছে—তাহাতেই বলিতেছিলাম সম্পাদকের শুভ্র বসনের উপর, এইরূপ আত্মম্ভরিতার কৃষ্ণচ্ছটা কেন?

আমরা আষাঢ়ের ভারত মহিলা পাইয়াছি, রূপে গুণে মন্দ কি? তবে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে, "অসূর্য্যম্পশ্যরূপা" কত দিনের কথা?

বামাবোধিনী ৪৬ বর্ষ চলিতেছে, আমরা আষাঢ় সংখ্যা পাইয়াছি।

ভারতী বত্রিশ বর্ষ চলিতেছে। ইদানী ভারত মহিলা কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে। আমরা শ্রাবণ সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। ৫।৬ জন সম্ভ্রান্ত মহিলা, নিয়মিত লেখিকার মধ্যে। ভালই চলিতেছে। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার মহাশয় ভারতীতে বাঙ্গালার গীত কথা, তন্মধ্যে 'পুষ্পমালা' প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি যেরূপ কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। আষাঢ়ের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় ঠাকুমার ঝুলির যে পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা করিয়াছেন, দক্ষিণা বাবু যেন সেগুলি লক্ষ্য করিয়া আপনার গন্তব্য পথ স্থির করেন। আমাদের দেশের প্রাচীন গীত কথা বা রূপ কথা নিখুঁত হইয়া প্রকাশিত হয়, সংগ্রাহকের অবশ্যই সে ইচ্ছা আছে, সেই ইচ্ছা হইতে কার্য্যের পন্থা স্থির করণের জন্য আমরা ঐ অনুরোধ করিলাম।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে, যে ৫।৭ খানি মাসিক পত্র আছে—সে গুলি যে বেশ ভাল চলিতেছে, তাহা বোধ হইতেছে না। 'বঙ্গ লক্ষ্মী' বোধ করি উঠিয়া গিয়াছে।

স্বদেশীর শ্রাবণ সংখ্যা অবধি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু বৈশাখেও যেমন বলিয়াছি এখনও তাই দেখিতেছি। স্বদেশীতে প্রায় সমস্তই সাহিত্য প্রবন্ধ। জ্যৈষ্ঠে একটিমাত্র প্রবন্ধ অন্য রূপ আছে—"ব্যবসায় ও বাণিজ্য"। ইহাতে আমদানি শুল্ক রপ্তানি শুল্ক প্রভৃতির কথা আছে। একরূপ রাজনৈতিক প্রবন্ধ বলিলেই হয়। আষাঢ়ে 'পাত ও পলু' সম্বন্ধে ৩ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি প্রবন্ধ আছে মাত্র, আর শ্রাবণে ঐ পাতপলু ও পিপুলের প্রবন্ধ আছে। আর সমস্তই 'সাহিত্য'। এমনি করিয়া কি স্বদেশীর শ্রীবৃদ্ধি হইবে?

কমলার খ্যাতনামা লেখকদের কথঞ্চিৎ পরিচয় বৈশাখে দিয়াছি; কিন্তু লেখক থাকিলে কি হয়, মার্চ্চ পর্য্যন্ত কমলা মাত্র আমরা পাইয়াছি। কৃষি বাণিজ্যের মুখপত্র এত পিছাইয়া থাকিলে কৃষি বাণিজ্য অগ্রসর হইবে কি করিয়া?

কৃষক আষাঢ় পর্য্যন্ত। ভাল চলিতেছে বলিতে হইবে।

এই উপলক্ষে এই সময়ে একটা কথা বলিতে চাই। কৃষি শিল্প

বাণিজ্যাদি বিষয়ে কেবল সাধারণ ভাবে প্রবন্ধ না লিখিয়া, মধ্যে মধ্যে, কোন বিশেষ ক্ষেত্রের, বা কারখানার বা কারবারের বিবরণ দিলে ভাল হয়। অমুক, অমুক স্থানে ২০০ বিঘা জমি লইয়া চাস করেন, জমির খাজানা এত, সরঞ্জামি এত, মাসিক খরচ এত, প্রথম বৎসরে লোকসান, দ্বিতীয় বৎসরে, তথৈবচ—তৃতীয় বৎসরে খরচ উঠিল, সুদ পোষাইল না। এত টাকার অমুক কারবারে পরিদর্শনের অবহেলায়, চুরি হইল—কারবার নষ্ট হইল। এই সকল কার্য্যে এখন লাভের অপেক্ষা লোকসান বেশী; তা বলিয়া দমিত হইবে না। তবে লোকসানের ইতিহাস রাখিতে হইবে, নতুবা শিক্ষা হইবে কি করিয়া। বাঙ্গালিকে অগত্যা যখন কৃষিতে যাইতে হইবে, তখন কৃষির ক্ষতির ইতিহাস দিন থাকিতে শিক্ষা করা ভাল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধর্ম্ম ও দর্শনের দিকে যেন বাঙ্গালির একটু খর দৃষ্টি পড়িয়াছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিসনের পত্র উদ্বোধন। থিয়সফির পত্র পন্থা। ভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের মাসিক মুখপত্র ধর্ম্মপ্রচারক। ধর্ম্মপ্রচারক আটাইশ বৎসরের কাগজ, এখন ভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের মুখপত্র হইয়াছেন।

উদ্বোধনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত প্রতি সংখ্যায় থাকে। থাকাই চাই। আর ও বেশী বেশী থাকিলে ভাল হয়। ও সুধামাখা কথা যত অধিক থাকে, ততই ভাল। অমন জীবনী ত আর দেখিলাম না। আমরা প্রবৃত্তি বশে, এই পঞ্চাশ বৎসরে বহুতর ভদ্র অভদ্র,—শিক্ষিত, অশিক্ষিত,—গৃহী, সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পরিচয় পাইয়াছি; কিন্তু পরমহংসদেবের মত মানব দেখি নাই। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হওয়াতে, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল, (বা চিরঞ্জীব শর্ম্মা) ব্রাহ্ম মহাশয়ের কৃপায়, এক দিন আট ঘণ্টা কাল, পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ পাই, অর্দ্ধ ঘণ্টা আলাপ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা-তেই অধম-জীবন সার্থক মনে করিতেছি। এতটা সাত্ত্বিক ভাব, আর কোন মানবে দেখিয়াছি, মনে হয় না। তাঁহার কথামৃতচরিত নিয়ত নিস্যন্দিত হোক, এই উত্তপ্ত বঙ্গভূমিতে শান্তি দান করুক—ইহাই মনের বাসনা।

পন্থা আষাঢ় পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে শ্রীচৈতন্য দেবের কথা, রূপ সনাতন ও জীব গোস্বামীর কথা প্রতি সংখ্যাতেই প্রায় থাকে। এরূপ কথা সকল যত প্রচারিত হয়, ততই মঙ্গল।

ধর্ম্ম প্রচারক এখন ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের পত্র। ভারত ধর্ম্ম মহা-মণ্ডল আমাদের ভয়ের বিষয়। আমাদের ভয় বাড়িয়াছে All-India Deputation এ—ধর্ম্ম মহামণ্ডলে রাজনীতির চর্চ্চা কেন? ভয় বাড়িয়াছে চৈত্র সংখ্যার (তাহার পর আর পাওয়া যায় নাই) শুভ সংবাদে; শুভ সংবাদ কি জানেন—৺ কাশীধামে খরিদ বিক্রয়ে বড় প্রতারণা। যাহাতে কি কাশীবাসী জন সাধারণ, কি মফস্বল বাসী, কি স্থানীয় রহস্যানভিজ্ঞ যাত্রী বর্গ, কাশীবাসী ব্যবসায়ী দ্বারা প্রতারিত না হন, সেই উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম সভা সমিতি কার্য্য ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। কি সর্ব্বনাশ! এযে ব্যবসার বিজ্ঞাপন!! ভয় বাড়িয়াছে,—বর্ণ নির্ণয় প্রবন্ধে। কেন বলিতেছি। বঙ্গের কায়স্থ বঙ্গের ব্রাহ্মণের সেবক অথচ রক্ষক; এই মোটা কথাটা কায়স্থ ব্রাহ্মণ উভয়েই ভুলিয়া যাওয়াতে বাঙ্গালায় বিষম বিড়ম্বনা উপস্থিত। প্রবন্ধে সেই বিড়ম্বনা বৃদ্ধি পাইয়াছে; তাহাতেই আরও ভয়।

হিন্দুপত্রিকা। মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা। বৈশাখে বলিয়া-ছিলাম সাময়িক সাহিত্যে ধর্ম্ম চর্চ্চা যথেষ্ট হইতেছে, কিন্তু যে ভাবে হওয়া উচিত, সে ভাবে যেন হইতেছে না। এইবার হিন্দুপত্রিকা হইতে একটী উদাহরণ দিতেছি। শাণ্ডিল্য সূত্র প্রবন্ধে, দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যায় লেখক বলিতেছেন—"ঈশ্বরে পরা—অর্থাৎ অত্যন্ত অনুরক্তিকেই ভক্তি বলে।" এই ব্যাখ্যা ভুল। লেখক, ভবদেব কৃত ভাষ্য দেখিলেই বুঝিবেন। আমরা যে প্রাচীন টীকা ভাষ্য না দেখিয়া শাস্ত্র বুঝিতে যাই—সেইটাই আমাদের ভুল।

কদমতলা, চুঁচুড়া শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস* ।

যাঁহার "নবজীবন"—মৃত হিন্দু-সমাজের অস্থিরাশিতে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছিল, বঙ্গসাহিত্যের সেই বরেণ্য মহাপুরুষ—একদিন আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—"ভারতবাসী ভারত কাহাকে বলে তাহা জানে না, বোঝে না, ভাবে না। ভারতবর্ষ—ভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। দেখিবার বস্তু বটে ! কিন্তু আমরা ভারত-সন্তান, এ হেন ভারত আমরা দেখি নাই, দেখি না। * * দেখিবার সামগ্রী বটে—কিন্তু আমরা দেখিলাম না।"

বাস্তবিক—অন্তঃসারশূন্য, নির্লক্ষ্য, আপাতভোগতুষ্ট, ভাবিদর্শন বিরহিত, স্বার্থ মোক্ষ জড়পিণ্ড ভারতবাসী—ভারতের কিছুই দেখিল না ! দেখিল না বলিয়াই, আজ তাহারা 'চাষ ছাড়িয়া দাস' সাজিয়াছে ! ভারতবাসী—ভারত বুঝিল না বলিয়াই, সার্ব্ববর্ণিক বিদ্যা চর্চ্চাতেও—আজও তাহাদের দুঃখ ঘুচিল না ! ভারতবাসীর অযত্নেই—ভারতের "শাল-তমাল-তাল-সঙ্কুল-ঘন-বিজন-কানন" আজ ছিন্নভিন্ন ; "ধীর-গম্ভীর-প্রবাহ-ধার-নদ-নদী" জন্মের মত মজিয়া গিয়াছে ! "সদাব্রতের ভাণ্ডার" হইতে লক্ষ্মী কাঁদিয়া চলিয়া গিয়াছেন ! সেই "অনন্ত কোটি জীবের বিচরণ স্থল—বিংশতি কোটি মানবের আবাস ভূমির" কক্ষে কক্ষে, অন্ধকার ও বিজনতা—উভয়ে মিলিয়া মরণের ধ্যান করিতেছে !

ভারতের এই অধঃপতনের দিনে—দুঃখ দুর্গতির এই শোচনীয় সময়ে, তবে আবার "আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস" লিখিতেছি কেন ? এই বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য সুবর্ণময় যুগে, বৈদিক ঋষিদের কথা—যাঁহাদিগকে তোমরা 'হটেনটট্' বা সাঁওতালের মার্জ্জিত সংস্করণ মনে কর—সেই বৈদিক ঋষিদের কথা হয়তো তোমাদের ভালই লাগিবে না। কিন্তু, তবুও বহুদিনের পুরাতন অনাদৃত আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস আজ তোমাদের শুনাইতে চাই !

ঐ দেখ—ভারতের উদাসীন, অনুতপ্ত, হতভাগ্যসন্তান—অনেক দেশে

---

* এই প্রবন্ধে যে সকল মহাত্মার গ্রন্থ হইতে সাহায্য পাইয়াছি, উপসংহারে তাঁহাদের নামের উল্লেখ করিব।

ঘুরিয়া, অনেক দ্বারের লাঞ্ছনা সহিয়া, শ্রান্ত দেহে, মলিন মুখে, আবার মাতৃমন্দিরের সিংহদ্বারে ফিরিয়া আসিয়াছে! আরতো তাহাদের জন্য পুরদ্বারে তূর্য্যধ্বনি হইবে না। আরতো পুরবালাগণ জলের ঝারি দিয়া তাহাদের বরণ করিতে আসিবে না। তাই, এই মঙ্গল শঙ্খ বাজাইয়া আমরাই তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছি।

তবে এসো—ভাই! মায়ের ছেলে মায়ের ঘরে ফিরে এসো। এত দিন যে মায়ের কোল ছাড়িয়া, অনির্দ্দিষ্ট পথে—চলিয়া গিয়াছিলে, তোমাদের সেই মা—জরাজীর্ণ দেহে—বুক ভরা স্নেহ লইয়া এখনো তোমাদের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। তোমাদের অক্ষয় রাজভাণ্ডার—এখনো অনন্ত রত্নে পূর্ণ! এখনো কতকগুলি তালপত্রের কীটদষ্ট পুঁথি, 'যক্ষে'র মত, তোমাদের অমূল্য সম্পত্তি রক্ষা করিতেছে! তোমাদের সমস্ত ঐশ্বর্য্যই এখনো অবিকৃত, কেবল অনেক দিনের অনাদরে বিপৃঙ্খল। যদি পরিত্যক্ত ভদ্রাসনে আজ আবার ফিরিয়া আসিয়াছ, তবে এসো ভাই! পুরাতন ঘরকন্না আবার আমরা গুছাইয়া লই। "রত্নমালিনী রাজপুরী" আমাদের আনন্দ উৎসবে, অহল্যা পাষাণীর মত আবার প্রাণময়ী হইয়া উঠুক!

স্বদেশীকে পূর্ব্বতন মহত্ত্বের কথা বুঝাইতে গেলে, আয়ুর্ব্বেদের কথা পাড়িতে হইবে। কেন না, আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস—আমাদের উন্নতির ইতিহাস—সভ্যতার ইতিহাস। আয়ুর্ব্বেদ শুধু চিকিৎসা শাস্ত্র নয়, আয়ুর্ব্বেদ—জড় ও জীবশক্তির সামঞ্জস্য। কিন্তু, কি দুঃখের বিষয়, আর্য্য ঋষির অতুলনীয় মহাকীর্ত্তি—এমন যে অমূল্য আয়ুর্ব্বেদ—তাহা আমরা সম্পূর্ণ বরবে দেখিতে পাইলাম না। আয়ুর্ব্বেদ—এখন ঐশ্বর্য্যপুরীর ভগ্নমন্দির মাত্র। সেই ভগ্নাবশেষ দেখিয়াও, পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে ভারতের আয়ুর্ব্বেদ এখনো অপরের কাছে অনমনীয় ও অপরাজেয়!

পরার্থপরতা ও সর্ব্বজন হিতৈষিতা—আর্য্য জীবনের একটী অপূর্ব্ব লক্ষণ। ইহাতেই আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি। আয়ুর্ব্বেদ তরঙ্গময় মহাসমুদ্র, হ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, টিস্যু রেমিডি,—এ সমুদ্রে জগতের যত চিকিৎসার ঢেউ আছে। আয়ুর্ব্বেদ—বেদ বলিয়া অনন্তকালব্যাপী। আমরা এ সকল কথা একে একে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

ইংরাজীতে যাহাকে History বলে, ঋষিরা 'ইতিহাস' বলিতে ঠিক্ তাহাই বুঝিতেন না। তাঁহাদের মতে—

ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাণামুপদেশ সমন্বিতং।
পূর্ব্ববৃত্ত কথাযুক্ত মিতিহাসং প্রচক্ষ্যতে॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপদেশ সমন্বিত পুরাবৃত্তের নাম ইতিহাস। এই জন্য "রামায়ণ" ও "মহাভারত" কাব্য হইলেও ইতিহাস। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মূল—আরোগ্য। আরোগ্যই আয়ুর্ব্বেদের অবলম্বন। এই জন্য "আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস" বলিয়া, এ প্রবন্ধের নামকরণ হইল।

বৈদিক, ব্রাহ্মণ, আচার্য্য, বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক, আয়ুর্ব্বেদের এই পাঁচটী অবস্থা। আমরা একে একে—আয়ুর্ব্বেদের এই পাঁচটী অবস্থাই দেখাইব। এবং তান্ত্রিক ও বৈদিক ভেদে—যতগুলি আয়ুর্ব্বেদীয় সংহিতার এখনো প্রচলন আছে, তাহাদের পরিচয় দিব। সাধ্যমত প্রত্যেক গ্রন্থের সংক্ষেপে সমালোচনা করিব। প্রাচীন বৈদ্যগণের সাহত, আধুনিক কবিরাজদের তুলনা করাও আমাদের গৌণ অভিপ্রায় থাকিল।

দয়াতেই আয়ুর্ব্বেদের জন্ম, দয়াতেই আয়ুর্ব্বেদের প্রসার, দয়াতেই আয়ুর্ব্বেদ পরিপুষ্ট। এ সম্বন্ধে প্রথমেই একটী গল্প বলিব।

পবিত্র তপোবনে, আশ্রম তরুতলে, ধ্যান-স্তিমিত লোচনে একজন ঋষি বসিয়াছিলেন। ঋষি যে বৃক্ষ তলে বসিয়াছিলেন, সেই বৃক্ষের শাখায় একটী বন-বিহঙ্গ বসিয়াছিল। পাখী নিজের মনে নিজের ভাষায় গাহিতেছিল—

"কোইরুক্"——

অনেক সময়ে পাখীর ডাক শুনিলে বোধ হয় পাখী যেন কথা কহিতেছে। পাপিয়া অভ্যস্ত স্বরে যখন আলাপ করে, মনে হয় সে যেন "চো'খ গেল" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। এক রকম হরিদ্রা বর্ণের পাখী—"বৌ কথা কও" বলিয়া ডাকে। বাস্তবিক, পাপিয়া কি চক্ষের বেদনায় কাতর হইয়া ঐরূপ রোদন করে? না, 'বৌ কথা কও' পাখী—নববধূর লজ্জানম্রমুখের একটী কথা শুনিবার জন্য "বৌ কথা কও" বলিয়া—সাধ্য সাধনা করে? উহাদের স্বরই ঐ রকম। আমরা কেবল—"চো'খ গেল" বা "বৌ কথা কও"

কল্পনা করিয়া লইয়াছি বৈ ত নয়! তাই বনের পাখী যখন আপন মনে ডাকিতেছিল, তখন ঋষি মনে করিলেন—কে বুঝি তাঁহাকে প্রশ্ন করিতেছে—"কোইরুক্"? অর্থাৎ ইহজগতে নীরোগী কে? ঋষির প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন—"আহা! জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী—কোন্ মহাপ্রাণ—আজ আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন—কোইরুক? যাহাহউক—এ সারগর্ভ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইতেছে। পাখী আবার ডাকিল——

"কোইরুক্"?

ঋষি উত্তর দিলেন——"হিতভুক্"। যে ব্যক্তি হিতজনক আহার বিহারের সেবা করে, সেই নীরোগী হইতে পারে। কিন্তু বনের পাখী আবার ডাকিল——"কোইরুক্"? পাখীর ডাক শুনিয়া প্রথমেই ঋষির মনে হইয়াছিল—এই "কোইরুক্" শব্দটীর ভিতর জগজ্জীবের কি গুরুতর সমস্যাই রহিয়াছে! তাই তিনি 'হিতভুক' বলিয়া তাহার উত্তর দিয়াছিলেন। পাখী আবার যখন ডাকিল—"কোইরুক্" ঋষি কিছু বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের হয়তো ঠিক উত্তর হয় নাই। তাই তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন। শুধু হিতজনক আহার করিলেই নীরোগী হওয়া যায় না। আহার যদি অপরিমিত হয়, তাহা হইলে ত রোগ জন্মিতে পারে। অতএব 'হিতভুক্' হইলেই শুধু চলিবে না, আহারের একটা পরিমাণ থাকা চাই। কোইরুক্? 'মিতভুক্'। পাখীর প্রশ্নে—ইহাই ঋষির উত্তর। কিন্তু এবারও দুষ্ট পাখী আবার মধুর কণ্ঠে মুক্ত পবনে তরঙ্গ ছুটাইয়া, নাচিতে নাচিতে গাহিল কোইরুক্?

ঋষি বুঝিলেন—এবারও তাঁহার উত্তর, প্রশ্নকর্ত্তার মনোমত হয় নাই। হিতজনক আহার, পরিমিত মাত্রায় ভোজন করিলেও চলিবে না। সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত পরিশ্রম করাটাও চাই। শারীরিক যন্ত্রের চলাচল না হইলে আহারীয় দ্রব্য জীর্ণ হইবে কেন? তাই, ঋষি এবার জলদ-গম্ভীর-স্বরে—কানন কম্পিত করিয়া উত্তর দিলেন—শ্রমোপভুক্ মশচ!

পাখী উড়িয়া গেল। এবারকার উত্তর অভ্রান্ত বুঝিয়া, ঋষিও ধ্যানমগ্ন হইলেন। দেখুন, এই সামান্য গল্পটীতে কি গভীর বৈজ্ঞানিক উপদেশ রহিয়াছে! আজ কাল অনেক বাঙ্গালীকেই আমরা অম্ল, অজীর্ণ, মেহ,

বহুমূত্র প্রভৃতি রোগে যে কষ্ট পাইতে দেখি, তাহার কারণ আর কিছুই নয়—ব্যায়াম বা পরিশ্রমের অভাব।

আগেকার লোকে—ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার জন্য—দীর্ঘ জীবন কামনা করিত। এই জন্যই—আয়ুর্ব্বেদীয় সংহিতাগুলি—"অথাতো দীর্ঘজীবিতীয় মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ" বলিয়া আরম্ভ হইয়াছে দেখিতে পাই। যে নীরোগী—সেই দীর্ঘজীবী। শরীর যাহাতে রোগশূন্য হয়—পূর্ব্বোক্ত পাখীর গল্পে তাহারই উপদেশ আছে। আমরাও ঐ গল্পটীকে—আয়ুর্ব্বেদের মূল ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

লোকে যখন ঋষিবাক্য অবহেলা করিল, তখনই তাহাদের দেহে—জীবনধ্বংসকারী ব্যাধি দেখা দিতে লাগিল। যেখানে দুর্ঘটনা—সেইখানেই তা'র প্রতিকার। স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা—আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োজনীয়তা বুঝিলেন। অথর্ব্ববেদের অংশ বিশেষ হইতে, তিনি স্বকীয় নামে লক্ষ শ্লোকময়ী একখানি আয়ুর্ব্বেদীয় সংহিতা রচনা করিলেন। এবং প্রজাপতি দক্ষকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দক্ষের শিষ্য হইলেন।

কোন সময়ে ভগবান শূলপাণি, ক্রোধবশে ব্রহ্মার শিরশ্ছেদ করেন, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ঐ ছিন্নমস্তক আবার যুড়িয়া দেন। এই চিকিৎসা নৈপুণ্য দেখিয়া, শচীপতি ইন্দ্র—অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। পুরাণে, এইরূপে আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল উপাখ্যান পড়িয়া আমরা দুইটী বিষয় বুঝিতে পারি। প্রথম—ব্রহ্মা আয়ুর্ব্বেদের উদ্ভাবক, সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ অত্যন্ত প্রাচীন। দ্বিতীয়—শাস্ত্রকর্ত্তার উৎকর্ষে শাস্ত্রেরও উৎকর্ষ,—আয়ুর্ব্বেদ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল মানব মস্তিষ্কের অসার কল্পনা নয়। পৌরাণিক গল্প ছাড়িয়া এইবার আমরা বৈদিক যুগের কথা বলিব।

আর্য্য দস্যু মধ্যে বিরোধ বৈদিক যুগের ঘটনা। এই যুদ্ধই "দেবাসুরের যুদ্ধ"। যুদ্ধে যা'রা আহত হইল, তাহাদের রক্ষা কল্পে—শল্যতন্ত্র বা Surgeryর প্রথম উৎপত্তি হইল। মহর্ষি সুশ্রুতও বলেন—দেবাসুরের যুদ্ধেই অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্ত্তৃক অস্ত্র-চিকিৎসা প্রণালী প্রথম উদ্ভাবিত হয়।

এই সময়ে, ভগবান আত্রেয় অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কাছে, আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা

করিলেন। তা'র পর ভরদ্বাজ প্রভৃতি মহর্ষিগণ—আত্রেয়ের শিষ্য হইলেন। তাঁহাদের যত্নে, শল্য তন্ত্র [অস্ত্রচিকিৎসা প্রণালী] উন্নতি লাভ করিল।

বৈদিক যুগের বৈদ্যেরা, অশ্মরী [পাথুরী] কাটিয়া বাহির করিতেন। এক দেহের শিরা হইতে অন্য দেহের শিরায় রক্ত চালনা করিতে পারিতেন। অকর্ম্মণ্য ভগ্নপদ কাটিয়া ফেলিয়া, তৎস্থলে রোগীকে লৌহময়ী জঙ্ঘা [লোহার পা] পরাইয়া দিতেন। কাহারও চক্ষু নষ্ট হইয়া গেলে, সেই বিনষ্ট চক্ষু নির্ব্বিঘ্নে উৎপাটন করিতেন। মাথার খুলি খুলিয়া, মস্তিষ্ক-পীড়ার নিদান অবগত হইতেন, আবার সেই খুলি রোগীর মাথায় বসাইয়া দিতেন। জরাজীর্ণ শরীরে নবযৌবনের শক্তি আনিয়া দিতেন। ঋগ্বেদে—ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

কতকগুলি শিক্ষিত যুবকের কাছে, পূর্ব্বাচার্য্যগণের এই সকল গৌরবের কথা—আমি এক দিন গল্প করিতেছিলাম। বলা বাহুল্য—তাঁহারা অবিশ্বাসের হাসি হাসিতেছিলেন। শেষে আমার এক ডাক্তার বন্ধু আসিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন—সার্ জন্ লবক্ সাহেব—সোসাইটী দ্বীপবাসী-দের বিবরণে—তাহাদের অস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধে এইরূপ অনেক অদ্ভুত আখ্যা-য়িকা লিখিয়াছেন *। এলিস্ নামক সাহেবও বলেন—"তাহারা রোগীর মস্তকের খর্পর খুলিয়া, তন্মধ্যে শূকরের মস্তিষ্ক পুরিয়া দিত। ইহাতে অনেক রোগীর জীবন রক্ষা হইত †।" বলিতে লজ্জা হয়, যাঁহারা ঋকমন্ত্র বিশ্বাস করেন নাই, খোদ ইংরাজের কথা শুনিয়া আর তাঁহাদের অবিশ্বাস রহিল না!

আমরা দেখাইলাম—ঋগ্বেদের সময়েও আয়ুর্ব্বেদের অস্ত্র চিকিৎসা-প্রণালী কতদূর উন্নত ছিল।

শারীর বিদ্যা। শল্যতন্ত্র জানিতে হইলে, শরীর বিজ্ঞানে জ্ঞান থাকা চাই। কেন না শরীরস্থ যন্ত্রাদির গঠন না বুঝিতে পারিলে, রোগীর দেহে অস্ত্র প্রয়োগ করা যায় না। বৈদিক বৈদ্যেরা শারীর বিদ্যাতেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বৈদিক যুগ—যজ্ঞবহুল ছিল। যজ্ঞে যে সকল পশু বলি

* Pre-historic Times. Sir J. Lubbock. p. 483.

† Ellis. vl. p. 277.

হইত, তাহাদের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া, তাঁহারা শরীর যন্ত্রের গঠন প্রণালী আয়ত্ত করিতেন। ঋগ্বেদে—চ্চূবক, মস্তিষ্ক, অন্ত্র, কীকসা, যকৃৎ প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। ঋষিগণ—যদি এ সকল শারীর যন্ত্রের প্রভেদ না বুঝিতেন, ইহাদের নামও জানিতেন না।

তয়া সমস্ত হৃদয় মারিস্ব কিকিরা কৃণু—	৬ষ্ঠ ৫৬।৮
হৃদা ইব কুক্ষয় সোমধানা	৩য় ৩৬।৮
সরোন প্রাস্ত্যদরং	১ম ২৩
দধিশ্বেমং জঠর ইন্দুমিত্র	১০ম ১৬৩

ঋগ্বেদের এই অংশ দেখুন—হৃদয়, কুক্ষি, উদর, জঠর [অন্ননালি] প্রভৃতি দৈহিক যন্ত্রের উল্লেখ রহিয়াছে। ঋগ্বেদে রাজ যক্ষ্মার বিষয়ে একটী স্বতন্ত্র ঋক্ আছে; এক জন বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলেন—যে হৃদ্পিণ্ডের গঠন আকৃতি জানে না, তাহার দ্বারা উক্ত ঋক্ রচিত হইতে পারে না। জীব দেহ পাঞ্চভৌতিক উপাদানে নির্ম্মিত। বৈদিক আর্য্য বহু পূর্ব্বেই ইহা জানিতেন। ঋক্সংহিতার * শবদাহের মন্ত্রে পাঞ্চভৌতিক তত্ত্ব—কি সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে। অস্থি, মাংস, স্নায়ু, পেশী—প্রভৃতির কার্য্য, ধমনীর স্পন্দনই জীবনী শক্তি, বিভিন্ন খাদ্যের বিভিন্ন ফল,—এ সকল কিছুই তাঁহা-দের অবিদিত ছিল না।

বৈদিক যুগ—শল্য তন্ত্রের প্রভূত উন্নতির কাল। কিন্তু, তখন শল্য বৈদ্যের ততটা আদর ছিল না। তাঁহারা ভদ্র সমাজে পতিত ছিলেন। ইহার প্রমাণ—অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইন্দ্রাদির গুরু হইয়াও, বহুদিন যজ্ঞ ভাগে বঞ্চিত ছিলেন। পরে যজ্ঞের ছিন্নমস্তক সন্ধান করিয়া দিয়া, তাঁহারা যজ্ঞ ভাগ লাভ করিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন †।

রোগ ও চিকিৎসা।

ক্রমে, যুদ্ধ বিগ্রহ বিবাদ বিসম্বাদ অনেকটা কমিয়া গেল। কাজেই শল্য-

* ঋক্সংহিতা—১০ম, ১৬শ, ৩।৪।৫।৬।৭।

† সুশ্রুত, সূত্র, ১অ, ১৭, তৈত্তিরীয় সং।

শুনা যায়—মেডিকেল কলেজের সর্ব্বপ্রথম ছাত্র—মধুসূদন গুপ্ত শবচ্ছেদ করিয়া, তৎকালে সমাজে পতিত হইয়াছিলেন।

তন্ত্রের কার্য্যও কমিয়া গেল। এদিকে, শান্তির কোলে শুইয়া, আর্য্যগণ কতকটা বিলাসী হইয়া উঠিলেন। বিলাসীর শরীর রোগের আশ্রয় স্থান। এই সময়েই রোগ দেখা দিল। ঋগ্বেদে জ্বর, অজীর্ণ, ধাতুদৌর্ব্বল্য প্রভৃতি রোগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন রোগ দেখা দিল, তখন "কায়-চিকিৎসকের"ও প্রয়োজন হইল। রোগনাশক "ভিষক অথর্ব্বণের" গৌরব বাড়িল।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বৈদিক যুগে দুই শ্রেণীর বৈদ্য ছিলেন। এক শ্রেণীর নাম—"শল্য বৈদ্য"—ইহারা অস্ত্রচিকিৎসক ছিলেন। আর এক শ্রেণীর নাম "ভিষক অথর্ব্বণ" জ্বরাদি কায় রোগের চিকিৎসা করাই ইহাদের কার্য্য ছিল।

বেদ লইয়াই বৈদ্য। বৈদিক যুগে বৈদ্যই ছিলেন, কবিরাজ ছিল না। তখন চিকিৎসা ব্যবসায় হইয়া উঠে নাই। হিমালয়ের পার্শ্ব দেশে বসিয়া, অত্রি, ভৃগু—যখন ঋষি মণ্ডলীর মাঝে—আয়ুর্ব্বেদের প্রচার করিতে ছিলেন, তখন তাঁহারা ভাবেন নাই, যে, তাঁহাদের অভ্রান্ত উপদেশ পূর্ণ আয়ুর্ব্বেদ একদিন ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইবে! তখন—তাঁহারা জানিতেন না—যে, তাঁহাদের পুণ্য গ্রথিত আয়ুর্ব্বেদ, আপামর সাধারণের উপকারী না হইয়া, একদিন—ব্যক্তি বিশেষের প্রকাণ্ড অট্টালিকা, বিশাল জমিদারী, কিম্বা সোনার চন্দ্রহার ও হীরার বালা সংগ্রহের সুবিধা করিয়া দিবে!

ভিষক অথর্ব্বণেরা—ভিজিট সংগ্রহকারী, ল্যাণ্ডো-আরোহী, কবিরাজ ছিলেন না। তাঁহারা পথে পথে ডাকিয়া* বেড়াইতেন। তাঁহাদের গৃহ পার্শ্বে—ঔষধের উদ্যান থাকিত। শারীর জ্ঞান ও ব্রহ্ম জ্ঞান, তাঁহারা তুল্য পদার্থ ভাবিতেন।

নিদান।

রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে, রোগের কারণ জানিতে হয়। বৈদিক যুগের বৈদ্যেরা "নিদান" আবিষ্কার করিলেন। তাঁহারা বহির্জগতের সঙ্গে মানব দেহের সম্বন্ধ বুঝিতেন। সূর্য্যোদয় হইলে, উদ্ভাপে ও

* রচতং ভিষক্—ঋ বে, ৯ম ১১২।

আলোকে, পৃথিবী হাসিয়া উঠে। বায়ুর সাহায্যে উত্তাপ ছড়াইয়া পড়ে, জলের শৈত্য গুণে আবার তাহা শীতল হইয়া যায়। এই প্রাকৃতিক নিয়ম দেখিয়া, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন—জীব দেহেও তাপের অস্তিত্ব আছে, সেই তাপে—খাদ্য দ্রব্য পরিপাক হয়। শরীরে এমন একটী শক্তি আছে, যাহার সাহায্যে রস রক্ত শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া থাকে। বৈদিক আর্য্য বুঝিয়াছিলেন—ত্রিধাতু শর্ম্মং বহতং*। ত্রিধাতু প্রকৃতিস্থ থাকিলেই দেহ সুস্থ থাকে; ইহাদের বিকৃতির নাম—ব্যাধি। এইরূপে পৃথিবীতে রোগের নিদান প্রথম আবিষ্কৃত হইল। ঋগ্বেদ যত দিনের, এ নিদানও তত দিনের।

ঔষধ।

নিদানের পর ঔষধ। বহু গবেষণার পর, আর্য্য ঋষি—এক সহস্র এক শত† ঔষধের আবিষ্কার করিলেন। পশুরা বিবাক্ত দ্রব্যে প্রায় মুখ দেয় না, সুতরাং বৈদিক আর্য্য পণ্ডদের প্রতিই স্বাস্থ্যকর খাদ্য নির্ব্বাচনের ভার দিলেন। ক্রমে—সোম প্রস্তুত হইল। এই সোম প্রণালীই—রসায়ন শাস্ত্রের সূতিকা গৃহ।

ভ্রূণ তত্ত্ব।

বৈদিক ঋষি "জীবন" যে কি পদার্থ তাহা জানিতেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, আত্মার ধ্বংস হয় না। মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ একেবারে ঘুচিয়া যায় না। এইজন্য তাঁহারা "পিতৃ যজ্ঞ" করিতেন। জীবনের প্রথম অবস্থা বুঝিবার জন্য—তাঁহারা ভ্রূণ তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন। ভ্রূণ জরায়ুর মধ্যে অবস্থান করে; গর্ভস্থ সন্তান—হেঁট মুণ্ডে থাকে বলিয়াই নারীগণ সহজে প্রসব করিতে পারে। গর্ভ মধ্যে ভ্রূণের ক্রম বিকাশ হয়‡। এই সকল গর্ভ বিষয়ক তত্ত্ব—বৈদিক ঋষির ভ্রূণ তত্ত্ব অনুসন্ধানের ফল।

বিষ্ণু র্যোনিং কল্পয়তু, ত্বষ্টা রূপানি পিংশতু
আসিং চতু প্রজাপতি র্ধাতা গর্ভং দধাতু তে।

* । ঋবে, ১ম ১৪।৬। বাত পিত্ত-শ্লেষ্মা ধাতুত্রয়-শমন-বিষয়ং সুখং বহতং। সায়নাচার্য্য।

† । ঋ-সং ১খণ্ড, ২৪।৯

‡ । ঐতরেয় ব্রা—৬, ১০

গর্ভং ধেহি সিনি বালি, গর্ভং ধেহি সরস্বতী।
গর্ভং তৈ অশ্বিনৌ দেবা বাধত্তাং পুষ্কর স্রজা ॥

বিষ্ণু---বায়ুর দেবতা ; ত্বষ্টা—তাপের অধিষ্ঠাতা।

প্রজাপতি—রক্ত বর্ণ, তিনি আর্ত্তবের [স্ত্রীবীর্য্য] দেবতা। অশ্বিনীকুমারদ্বয়—ছেদ ভেদাদি ক্রিয়ার দেবতা। ঋগ্বেদ বলিতেছেন—জরায়ুতে শুক্র বিষ্ণু [বায়ু] কর্ত্তৃক নীত হইয়া, প্রজাপতি [আর্ত্তব] কর্ত্তৃক সিঞ্চিত হইলে, গর্ভ উৎপন্ন হয়। সেই গর্ভ পদার্থ অন্তর্বিভক্ত হইয়া, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কর্ত্তৃত্বে ভ্রূণের দেহ গঠিত করে। ভ্রূণের দৈহিক বিকাশ পিতৃ নিয়মেই হইয়া থাকে। মানুষের সন্তান মানুষই হয়, অন্য কিছু হয় না। সুতরাং তাহাতে সরস্বতীর [জ্ঞানের] নেতৃত্ব থাকে।

দেখিলে, পাঠক! বৈদিক আর্য্য—গর্ভ তত্ত্ব কিরূপ বুঝিতেন? আধুনিক Embryologyতেও, তোমরা এর চেয়ে নূতন কথা পাও কি?

স্বাস্থ্য তত্ত্ব।

বৈদিক আর্য্য স্বাস্থ্য তত্ত্বেরও যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। স্বাস্থ্য—ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষের মূল, তাঁহারা স্বাস্থ্যের আদর জানিতেন। আজকাল ডাক্তার বাবুদের মুখে শুনিতে পাই,—বিশুদ্ধ বায়ু, বিশুদ্ধ জল, ও আলোক—স্বাস্থ্যের প্রধান উপাদান। অন্তত ৫ হাজার বৎসরের আগে, বৈদিক আর্য্যেরাও ইহা জানিতেন। সহস্র কিরণ সূর্য্য—জীব দেহে জীবনী শক্তি সঞ্চারিত করেন—তিনি পুষন—পুষ্টিকারক *। সূর্য্য রশ্মিতে শরীর সুস্থ থাকে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের—“ অবাত বাহি-ভেষজম্, ত্বংহি বিশ্বে ভেষজঃ” “আপো যাচামি ভেষজম্” পড়িয়া দেখ;—বিশুদ্ধ বায়ু, জল, বহ্নি ও সূর্য্যালোককে তাঁহারা অমৃতের সহোদর বলিতেন, এমন কি, যে সকল বৃক্ষের বাতাস ভাল, তাঁহাদের চক্ষে সে সকল বৃক্ষ, দেব সদৃশ পূজ্য ছিল। নিত্য স্নান, তাঁহাদের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। তোমরা যে আজিও ‘আপোহিষ্টেতি’ পবিত্র মন্ত্র শুনিতে পাও, তাহা আর কিছুই নয়—কেবল সূর্য্য ও জলের আবাহন।

বৈদিক আর্য্য—জ্যোতিষ জানিতেন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বুঝিতেন।

* ঋবে, ২য়, ৩৮।২

কম্প হইতে পর্ব্বতের উৎপত্তি [ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬ষ্ঠ-৩৫], সমুদ্র হইতে উত্থান [ব্রজ হইত্তের্মরুভিঃ ঋ,বে—৭ম।৭।৪, উদীরয়থ মরুতঃ সমুদ্র তো, বৃষ্টিং বর্ষয়থ—ঋ বে, ৫ম৫৫।৫] আধুনিক সভ্য সমাজের বহু পূর্ব্বেই তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন। শারীর তত্ত্ব, স্বাস্থ্য তত্ত্ব, নিদান, শল্য তন্ত্র, ভেষজ বিধি, ধাত্রী বিদ্যা, কোনও জ্ঞানই তাঁহাদের অপ্রতুল ছিল না। এ সকল বহু দিনের কথা। তা’র পর—কত কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। য়ুরোপ যখন—শৃঙ্খলাশূন্য নরশ্বাপদের বিহার ভূমি, তখনও ভারত জ্ঞান গৌরবে, বুদ্ধি বৈভবে, সকলের শীর্ষস্থানীয়! পৃথিবীর অপর স্থান—যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তখনও আর্য্য ঋষির পর্ণ কুটিরে—অমানুষিক প্রতিভার উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল। পঞ্চনদের প্রশস্ত ক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া, গ্রীসও এক দিন যাহাদিগকে শিক্ষা গুরু বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, হায়! সেই ভারতবাসী—আজ সর্ব্বাংশেই আত্মবিস্মৃত!

সেই সনাতন মহাপুরুষ—বৈদিক আর্য্যগণের শ্রীচরণ কমলে, কোটি কোটি প্রণাম করিয়া আপাততঃ আমরা এই স্থানেই বৈদিক যুগ শেষ করিলাম।

শ্রীব্রজবল্লভ রায়।

দ্বারকার পথে।

(৫)

গাড়ী যতই অগ্রসর হইতে লাগিল ততই বায়ুর প্রকোপ বাড়িতে লাগিল—সমুদ্রের দিকে যাইতেছি কি না? আর পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম আরব সাগর সর্ব্বদা বাত্যা-পীড়িত। শীত অনুভব হওয়ায় গায়ে কাপড় দিতে বাধ্য হইলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে অধিকাংশ আরোহী পোরবন্দর অভিমুখে চলিয়াছে—আর এক শ্রেণীর আরোহী জটিলেশ্বর পর্য্যন্ত যাইবে। তাহারা জটিলেশ্বরে নামিয়া জুনাগড় যাইবে। জুনাগড়ের আরোহীর মধ্যে অনেক সাধু ছিলেন; তাঁহারা গির্ণার যাইবেন। আম

মাঠের দিকে মুখ বাড়াইলেই সেই ধূ ধূ অনুর্ব্বর ক্ষেত্র এবং অতি দূরে দূরে কৃষিকার্য্যে সাহায্য জন্য এক একটী কূপ। আর গাড়ীর মধ্যে মুসলমান দম্পতীর কার্য্য বাড়িয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে ষ্টেসনে গাড়ী থামিলে নামিয়া ধূলা লইতেছেন ও চাপা দিতেছেন। তাহাতে একটী ছোট খাট পাহাড় সৃষ্টি হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

গাড়ী বড় দেরি করিয়া ফেলিল ঘড়ি দেখিয়া বেশ বুঝা গেল, এদিকে সময় কাটে না। একজন ভদ্র মুসলমান এক খানি গুজরাটী সংবাদপত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। আমি দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে হাতে দিলেন। দেখিলাম গুজরাটী ও ইংরেজী দুই রকম ও কোথাও কোথাও উর্দ্দু হরফ আছে, আর দেখিলাম কংগ্রেসের ছবি আছে। কাগজ খানির নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি কিন্তু বড় আড়ার কাগজ বঙ্গবাসীর মত ঐরূপ বিশাল দেহ। আগা গোড়া কাগজটা কেবলমাত্র কংগ্রেসের কথায় পূর্ণ। পড়িতে পারিলাম না—হাসিয়া ফিরাইয়া দিলাম।

বেলা ১১॥ টার সময় ধীরে ধীরে গাড়ী আসিয়া জটিলেশ্বর ষ্টেসনে প্রবেশ করিল। প্লাটফরম আর ফুরায় না। আমাদের এখানকার একটা বড় ষ্টেসনের প্লাটফরমের ৩ গুণ, প্রথমে সারি সারি পাইখানা; হিন্দুর—(পুরুষ আলাদা—স্ত্রী, আলাদা); মুসলমানের (পুরুষ আলাদা—স্ত্রীর আলাদা) ছোট লোকদেরও যেন আছে মনে হইতেছে। তার পর বাজে আফিস ঘরাদি বাদে এক প্রান্তে ইংরেজের জন্য হোটেল, আবার অনেকটা তফাতে অগ্রসর হইয়া মুসলমানের হোটেল আবার অনেকটা তফাতে হিন্দুদের হোটেল। তার পর আফিসাদি। যেদিক হইতে আমরা আসিতেছি সেদিক হইতে দেখিলে প্রথমে হিন্দুর হোটেল তার পর মুসলমানের হোটেল তার পর ইংরেজের হোটেল। পাইখানার কাছে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন পাঁচীল গাঁথা স্নানাগার। ইহাতেও স্ত্রী ও পুরুষভেদে আলাদা। গাড়ীখানি আসিয়া লাগিল এখানকার প্লাটফরমের শেষ প্রান্তে অর্থাৎ ইংরেজের হোটেলের নিকট গোরবন্দর দিকের শেষ প্রান্তে। গাড়ী কত দেরিতে আসিয়াছিল ঠিক দেখা হয় নাই। গাড়ী না থামিতে থামিতে টিকিট পরীক্ষক মহাশয়েরা আসিয়া অনুগ্রহ করিলেন। তার পর

খুলিয়া দিলে নামিয়া বাঁচিলাম। তার পর হাঁটিতে হাঁটিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত—এত দূরে পাইখানা ও স্নানাগার। পাইখানা হইতে আসিয়া হোটেলে তৈল মর্দ্দন করিলাম। হোটেলওয়ালা ব্রাহ্মণ অমনি জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন কি আহার হইবে। মাছ মাংস খাই না শুনিয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুর একটু আশ্চর্য্য হইলেন। ততোধিক আশ্চর্য্য হইলেন ব্রাহ্মণী—ভাবে বুঝা গেল। যাহাহৌক অমনই আয়োজনের ধুম পড়িয়া গেল। আমি স্নান করিতেছি তখনও বন্ধু দাঁড়াইয়া। বলিলাম জ্বরের উপর স্নান সবে কি? তিনি সেই মিহি সুরে বলিলেন দে——খি। আমি বলিলাম সময় নাই দেখো যেন ট্রেণ না ফেল হই। তাহা হইলে আতান্তরে পড়িতে হইবে। বলিয়া রাখি বন্ধু বর্দ্ধমান জেলার লোক বড়ই এক গুঁয়ে। যাহাহৌক আমি তাড়াতাড়ি আসিয়া তপ্ত আতপ তণ্ডুলের অন্নের উপর গব্য ঘৃত ঢালিয়া দিয়া নারায়ণকে উৎসর্গ করিলাম। তখন পা ছড়াইয়া বন্ধুবর তেল মাখিতে বসিলেন। আমি আর কিছু বলিলাম না। একটী জোড়া বিশাল লোচন মধ্যে মধ্যে আমাকে সমালোচন করিতেছে ও ঘরের মধ্য হইতে শব্দ করিয়াই আমার আহারের অগ্রসর হইবার ব্যবস্থার ইঙ্গিত করিতেছে। তরকারী ও টক ফুরাইলে পুংলিঙ্গ জিজ্ঞাসা করিল, দুধ খাইবেন? আমি শির সঞ্চালনে "হাঁ" জ্ঞাপন করিলে স্ত্রীলিঙ্গ স্বয়ং আসিয়া দুধ পাতের কাছে দিয়া গেলেন—বড় গরম। তার পর শক্কর অর্থাৎ গুড়ও তিনিই দিলেন। তার পর সেই সময়ে আর একটী পরমাসুন্দরী মহিলা তথা আসায় তিনি তাহার সঙ্গে একটু পার্শ্বে গিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আমার খাওয়া শেষ হইলে (দুধ গরম বলিয়া একটু বিলম্ব হইল) খড়কে ও তাম্বুলের ইঙ্গিতে ঠিক ব্যবস্থা করিলেন। আমি হিসাব করিয়া—(ঘৃতের আলাদা, পানের আলাদা, দুধের আলাদা, গুড়ের আলাদা, তেলের আলাদা)—পয়সা দিতেছি এমন সময় বন্ধু আসিয়া খাইতে বসিলেন, তাঁহার পয়সাশুদ্ধ চুকাইয়া দিয়া আমি বাহির হইয়া প্লাটফরমে আসিয়া পড়িলাম ও একটু অগ্রসর হইয়া দেখি খালাসীটা গার্ডের দিক হইতে কলের দিকে ছুটিতেছে, গার্ড ধ্বজা ধরিয়া ক্রমাগত নাড়িতেছে। খালাসীও ছুটে আমিও ছুটি। একজন ড্রাইভার কলের কাছে প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া খালাসীকে বকিতেছে।

আমি চীৎকার করিয়া ড্রাইভারকে বলিলাম আমি কলিকাতা হইতে আসিয়াছি—অমুক হাইকোর্টের উকীল, সঙ্গে লোক আছে একটু দেরি করে গাড়ী ছাড়িলে উপকৃত হইব। ড্রাইভার কি ভদ্রলোক যথাস্থানে পঁহুছিয়া গার্ডের সিগনাল বা সঙ্কেত না মানিয়া একটু বিলম্ব করিল। শেষে বলিল "কৈ বাবু আপনার লোক এসেছে"—আমি বলিলাম "না"। তখন বলিল গাড়ীতে উঠুন আর দেরি করিতে পারিব না। গাড়ীশুদ্ধ লোক হাঁ হাঁ করিতে লাগিল। বাবুর অনেক মোট গাড়ীতে উঠুন পরে ব্যবস্থা হইবে। আমি প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া বিকট চীৎকার করিয়া—ও পূর্ণ—ও পূর্ণ—ও পূর্ণ—রবে বন্ধুকে ডাকিতে লাগিলাম। কোথা বা পূর্ণ, কোথা বা নাড়া। গাড়ী আর রহিল না—বংশীধ্বনি হইল—গাড়ী চলিতে লাগিল। তখনও ভাঙ্গা গলায় চীৎকার করিতে করিতে গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী হুড় হুড় হুড় হুড় করিয়া শব্দ করিয়া যেন ব্যঙ্গ করিয়া চলিল। গাড়ীতে উঠিয়া আমি ভেবা-গঙ্গারাম অবস্থায় বসিয়া রহিলাম। মাথা বুজিয়া গিয়াছে—বুদ্ধি অস্থিবৎ। সঙ্গে ৭।৮টা বড় বড় মোট তার পর হুঁকা তামাক টিন ঘটী গামছা প্রভৃতি শতটা ছোট ছোট দ্রব্য খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। তার পর টিকিটও মনে হইল পূর্ণচন্দ্রের নিকট। তখন গাড়ীর নানা জনে নানা পরামর্শ দিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন পোরবন্দর চলিয়া যাউন। উনি কাল প্রাতঃকালের অর্থাৎ এই গাড়ীতে যাইবেন আর দ্বিতীয় গাড়ী নাই। কেহ বলিলেন ঐ কথাই কথা তবে পরের ষ্টেসনে নামিয়া তারে খবর দিন—বন্ধু সেই অনুসারে কার্য্য করিবেন। আর আপনার নিকট টিকিট নাই বলিয়া কোন ক্ষতি হইবে না—ষ্টেসন মাষ্টার জটিলেশ্বর হইতে পোরবন্দরে ঠিক এ বিষয়ে "তার" করিবেন। সে ভাবনা আপনার নাই। কেহ বলিলেন "ভাবিয়া কি করিবেন পরের ষ্টেসন ধোরাজী—সেইখানে আপনি নামিয়া বন্ধুকে তার করুন। পরের একখানি গাড়ী আছে ধোরাজী পর্য্যন্ত যায়। বন্ধু সেই গাড়ীতে ধোরাজী পঁহুছিবেন। তখন উভয়ে একত্র হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিবেন। আপনি একেলা, সঙ্গে চাকর নাই; মোট ঘাট লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িবেন—লোক ভিন্ন আপনার এক দণ্ড চলিবে না। আমি আপনার সব জিনিষ নামাইয়া দিব।" যিনি শেষ কথা

কহিলেন তিনি একজন মুসলমান। খোনা খোনা কথার আওয়াজ, তাহার উপর ভাঙ্গা গলা; একে বড়ী নাক, তাহার উপর, বোধ হয়, পিনাশ হইয়া বসিয়া গিয়াছে। কিম্বা অপর কোন গুরুতর অর্থাৎ ফারঙ্গ রোগের ফল এইগুলি সব। মুখটাও ভাল নয় তাতে নিজে লোকটা ক্ষীণজীবী ও রুগ্ন। অপর সময় হইলে সে কথা কহিলে স্থানত্যাগ করিতে বোধ হয় বাধ্য হইতাম (ভদ্রসমাজের হিসাবে বলিতেছি) কিন্তু তাহার হৃদয়টা বড় উদার দেখিয়া মনে হইল—কি আশ্চর্য্য আকৃতি দেখিয়া কিছু বুঝা যায় না হৃদয়টা কেমন। যত্রাকৃতিঃ তত্রগুণাঃ বার বার মনে পড়িল। "ন সুরূপাঃ পাপসমাহারা ভবন্তি" তাও মনে পড়িল। এমন সময় আমার পাশের সাধুটি জিজ্ঞাসা করিলেন বাবু এই কি গীর্ণারের পাহাড়? আমি চাহিয়া দেখিলাম আমাদের গাড়ীর সমান্তরালে একটী পাহাড়—তার এক প্রান্ত হইতে প্রায় অপর প্রান্ত দেখা যাইতেছে। আমি অবশ্য 'জানি না' বলিলাম, কিন্তু সেই মুসলমান বলিলেন "হাঁ এই গীর্ণার। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫।১৬ মাইল আর বিস্তৃতি প্রায় ৮ মাইল। বড় উঁচু পাহাড়। আমাদের দেশে ইহাকে যাদুর পাহাড় বলে—মায়াময় ব্যাপার কোথা যে কখন কি হয় তাহার ঠিকানা নাই। ইহাতে বড় বড় শের আছে। আর বড় বড় সাধু আছে। জটিলেশ্বর হইতে গীর্ণার পাহাড় যাইতে হয়। এখনই একখানি গাড়ী ছাড়িবে। সন্ধ্যার সময় জুনাগড়ে পঁহুছিবে।" অবশ্য জ্ঞাতব্য সব কথা শুনিলাম, কিন্তু কখন? হা অদৃষ্ট! হা বিড়ম্বনা! হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। তখন মনে মনে বলিলাম দ্বারকানাথ ইহা তোমার পরীক্ষা। এমন সময় সাহেব বলিলেন বাবু আপনি প্রস্তুত হউন ধোরাজী আসিয়াছে। গাড়ী ধোরাজী পঁহুছিল।

ধোরাজীতে আমি নামিয়াই ষ্টেসন মাষ্টারের নিকট উপস্থিত হইলাম। আমার মোট ঘাট প্লাটফরমে রহিল। সেই মুসলমানটী একটী একটী করিয়া হাল্কা দ্রব্যগুলি নামাইলেন আর বড় বড় মোটগুলি সাধু ও সাহেব উভয়ে ধরিয়া নামাইয়া দিলেন। আর সকলেই সাহায্য করিলেন কেহ হুঁকাটা ধরিয়া দেন, কেহ গামছাটা নামাইয়া দেন, কেহ বা ভিজা কাপড়খানা নামাইয়া দেন। ইহাদের সহৃদয়তা দেখিয়া আমি একেবারে গলিয়া

গেলাম। অশ্রুসিক্ত চক্ষে বার বার ধন্যবাদ করিলাম। সাধুজী তখন আমার নিকট বিদায় লইলেন। বলিলেন পোরবন্দর ও দ্বারকা হইয়া তিনি করাচী যাইবেন ও তথা হইতে হিঙ্গুলা যাইবেন। সাধুকে বিদায় দিতে আমার বুক ফাটিয়া গেল—সেরূপ বালক সুলভ সৌজন্য ও সরলতা আমি আর কখনও বোধ হয় দেখিব না। যাহাহৌক কঠোর সংসার কশাঘাত করিতেছে—উপায় নাই। জনে জনে বিদায় হইলেন। আমিও বিদায় লইলাম। তার পর খুঁজিয়া ষ্টেসন মাষ্টারের নিকট উপস্থিত হইলাম।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন যে আপনি ব্যস্ত হইবেন না। আমি তার পাইয়াছি আপনার লোক পরের গাড়ীতে আসিতেছেন, আধ ঘণ্টার মধ্যেই আপনি তাঁহাকে পাইবেন। বিশ্রাম ঘরে আপনি বিশ্রাম করুন, গাড়ী ছাড়িয়া গেলে আমি স্বয়ং যাইয়া আপনার ব্যবস্থা করিব। আপনার মোট দেখাইয়া দিন ষ্টেসনের কুলী বিশ্রাম ঘরে পঁহুছিয়া দিবে। এই বলিয়া তিনি পুলিস ডাকিয়া মুটে ডাকিয়া দিতে বলিলেন ও মোট লইয়া যাইবার আজ্ঞা দিলেন। আমি দাঁড়াইয়া গাড়ী দেখিতে লাগিলাম। পাঁচ মিনিট থামিয়া গাড়ী হুস হুস শব্দে আমাকে ব্যঙ্গ করিয়া পোরবন্দর অভিমুখে ছুটিল। আর আমি? তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে। ভাবনার—তিমিরে আমি এখন আচ্ছন্ন—আকাশ পাতাল ভাবিতেছি।

ষ্টেসন মাষ্টার মহাশয় যথা সময়ে আসিয়া আমার পরিচয় লইলেন। বলিলেন আমারই অদৃষ্ট ক্রমে আজ এরূপ ঘটিয়াছে আমরা এই মাঠের মধ্যে বনবাসে পড়িয়া থাকি ভগবানের কৃপায় আমার আজ মিত্রলাভ ঘটিয়াছে আমি এ অতিথি ছাড়িব না।

আর যাইবারও কোন উপায় নাই কাল আবার এমনি সময়ে গাড়ী আর যদি জুনাগড় যান তবে সেও কাল প্রাতঃকালে। আজ রাত্রিতে এইখানে থাকুন। এই পুলিস আপনার প্রহরী থাকিবে, বিশ্রাম ঘর আপনার ঘর, দুই জন কুলী আপনার চাকর। রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত আমি নিয়ে থাকিব। আহারাদির যেরূপ ব্যবস্থা বলিবেন সেইরূপই হইবে। তবে আমি পার্সী নই—বোধ হয় আপনি তাই মনে করিয়াছেন—আমি মুসলমান। আমি আজ গল্প শুনিয়া বাঁচিব।

এইরূপ আলাপ হইতেছে, এমন সময় চারি জন মুসলমান মহাজন আসিয়া মাল ডিলিভারী চাহিল। আসিল ঘোড়ার গাড়ীতে—দেখিলে ধনী বলিয়া বোধ হয়, হাতে মোটা খাতা। মাষ্টার মহাশয় বলিলেন "ইহারা ধোরাজীর মহাজন—এক একজনে লাখপতি। ইহাদের হাইদরাবাদ, বোম্বাই, কলিকাতা, মান্দ্রাজ, সুরত, লাহোর প্রভৃতি স্থানে দোকান আছে। ইহাদের এক এক জনের সব খরচ খরচা বাদ বৎসরে লক্ষ টাকা লাভ। লেখাপড়া কিছুই জানে না অথচ কেবল ব্যবসা-বুদ্ধিটা আছে। আর একটি পয়সার মা বাপ।" এই বলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দূরে ধোরাজী সহর দেখাইয়া দিলেন—সূর্য্যকিরণে দুই তিনটা কলস ঝক্ ঝক্ করিতেছে। শুনিলাম এ নগর গণ্ডালের ঠাকুর সাহেবের রাজধানী। বৎসরে কয়েক মাস এখানে থাকেন আর কয়েক মাস গণ্ডালে থাকেন। হিন্দু রাজার রাজধানী শুনিয়া প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল, দেখিবার জন্য প্রয়াস জন্মিল। এদিকে টং টং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মাষ্টার মহাশয় গাড়ী দেখিতে গেলেন। আমিও উদ্গ্রীব হইয়া দেখিতে ও ভাবিতে লাগিলাম। খানিকক্ষণ পরে ট্রেণ আসিয়া প্লাটফরমে লাগিল—ছোট খাট ট্রেণটী—ঠিক যেন শটল ট্রেণের মত। দেখিতে দেখিতে চারি পাটি দাঁত বাহির করিয়া বন্ধুবর পূর্ণচন্দ্র স্বয়ং সম্মুখে প্রকট।

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

মোতি-কুমারী।

[গল্প]

(৪)

বৃদ্ধ বেনোনী অর্থপিশাচ; 'অর্থ' 'অর্থ' করিয়া সমস্ত জীবন কাটা ইয়াছে। ধর্ম্মেও পিশাচ; ধর্ম্মত্যাগী বলিয়া জামাতাকে প্রাণে বধ করাই য়াছে, কন্যার শত লাঞ্ছনা করাইয়াছে; কিন্তু পিশাচই হোক্ আর রাক্ষসই হোক্, মানুষত বটে। মানুষ রক্তের টান শীঘ্র এড়াইতে পারে না। বেনোনী যেমন মিরিয়্যামের কথা শুনিল, বুঝিল, অমনি মিরিয়্যাম্‌কে দেখিতে, তাহাকে স্বীয় ভবনে আনয়ন করিতে, আদরে লালিত পালিত করিতে, তাহার ইচ্ছা হইল। বেনোনী দলে বলে ঈষানী ক্ষেত্রে গমন করিল। দৌহিত্রীর উপর দাবি করিল। শত বৃদ্ধ সমবেত হইলেন বেনোনী যে মিরিয়্যাম্‌কে স্বধর্ম্মে প্রতিপালন করিবেন, মিরিয়্যামের ইচ্ছা মত খৃষ্টান যুবকের সহিত তাহার বিবাহ দিবেন, যৌতুকের রীতিমত বন্দোবস্ত করিবেন, এই সকল কথা পাকা করিয়া লেখাইয়া লইয়া তাঁহারা মিরিয়্যাম্‌কে মাতামহের করে অর্পণ করিলেন। বৃদ্ধ আইথিয়্যাল কাঁদিয়া আকুল হইল বটে তবু মিরিয়্যাম্‌কে বলিল আমার বিশ্বাস যে তোমার সহিত আবার দেখা হইবে।

টায়র নগরে বেনোনীর সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী বিস্তৃত প্রাসাদে মিরিয়্যাম্‌ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ছিলেন সন্ন্যাসী ক্ষেত্রে বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে, নর মণ্ডপে কুটীরবাসিনী বনদেবী, এখন হইলেন তরঙ্গ সঙ্কুল সাগর পার্শ্বে সুরম্য হর্ম্ম্য মধ্যে রাজরাজেশ্বরী। যৌবনে বেনোনীর খৃষ্টধর্ম্মের উপর বড়ই ঘৃণা ছিল; এখন রক্তের জোর কমিয়াছিল, বৃদ্ধ বয়সে আপনার লোকের জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন, এমন দিনে মিরিয়্যাম্‌কে পাইয়া বুড়া তাহাকে ভালবাসিতে লাগিল। মিরিয়্যামও পিতৃহন্তা মাতামহকে ভালবাসিতে পারিল। রক্তের টান বড় টান।

মারকস্‌কে মিরিয়্যামের সর্ব্বদাই মনে পড়ে। মিরিয়্যাম্‌ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্যতীত কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিবে না এটী মিরিয়্যামের মাতার মরণ কালের অনুরোধ। মিরিয়্যামের মনের ভাবও সেইরূপ। মারকসের

সহিত মিরিয়্যামের বিবাহ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তাত নাই, তা বলিয়া কেহ ভাবিতে ছাড়ে না! তা ভাবিয়াই বা কি হইবে? "অধুনা অবয়োর্মধ্যে সরিৎ সাগর ভূধরাঃ," কোথায় মারকস্‌ আর কোথায় মিরিয়্যাম্‌। মারকস্‌ হয়ত রণোন্মাদে পদ-গৌরবে ভোগৈশ্বর্য্যে মিরিয়্যাম্‌কে ভুলিয়াছে। না মারকস্‌ ভুলেন নাই। গ্যালাস্‌ বলিয়া একজন রোম্যান দূত হঠাৎ একদিন আসিয়া উপস্থিত হইল, মিরিয়্যাম্‌কে মারকসের এক খানি পত্র দিল; সঙ্গে সঙ্গে একটী পুলিন্দা দিল। তাহার মধ্যে একটী বহুমূল্য অঙ্গুরীয়ক ও একটি ছড়া মোতির হার। পত্রে মারকস্‌ লিখিয়াছেন যে খুল্লতাতের মৃত্যুতে তিনি মহা ধনী হইয়াছেন, সম্রাটের আদরে মহা আদৃত হইয়াও বিপন্ন। মিরিয়্যাম্‌ খোদিত মারকসের সেই মূর্ত্তি, সম্রাট্‌ দেখিয়া, শিল্পীর আদরের জন্য তাহা নবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; ধূপ দীপ পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা মূর্ত্তি পূজা হইয়া থাকে; আর মারকস্‌ই সেই পূজার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতটা কাণ্ড হইয়াছে মারকসের একটা মিথ্যা কথার জন্য। মারকস্‌ ভয় করিয়াছিলেন যে শিল্পিনীর পরিচয় পাইলে সম্রাট্‌ মুগ্ধ হইয়া পড়িবেন। তাঁহাকে বিবাহ করিতে অভিলাষ করিবেন, কাজেই ভয়ে তিনি বলিয়াছিলেন যে শিল্পিনী ইহসংসারে আর নাই। ফল এই হইয়াছে মারকস্‌ শিল্প পূজার পর্য্যবেক্ষণে, ভার পাইয়া রোম ছাড়িয়া তিলার্দ্ধ যাইতে পারেন না। মারকস্‌ উপসংহার করিয়াছেন "মিরিয়্যাম্‌! আমার মত কেহ দুঃখী আছে কি?" আমরা কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না মারকস্‌ দুঃখী কি সুখী। সুখীই বলিতে হইবে নতুবা পত্র পাঠে মিরিয়্যামের এত আনন্দ কেন?

এদিকে য়ুদীরা রোম্যানদিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। টায়র নগরীতে, বৃদ্ধ বেনোনীর বাড়ীতে, বেনোনীকে লইয়া ষড়যন্ত্রকারীগণের সভা হইতে লাগিল। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ক্যালেবও সেখানে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। ক্যালেব এখন একজন সেনাপতি। তাঁহার বিক্রমে জোদা দুর্গ হইতে রোম্যানরা এখন বিতাড়িত হইয়াছে। বেনোনীর বাড়ীতে ক্যালেবের সহিত মিরিয়্যামের দেখা সাক্ষাৎ হইল। ক্যালেব বলিল "আমি য়ুদীদিগের রাজা হইব, তোমাকে রাণী করিব; আমাকে

বিবাহ কর।" মিরিয়্যাম্ কহিল "তুমি ত জান যে আমি অখৃষ্টানকে বিবাহ করিতে পারিব না।" ক্যালেব জিজ্ঞাসা করিল "আমি যদি খৃষ্টান হইতাম?" মিরিয়্যাম্ বলিল "তাহা হইলেও পারিতাম না। আমি মারকস্‌কে ভালবাসি। তবে তিনি খৃষ্টান নন, তাঁহাকেও বিবাহ করিতে পারিব না।" ক্যালেব ভ্রুকুটী করিয়া চলিয়া গেল।

দুই বৎসর মধ্যে য়ুদীরাজধানী জেরুসালেম নগরে মহা আকুণ্ডকুণ্ড বাধিয়া উঠিল। রোমের বিরুদ্ধে য়ুদীরা প্রকাশ্য অভ্যুত্থান করিয়াছে; শত শত সম্প্রদায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভাবে মহা বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছে। এক জনের নায়কত্ব স্বীকার করে না, সকলেই স্ব স্ব প্রধান। সকলেই মনে করে রোমের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করিয়া ধন লুণ্ঠন করিব, কর্ত্তৃত্ব হস্তগত করিব, রাজা হইব। এইরূপে আপনাদেরই মধ্যে মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হইল। বেস্পেসিয়্যান্ তখন রোমের সম্রাট। তিনি স্বীয় পুত্র টাইটাস্‌কে প্রধান সেনাপতি করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। টাইটাস্ দলে বলে আসিয়া মহা বিক্রমে জেরুসালেম আক্রমণ করিলেন।

ওদিকে সিরিয়াবাসীরা বেনোনীর প্রাকার বেষ্টিত দুর্গ সদৃশ প্রাসাদ আক্রমণ করিল। ক্যালেব আপনার জীবন তুচ্ছ করিয়া জলপথে জাহাজ লইয়া আসিয়া বেনোনী, মিরিয়্যাম্ এবং নেহুস্তার উদ্ধার সাধন করিল। সকলে বারণ করিলেও বেনোনী জেরুসলামে আশ্রয়ের জন্য গেলেন। অতি কষ্টে নগরীতে স্থান পাইলেন। সকলেই প্রাণভয়ে ভীত, ক্যালেব বেনোনী কোথায় গেলেন তাহার স্থিরতা নাই। নেহুস্তা মিরিয়্যাম্‌কে লইয়া একটী নিভৃত গুহায় স্থান পাইল। যুদ্ধ বিগ্রহে সেই শান্তশীল সন্তোষপ্রিয় সন্ন্যাসীর দল এখন ছিন্ন ভিন্ন বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। সম্প্রদায়ের অবশিষ্টাংশ লাঞ্ছিত তাড়িত হইয়া জেরুসালেম নগরের প্রান্ত দেশের জঙ্গলের মধ্যে গুহার ভিতর আশ্রয় লইয়াছে। তাহারাই আবার মিরিয়্যাম্ নেহুস্তাকে আশ্রয় দিল। তাঁহারা গুহায় থাকেন, কখন কখন সুড়ঙ্গ পথে একটী প্রাচীন মঠের মধ্যে যান। কখন কখনও বা সেই মঠের উপরতালায় সোপান অবলম্বনে উঠেন। অলিন্দের গবাক্ষ দিয়া নগরব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ দর্শন করেন।

এক দিন তাঁহারা দেখেন কি, সৈন্যদল মধ্যে স্বয়ং মারকস্ দড়বড়ি ঘোড়াচড়ি রণরঙ্গে চলিয়াছেন। ক্যালেবের সেনাদল তাঁহাকে প্রতিরোধ করিল। ক্যালেব মারকস্‌কে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিল। বিষম যুদ্ধে ভীষণ অস্ত্রাঘাতে মারকস্‌কে ধরাশায়ী করিয়া ক্যালেব দলে বলে চলিয়া গেল।

মারকস্‌কে বন্দী করিয়া শত্রুপক্ষেরা সেই মঠের মধ্যে একটী বৃহৎ প্রকোষ্ঠে রাখিল; বহির্ভাগে খাড়া পাহারা রহিল। সেই প্রকোষ্ঠের একটী গুপ্ত দ্বার ছিল, দ্বারটী বন্ধ থাকিলে কেহই বুঝিতে পারিত না যে সেখানে একটী দ্বার আছে। বিশেষ কৌশলে সেই দ্বারটী খোলা দেওয়া যাইত। সেই গুপ্ত দ্বার দিয়া নেহুস্তা ও মিরিয়্যাম্ প্রবেশ করিয়া প্রাপ্ত চেতন মারকস্‌কে উঠাইয়া লইল। নেহুস্তা মারকস্‌কে কোলে লইয়া সুড়ঙ্গে চলিয়া গেলে দ্বারটী বন্ধ হইয়া গেল, মিরিয়্যাম্ রক্ষীগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন। আর তাঁহা কর্ত্তৃক যে মারকসের উদ্ধারসাধন হইয়াছে এইরূপ সকলে অনুমান করিল। কিন্তু গুপ্ত দ্বারের সংবাদ কেহই পাইল না। একজন সৈনিক মিরিয়্যামের শির-শ্ছেদন করিতে উদ্যত হইলে ক্যালেব উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিলেন। মিরিয়্যাম্ বন্দিনী হইয়া বিচার গৃহে নীত হইল। বিধির বিড়ম্বনায় বিচারপতিগণের মধ্যে বেনোনী অধিষ্ঠিত। মিরিয়্যামের দণ্ড হইল যে নিকান্নর নামক দ্বারের তোরণের উপরে রৌদ্রে মিরিয়্যাম্ শৃঙ্খলা-বদ্ধ হইয়া বন্দিনী থাকিবেন। সেইরূপে আছেন, ক্যালেব তাঁহাকে উদ্ধার করিতে আসিল, বলিল "আমি খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছি; আমাকে বিবাহ কর। আমি তোমাকে উদ্ধার করিব।" মিরিয়্যাম্ উত্তর করিলেন "আমার জন্য খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে সে ত খৃষ্টান" হওয়া হইল না। সুতরাং আমি তোমাকে বিবাহ করিতে পারিব না। ক্যালেব আবার ভ্রুকুটি করিয়া চলিয়া গেল। মিরিয়্যাম্ এত যে নিগৃহীত, লাঞ্ছিত, কিন্তু তবু তাঁহার কণ্ঠে মারকসের দেওয়া সেই মোতির মালা ঝলসিছে;—সেটী যে তাঁহার ...ই কবচ। তাঁহার রক্ষীদের মধ্যে একজন লোলুপ হইয়া সেই মালা নিতে আসিতেছে দেখিয়া ক্যালেব ঘুরিয়া আসিয়া, স্বীয় ভীম-তরবারিতে তাহার মস্তক দ্বিখণ্ড করিলেন; অন্য রক্ষীরা একটু চকিত হইয়া পরক্ষণেই ...িয়া উঠিল;—যেমন রোগ তার তেমনি ঔষধ!!

তিন দিন তিন রাত্রি মিরিয়্যাম্ ঐ রূপে ফটকের উপরি তেতালার ফাকা ছাদে পাথরের থামে শিকলে বাঁধা অবস্থায় কাটাইলেন। কেহ এক টুক্‌রা রুটি এক ফোঁটা জল দিল না। সকাল বিকাল থামের আড়ালে একটু ছায়া পান, সেইখানটীতে বসিয়া থাকেন; ঠিক রৌদ্রের বেলায় ছায়া পড়ে না, মাথা ফাটিয়া যায়, প্রাণ শুখাইয়া উঠে, পিপাসায় ছাতি ফাটে। এক বিন্দু জল দিবার কেহ নাই; রাত্রিতে ঠাণ্ডা হয়, কাপড় চোপড় শিশিরে ভিজিয়া উঠে; পাথরের থামের গায়ে শিশির জমিয়া গড়াইতে থাকে, তাহাই জিহ্বা দিয়া লেহন করেন, দিবসের তৃষ্ণা নিবারণ করেন। কাজেই সোণার কমল শুখাইতে লাগিল। অনেক দূর হইতে এই দুর্দ্দশা উভয় পক্ষের সৈন্যেরা দেখিতে লাগিল; কিন্তু সে রণোন্মাদে কে কাহাকে দয়া করিবে?

রণোন্মাদই বটে। যুদ্ধারম্ভে টাইটস্ আদেশ দেন, যে, প্রাণপণে সকলে লড়াই করিবে বটে, প্রাণী হত্যাও অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু মঠ মন্দির গুলি, এমন কি বাহিরের প্রাচীর পর্য্যন্ত যেন অক্ষুণ্ণ রাখা হয়। কিন্তু যখন দেখিলেন, যে সংগ্রামের আর বিরাম নাই—তখন হুকুম দিলেন 'তোরণ দ্বারে আগুন লাগাও'। বাণবর্শার বৃষ্টিপাত মস্তকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রোমান সৈন্য ভীষণ উল্কা হস্তে অগ্রসর হইয়া, যে যেখানে পারিল, আগুন লাগাইতে লাগিল। বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ কাণ্ডের তোরণ রক্ষণ সকল কালী করালী জিহ্বা বিস্তার করিয়া ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলিতে লাগিল; ধূমে সমরাঙ্গন আচ্ছন্ন হইল; অন্ধকার হইয়া আসিল; অস্ত্র চালনা চলিয়াছে, কিন্তু পাত্র নিত্র নির্ব্বিশেষে; কে কাহাকে মারিতেছে, তাহা আর বুঝা যায় না; তোরণ উচ্চ প্রকোষ্ঠে মিরিয়্যাম শৃঙ্খলাবদ্ধ, ধূমরাশি সেখান পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিল; মিরিয়্যাম্ প্রাসাদের সীমার নিকট আসিয়া দেখিলেন, নিম্নে ভয়ানক অগ্নি-কাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে।

নদীয়া-কাহিনী।

বাদসাহজাদা আজিম ওসান নদীয়ার রাজা রামকৃষ্ণকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, দেওয়ান জাফর খাঁর তাহা ভাল লাগিত না। রামকৃষ্ণের উপর তাঁহার বিজাতীয় বিদ্বেষ ভাব ছিল কিন্তু তখন তিনি দেওয়ান মাত্র, কাজেই রামকৃষ্ণের কোনও অনিষ্ট করিতে সাহসী হন নাই। জাফর খাঁ, মুরসিদ কুলী খাঁ নাম গ্রহণ করিয়া যখন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বাঙ্গালার শাসন কার্য্য গ্রহণ করিলেন তখন রামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার পূর্ব্ব বিদ্বেষ জাগরিত হইয়া উঠিল এবং রাজস্ব অনাদায় ব্যপদেশে কৌশলে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাজধানীস্থ 'বৈকুণ্ঠে' (কারাগারে) প্রেরণ করিলেন। বাঁশবেড়িয়ার রাজা রঘুদেব রায় মহাশয় এ কথা শুনিতে পাইয়া আপনি তাঁহার সমুদায় দেনা শোধ করিয়া তাঁহাকে নরক মুক্ত করিয়া দেন। রঘুদেবের এই বদান্যতায় মোহিত হইয়া নবাব রঘুদেবকে "শূদ্রমণি" উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু তাহাতেও রামকৃষ্ণের পাপগ্রহ কাটিল না। অল্প দিন পরে পুনরায় রাজস্ব বাকী পড়ায় নবাব তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া রাজস্ব পরিশোধের নিমিত্ত একটা সময় নির্দ্দেশ করিয়া দেন। উক্ত নির্দ্দিষ্ট দিনের ভিতর টাকা না আসিলে তাঁহার জাতি নাশের ভয় প্রদর্শন করেন। একদিন দুইদিন করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিন আসিল কিন্তু এবারেও রামকৃষ্ণের টাকা আসিয়া পৌঁছিল না। ওদিকে অন্যতম কারারুদ্ধ সমুদ্রগড়ের রাজার টাকা আসিল। সমুদ্রগড়ের উদার হৃদয় রাজা, রঘুদেবের মহৎ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া আপনার সমস্ত অর্থ রাজা রামকৃষ্ণের নামে জমা দিলেন। রঘুদেব যে কার্য্যের জন্য "শূদ্রমণি" উপাধিতে ভূষিত হইলেন সেই কার্য্যের জন্যই সমুদ্রগড়ের রাজার ভাগ্যে অন্যরূপ ব্যবস্থা হইল। তিনি স্বীয় রাজস্ব দিতে না পারায় নবাবের আদেশে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন *। যদিও সদাশয় সমুদ্রগড়াধিপতির

* ইঁহাদের বাটীতে অদ্যাপি মহাসমারোহে দুর্গোৎসব ও মহরম দুইই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে এবং কৃষ্ণনগরের রাজবংশীয়গণের সহিত ইঁহাদের বেশ সৌহৃদ্য বিদ্যমান আছে।

মহত্ত্বে সে যাত্রায়ও রাজা রামকৃষ্ণের নিষ্কৃতিলাভ সুলভ হইয়াছিল কিন্তু 'বৈকুণ্ঠের' দারুণ কষ্টে তিনি ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া কারাগারে প্রাণত্যাগ করেন।

মুরসিদকুলীর রাজত্বকালে আর একটী ঘটনার সহিত নদীয়ার সম্পর্ক দেখা যায়। এই সময়ে হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে মহাপ্রভু প্রদর্শিত বৈষ্ণবধর্ম্মই দেশ বিদেশে চর্চ্চিত ও বহুলরূপে আচরিত হইতেছিল। জয়পুর রাজের সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য নামীয় একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আপনার অসাধারণ বিদ্যাবলে বলীয়ান হইয়া মহাপ্রভূ ও তাঁহার অনুবর্ত্তী ভক্তগণের আচরিত পরকীয়া মতে দোষারোপ করিয়া স্বকীয়াভাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনকল্পে জয়পুর ও বৃন্দাবনবাসী বাঙ্গালী পণ্ডিতগণের সহিত বিচারার্থী হন। বিচারে পরাস্ত হইয়া পণ্ডিতগণ স্বকীয়ামতের আনুকুল্যে দিগ্বিজয়ীর জয়পত্র স্বাক্ষরিত করেন কিন্তু তৎকালিন জয়পুরাধিপতি মহারাজ জয়সিংহ তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া দিগ্বিজয়ীকে বঙ্গের পরকীয়া ভাবের শ্রেষ্ঠ অধিকারী বৈষ্ণব কুলের সহিত বিচার করিয়া স্বকীয়া বা পরকীয়াভাবের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের নিমিত্ত বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে প্রয়াগ ও কাশীর বৈষ্ণবকুলও স্বকীয়ায় দস্তখত করিতে বাধ্য হন এবং বঙ্গের বহুস্থানেও দিগ্বিজয়ীর জয় হয়; কিন্তু পরিশেষে শ্রীধাম নবদ্বীপে এবং শ্রীখণ্ড ও জাজিগ্রাম প্রভৃতি বৈষ্ণবপ্রধান স্থানে আসিয়া ঐরূপ দাবী করিলে উক্ত স্থানসমূহের, বিশেষতঃ নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণব-পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত বিচার না করিয়া দিগ্বিজয়ীর প্রাধান্য স্বীকার করিতে অসম্মত হওয়ায়, তদানীন্তন বঙ্গেশ্বর নবাব জাফর খাঁর আনুকুল্যে এক বিরাট বিচার সভা আহুত হইয়া এ সম্বন্ধে বিচার হয়। এই সভায় নদীয়ান্তর্গত চাকড়ী (চাখন্দী) গ্রাম নিবাসী শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের বংশধর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর রাধামোহন ঠাকুরের সহিত বিচারে দিগ্বিজয়ী পরাজিত হইয়া স্বকীয়া ভাবাপেক্ষা পরকীয়ার প্রাধান্য স্বীকার ও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এ সম্বন্ধে সম্প্রতি যে দলিলের প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে স্বাক্ষরকারী গোস্বামীগণের মধ্যে শান্তিপুর, নবদ্বীপ, খড়দহ, বর্দ্ধমান, কাটোয়া, কানাইডাঙ্গা প্রভৃতির গোস্বামীগণের স্বাক্ষর দৃষ্ট হয়। তাঁহারা বলেন আমরা "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতাবলম্বী; অতএব বিচারে যে ধর্ম্ম স্থায়ী হয়

তাহাই লইব। এই মত কড়ার হইল, বিচার মানিলাম—তাহাতে পাত্তশাহী সুভা শ্রীযুক্ত নবাব জাফর খাঁ সাহেবের নিকট দরখাস্ত হইল—তিঁহো বলিলেন ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনা তজবিজ্ হয় না—অতএব বিচার কবুল করিলেন। এই মত সভাসদ্ হইল—শ্রীপাট নবদ্বীপের শ্রীকৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য ও তৈলঙ্গ দেশের শ্রীরামজয় বিদ্যালঙ্কার, সোনারগ্রামের শ্রীরামরাম বিদ্যাভূষণ ও শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য সাং শ্রীশ্রীকাশীর শ্রীহরানন্দ ব্রহ্মচারী ও নয়নানন্দ ভট্টাচার্য্য—সাং মজুলা *।"

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে রাজা রামকৃষ্ণ মুসলমানের অকথ্য পীড়নে কারাগারে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্রাদি না থাকায় নদীয়া সিংহাসন কাহাকে বর্ত্তিবে এই লইয়া সে সময় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং রাজা রামকৃষ্ণের পরম সুহৃদ সাজাদা আজিম ওসান তাঁহার শোচনীয় মৃত্যু সংবাদে আন্তরিক ব্যথিত হইয়া জাফর খাঁর প্রতি এক পরোয়ানা জারি করেন এবং রামকৃষ্ণের যাবতীয় সম্পত্তি ও নদীয়ার রাজ্য তাঁহার পুত্র বা পৌত্র অভাবে দত্তক পুত্র বা তদ্বৎ-সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তিকে দান করিতে অনুজ্ঞা করেন। জাফর রামকৃষ্ণের প্রতি অসৎ ব্যবহার করিলেও এক্ষণে সাজাদা আজিম ওসানের আজ্ঞা উপেক্ষা করিতে সাহসী না হইয়া লিখিলেন যে রামকৃষ্ণের পুত্রাদি বা উত্তরাধিকারী কেহই বিদ্যমান নাই, তাহাতে সাজাদা নদীয়া রাজ্য, রামকৃষ্ণের স্ত্রী ও আত্মীয়গণের সুখ স্বচ্ছন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে সক্ষম এরূপ কোন বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারীকে দান করিতে বলেন। এতদুত্তরে জাফর খাঁ পুনরায় লিখিলেন যে রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবন যিনি বহুদিন যাবৎ ঢাকায় বন্দী অবস্থায় আছেন—অনুমতি হইলে তাঁহাকে নদীয়া রাজ্য প্রদান করা যায়। সাজাদা আজিম ওসান জাফরের এই প্রস্তাবে সম্মত হন। এইরূপে রামজীবন তাঁহার মুক্তির নিমিত্ত জাফর খাঁকে বহু অর্থ অঙ্গীকার করিয়া নদীয়ার সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু যথাসময়ে তাঁহার মুক্তির মূল্য পরিশোধ করিতে না পারায় পুনরায় জাফর খাঁ কর্ত্তৃক নবরাজধানী মুরশিদাবাদে কারারুদ্ধ হন।

* শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রকাশিত প্রতিলিপি (সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা, ফাল্গুন ১৩০৬)।

এই সময়ে আলি মহম্মদ ও কালু জমাদার নামক দুইজন মুসলমান সেনানীর সহায়তায় রাজসাহীর জমিদার উদয়নারায়ণ, বিদ্রোহী হইয়া বঙ্গেশ্বরের অধীনতা অস্বীকার করেন এবং বীরকাটি *, নারায়ণগড়, দেবীনগর প্রভৃতি স্থানে দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। মুরসিদকুলী খাঁ তাঁহার দমনের নিমিত্ত লহরীমল্ল প্রমুখ সেনাপতিগণকে প্রেরণ করেন। কৃষ্ণনগরাধিপতি রামজীবনের পুত্র অসীম বলশালী যুবরাজ রঘুরাম স্বইচ্ছায় লহরী মল্লের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন এবং তথায় স্বীয় বাহুবল ও বুদ্ধিবল প্রকাশ করিয়া যশস্বী হন। কথিত আছে তাঁহারই অমোঘ সন্ধানে আলি মহম্মদ নিহত হইলে পরিণাম চিন্তা করিয়া বিদ্রোহী রাজা উদয়নারায়ণ সপরিবারে দেবীনগরের নিকটবর্ত্তী হ্রদে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। এইরূপে বিদ্রোহ দমিত হইলে নবাব মুরসিদকুলী বিস্তীর্ণ রাজসাহী জমিদারী তাঁহার প্রিয়পাত্র রঘুনন্দনকে প্রদান করেন। রঘুনন্দন তদা- নীন্তন বঙ্গের সদর কাননগু দর্পনারায়ণের কর্ম্মচারী ছিলেন †। এই রঘুনন্দনই নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। মুরসিদ নদীয়া রাজকুমার রঘুরামের কৃতকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহার পিতা রামজীবনের কারামোচন করেন। পরে পিতার মৃত্যু হইলে রঘুরাম ত্রয়োদশ বর্ষ রাজত্ব করিয়া ১৬৫০ শকে বা ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে ভাগীরথী-তীরে প্রাণত্যাগ করেন এব

* লুপ লাইনে মুরারই রেল ষ্টেসনের পশ্চিমে মহেশপুরের পূর্ব্ব-দক্ষি বীরকিটী গ্রাম। ক্ষিতীশ বংশাবলীতে ইহাই বীরকাটী নামে অভিহি দেবীনগর অদ্যাপি বর্ত্তমান—এই সকল স্থানে ভগ্ন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ অদ্যা দৃষ্টিগোচর হয়।

† কথিত আছে নবাব মুরসিদকুলী (তৎকালিন দেওয়ান জাফর খাঁ এক সময়ে বাদসাহী দরবারে পেশ করিবার নিমিত্ত নিকাশী কাগ প্রথামত সদর কাননগু দর্পনারায়ণের মোহর ছাপ করাইতে চাহি দর্পনারায়ণ তাঁহার প্রাপ্য রসুম বাবদ তিন লক্ষ মুদ্রা দাবী করেন এ উক্ত মুদ্রা না পাইলে কোন মতেই মোহর ছাপ করিবেন না প্রকাশ করে কিন্তু দেওয়ানের তখন অত মুদ্রা সংগ্রহ না হওয়ায় দর্পনারায়ণের কর্ম্মচা উদয়নারায়ণকে প্রলোভনে বশীভূত করিয়া তাঁহার দ্বারা নিকাশী কাগ কাননগুর মোহর ছাপ করিয়া লন। এই উপকারের প্রত্যুপকার স্ব ভবিষ্যতে মুরসিদকুলী উদয়নারায়ণকে রাজসাহী জমিদারী প্রদান করেন।

ৎপুত্র ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এই রাজার অধিকারকালে নদীয়া সর্ব্ববিষয়ে উন্নতিলাভ করিয়াছিল। এই সময়ে নদীয়া রাজ্যের বিস্তৃতি উত্তরে মুরসিদাবাদ হইতে দক্ষিণে সুদূর বঙ্গোপসাগর এবং পূর্ব্বে ধুলিয়াপুর হইতে পশ্চিমে ভাগীরথী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় *। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড পরিভ্রমণ করিতে ন্যূনাধিক দ্বাদশ দিবস অতিবাহিত হইত এবং ইহার আয় পঞ্চবিংশতি লক্ষ মুদ্রারও উপর ছিল †। সমগ্র অধিকার মোট ৮৪ পরগণায় বিভক্ত ছিল; এই সকল পরগণা বিভিন্ন জমিদারগণের অধিকারভুক্ত ছিল এবং দেশের সর্ব্ববিধ বিচার কার্য্যই এই সকল জমিদারগণ কর্ত্তৃক সমাহিত হইত। মহারাজা স্বয়ং হিন্দু পণ্ডিত ও মুসলমান কাজীর সাহায্যে ন্যায়ানুমোদিত বিচার সাধন করিতেন। মহারাজের অধীনে বদীরুদ্দীন নামক জনৈক কাজী ছিলেন। কথিত আছে এই কাজীর মাতৃবিয়োগ হইলে মাতার প্রেতকার্য্য সমাধানার্থ তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত অবকাশ প্রার্থনা করিলে মহারাজ তাঁহাকে বিদায় দিয়া তাঁহার মাতৃকার্য্যে গোহত্যা করিতে নিষেধ করেন, এবং তাহার স্থলে ছাগ ও মহিষ বধে অনুজ্ঞা দেন। কাজী স্বীকৃত হইয়া বাটী প্রত্যাগমন করত মহিষান্বেষণে বহু লোক নিযুক্ত করেন, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে মহিষ আসিয়া না পৌঁছানয় তাঁহার আত্মীয় স্বজনের প্ররোচনায় গোহত্যা করিতে বাধ্য হন। মহারাজ, স্বীয় অধিকার মধ্যে আপনার ভৃত্য কর্ত্তৃক এরূপে গোহত্যা কাহিনী শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ কাজীর মুখদর্শন

* রাজ্যের উত্তর সীমা মুরসিদাবাদ।
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগিরথী খাদ ॥
দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার।
পূর্ব্বসীমা ধুল্ল্যাপুর বড় গঙ্গাপার ॥ অন্নদামঙ্গল।

† Holwell, in his work, quoted under Jafar Khan I p. 202, says that he (Krisna Chandra) possessed a tract of country of about twelve days' journey and that he was taxed at 9 lacs per annum, though his revenue exceeded twenty-five lacs of rupees.—Kshitish Bangsabali Charitam—Translation by W. Pertsch p. 60. (Index).

করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন ও তাহার আবাস লুণ্ঠনে আদেশ দেন। রাজসভায় রাজার জমাদার জাফর খাঁ—কাজীর বন্ধু ছিলেন। তিনি রাজার আদেশ শ্রবণমাত্র গোপনে কাজীকে সপরিবারে গ্রাম ত্যাগে পরামর্শ পাঠাইয়া সতর্ক করিয়া দেওয়ায়, রাজভৃত্যগণ যখন কাজীর আবাস লুণ্ঠন করিতে আসিল, তখন সমস্ত গ্রাম অনুসন্ধানেও কাজীর সন্ধান না পাইয়া তাহার শূন্য আবাস দগ্ধ করিয়া তাহারা রাজসন্নিধানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কাজী ইতিমধ্যে বসিরহাটে কুটুম্বগৃহে অজ্ঞাতবাস করিতে থাকেন এবং গোপনে জমাদার জাফর খাঁকে * রাজসন্নিধানে উপযুক্ত অবসরে তাঁহার পক্ষে ওকালতি করিয়া রাজার ক্রোধোপশমনে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করেন। মহারাজা সর্ব্বদা ন্যায় বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রধান কাজী বিহনে মুসলমানদের বিচারে সর্ব্বদাই মহারাজের সন্দেহ হইতে লাগিল। এক দিন এবম্বিধ সন্দেহাকুলিত চিত্তে যখন উপবিষ্ট ছিলেন তখন তাঁহার প্রিয় জমাদার সুযোগ বুঝিয়া কাজীর জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করেন। তাহাতে মহারাজ সে যাত্রা কাজীকে ক্ষমা করেন বটে কিন্তু তাঁহার মুখদর্শন করিবেন না বলিয়া পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করায় কাজীর উপযুক্ত পুত্রকে ঐ কার্য্যে মনোনীত করিয়া তাহাদের সন্ধান করিতে আজ্ঞা করেন। জমাদার পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের সন্ধান অবগত ছিলেন এক্ষণে সুযোগ পাইয়া অবিলম্বে তাহাদের এই শুভবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন ও তাহাদের দেশে ফিরিয়া আসিতে আদেশ পাঠাইলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে বঙ্গের রাজনৈতিক গগন ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন হয়। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মুরসিদকুলী খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দীন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদারী প্রাপ্ত হন। ইঁহার সময়ে চারি জন ব্যক্তি রাজ্যমধ্যে প্রধানরূপে গণ্য হন ও তাঁহাদের পরামর্শানুসারে সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে থাকে। প্রথম আলম চাঁদ—ইনি হিন্দু এবং ায়েব দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়া পরে "রাইরাঁইয়া" অর্থাৎ রাজাদের ধ্যে রাজা—এই পদবী ভূষিত হন। দ্বিতীয় ফতেচাঁদ—যিনি বাদসাহ র্ত্তৃক জগৎ শেঠ উপাধী-মণ্ডিত হন *। তৃতীয় হাজি-আহম্মদ—সুজার প্রধান ন্ত্রী ও চতুর্থ হাজি আহম্মদের সহোদর ভ্রাতা আলিবর্দ্দী যিনি আজিম-াদের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। সুজা এই সকল উপযুক্ত সহকারীর াহায্যে সুচারুরূপে রাজ্যশাসন করিয়া ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে (১৩ই জেলহজ্জ ১:৫১ হিঃ) পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র সরফরাজ বঙ্গ মসনদে উপবিষ্ট হন। সরফরাজ বাল্যকাল হইতে উচ্ছৃঙ্খল ও দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন, এক্ষণে স্বয়ং সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া উঠেন এবং পিতৃবন্ধু রাইরাঁইয়াঁন আলমচাঁদ, মন্ত্রী হাজি আহম্মদ ও জগৎশেঠ, ফতেচাঁদকে সর্ব্বদা তাচ্ছিল্য করিতে থাকেন, এমন কি সময়ে সময়ে তাঁহাদের অপমানিত করিতে চেষ্টা পাইতেন। রাজ্যস্থ ক্ষমতাবান ব্যক্তি চতুষ্টয়ের সহিত সংঘর্ষ তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া উঠে এবং জগৎ শেঠের প্রতি নিদারুণ পাশব ব্যবহার তাঁহার উচ্ছেদের কাল অগ্রবর্ত্তী করিয়া দেয়। কথিত আছে সরফরাজ এইসময় এতই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠেন যে জগৎ শেঠের ন্যায় একজন ক্ষমতাবান ধনীর অন্তঃপুরে দৃষ্টিপাত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই †। বৃদ্ধ জগৎ শেঠ তাঁহার পৌত্র মহাতাপ রায়ের সহিত একটী কিঞ্চিন্ন্যূন একাদশ বর্ষীয়া অনিন্দ্যসুন্দরী বালিকার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার রূপলাবণ্যের প্রশংসা প্রবাদের ন্যায় তৎকালে প্রচারিত হয়। নরপশু সরফরাজ এই লাবণ্যময়ী, সকল সৌন্দর্য্যের ললাম-ভূতা কন্যার রূপের কথা লোক-মুখে শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে একবার দর্শনের নিমিত্ত কামাকুল হৃদয়ে বৃদ্ধ জগৎ শেঠের শরণাপন্ন হন। এই নিদারুণ

* এই জাফর খাঁ সম্বন্ধে নানারূপ অদ্ভুত কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তিনি নাকি একজন যথার্থ সাধক ছিলেন এবং কোনও সময়ে শিবনিবাসে থাকিয়াই যোগবলে শ্রীধাম পুরীর মন্দিরের অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়াছিলেন। শিবনিবাসে অদ্যাপি ইঁহার সমাধি বিদ্যমান আছে।

* Riyaz-us-salatin—p. 274.

† He (Fattauah Chand) had about this time married his youngest grandson named Set-Mortab Roy to a young creature of exquisite beauty, aged about 11 years. The fame of her beauty coming to the ears of the Soubah, he burned with curiosity and lust for the possession of her and sending for Jagut Set demanded a sight of her —Holwell's Interesting Historical Events. Part I. Ch. II. p. 70.

বাক্যে বৃদ্ধের মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তাঁহার বংশমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপায় উদ্ভাবন করিবার পূর্ব্বেই পাপিষ্ঠ সরফরাজ জগৎ শেঠের বাটী অবরোধ পূর্ব্বক সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই কন্যাকে প্রাসাদে আনয়ন করেন এবং দর্শন-পিপাসা মিটাইয়া তাঁহাকে পুনঃ প্রেরণ করেন *।

কেহ কেহ অনুমান করেন জগৎ শেঠের সহিত অর্থসংক্রান্ত ব্যাপার লইয়াই সরফরাজের মনান্তর হয়। যে কারণেই হউক রাজ্যপ্রাপ্তির ৫ বৎসরের মধ্যে সরফরাজ, আহম্মদ, জগৎ শেঠ প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্ম্মচারীবৃন্দের কোপনয়নে পতিত হন। হাজি আহম্মদ রাজমহলের ফৌজদার পরে পাটনার নবাব স্বীয় ভ্রাতা আলিবর্দ্দীকে সিংহাসনে বসাইয়া নিজের প্রতি সরফরাজের তাচ্ছিল্য ভাবের প্রতিশোধ গ্রহণে সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। এক্ষণে জগৎ শেঠের সাহায্য পাইয়া কৌশলে দিল্লী হইতে আলিবর্দ্দীর নামে বাঙ্গালার সুবেদারের সনন্দ বাহির করিয়া লন, এবং গোপনে আলিবর্দ্দীকে সসৈন্যে মুরসিদাবাদ আক্রমণে উপদেশ প্রেরণ করেন। পথে গিরিয়া নামক স্থানে নবাব সৈন্যের সহিত আলিবর্দ্দীর বল পরীক্ষা হয় এবং এই যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হইলে আলিবর্দ্দী আপনাকে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার বলিয়া ঘোষণা করেন। রাজধানী অধিকৃত হইলেও সমগ্র দেশ তাঁহাকে প্রথমে সুবেদার বলিয়া স্বীকার করে নাই এ কারণে তাঁহাকে অনেক যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এই সকল যুদ্ধের পর দেশে শান্তি স্থাপিত হইতে না হইতেই নাগপুর হইতে মারহাট্টারা আসিয়া বার বার পশ্চিমবঙ্গ লুটপাট করিতে থাকে। এই ঘটনার নাম বর্গীর হাঙ্গামা *। এই হাঙ্গামা দেশে দশ বৎসর ছিল। এই সময়ে বর্দ্ধমানের

* The young woman was sent to the Palace in the evening, and after staying there a short space, returned unviolated indeed, but dishonoured to her husband.—Orme Vol. II p. 30.

সম্ভবতঃ এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া বঙ্গ কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার "পলাশীর যুদ্ধে" সিরাজদ্দৌলা কর্ত্তৃক জগৎ শেঠের নির্ম্মল কুলে কালি দিয়াছেন। হতভাগ্য সিরাজ! মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণের যাবতীয় পাপ মিথ্যা দোষ ভাগ্যক্রমে তোমার স্কন্ধে আরোপিত—জানি না, তোমার প্রেতাত্মা কিরূপে এই দুর্ব্বহ ভার বহন করিতেছে।

রাজা সপরিবারে পলায়ন করিয়া তদানীন্তন নদীয়ান্তর্গত মূলাজোড়ের সন্নিহিত কাউগাছি গ্রাম গড়খাই করিয়া তন্মধ্যে প্রাসাদাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতে থাকেন। কিন্তু নদীয়াও এ সময়ে ভাস্কর পণ্ডিতের অধীন মহারাষ্ট্রীয়গণের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পায় নাই। নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাহাদের দৌরাত্ম্য হইতে নির্ব্বিঘ্ন হইবার মানসে শিবনিবাসকে কঙ্কণাকারে নদী বেষ্টিত করিয়া সুদৃঢ় দুর্গ ও বাসস্থানাদি নির্ম্মাণ করেন, এবং সন্নিহিত কৃষ্ণপুরে অসংখ্য লাঠি সড়কী ক্রীড়া পারদর্শী গোপগণের বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন †। বর্গীর বিভ্রাটে নদীয়ার ভাগীরথীকূল যেমন ধ্বংস হইয়াছিল তেমনি নবাবের রাজস্ব আদায়ের অযথা অত্যাচারে সমগ্র নদীয়ার প্রজাকুল উদ্বাস্ত হইতে বসিয়াছিল। বর্গীর বিভ্রাটে পশ্চিম বঙ্গের জমিদারকুল, বর্গীর আক্রমণে অত্যধিক পীড়িত হওয়ায় পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের জমিদারগণের নিকট হইতে অসম্ভব রাজস্ব আদায় হইতেছিল এবং নদীয়া, রাজসাহী, দিনাজপুর প্রভৃতি রাজাগণের নিকট যুদ্ধের ও রাজ্যরক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অর্থ সংস্থানের নিমিত্ত সবিশেষ উৎপীড়ন চলিতেছিল। নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র পৈত্রিক ঋণ দশ লক্ষ ও দুই লক্ষ মুদ্রা নিজ নজরানা না দিতে পারায় তৎকাল প্রচলিত নিয়মে কিয়ৎকালের নিমিত্ত কারারুদ্ধ থাকিতে বাধ্য হন *। এখান হইতে তিনি সে সময়ে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন কিন্তু শীঘ্রই স্বীয় দক্ষ দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্রের কর্ম্মকুশলতায় নজরানার টাকা পরিশোধ করিয়া মুক্ত হন। মারহাট্টা বিভ্রাট শেষ হইলে পুনরায় রাজস্ব বাকী দায়ে কারারুদ্ধ হন। এবার নবাব আলিবর্দ্দী স্বচক্ষে তাঁহার জমিদারীর দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে মুক্তি দেন। কথিত আছে চতুরচূড়ামণি কৃষ্ণচন্দ্র কৌশলে জলবিহারী নবাবকে নদীয়ার জলমগ্ন

* আজিও অশান্ত শিশুকে ঘুম পাড়াইতে হইলে, বঙ্গজননী

"ছেলে ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে?॥"

বলিয়া তাহার চঞ্চল মনে ভীতির সঞ্চার করিয়া ঘুম পাড়াইতে চেষ্টা করেন।

† শিবনিবাস এক্ষণে লুপ্ত-শ্রী। কৃষ্ণপুরের গোয়ালাদের বংশাবলী অদ্যাপি আছে ও লাঠী ধরিতে আজিও মজবুত।

ভূভাগ সকল বিশেষতঃ নবদ্বীপের বংশাচ্ছাদিত জলাভূমির ও কলিকাতা সন্নিহিত বাদার জলময় স্থান সকলের দুরবস্থা দেখাইয়া সে-যাত্রা অব্যাহতি লাভ করেন। পূর্ব্বোক্ত দেওয়ান রঘুনন্দন সম্বন্ধেও বহু কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে কোন সময়ে নদীয়ারাজের দেওয়ান মুরসিদাবাদ দরবার গৃহে প্রবেশকালে সভাপ্রবেশের পথ অতি সঙ্কীর্ণ থাকায় তাঁহার পরিচ্ছদের প্রান্তদেশ বর্দ্ধমানাধিপতির দেওয়ান মাণিকচাঁদের অঙ্গস্পর্শ করায় ক্রুদ্ধ হইয়া মাণিকচাঁদ, রঘুনন্দনকে হিন্দি ভাষায় "দেখ্‌তে নেহি পাগী" বলায় তেজস্বী রঘুনন্দন "হাঁ, নওকর সব্‌হি পাজা হৈ—কোই ছোটা কোই বড়া"—এই সমুচিত উত্তর প্রদান করেন। সেই অবধি মাণিকচাঁদ রঘুনন্দনের ভয়ঙ্কর শত্রু হইয়া দাঁড়ান এবং পরে বুদ্ধিবলে বর্দ্ধমান রাজ সংসার হইতে মুরসিদাবাদের নবাবের দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হইয়া রঘুনন্দনের সর্ব্বনাশ করিবার পন্থা খুঁজিতে থাকেন। এই সময়ে হুগলী হইতে কয়েক লক্ষ মুদ্রা রাজস্ব হিসাবে মুরসিদাবাদ সরকারে প্রেরিত হয়, কিন্তু পথে নদীয়ান্তর্গত পলাশীতে দস্যুগণ কর্ত্তৃক উহা অপহৃত হইলে বহু অনুসন্ধানেও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কর্ম্মচারীগণ উহার উদ্ধার সাধন করিতে না পারায় রঘুনন্দনের দোষেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে বলিয়া মাণিকচন্দ্রের ষড়যন্ত্রে রঘুনন্দনকে প্রথমে গর্দ্দভ পৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করাইয়া পরে তোপমুখে উড়াইয়া দেওয়া হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাসী দেওয়ানের এই বীভৎস পরিণামে মর্ম্মাহত হইয়া রঘুনন্দনের বংশাবলীকে পলাশী পরগণায় চোদ্দ শত বিঘা মহোত্রাণ জমি প্রদান করেন। অদ্যাপি তাঁহারা উহা ভোগ করিতেছেন।

শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক।

---

* শাকে আগে মাতৃকা যোগিনীগণ শেষে। (১৬৬৪ শকে)
বর্গীর বিভ্রাট হইবে এই দেশে ॥
আলিবর্দ্দী কৃষ্ণচন্দ্রে ধরে লয়ে যাবে।
নজরানা বলি বার লক্ষ টাকা চাবে ॥
বদ্ধ করি রাখিবেক মুরসিদাবাদে।
মোর স্তুতি করিবেক পড়িয়া প্রমাদে ॥ অন্নদামঙ্গল।

পরিত্যক্তা।

…র সঙ্কুল ঘোর অরণ্য ভীষণ
জনসমাগম হীন দুর্গম বিশাল
নানা বৃক্ষ সমাকুল—শ্রেণীবদ্ধ সবে—
তমাল পিয়াল আর অভ্রভেদী শাল ॥

অরণ্যের মধ্যভাগে দেখা যায় ওই
স্বল্প পরিসর ভূমি সুনীল বরণ,
নবদূর্ব্বাদলবৃত, যেন একখানি
প্রকৃতি রচিত চারু নীল আস্তরণ ॥

মাঝে এক মহীরুহ প্রিয়দরশন
শোভিছে সে ভূমি'পরে ফুল ফলভরা।
পাদমূলে তার এক নিদ্রিতা রমণী,
ধরণীতনয়া যেন আলিঙ্গিয়া ধরা ॥

ত্রৈলোক্যমোহিনী বামা যদি ওরে, হায়!
আতপ তাপেতে ম্লান সে বরাঙ্গ রুচি,
ছিন্নবাস পরিহিতা, ভূষণবিহীনা,
ভস্ম-আচ্ছাদিত যেন স্বাহাপতি শুচি ॥

প্রদোষের ছায়া সেথা নামিয়া আসিল
অস্তাচল চূড়ে রবি করিল প্রয়াণ।
নীড়-প্রত্যাগত পাখি তুলিল কাকলী
চমকি' সে রবে সতী মেলিল নয়ান ॥

ভূমিশয্যা ত্যজি' ত্বরা উঠিয়ে বসিল,
বিহ্বলা চৌদিকে পরে দেখিল চাহিয়া।
দেখিল বিজন দেশ—সেতো একাকিনী
সভয়ে কাঁপিল বক্ষ রহিয়া রহিয়া ॥

আবার মুদিল আঁখি কমলাক্ষী ভয়ে
আবার মেলিল তায় লয়ে দীর্ঘশ্বাস।
অবস্থানির্ণয় যেন হ'য়েও হ'ল না।
নিজ আঁখি পরে তার হ'ল অবিশ্বাস ॥

শিরোদেশ চাপি' তবে ধীরে করযুগে
চিন্তিতা কহিল একি কোথা আছি আমি
কে আনিল হেথা মোরে—কেমনে আইনু
কোথা পুণ্যশ্লোক রাজা নল মোর স্বামী ॥

নীরব হইল বামা—ডুবিল চিন্তায়—
ভাবিতে ভাবিতে পরে পড়ে গেল মনে।
নির্ব্বাসিত পতি পত্নী কেমনে তাহারা
শ্রান্তপদে ক্লান্তদেহে পশিল এ বনে' ॥

বিচ্ছেদ আশঙ্কা দূরে রাখিতে তখন
কেমনে সে করেছিল উপায় নূতন।
বসনার্দ্ধভাগে তার সুদৃঢ় বন্ধনে
নলরাজ কটিদেশ করিয়া বন্ধন ॥

কলি ছলে হারাইলে কেমনে সে বনে
অঙ্গের বসন শেষ নল নরমণি।
যেরূপে সে করেছিল লজ্জা নিবারণ
দুঃসময়ে তাঁর সেই সেবিকা রমণী ॥

পরে নিদ্রালসা রাখি' পতি অঙ্কে শির
কেমনে সে করেছিল ভূমিতে শয়ন!
তার পর—তার পর?—মনে নাই কিছু
নিদ্রাভঙ্গে এই দশা হেরিল নয়ন ॥

"কই কোথা নলরাজ" সহসা বলিয়া
সাগ্রহ-নয়নে বামা দেখিল তখন
নিজ পরিধেয় পানে; চমকিল প্রাণ
দেখিল কর্ত্তিত হৃত আধেক বসন ॥
আরো কি বুঝিতে বাকি বুঝিতে কোথায়
প্রিয়তম স্বামী তার নিষধ বিধাতা?
না,না,না, বুঝেছি রাণী নিদ্রাকালে তার
যেরূপে পলাল রাজা ভুলিয়া মমতা ॥
বক্ষে ভালে করাঘাত করিল অমনি
দময়ন্তী সতী তবে উন্মাদিনী প্রায়।
বিলাপিয়া উচ্চতানে কহিতে লাগিল
"কেন কাল নিদ্রা মোর এসেছিল, হায়!
নিদ্রায় হারানু আমি সর্ব্বস্ব আপন
প্রাণ হতে প্রিয়তর স্বামীরে আমার।
বুঝি এ জীবনে আর পাইব না তাঁরে;
হায়, বিধি! একি বিধি হইল তোমার ॥
বিবাহের পূর্ব্ব হ'তে নলে অনুরাগ
বিবাহের দিন হ'তে একত্রেতে বাস।
রাজকার্য্যে গৃহকার্য্যে নিত্য সহচরী
অবকাশ সাথী ছিনু এলে অবকাশ ॥
নলরাজ—ধ্যান জ্ঞান, নলরাজ-প্রাণ
নলসঙ্গ ছাড়া কভু ছিল না অভাগী।
নিত্য মিলনের সুখে ভাবিতাম মনে
'নল যে আমার, আমি বাঁচি নল লাগি'॥
দুষ্ট পুষ্করের সনে দ্যূতক্রীড়া করি'
সর্ব্বস্ব হারা'য়ে যবে নল মহামতি
পশিলেন বন মাঝে, আমি মাত্র তাঁর
রহিনু সঙ্গিনী, জানি' 'পতি সতীগতি' ॥

ভেবেছিনু সুখে যথা দুঃখেও তেমতি
নল সনে হেথা কাল করিব যাপন।
রাজগৃহ বনভূমি দোঁহে সম ভাবি
বনভূমে নারীধর্ম্ম করিব পালন ॥
পথশ্রমে ক্লান্ত হ'লে চরণ পতির,
অঙ্কেতে উঠায়ে লয়ে সেবিব যতনে।
রৌদ্রক্লিষ্ট মুখখানি টানি' বক্ষদেশে
জুড়াইব ধীরে ধীরে অঞ্চল ব্যজনে।
ক্ষুধাতুর হ'লে পতি ক্ষুধা নিবারিব
বনজাত খাদ্য তাঁর করেতে প্রদানি'।
তৃষাতুর হলে তাঁর তৃষা নিবারিব
সুশীতল বারি পদ্মপত্রাধারে আনি'।
নিদ্রাঘোরে মগ্ন বনে রহিবেন পতি
সতর্ক প্রহরী সম রব তাঁর পাশে।
বিপদ ঘটিলে কিম্বা আবশ্যক হ'লে
নিজ প্রাণ দিব তাঁর প্রাণরক্ষা আশে।
হায় আজি কোথা সেই প্রাণপতি মোর
কোন্ পাপে হারাইনু সেই গুণাধারে!
কিম্বা মম অপরাধ কোন্ দোষে দোষী
ফেলিয়া গেলেন তাই কানন মাঝারে।
ভালবাসা অপরাধ হ'য়ে থাকে যদি
সত্য বটে অপরাধী আছি তাঁর পদে।
কিন্তু কি কঠোর শাস্তি! রক্ষাকর্ত্তা [illegible]
এই দোষে পলাইলে ফেলিয়া বিপদে!
পত্নী আমি, প্রজা আমি, আশ্রিতা তোমা[illegible]
তবে কেন মোরে প্রভু হ'লে আজি বা[illegible]
স্বামীধর্ম্মে, রাজধর্ম্মে ক্ষত্রধর্ম্মে আর
কেন তবে জলাঞ্জলি দিলে গুণধাম!

[illegible]াধী চিরদিন তুমি মহারাজ
[illegible] কেন সত্যভঙ্গ করিলে হে তবে?
[illegible]জিব না বলেছিলে যাবত জীবন'
[illegible] কেন ত্যজিলে হে নিদ্রাধীনা যবে' ॥
[illegible] দময়ন্তী, অশ্রুসিক্ত আঁখি,
[illegible]াবেগে স্বরকম্প হইল তাহার।
[illegible] উপজিল তবে ঘোর অভিমান
[illegible]মান-অন্তে পরে কহিল আবার
[illegible]না,না, আমারি ভ্রান্তি নহ তুমি দোষী
[illegible] কোপে আজি তুমি ভ্রান্তমতি স্বামী।
তুমি না' ক'রেছ সেত' নহে কার্য্য তব
[illegible] করেছে সব উপলক্ষ্য তুমি ॥
[illegible]বে নলরাজ মুহূর্ত্তেক তরে,
হারা[illegible]য়াছিনু আমি তোমাতে বিশ্বাস।
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখনি করিব;
কেমন সন্তুষ্ট ইথে হ'বে মহেষাস?

"আরে কলি দুরাচার নহ অভিশাপ
অকারণে হিংসি' নলে তাপ পাবি মনে।
সতী আমি—কার সাধ্য রোধে মোর গতি
অচিরে মিলিব দেখ প্রাণপতি সনে" ॥
বলিতে বলিতে গেল চিত্তের সংযম
উন্মাদিনী অন্ধকারে ছুটিয়া চলিল
মুক্ত কেশ, মুক্ত বক্ষ, ত্রস্ত অঙ্গবাস
মুখের করুণ বাণী সমীরে ভাসিল ॥
"বল্ দেখি তরুলতা, বল্ দেখি গিরি,
বল্ দেখি স্রোতস্বিনী, বল্ সমীরণ।
'কোথায় এখন মোর অসহায় পতি,
কোন্ পথে গেলে তাঁর পাব দরশন'।
'কোথা পতি?' কোন্ পথে?' হল প্রতিধ্বনি
প্রকৃতি-হৃদয় তাহে কাঁপিয়া উঠিল।
সে ধ্বনি ডুবা'য়ে তীব্র নাদিল অম্বর
দিগ্‌দিগন্তরে মেঘ বিদ্যুত ছুটিল ॥

শ্রীচুণীলাল সেন।

সবৌরে কৃষি-কলেজ পত্তন।

[illegible]াস ১৭ই আগষ্ট ছোট লাটের এখানে শুভাগমন হইয়াছিল। আমরা লাট মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। ১২৫ জন মাত্র নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক হাজির হইয়াছিলেন। ৮৷১০ মিনিটের সময়, প্রাতে, লাট সাহেব ভাগলপুর হইতে আসিলেন; তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই লেডী ফ্রেজর আসিয়াছিলেন।

[illegible] কার্য্যারম্ভে, প্রথমেই ভাগলপুরের অধিবাসীর তরফ হইতে, মুঙ্গেরের রায় কমলেশ্বরীপ্রসাদ এক অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। এত ধীরে ধীরে পাঠ করিয়াছিলেন, যে কেহই কিছুই শুনিতে পায় নাই। স্বগত বলিয়া [illegible] হইয়াছিল। তাহার পর, কৃষি বিভাগের বড় কর্ত্তা গোর্লে সাহেব

সবৌর কলেজের এক বিস্তৃত বিবরণী পাঠ করেন। কি উদ্দেশ্যে এই কলেজ স্থাপিত হইতেছে, ছেলেরা এখানে কিরূপ শিক্ষা পাইবে, কেন এই স্থান কলেজের জন্য নির্ব্বাচিত হইল ইত্যাদি কলেজ সম্বন্ধে নানা কথা তিনি বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। তাহার পর, বলিলেন যে আমরা দেখিতেছি, এতদিন ধরিয়া শিবপুরে কৃষি-কলেজ চালাইয়াও এক জনও ভাল, উদ্যোগী, উৎসাহী, কাজের লোক পাইলাম না। পরে আমরা মতলব করিয়া কয়েক জন ছাত্রকে আমেরিকা যুক্তপ্রদেশে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাইলাম; তাহাদের মধ্যে ৪ জন আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন; কৈ তেমন ভাল লোক ত তাঁহাদের মধ্যে এক জনকেও দেখিতেছি না। শিবপুরে আর এক মজা; সে স্থানের ভাল ছেলেরা শাসন বিভাগে কর্ম্ম লন; বাকি কতকগুলা ওঁচা ছাত্র, আমরা কৃষি বিভাগের জন্য পাই। আর ইহাদের মধ্যে কেহই practical লোক হয় না। এই সকল কারণে আমরা এই সবৌর কলেজ খুলিতেছি। এখানে খুব practical ধরণে পড়ান হইবে। তাহারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই এইখানে আসিয়া ভর্ত্তি হইবে। সেই অল্প বয়স হইতেই তাহাদিগকে আমরা practical ধরণে কৃষি শিখাইব। আমাদের ইচ্ছা প্রত্যেক বিভাগে এইরূপ ভাবে এক একটি কৃষি কলেজ স্থাপনা করা। ১৫০ জন ছাত্র লওয়া হইবে। প্রায় ৩৩৫ একর জমী লওয়া হইয়াছে; ইহার মধ্যে ১০০ একারে রীতিমত আবাদ করা হইবে; ৫০ একারে Experimental cultivations হইবে; বাকি জমীর উপর কলেজ, বোর্ডিং, আপিস ও অন্যান্য Quarters হইবে। এখানে প্রতি ছাত্রের মাহিনা ও খাইখরচ লইয়া ১৫৲ টাকা মাসে লাগিবে। এই স্থান বাঙ্গালা ও বেহারের মধ্যস্থল, রেল লাইন আমাদের জমী দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে, আমাদের ফার্ম্মের ভিতর ষ্টেসন, সুতরাং কর্ম্ম পরিদর্শন করিবার বিশেষ সুবিধা। ১ লক্ষ টাকার জমী খরিদ হইয়াছে। আর বাড়ীঘর পুস্তকাগার, ল্যাবোরেটারী, মিউজিয়াম্ প্রভৃতির বাড়ী তৈয়ার করিতে ৮ লক্ষ টাকা খরচ হইবে ইত্যাদি নানা কথার অবতারণা করিয়া তাহার পরেই লাট সাহেবের বক্তৃতা।

কলেজ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে, তিনি বলিলেন যে "আমাকে

গোটাকতক অন্য কথা বলিতে হইতেছে, আর সেই সঙ্গে আমি অভিনন্দন-পত্রের জবাব দিব। কথাটী কি জানেন, এই আজ কালকার ভয়ের কথা। বেহারীরা বিশেষ রাজভক্ত তাহা তিনি পূর্ব্বেই জানিতেন। যত কিছু গোলমাল কেবল বাঙ্গালায়। তাহারাই অরাজকতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বিশেষ সতর্ক, গবর্ণমেণ্ট কঠোর শাসন নীতি অবলম্বন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। সুতরাং গোলযোগ শীঘ্রই মিটিয়া যাইবে। পরে কলেজের কথা পাড়িলেন;—বলিলেন গোর্লে সাহেব কলেজ সম্বন্ধে সকল কথাই বলিয়াছেন। এই কলেজ হইতে যে সকল ছাত্র বাহির হইবে, পরে তাহারাই কৃষি বিভাগে উচ্চস্থান অধিকার করিবে। যাহারা ভারতবর্ষীয় কৃষি সম্বন্ধে কিছুই জানে না, তাহাদের দ্বারা কৃষি বিভাগ চালান বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু তবুও কৃষি বিভাগে গোর্লে সাহেবের মত দুই এক জন ভাল লোক আমরা পাইয়াছি। ইংলণ্ড বা আমেরিকার কৃষিকার্য্য আর এদেশের কৃষিকার্য্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সুতরাং ইংলণ্ড বা আমেরিকায় ছাত্র পাঠাইবার আবশ্যক নাই। বিভাগীয় কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া, ইহারা পরে পুষায় রিসার্চ করিবে। তাহার পর দেশের কৃষিকার্য্য দেশে বসিয়াই ভাল করিয়া শিক্ষা লাভ করিবে; পরে আবশ্যক বিবেচনা করিলে, দুই এক জনকে বিশেষজ্ঞ করিবার জন্য আমরা বিদেশে পাঠাইতে পারি; সে দূরের কথা। মোটের উপর আমরা এই স্থানের বাছা বাছা ছাত্র লইয়া "আমাদের বিভাগে বড় বড় চাকরী দিব।" কৃষি বিভাগের ছাত্রগণের পক্ষে ইহা বড়ই আশার কথা সন্দেহ নাই। তার পর, কৃষিশিক্ষা—আমাদের দেশে এত আবশ্যক কেন, তাহাই তিনি বুঝাইলেন। কৃষি ও শিল্পের দিকে সাধারণের নজর পড়িলে, ঐ দিকে তাহারা মনোনিবেশ করিলে, দেশে শান্তি স্থাপিত হইবে। সর্ব্বত্র শান্তি ও সুখ বিরাজ করিবে; লোকে অরাজকতার দিকে ঝুঁকিবে না। এখন যেরূপ অরাজকতার দিকে অনেক বাঙ্গালি ঝুঁকিয়াছে, তখন সে সকল কিছুই থাকিবে না; সুতরাং দেশের পক্ষে, দশের পক্ষে এবং আমাদের সকলের পক্ষেই পরম মঙ্গলের কথা, সন্দেহ নাই। তাহার পর, পণ্ডিত প্রস্তর বসান হইল এবং ধন্যবাদের আদান প্রদান হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার।

মৃত্যুর পর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীভগবান গীতার অষ্টমাধ্যায়ের ১৪শ শ্লোকে বলিয়াছেন,

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪

অর্থাৎ অনন্যচিত্ত হইয়া যিনি আমায় সর্ব্বদা নিরন্তর স্মরণ করেন, হে পার্থ, নিত্যযুক্ত সেই যোগীর পক্ষে আমি সুলভ ॥ ১৪।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয় মশাশ্বতং।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫।

নিত্যানন্দস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া যাঁহারা পরমাসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, সেই সকল মহাপুরুষগণ আর পুনর্ব্বার অনিত্য এবং দুঃখময় জন্ম যাতায়াত ভোগ করেন না ॥ ১৫।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬।

হে অর্জ্জুন, ব্রহ্মলোক হইতেও সকল লোক পুনরায় আবর্ত্তনশীল হয় (পুনরায় ভূলোকে জন্মগ্রহণ করে;) কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে পাইলে লোকের পুনর্জন্ম হয় না ॥ ১৬।

পাঠক মহাশয়ের এই ভাবের বোধ সৌকর্য্যার্থে একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ভক্ত সম্রাট রামপ্রসাদ সেন বলিয়াছেন—যা গাহিয়াছেন—তখন মাকে দেখিতেছেন—

মল্লার

কাল মেঘ উদয় হল অন্তর অম্বরে।
নৃত্যতি মানস শীখী কৌতুকে বিহরে ॥
* * *
ইহজন্ম পরজন্ম বহুজন্ম পরে।
রামপ্রসাদ বলে আর জন্ম হবে না জঠরে ॥

ভগবান মুখে যাহা বলিয়াছেন, ভগবানের ভক্ত হৃদয়ে তাহা প্রত্যক্ষ

অনুভব করিতেছেন, প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছেন, আর যাহা অনুভব করিতেছেন তাহা এই—"আর জন্ম হবে না জঠরে।"—মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। তবে কালী কালার ভেদ? সে ত সব একই। প্রসাদই ত বলিয়াছেন—

উপাসনা ভেদে তুমি প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ।
যে জন পাঁচেরে এক করে ভাবে তার কাছে মা কোথায় বাঁচ ॥

পাঁচটী প্রধান উপাসক হইতেছে—

সৌর (সূর্য্য-উপাসক) গাণপত্য (গণেশ) শৈব (শিব) শাক্ত (শক্তি বা কালী তারা ইত্যাদি) বৈষ্ণব (বিষ্ণু)। আর শাস্ত্র তারস্বরে বলিয়াছেন "কলৌ কালী—কলৌ কৃষ্ণ, কলৌ গোপাল কালিকা।"

তারপর শ্রীভগবান গীতার নবম অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকে কি বলিতেছেন মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥২৬।

ভক্তি পূর্ব্বক যিনি আমাকে পত্র পুষ্প ফল জল প্রদান করেন, আমি সেই সংযতাত্মা ব্যক্তি কর্ত্তৃক ভক্তি পূর্ব্বক প্রদত্তপত্র পুষ্পাদি গ্রহণ করি।২৬

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পনম্ ॥২৭

হে কৌন্তেয়, যাহা কিছু কর, যাহা কিছু খাও, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তৎসমস্তই আমাতে অর্পণ করিবে।২৭

শুভাশুভ ফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাস যোগযুক্তাত্মা বিমুক্তোমামুপৈষ্যসি ॥২৮

এইরূপ করিলে কর্ম্মে আসক্তিজনিত শুভাশুভ ফল হইতে মুক্ত হইবে, সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা পরে অর্থাৎ আমাতে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ রূপ যোগে যুক্ত চিত্ত হইয়া তুমি আমাকে পাইবে।২৮

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥২৯

আমি সর্ব্বভূতেই সমান ; আমার দ্বেষ্য কেহ নাই আমার প্রিয়ও কেহ নাই। যাঁহারা আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েন ; যেহেতু আমি তাহাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত।২৯

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০

অতি দুরাচার পুরুষও যদি অনন্যশরণ হইয়া আমাকে ভজনা করে, তাহাকেও সাধু বলিয়া মনে করিব, কেননা তাহার অধ্যবসায় সাধু।৩০

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১

অতি দুরাচার ব্যক্তিও আমাকে ভজনা করিলে শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হন এবং নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হন, হে কৌন্তেয় আমার ভক্ত নষ্ট হয় না—এই প্রতিজ্ঞায় (সত্যে) তুমি নির্ভর রাখ।৩১

মাংহি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপ যোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরা গতিম্।
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা ॥৩২

হে পার্থ, স্ত্রী হৌক, বৈশ্য হৌক, শূদ্র হৌক এবং তদপেক্ষা পাপযোনি বা হৌক আমাকে আশ্রয় করিলে নিশ্চয়ই পরমাগতি প্রাপ্ত হন। পুণ্য যোনি ভক্ত ব্রাহ্মণগণ এবং রাজর্ষিগণ যে মুক্ত হইবেন তাহা আর বলিবার হইবে কেন ? ৩২

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥৩৩

অতএব তুমি অনিত্য এবং অসুখকর এই মর্ত্তলোক পাইয়া (সংসারে আসিয়া) আমারে ভজনা কর (জন্ম সার্থক হইবে)।৩৩

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামে বৈষ্যসি যুক্ত্বৈব মাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥৩৪

তুমি মদ্গত চিত্ত, মদ্‌ভক্ত, এবং আমার উপাসক হও ; আমারে নমস্কার কর। মৎপরায়ণ হইয়া এইরূপে মনকে আমাতে সমাধি করিলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। ৩৪

আসিছে জননী।

১

সারা বরষের বহি' দুখভার,
সারা বরষের মুছি' আঁখি-ধার,
সারা বরষের ভুলি' হাহাকার,
আশা-পথ কার চাহি রে।
শিশির, নিদাঘ, বরষা যাপন
মাস, পক্ষ, তিথি করি' সমাপন—
কার তরে দিন বাহি রে ॥

২

এসেছে শরৎ—ফুটেছে শেফালী,
ভরি' দেছে ফুলে ধরণীর ডালি;
আরতির তরে কোটি দীপ জ্বালি'—
আকাশে তারকা বিহরে!
আধ শশধর ভাসে নীলাকাশে,
মায়ের রুচির নখর প্রকাশে;
ভক্ত-হৃদয় শিহরে ॥

৩

আসিছে জননী! ব্যাকুল-অন্তর
পূজিবে চরণ কোটি কোটি নর;
হৃদয় ফুটিয়া ভকতি-নির্ঝর
বহিবে মায়ের চরণে।
নয়ন ভরিয়া হেরিবে মূরতি—
দশভুজারূপ, ঘুচিবে দুর্গতি,
ঘুচিবে বিপদ স্মরণে ॥

আসিছে জননী—বরাভয়-করা,
অসুর-দলনী, ভব-ভয়-হরা;
অকূলে কি কূল পাব না আমরা—
ডুবিবে সাগরে তরণী?

মাথার উপরে মেঘ—বজ্রভরা,
'সামাল—সামাল' প'ড়ে গেছে ত্বরা
বিপদে কাণ্ডারী জননী!

৫

এই দেখা যায় লক্ষ্য—ধ্রুবতারা,
এই মেঘ মাঝে পুন হয় হারা,
আশা-নিরাশায় ভেবে মোরা সারা,
উপায় মোদের কি হ'বে?

আসিছে জননী! মনের বেদন
নিবেদিব পদে; করিবে মোচন,
বিপদ মোদের না রবে!

৬

আলো করি দিক্ উষা ওই হাসে,
কনক কিরণ উথলে আকাশে,
ফুল-পরিমল সমীরণে ভাসে;
এল কি মোদের জননী?

পথের কাঙাল, কিবা গৃহবাসী,
ল'য়ে এস পূজা-উপহার-রাশি,—
অঞ্জলি পূরি' অমনি॥

৭

এসেছে জননী! আর কি ভাবনা?
পূরিবে মোদের প্রাণের কামনা,
সার্থক হবে জীবন-সাধনা,
যাবে না—যাবে না বিফলে!

বলিব—"মা তুমি পতিত সন্তানে—
দেছ জাগাইয়া দেশের কল্যাণে,
যেন গো ডুবে না অতলে॥"

৮

"শক্তি দিয়ো মা গো, ভক্তি তারি সাথে,
দিয়ো মা, পৌরুষ মণ্ডিয়া ক্ষমাতে,
যেন মা গো, তব জগত্ সভাতে
সরমে না লই বরিয়া!
তোমার সন্তান, ভুলিয়া না যাই,
স্বার্থের দ্বারে যেন না বিকাই
লক্ষ্য থাকি মা, ধরিয়া!"

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

আগমনী।

১

কি সুর শুনি রে আজি শুনি রে মধুর!
যে দিকে ফিরাই আঁখি,
পুলকেতে মাখামাখি,
আনন্দের স্রোত যেন ঝরিছে প্রচুর!
সারা বঙ্গে উঠে রঙ্গে সুমধুর সুর!
কেন রে শারদ চাঁদ,
পেতেছে রূপের ফাঁদ!
ঢালে রে কৌমুদী রাশি—বিশ্ব ভোরপুর!
কি সুর শুনি রে আজি শুনিরে মধুর!

২

কেন বা হাসিছে আজি নানা জাতি ফুল ?
হাসিছে কুমুদ বালা,
সরোবর করি আলা ;
হাসিছে চামেলী, চাঁপা,—বঙ্গের মুকুল !
হাসে রে অপরাজিতা এলাইয়া চুল !
কেন রে মধুর হাসি,
দশদিশি পরকাশি ?
আসে বুঝি' মা আমার ভাঙিবারে ভুল ?
তাই কি হয়েছে আজি সুষমা অতুল !

৩

এলি কি এলি কি ফিরে জননী আমার ?
তোর এ সাধের বঙ্গে,
দেখ, লয়ে আজি রঙ্গে,
ধায় অকুটন্ত কলি পসরা পূজার !
দেখ্ মা বারেক ফিরে দেখ্ মা আমার !
ঘিরেছে বিষম ভুল,
হিয়া হয় বেয়াকুল ;
সে ভুল ভাঙিয়া দেগো ! হাসি মা, আবার !
ভ্রান্তি গিয়া শান্তি হোক্ জগত মাঝার !

৪

দেখ্ চেয়ে আজি বঙ্গে দেখ্ একবার !
শান্তি প্রীতি তুষ্টি ভরা
ছিল তোর এই ধরা ;
দেখ্ এবে ঘেরিয়াছে অশান্তি অপার !
বিষাদ করাল মুখ দেখায়েছে তার !
তোরি মত ছিল তার,—
হাসিমুখ সুধাধার ;

দীনা ক্ষীণা কাঙালিনী এবে মা আমার !
নয়নে নিরত ঝরে শোক-অশ্রু-ধার !

৫

দেনা মা ! মুছায়ে তার ম্লান মুখখানি !
দেনা মা ! পরায়ে রঙ্গে,—
শ্যাম বারাণসী অঙ্গে,
মিটাইয়ে হৃদি-আশা দে মা শিবরাণি !
দেখি' মার হাসিমুখ জুড়াই পরাণি !
চাঁচর চিকুর চুলে
বিনা'য়ে কুন্তল তুলে,
সীমন্তে সিন্দুর রাগ দে মা ভবরাণি !
বনফুলে সাজাইয়ে দেগো ! বনরাণী !

৬

আয় মা ঈশানি শিবে ! আয় ফিরে আয় ;
শুধু তোর আগমনে
উথলিবে শান্তি মনে ;
ঘুচিবে সকল জ্বালা নাম-মহিমায় !
সারদে, সুখদে ! বঙ্গে আয় ফিরে আয় !
ডাকি তোরে ভবদারা,
দনুজদলনী, তারা,
আকুল জগতবাসী কাঁদে উভরায় !
অকাল বোধনে মা গো ডাকি মা তোমায় !

হিন্দু-সমিতি, চুঁচুড়া। শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

মহর্ষি কণ্ব।

মহর্ষি কণ্ব অভিজ্ঞান "শকুন্তলের" একটি অত্যুৎকৃষ্ট চিত্র। যেমন একদিকে মহারাজ দুষ্মন্ত ভারতবর্ষের একজন উন্নত চরিত্র শ্রেষ্ঠ রাজা এবং নাটকের নায়ক, অপরদিকে সেইরূপ ভগবান্ কণ্ব এক বিশাল বিরাট মূর্ত্তি। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মিলন ও বিবাহ এবং তাঁহাদের বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন লইয়া এই নাটক। বরপক্ষে স্বয়ং দুষ্মন্তই এক অদ্বিতীয় প্রভাববান্ পুরুষ। কন্যাপক্ষে তদ্রূপ মহর্ষি কণ্বও এক আদর্শস্থানীয় মহাপুরুষ।

নাটকীয় ঘটনাবলীর মধ্যে কেবল একবার মাত্র আমরা মহর্ষি কণ্বকে দেখিতে পাই। চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলার পতিগৃহ গমনের সময় মহর্ষি সশরীরে আমাদের দর্শন গোচর হইয়াছেন। এই অত্যল্প সময়ের জন্য দেখিয়াও আমরা তাঁহার বিরাট অস্তিত্বের অনুভব করি; এবং আশ্রমের কুলপতি মহর্ষি কাহাকে বলে তাহা বেশ বুঝিতে পারি। নাটকের অন্যান্য অঙ্কোক্ত ঘটনাবলীতেও তাঁহার অলক্ষিত প্রভাব দেখিতে পাই। তিনি অশরীরিণী বাণীর ন্যায় অতি প্রভাবযুক্ত। মনে হয় যেন প্রত্যেক ঘটনাতেই, প্রত্যেক সৎকার্য্যে তিনি অলক্ষিত ভাবে থাকিয়া সাহায্য করিতেছেন। শকুন্তলার গান্ধর্ব্ব বিবাহের সময় তিনি আশ্রমে ছিলেন না; কিন্তু মনে হয় যেন মহর্ষি অলক্ষিতে থাকিয়া এই বিবাহের অনুমোদন করিলেন। রাজা দুষ্মন্ত যখন প্রথমে আশ্রমে প্রবেশ করেন তখন সারথিকে বলিলেন, "সূত বিনীত বেশেন প্রবেষ্টব্যানি তপোবনানি নাম," এবং আভরণ ও ধনু প্রভৃতি সারথিকে অর্পণ করিলেন। তপোবনবাসিদের পাছে ক্লেশ হয় এইজন্য দূরে রথ রক্ষা করিলেন। ইহাও মহর্ষি কণ্বের অলক্ষিত প্রভাব।

ভগবান্ কণ্ব তপস্বী। তপস্যাই তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন এই তাঁহার তপস্যা কি তাহা বিস্তারিত বুঝা বড় কঠিন। তবে এই টু বুঝা যায় যে ভগবৎ-প্রীতি এবং ঈশ্বরাভিপ্রেত কর্ম্ম করাই তাঁহার জীবনে উদ্দেশ্য এবং সর্ব্বদা তিনি ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভ করিবার জন্য অভিব্যক্ত

শকুন্তলাকে বিদায় দিবার সময় মহর্ষি বলিতেছেন, "বৎসে, উপরুধ্যতে তপোঽনুষ্ঠানম্"। শকুন্তলাও পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তপশ্চরণ পীড়িতং তাত শরীরং। তদ্দলং অতিমাত্রং মমকৃতে উৎকণ্ঠ্য"।

এই মহামুনির তপস্যার স্থান মালিনী তীরের আশ্রম। কালিদাস অতি যত্নের সহিত নাটকের স্থানে স্থানে এই আশ্রমের বর্ণনা করিয়াছেন। এমন আশ্রম যেন জগতে আর কোথাও ছিল না। কণ্বমুনি এই আশ্রমের কুলপতি বা রাজা। যেমন দুষ্মন্ত, সংসারের—হস্তিনাপুরের—রাজা, মহর্ষি সেইরূপ এই আশ্রমের সর্ব্বময় অধিপতি। রাজা অপেক্ষা মহর্ষি কত বড়, তাহা, এই আশ্রম কি ভাল করিয়া বুঝিলে, বুঝা যাইবে। এই আশ্রমবাসী মানুষ ও এই আশ্রমস্থিত তরু লতা পশু পক্ষী প্রভৃতির প্রকৃতি ভাল করিয়া বুঝিলেই বুঝা যাইবে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ রামায়ণ মহাভারতাদিতে নানা মুনির নানা আশ্রমের বর্ণনা আছে। কিন্তু কালিদাস যেমন তন্ন তন্ন করিয়া এই মালিনীতীরের আশ্রমের শান্তিপূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছেন, এরূপ আর কেহ কোথাও দেখান নাই। মরুভূমির মধ্যে যেমন oasis (জল পুষ্প সলিলাদিপূর্ণ শ্যামল ক্ষেত্র), এই সুখদুঃখময়, পাপপুণ্যময় সংসারের মধ্যে তেমনি মুনিদিগের আশ্রমভূমি। আর এই মহর্ষি কণ্বের আশ্রম অন্যান্য সকল আশ্রমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কালিদাসের মনে এই আশ্রমের কবিত্বময় সৌন্দর্য্য চিরবদ্ধমূল ছিল। তিনি তাঁহার প্রত্যেক কাব্যেই যেখানে অবসর পাইয়াছেন সেইখানেই আশ্রম বর্ণনার অবতারণা করিয়াছেন। আশ্রমভূমি যেন ইহলোকে স্বর্গ—"দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্"।

এই অভিজ্ঞান শকুন্তলেই দুটি আশ্রম বা তপোবনের বর্ণনা আছে। একটি ভগবান্ কণ্বের পবিত্র মালিনীতীরস্থ আশ্রম। অপরটি সুরাসুর গুরু ভগবান্ কশ্যপের হেমকূটপর্ব্বতস্থ পুণ্য তপস্যা ভূমি। এই উভয়ের মধ্যেও কবি অনেক পার্থক্য দেখাইয়াছেন। প্রথম আশ্রমটি কবিতাময়, পরম সৌন্দর্য্যময়, শান্তিময় পবিত্র মুনিগণের আবাস ভূমি। দ্বিতীয়টি দেবভাবাপন্ন, অলৌকিকত্ব সম্পন্ন, কঠোর তপস্যার লীলাভূমি। কবি কণ্বাশ্রমের প্রতি একটু অত্যাদর দেখাইয়াছেন। তাহার কারণ মহর্ষি কণ্ব মানুষ

এবং ঋষি এবং ভগবান্ কশ্যপ দেবতা এবং ঋষি। মহর্ষি কণ্ব মানুষের আদর্শ (ideal); ভগবান্ কশ্যপ—সর্ব্বতোভাবে অলৌকিক প্রভাবযুক্ত দেবতা বিশেষ। কশ্যপাশ্রমের বর্ণনা অতিশয় সংক্ষিপ্ত। মালিনীতীরের আশ্রম মহাকবি একটু বিস্তৃত ভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার কারণ মহর্ষি কণ্ব নাটকের একজন প্রধান চরিত্র। তাঁহাকে বুঝিতে হইলে তাঁহার আশ্রম ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। এই আশ্রমের ছবি অতি অপূর্ব্ব। কোথাও শুক পক্ষীর আবাস স্থান বৃক্ষ কোটর হইতে ভ্রষ্ট নীবার ধান্যগুলি বৃক্ষের তলদেশে পতিত রহিয়াছে; কোন স্থানে মুনিরা প্রস্তরের উপর ঈঙ্গুলী ফল ভাঙ্গিয়াছেন বলিয়া প্রস্তরখণ্ডগুলি স্নেহলিপ্ত রহিয়াছে। মৃগেরা নবোদ্গত কুশাঙ্কুর ভক্ষণ করিয়া নির্ভয়ে চারিদিকে বিচরণ করিতেছে। আরণ্য গজ প্রভৃতি ভয়াবহ জন্তু সকল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিলেও কাহাকেও হিংসা করে না। কোথাও অবগাহনান্তে মুনিদের পরিধেয় বল্কল প্রান্ত হইতে জলধারা বিগলিত হওয়াতে জলাশয়ের পথগুলি আর্দ্র হইয়া রহিয়াছে। কোথাও বা আহুতঘৃতোৎপন্ন ধূমোদ্গমে বৃক্ষলতাদির নবপল্লবপত্রাদি মলিন হইয়া রহিয়াছে। কোন স্থানে তাপস বালিকারা স্বপ্রমাণানুরূপ সেচন কলস লইয়া ছোট ছোট গাছগুলিতে জল দিতেছে। বৃক্ষ লতাদির উপর বালিকাদের ভ্রাতৃভাব ও ভগিনীভাব; এবং হরিণ শিশুর প্রতি তাঁহাদের পুত্র বাৎসল্য। "শকুন্তলে"র আলবাল পূরণে নিযুক্ত তিনটি সখীর ভুবনমোহন ছবি আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল রহিয়াছে। স্বয়ং কবিও এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় ছবি ভুলিতে পারেন নাই। অন্যান্য স্থানে আশ্রম বর্ণনার সময় অজ্ঞাতসারে এই ছবিই পুনরঙ্কিত করিয়াছেন। রঘুবংশে বশিষ্ঠাশ্রমের বর্ণনায় আছে;

"সেকান্তে মুনিকন্যাভিস্তৎক্ষণোজ্ঝিত বৃক্ষকম্।
বিশ্বাসায় বিহঙ্গানামালবালাম্বুপায়িনাম্॥"

এখানে এই মুনি কন্যারা আর কেহ নন; ইঁহারা শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা। এই তাপস বালিকারা কোথাও নবকুসুমযৌবনা লতিকার সহিত সহকারাদি পাদপের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পাদন করাইয়া সস্নেহ দৃষ্টিতে আগ্রহের সহিত দেখিতেছেন; কোথাও আবার পুত্রীকৃত মৃগশাবককে নবীন

তৃণ ভোজন করাইয়া কৃতার্থা মনে করিতেছেন। ফল মূলাদি অর্ঘ্যদ্বারা অতিথির সেবা, পূজাদির জন্য পুষ্পাদি আহরণ প্রভৃতি কাজই আশ্রমবাসিদের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম। দরিদ্র ঋষিদের পরিধেয় বল্কল স্নানের পর বৃক্ষশাখায় বিলম্বিত হইয়া শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়। ঈঙ্গুলী ফলের তৈলে তাঁহারা মস্তকের রুক্ষভাব দূর করেন। নলিনী পত্রের সঞ্চালনে তাঁহাদের গ্রীষ্মের সন্তাপ দূর হয়। আবশ্যক হইলে দেহসন্তাপ দূর করিবার জন্য তাঁহারা উশীর লেপন করিয়া থাকেন। ঋষি-রমণীরা মৃনালবলয়ে ও কুসুমহারেই দেবতাবৎ অলঙ্কৃতা। এইরূপ সরলভাবে জীবন যাপন করিয়াও আশ্রমবাসিরা মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সর্ব্বদা যত্নশীল। মুনিশিষ্যেরা পরম পণ্ডিত এবং বহু শাস্ত্রবিৎ। শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত তপোবলসম্পন্ন বিদ্বান্ ঋষি এবং তাঁহারা লোক-চরিত্রজ্ঞ। বেদির আচ্ছাদন জন্য যে শিষ্যটি কুশসংগ্রহ করিয়াছেন তিনিও রাজা দুষ্মন্তের চরিত্র উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন এবং তিনিই শকুন্তলাকে "কণ্বস্য কুলপতেরুচ্ছ্বসিতম্" বলিয়া জানেন। যে শিষ্যটী হোমবেলা ঠিক করিতেছেন তিনিও বলিতেছেন:

"যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্
আবিষ্কৃতোঽরুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।
তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং
লোকো নিয়ম্যত ইবাত্মদশান্তরেষু॥
অন্তর্হিতে শশিনি সৈব কুমুদ্বতী মে
দৃষ্টিং ন নন্দয়তি সংস্মরণীয় শোভা।
ইষ্টপ্রবাসজনিতান্যবলাজনস্য
দুঃখানি নূনমতিমাত্রসুদুঃসহানি॥"

তাপসবালিকারাও সুশিক্ষিতা এবং ইতিহাসাদি নানাশাস্ত্রজ্ঞা। অনসূয়া সুশিক্ষিতা বুদ্ধিমতী তাপসবালা। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে এই আশ্রমভূমি Plain Living এবং High Thinking এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল।

কালিদাস তাঁহার প্রায় প্রত্যেক কাব্যেই নানা স্থানে আশ্রম বর্ণনার অবতারণা করিয়াছেন। রঘুবংশে ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের আশ্রমের কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। "রঘু"র অন্যান্য স্থানে বিশ্বামিত্রের আশ্রম,

বামনাশ্রম, অত্রিমুনির তপোবন, অগস্ত্যাশ্রম, গৌতমাশ্রম প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। কুমারে ভগবান্ স্থাণুদেবের আশ্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। এইরূপ "বিক্রমোর্ব্বশী" এবং "মেঘদূতে"ও আশ্রমের বর্ণনা আছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম বর্ণনা এই মালিনীতীরের আশ্রমের। তাহার কারণ তিনি মহর্ষি কণ্বকে অত্যুন্নত চরিত আদর্শস্থানীয় মহাপুরুষ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহার উচ্ছসিত শকুন্তলা এই আশ্রমের ললামভূতা। মহর্ষি এই আশ্রমের কুলপতি বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুনি। "কুলপতি"র একটা আভিধানিক সংজ্ঞা আছেঃ

মুনীনাং দশসাহস্রং যোঽন্নদানাদি পোষণাৎ।
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিরসৌ কুলপতিঃ স্মৃতঃ॥

প্রত্যেক কুলপতিরই যে দশ সহস্র মুনির অধিনায়ক হইতে হইবে এমন বোধ হয় না। তাহা হইলে আশ্রমের পরিমাণ অত্যধিক বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এমন হইতে পারে ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমের একজন অধিনেতা থাকিত। আভিধানিক অর্থ হইতে এইটুকু বেশ বুঝা যায় যে কুলপতিগণ অতি শ্রেষ্ঠ মহামুনি ছিলেন, এবং তাঁহাদের সংখ্যা যে বড় বেশী ছিল তাহা বোধ হয় না। অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মুনিরাও কুলপতির অধীনে সশিষ্য বাস করিতেন। কুলপতির উপর সশিষ্য মুনিদের অন্নদানাদি পোষণভার ছিল *। রাজার প্রথম মৃগয়ার সময় সশিষ্য বৈখানস তাঁহাকে মৃগবধ হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন। মহর্ষি কণ্ব এরূপ ব্যক্তিরও পোষক এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু। এই বিস্তারিত বর্ণনা হইতে অনায়াসেই বুঝা যাইতেছে মহর্ষি কণ্ব এই আশ্রমের আধ্যাত্মিক রাজা। এক্ষণে বুঝিয়া দেখিতে হইবে মনুষ্যত্বের হিসাবে তিনি কি চরিত্রের মানুষ।

এই আধ্যাত্মিক রাজার প্রিয়তমা কন্যার সহিত তাৎকালিক ভারতবর্ষের রাজচক্রবর্ত্তী দুষ্মন্তের শুভপরিণয় হইয়াছিল। যোগ্যে যোগ্যে মিলন হইয়াছিল কিনা বুঝিবার জন্য মহর্ষি কণ্বের চরিত্র বিশেষরূপে অনুধাবনীয়।

শকুন্তলা মহর্ষির ঔরসজাত কন্যা নহেন, তাঁহার পালিতা কন্যা। কিন্তু এ কথাটা ভুলিয়া গেলেই ভাল হয়। মহাভারতে এইরূপ আছে বলিয়া

* সম্ভবতঃ এই কুলপতি প্রথা হইতে বর্ত্তমান টোল প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে।

বোধ হয় ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য মহাকবি মহাভারতের অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু নাটকে মহর্ষি অথবা শকুন্তলার এমন কোন ভাব প্রকাশ নাই যাহা হইতে ঘুণাক্ষরেও বুঝা যাইতে পারে যে শকুন্তলা তাঁহার পালিতা কন্যা। কাজে কাজেই বলিতেছিলাম পালিত কথাটা ভুলিয়া গেলেই ভাল হয়। মহাভারতের পালিত সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিবার এক কথা এই—পালিত ও ক্ষত্রিয়বর্ণ না হইলে দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার বিবাহ হয় না। কিন্তু ইহা ছাড়া প্রকৃত কারণ আর একটি আছে। ইহাতে মহর্ষি চরিত্রের বড় পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। তিনি শাশ্বতব্রহ্মচর্য্যোত্থিত, অথচ প্রত্যেক প্রাণি, প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থেই তাঁহার স্নেহপূর্ণ মানবীয় ভাব (Human interest) এই জন্য মহর্ষিকে ব্রহ্মচারী না করিলে এই ভাব সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হয় না। এই জন্য এখানে প্রতিভাবান্ মহাকবির কাব্যকৌশল। কবি ইচ্ছা করিলেই মহর্ষিকে অন্যান্য ঋষিদের ন্যায় বিবাহিত বলিয়া এবং শকুন্তলার জন্মদাতা পিতা বলিয়া বর্ণনা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহাতে নাটকের মহান্ উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। তাঁহার নিকট ঔরসজাত কন্যা এবং পালিতা কন্যার প্রভেদ নাই। অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদাও তাঁহার কন্যা নহে। কিন্তু তাঁহাদেরও তিনি ঔরস-কন্যার ন্যায় সমান আদর করেন। শকুন্তলাকে বিদায় দিবার সময় তাঁহাকে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "বৎসে ইমে অপি প্রেক্ষ্যে"। মহর্ষি পূর্ণ সমদর্শী।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি নাটকে মহর্ষির সশরীর দর্শন অতি অল্পই আমরা পাই; প্রথম চারি অঙ্কের ঘটনাস্থান আশ্রম। কিন্তু প্রথম তিন অঙ্কেই কণ্ব মুনি অনুপস্থিত। চতুর্থ অঙ্কের কতকদূর অগ্রসর হইলে তবে আমরা মহর্ষির প্রথম দর্শন পাই। প্রথম তিন অঙ্কের ঘটনার সময় তিনি সোমতীর্থে ছিলেন। তিনি দুহিতা শকুন্তলাকে অতিথিসৎকার কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া শকুন্তলারই প্রতিকূল দৈবের শান্তির জন্য সোমতীর্থে গিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র ঘটনায় আমরা মহর্ষির উচ্চশ্রেণীর মানবিকতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখিতে পাই। মহর্ষি শাশ্বতব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী হইয়াও শকুন্তলাকে দুহিতা পাইয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে নিজেরই দুহিতা করিয়া লইয়াছেন। মহর্ষির এক শিষ্যের মুখেই এই ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। শকুন্তলা, "কুলপতি

কণ্বের নিশ্বাস বায়ু."। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রত্যেক পাঠকেরই ভুলিয়া যাওয়া উচিত যে শকুন্তলা মহর্ষির পালিত কন্যা। তিনি শকুন্তলার জন্য যাহা যাহা করিয়াছেন তাহা পূর্ণতাপ্রাপ্ত আদর্শমানুষের—আদর্শ পিতার—নিজের কন্যার জন্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কন্যাকে পুত্রেরই ন্যায় পালন করিতে হইবে এবং উপযুক্তরূপে শিক্ষা দিতে হইবে। এই সোমতীর্থ গমনই কন্যাপালনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। একালের লোকেরা অনেকে প্রতিকূল দৈব মানেন না। কিন্তু সেকালের লোকেরা মানিতেন। ইহার কিছু কারণও আছে। এমন কতকগুলি ঘটনা আছে যাহার উপর মানুষের কোন হাত নাই। সেগুলি ভবিষ্যতে প্রতিকূল হইবে এরূপ বুঝিলে মানুষ অক্ষম হইলেও তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করে। যেখানে সহজ উপায়ে হয় না সেখানে ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়া তাহার উপশম করিবার চেষ্টা করে। রোগ হইলে যেমন চিকিৎসার আবশ্যক, ভাবি বিপদের আশঙ্কা হইলে তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করা সেইরূপ মানুষের কর্ত্তব্য। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্। তাঁহার প্রভাবে প্রতিকূল দৈবের উপশম হইতে পারে। এই জন্য মহর্ষি স্বীয় কন্যার ভাবি বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া সোমতীর্থে কোন রূপ ঐশ্বরিক ব্যাপারে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। যাঁহাদের মনোবৃত্তিগুলি স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণ ভবিষ্যৎ দেখিতে পান এবং ভাবি বিপদের প্রতিকারের জন্য কোথায় গেলে কি করিলে ফল লাভ হইবে তাহাও বুঝিতে পারেন। ইহারই জন্য কণ্ব মুনির সোমতীর্থে গমন। যাঁহারা এইরূপ দৈবশক্তি মানেন না তাঁহারা অন্ততঃ এইটুকু মানিবেন যে সর্ব্বদাই ভগবানের কাছে বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করা যায়; এবং এই ঘটনা হইতে ইহাও বুঝা যায় মহর্ষি কন্যাকে কত আদর করিতেন এবং তাঁহার জন্য কি না করিতেন। তপস্যা মহর্ষির জীবনের ব্রত। কিন্তু তিনি কন্যার জন্য একটা সাংসারিক ব্যাপারে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মচারী; তাঁহার এত ঝঞ্ঝাট কেন? ইহার উত্তর—মহর্ষি কণ্ব তপস্যানিরত ঋষি এবং মানুষ। মানুষের উচ্চ কর্ত্তব্য তিনি ভুলেন নাই—পৃথিবীর লোকের উপকারের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই আত্মনিয়োগ কর্ত্তব্য একথা তিনি ভুলেন নাই। তাই তিনি সোমতীর্থে গিয়াছিলেন।

প্রত্যেক পিতারই কর্ত্তব্য পুত্র কন্যার শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করা এবং তাহাদের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা যত্নবান্ হওয়া। কর্ত্তব্য বলিয়া ইহা করা উচিত। ইহা কামনাযুক্ত কাজ নহে। ভগবদারাধনার জন্য মহর্ষি সোমতীর্থে গিয়াছিলেন। কর্ত্তব্য পালনের জন্য এই আরাধনা। ইহাও নিষ্কাম।

সোমতীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর, ভগবান্ কণ্বের যে কার্য্যকলাপ আমরা দেখিতে পাই, তাহাও তাঁহার ন্যায় মহর্ষির উপযুক্ত এবং তাঁহার উচ্চশ্রেণীর মহত্ত্বের পরিচায়ক। প্রিয়ংবদার মুখে আমরা আশ্রম প্রত্যাগত মহর্ষির এই অনন্যসাধারণ মহত্ত্বব্যঞ্জক গুণের পরিচয় পাই। তিনি অগ্নিগৃহে প্রবিষ্ট হইতেছেন এমন সময়ে ছন্দোময়ী অশরীরিণী বাণী তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল ঃ

"দুষ্মন্তোহিতংতেজোদধানাং ভূতয়েভুবঃ।
অবেহি তনয়াং ব্রহ্মন্নগ্নিগর্ভাং শমীমিব॥"

তিনি দুষ্মন্ত শকুন্তলাঘটিত বৃত্তান্ত সমস্তই অবগত হইলেন। নাট্যকৌশলের জন্য এই অশরীরিণী বাণীর প্রয়োজন। ব্যাপার খুব সংক্ষিপ্ত হইয়া গেল। গৌতমী অথবা অন্য কোন পূজনীয়া আশ্রম-রমণীর নিকটও তিনি এই বার্ত্তা পাইতেন। যাঁহারা অলৌকিকে বিশ্বাস করেন না তাঁহারা এইরূপই মনে করিয়া লইতে পারেন। এই বৃত্তান্ত শুনিয়া মহর্ষি কি করিলেন? অন্য লোক হইলে হয়ত এইরূপ সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইত; পিতার অধিকার লুপ্ত হইল মনে করিয়া হয়ত ক্রোধে অতিশয় অধীর হইয়া পড়িত। কণ্ব কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে প্রকৃত অবস্থা বুঝিলেন। যাহা হইয়াছে, তাহা অতি শুভ হইয়াছে, এইরূপ বুঝিলেন। যাহা ঘটিয়াছে তাহা কেবল দুটি বংশের মঙ্গলের জন্য নয় পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য ঘটিয়াছে। "ভূতয়ে ভুবঃ" এই কথাটী মহর্ষির সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইল। বুদ্ধিমতী অনসূয়াও এই ব্যাপারটি ঠিক বুঝিয়াছিল। শকুন্তলার স্বয়ংবর বিবাহ লইয়া অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার মধ্যে কথোপকথন হইতেছিল ঃ

প্রিয়ংবদা—পিতা এক্ষণে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া না জানি কি করিবেন।

অনসূয়া—আমি যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয় এই গান্ধর্ব্ব বিবাহ তাঁহার অনুমত হইবে।

প্রিয়ংবদা—কিরূপে তাহা সম্ভব ?

অনসূয়া—গুণবান্ পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতে হইবে ইহাই কন্যার পিতার প্রধান সঙ্কল্প। যদি দৈবই তাহা সম্পাদন করেন, তাহা হইলে বিনা আয়াসে গুরুজন কৃতার্থ হইলেন।

মহর্ষি কণ্ব নিমেষের মধ্যে এই কথাই বুঝিয়াছিলেন। তাই অনসূয়ার মুখে এই কথা পূর্ব্ব সূচিত হইয়াছে। মহর্ষি পরম জ্ঞানী তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ।

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন।

দ্বারকার পথে।

(৬)

মনে করিয়াছিলাম ভয়ানক বকিব, কিন্তু তাহা হইল না। তিনি জটিলেশ্বর ষ্টেসনে কি করিয়াছিলেন তাহারই পরিচয় দিলেন। বুঝিলাম ষ্টেসন মাষ্টার খুব সদয়-হৃদয়; পূর্ণচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন তিনি সকলই করিয়াছেন—মায় পোরবন্দরে টিকিটের নম্বর দিয়া তার করা পর্য্যন্ত। পরে একখানি গাড়ী আছে শুনিয়া তাহাতেই ধোরাজী আসা মনস্থ করিয়াছিলেন। বকুনি হইল না বটে কিন্তু আমাদের উভয়ের মধ্যে কাহার? মনে শান্তি রহিল না। কেন এরূপ দৈব-দুর্ঘটনা হইল—এই চিন্তাই বলবতী। তাহার উপর, আমাদের রিটর্ণ টিকিট আছে। শুধু এক স্থানের নয়; নাগপুর হইতে হাবড়া দ্বিতীয় শ্রেণী আছে। সুরত হইতে নাগপুর দ্বিতীয় শ্রেণী আছেন। অমুক দিনের মধ্যে কলিকাতা ফিরিতে হইবে—আবার অমুক দিন নিশ্চয়ই আদালত খুলিবে—সেদিন ত উপস্থিত হইতে হইবে। আমরা এই সব হিসাব মাথায় ধরিয়া তবে টুর ও হল্ট প্রোগ্রাম করিয়াছিলাম অর্থাৎ গতি স্থিতির একটা খসড়া হিসাব করিয়া ছিলাম—

কেন লাট সাহেব সফরে বাহির হইয়াছেন। সুতরাং একটা দিন অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা নষ্ট হওয়ায় আমাদের উভয়েরই মনে একটা অশান্তির ছায়া পড়িয়াছিল। বসিয়া ভাবিতেছিলাম।

ষ্টেসন মাষ্টার বার বার বলিলেন ২৪ ঘণ্টা বসিয়া থাকা অপেক্ষা গীর্ণার পাহাড় দেখা কর্ত্তব্য। আমি বলিলাম ফেরৎ যাত্রায় দেখিব মনস্থ করিয়াছিলাম। এখন সেখানে যাইলে অন্তত একদিন আরও বিলম্ব হইবে, তাহাতে যদি পোরবন্দরে জাহাজ না পাওয়া যায়—কেন না নির্দ্দিষ্ট দিনে দিনে জাহাজ ছাড়িবার রীতি আছে—তাহা হইলে ভ্রমণ-নির্দ্দিষ্ট-সময় সব বদলাইয়া যাইবে। তাহাতে নানা ক্ষতি হইতে পারে। আমার এক সাহেব মক্কেলের এক মোকদ্দমা আমার উপর নির্ভর। দিনের দিন না পঁহুছিলে তাহার গতি কি হইবে ও পরে আমার গতি সাহেব কি করিবেন? ষ্টেসন মাষ্টার মহাশয় এ সব কথা শুনিয়া বলিলেন আপনার কাজ আপনি ভাল বুঝেন—আমি কেবল এই দুঃখ করিতেছিলাম যে এতটা কাছে আসিয়া গীর্ণার দেখিলেন না। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। পূর্ণচন্দ্রের ইচ্ছা আমরা গীর্ণার যাই কিন্তু ২৪ ঘণ্টা নষ্ট করিয়াছে বলিয়া সে আর সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পারিতেছিল না। আমি অনেক ভাবিলাম, অনেক চিন্তিলাম, শেষে গুরু-দেবকে নিভৃতে আত্ম-নিবেদন করিলাম। মনে শান্তি আসিল—ঠিক হইল এ যাত্রায় গীর্ণার যাওয়া হইবে না। ফেরৎ যাত্রায় যাইব। ইহাতে যদি কোন বাধা হয় অর্থাৎ এ পথে ফেরৎ না আসা হয় তবে জানিব সেও ভগবানের ইচ্ছা। আমি নিজের উপর দায়িত্ব রাখিলাম না—সবটা তাঁর উপর ফেলিয়া দিলাম—নিজে হাল্‌কা হইলাম। মনকে বলিলাম, মন তুমি ত সাধু দেখিতে যাইবে? যদি না দেখা পাও? যদি দেখা পাইয়াও না চিনিতে পার। তবে ত সব বিফল হইবে। এরূপ স্থানে গমন করিলে হিন্দুর পক্ষে অন্তত ৩ দিন তীর্থবাস করিতে হয়। আমার যে যাওয়া এ যেন মিলিটারি পরীক্ষা। আবার সাধু দর্শন করিতে আর কোথায় যাইব? আমার গুরুদেব অপেক্ষা কে বড় সাধু আছেন? আর যাইবা মাত্র যে গীর্ণারে সিংহ বেড়াইতেছে দেখিতে পাইব এত ভাগ্যই বা কোথা? অতএব সুতরাং কাজে কাজেই আমি এ যাত্রা গীর্ণার দেখিতে

যাইব না। মনে মনে এই সঙ্কল্প আঁটিয়া প্রকাশ্যে বলিলাম "পূর্ণ, চল ধোরাজী দেখিয়া আসি—স্বাধীন হিন্দু রাজার রাজধানী। স্বাধীন না হইলেও বন্ধু ত বটেন।" পূর্ণচন্দ্র তখন সেই মিহির উপর খাপ সুর বাহির করিয়া বলিলেন "চলুন, তাই ধোরাজী চলুন।" তখনই একখানা ঘোড়ার গাড়ী ডাকা হইল—সেই গাড়ী করিয়া মহাজনেরা আসিয়াছিল, গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু ঐ সুর পূর্ণর অনিচ্ছার সুর, ইহা আমার জানা ছিল।

তখন তামাক খাইবার ইচ্ছা হইল। পূর্ণচন্দ্রের মুখ এই কথা শুনিয়া অমাবস্যায় পরিণত হইল। জবাব নাই। আমি (অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া) —ব্যাপার কি? উত্তর—টিকে নাই তামাক খাওয়া অসম্ভব। মাথায় বজ্রাঘাত পতিত হইল। জিজ্ঞাসায় জানিলাম টিকে সে দেশে নাই। সে দেশে তামাক কেহ খায় না। দেশের উপর অত্যন্ত ঘৃণা হইল—মনে হইল কালাচাঁদের দেশে টিকে নাই তামাক নাই—হায় বিধির বিড়ম্বনা। যখন কথাটা উঠিয়াছে তখন একেবারে শেষ করিয়া দিই। ধোরাজীতে অনেক চেষ্টায় পাইলাম না। এক জনের কথামত রজকালয়ে গমন করি—সেখানে গুল মিলিল না। কয়লা (অঙ্গার) মিলিল। তখনই পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম সে সব কয়লা ধরে না। যাহাহউক ধোরাজী হইতে ফিরিয়া আসিয়া ষ্টেসনের একজন কুলীকে বলিলাম "পয়সা দেব—কয়লা তৈয়ারি করিয়া দে।" তাহাকে প্রথা বলিয়া দিলাম। একটা গর্ত্ত কাটা হইল। শুষ্ক ডাল আদি জ্বালাইয়া গর্ত্তে দিলাম। ষ্টেসন-মাষ্টার উচ্চ অগ্নিশিখা দেখিয়া ছুটিয়া আসিলেন—সব শুনিলেন। শেষে আমাদের সঙ্গে মাতিয়া গেলেন। পোড়ান হইলে মাটী চাপা দেওয়া হইল অনেক পরে তোলা হইল। আমাদের টিন ছাপাইয়া গেল—কাপড়ে করিয়া কয়লা বাঁধিয়া লইলাম। কিন্তু গাছের দোষে ঠিক সুবিধামত কয়লা প্রস্তুত হইল না। যাহাহউক যখন এক ছিলিম নূতন কয়লা দিয়া খাইলাম তখন সকল শোক তাপ দূরে গেল—মনে মনে ওয়ালটার রেলের আত্মাকে অভিবাদন করিলাম ও জাহাঙ্গীরের আত্মাকে শত সেলাম করিলাম। তারপর পোরবন্দরে গিয়া একটি বাঙ্গালীর বাড়ীতে আবার কয়লা যাচ্ঞা করিয়া ছিলাম—পাইয়াও

য়। যখন তাহা ফুরাইল তখন একেবারে চক্ষু স্থির। সে সব কথা পরে ব। এখন চলুন, গাড়ী দাঁড়াইয়া, ধোরাজী যাই। গাড়ীখানি না টঙ্গা কটন—অথচ দুইয়ের সংমিশ্রণ। ঘোড়া দুইটী খুব বলবান—আর বেগ

তীর তারা উল্কা বায়ু কোথা আছ কেবা।
বেগ শিখিবারে সব ধোরাজীতে যাবা॥

ড়ীতে উঠিবার অগ্রে একবার সতৃষ্ণ নয়নে ধোরাজী দেখিলাম—দেখিলাম কিরণে ঝক্ ঝক্ জ্বলিতেছে কতকগুলি কলস। আরও দেখিলাম প্রাকারের উপরকার চূড়াঘর (turret) সহরের দুই কোণে দুইটী ও গেটের নিকট একটী। অতিশয় উচ্চ। দেখিয়াই বুঝিলাম পূর্ব্বকালের টি—শত্রু আসিতেছে কি না দেখিবার জন্য, বা কতদূরে শত্রু দেখিবার এই সকল চূড়াঘর সৃষ্টি হইয়াছিল। থাক্ সে সব অতীতের কথা। নানে গাড়ীতে উঠিবা মাত্র সারথী দ্বিতীয় নলের ন্যায় অশ্ব চালনা রিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে আমরা "ধোরাজী—গণ্ডাল" বড় রাস্তায় সিয়া পড়িলাম। রাস্তার বাম পার্শ্বে দেখিলাম ট্রাম গাড়ীর আড্ডা। রথীকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন সংবাদই পাইলাম না। মনে হইল গণ্ডাল তে ধোরাজী পর্য্যন্ত বোধ হয় ট্রাম চলিবে। যাহাহৌক রাস্তাটী বড় র—অতি প্রশস্ত আর রাস্তার দুই পার্শ্বে বড় বড় বৃক্ষ পথিককে ছায়া ন করিতেছে। রাস্তার পরই দুই পাশে মাঠ। কৃষকগণ কৃষিকার্য্য রিতেছে। হু হু করিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল, ক্রমে আমরা তোরণ-দ্বারে সিয়া পঁহুছিলাম। সহরে প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম রাস্তার দক্ষিণ কের একটী বাটী হইতে দলে দলে বালিকারা পুস্তক হস্তে নামিতেছে। মার দৃশ্যটা ভাল লাগিল না। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম শুধু বালিকা দ্যালয় নহে, যুবতী-বিদ্যালয় পর্য্যন্ত আছে। একাংশে যুবতী-বিদ্যালয় কাংশে বালিকা-বিদ্যালয়। রাজা অনেক টাকা ব্যয় করেন, পড়াইবার ষ্ট মেম পর্য্যন্ত আছেন। একটা কথা এই স্থানে বলিয়া রাখি, এবার রে বাহির হইয়া অনেকগুলি হিন্দুরাজ্য দেখিয়াছি আর সকলগুলিতে খিয়াছি বালিকা-বিদ্যালয় ইত্যাদি। সকল গুলিতে লেডী ডফারিণ হাস-তাল। মেয়ে ডাক্তার কোথাও আছে, কোথাও নাই বটে কিন্তু ডাফরিণ

হাসপাতাল সর্ব্বত্র। আর "স্বদেশীর" নির্য্যাতন—কোথাও দেশী চিনি বা দেশী লবণ পাইবার যো নাই। সব বিলাতী ও বিদেশীয় চীজ্ বস্তু। কেন এমন হয় মনে প্রশ্ন হইল? সদুত্তর পাইলাম। আত্মরক্ষার জন্য। প্রশস্ত রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে এক ছুতারের দোকানের নিকট গিয়া মাতুলীর রথ ভাঙ্গিয়া গেল। ছুতারের দোকানের নিকট যে গাড়ী ভাঙ্গিয়াছিল পরে টের পাইলাম। যাহাহৌক সারথীকে খুব এক চোট বকিলাম। তাহাতে ও আগন্তুক দেখিয়া অনেক লোক দাঁড়াইয়া গেল। সারথী কহিল একটু বসুন, না হয় নামিয়া পাদচারণা করুন, এখনই গাড়ী ঠিক করিয়া লইতেছি। তখন চাহিয়া দেখিলাম, দোকানে ছুতারের যন্ত্রগুলি দেওয়ালের গাত্রে ও পার্শ্বে সাজান। ইংরেজী কায়দা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দোকান ঘরটী পাকা কুঠারী নূতন চুণকাম। ধপ্‌ধপে। আরও দেখিলাম নিকটেই ইদারা—নানা বর্ণের পরিচ্ছদে ভূষিতা রসবতী রঙ্গিণীগণ সঙ্গিনীসহ জল লইতে আসিয়াছেন, কেহ বা অবগুণ্ঠনবতী কেহ বা নহেন। বেলা তখন গড়াইয়া পড়িয়াছে—বস্ত্রক্ষালনের সময়ও বটে। কতক জল লইয়া প্রতিগমন করিতেছেন। কতক জল তুলিতেছেন—কতক বা আপনার সময় অপেক্ষা করিতেছেন। আমাদিগকে দেখিয়া অনেকে দাঁড়াইয়া গেলেন। নিশ্চয়ই বলিতে পারি অবগুণ্ঠন হইলেও তীব্র তীক্ষ্ণ সমালোচন চলিয়াছিল। নিমচাঁদ অটলকে বলিয়াছিল "আমার মনে হইল তোরে বাড়ীতে একটা দ পড়েছে।"

অটল—দ কেন রে?

নিমচাঁদ—দ নহিলে কি এত পদ্মফুল একত্রে দেখা যায়।

যাহাহৌক আমরা রাস্তায় দাঁড়াইয়া এটা ওটা দেখিতেছি আর প্রতি মুহূর্ত্তে সমবেত লোক সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। কেহ কাহারও ভাব বুঝে না—সে এক রকম বেশ। ক্রমে গাড়ী মেরামৎ হইল, তখন আমরা গণ্ডালের ঠাকুর সাহেবের ধোরাজীর বাসভবন দেখিতে গেলাম। রাস্তাগুলি এবার গলি তবে গাড়ী যায়—যে কোন পশ্চিমের সহরের মত বাটী অধিকাংশ পাথরের। এদিক ওদিক দেখিয়া বড় ধ্বজা উড়িতেছে দেখিয়া একটী বাড়ীতে গেলাম—জানিলাম সেটী ঠাকুরবাড়ী। কাঁসারী

হইতে একটা তামার ঘটি কিনিয়া লইলাম—ধোরাজীর স্মৃতি চিহ্ন। র পর চক্ দেখিলাম। কিছু ফল কিনিবার প্রয়োজন হওয়ায় চেষ্টা রিলাম,—ছোট ছোট বুনো আতা, বলে এক আনার কম দিব না। একটা টালী কলা এক পয়সা কখনও বা দুই পয়সা। দেশী চিনির নামমাত্র নাই তরাং খাবার কেনা হইল না। কাশীর ন্যায় মধ্যে মধ্যে ষাঁড় যথেচ্ছ চরণ করিতেছে—দেখিয়া বুঝিলাম—এটী হিন্দু-রাজ্যের পূর্ণ লক্ষণ। কা ও ভামাকের চেষ্টা অনেক হইল কিছুতেই মিলিল না। এক জন দীতে বলিল "রজকালয়ে যান"। সেখানে গিয়া যে ফল তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত রিয়াছি। যখন ফিরিয়া আসিলাম—সেই প্রথমোক্ত ইদারার কাছে ন সন্ধ্যা হয় হয়। গাড়ী-ওয়ান ছুতারের সহিত হিসাব নিকাশ করিতেছে ন সময় একজন ভদ্র মুসলমান বাঙ্গালা ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়র নিবাস কোথা"। আমিত একেবারে অবাক্—এ কি? এখানে লা বুলি বলে, এ কে? তখন সে ব্যক্তি পরিচয় দিল। কলিকাতার ণীহাটায়, ভদ্রেশ্বরে বৈদ্যবাটিতে তাহার সব ব্যবসা আছে। আমাকে ন আপনাকে যেন কোথা দেখিছি দেখিছি মনে হচ্চে, যেন খুব চেনা । আমি বলিলাম বোধ হয় বৈদ্যবাটীতে দেখিয়া থাকিবে। যাহাক তাঁহার নিকট অনেক সংবাদ পাইলাম। ঠাকুর সাহেব ধোরাজীতে একটা থাকেন না—থাকেন গণ্ডালে। তবে মধ্যে মধ্যে এখানে সেন। তাঁহার রাজ্যে অনেক মুসলমান প্রজা আছে। সমুদয় সহরটী টী দুর্গ-প্রাচীরে ঘেরা, প্রবেশের জন্য দ্বার আছে। রাত্রি দশটার পর রজা বন্ধ হয়, তখন আর কেহ বাহিরে যাইতে পারে না—বা ভিতরে শ করিতে পারে না। লেডী স্কুল ও গার্ল স্কুলের বড় উন্নতি। প্রাইজ স্কার) দিবার সময় সাহেবরা আসেন, বড় বড় বক্তৃতা হয়—খানা মধ্যে মধ্যে রেসিডেণ্ট সাহেব সহর দেখিতে আসেন। ধোরাজীর মানেরা বড় উদ্যোগী পুরুষ। অনেক স্থানে তাহাদের কারবার। তের এমন স্থান নাই যেখানে ধোরাজীর মুসলমানদের ব্যবসা বাণিজ্য । সকলেই ধনকুবের; তাঁহারও বাড়ী ধোরাজী। তিনি এখন বিশ্রাম ভোগ করিতেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

মুসলমান ভাই সাহেব সঙ্গে সঙ্গে তোরণ পর্য্যন্ত আসিলেন, আমি আ
আসিতে নিবারণ করিলাম। তিনি চলিয়া গেলে তোরণ পার হইয়া বা
দিকের বাগানে গেলাম। এক দিকে যাইতেছি এমন সময় একজন চুট
আসিয়া বারণ করিল "মহাশয় যাবেন না—ফিরুন।" আমি বলিলাম ফি
কেন? তখন বলিল এইখানে লেডী স্কুলের জেনানাদের থাকিবার স্থা
আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া অপর দিকে চলিয়া গেলাম। দুর্গপ্রাচীরে এ গাছে
মাথায় ও গাছের মাথায় সব ময়ূর বসিয়া আছে। গাছে জল দিবা
প্রয়োজন। তাই এক ব্যক্তি জল তুলিতেছে—বড় বড় মহিষ অনেক
পিছাইয়া যাইতেছে, আর ডোঙ্গাশুদ্ধ জল উঠাইতেছে। জল ঢালি
লইয়া ছাড়িয়া দিল ও মহিষগুলি কূপের দিকে অগ্রসর হইতে লাগি
যখন নিকটে আসিল তখন চর্ম্ম ডোঙ্গা বিশাল শব্দসহকারে জলে প
জল উঠিল, আবার ইঙ্গিত পাইয়া মহিষদ্বয় পিছাইয়া পিছাইয়া নির্দ্দিষ্ট
পর্য্যন্ত গেল। আবার জল তোলা—আবার যাওয়া আসা—আবার যা
আবার আসা। মনে পড়িল জীবের জনম মরণ, মরণ জনম, জনম
মরণ জনম—যাওয়া আসা, আসা যাওয়া। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া বা
জল তোলা দেখিলাম। আর দেখিলাম ময়ূরের ক্রীড়া। যেখানে যে
ময়ূর—সমতল ভূমিতে, গাছ, নগর-প্রাচীরের মাথায়। ওদিক হ
ফিরিয়া আসিলে দুই জন মুসলমান যুবকের সহিত আলাপ হইল। তাঁ
সংবাদপত্রে কংগ্রেসের বিবরণ পাঠ করিতেছিলেন ও দুঃখ প্রকাশ করি
ছিলেন। কংগ্রেসটা ভাঙ্গিয়া যাবার জন্য দুঃখ।

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

পূজার চাট্‌নী।

১

মুসলমান চাষা গ্রামস্থ জমিদারের বাটী দুর্গা প্রতিমা দেখিয়া সমস্ত মূর্ত্তিগুলির অনুকূলে সমালোচনার পর গণেশকে দেখিয়া বলিয়াছিল, "সুমুন্দি তো তামুক খাবার বাগ পায় না।"

২

পূজা বাটীতে ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন হইয়াছে। প্রবেশ নিষেধ। রবাহূত তিনজন পেটুক ব্রাহ্মণ কোনরূপে বাটীর ভিতর প্রবেশের চেষ্টা দেখিতেছেন। দুইজন, দ্বারবানের চক্ষে ধূলি দিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল; কিন্তু, তৃতীয় ব্যক্তি যেমন প্রবেশ করিতে যাইবে, অমনি দরোয়ানের চক্ষে পড়িল। তখন একটা টানাটানির পালা পড়িয়া গেল। দরোয়ান টানে বাহির দিকে ঠ্যাং ধরিয়া ও ব্রাহ্মণ সঙ্গীদ্বয় টানে ধড় ধরিয়া বাটীর ভিতর দিকে। তৃতীয় ব্যক্তি এইরূপে উভয় দিক হইতে আকৃষ্ট হইয়া তাহার সঙ্গীদ্বয়কে বলিল, ভাইরে! দ্বিখণ্ড হই তা'তে ক্ষতি নাই কিন্তু যে দিক্‌টাই তোমরা পাও মুখে হয়, উদরে হয় দুখানা লুচি পুরিয়া দিও পূজোটা অমনই না যায়।

৩

পূজা উপলক্ষে বোসেদের নব বিবাহিত জামাই শ্বশুর বাটী আসিয়াছে। পাড়ার অনেকে জামাই দেখিতে আসিয়াছে। ঠাকুরদা সম্পর্কীয় একজন ঠাট্টা করিয়া জামাইকে অপ্রস্তুত করিতে বলিলেন "আপনার সুন্দর মুখ খানির উপর যেন একটা বাঁদুরে ছায়া পড়েছে।" জামাই বাবু অতি সঙ্কুচিত হইয়া উত্তর করিলেন, "বটে মহাশয় তা আগে তো জানিতাম না যে আমার মুখে আয়নার কাজ করে"।

৪

একজন পল্লীগ্রামবাসী ব্রাহ্মণ সন্তান পূজার বাজার করিতে কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার পরিচিত এক বাবুর বাসায় উঠেন। ঐ সহুরে বাবুটী

পাড়াগাঁয়ের ব্রাহ্মণটীকে বেয়াকুব বানাইবার জন্য, পরদিন প্রাতঃকালে পরামাণিক কামাইতে আসিলে তাহাকে, ব্রাহ্মণকে কামাইবার কালে আঁচড়াইয়া, চড়াইয়া নানারূপ লাঞ্ছনা করিয়া কামাইতে শিখাইয়া দেন। পূর্ব্বনিদেশানুযায়ী নাপিত ব্রাহ্মণকে কষ্ট দিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ঐ নাপিতকে ধীর ভাবে কামাইতে অনুরোধ করিলেন; তাহাতে ঐ নাপিত উত্তর করিল—" মনে করুন ১০।১৫ মিনিট আপনাকে বাঘে ধরিয়াছে। " ব্রাহ্মণ এই কথার কোনও জবাব না দিয়া স্থির ভাবে কামাইয়া লইলেন এবং তৎপরে উঠিয়া সহসা ঐ নাপিতকে আক্রমণ করিয়া কীল, চড়, লাথি মারিতে আরম্ভ করিলেন, এবং বলিলেন, "বাপু! মনে কিছু করিও না, ভাব তোমাকে খানিকক্ষণ ব্রহ্মদৈত্যে পাইয়াছে।"

শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক।

মৃত্যুর পর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গীতার দ্বাদশাধ্যায়ে অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১

যে সকল ভক্তগণ সততযুক্ত হইয়া এইরূপ সাকার সগুণরূপে তোমাকে উপাসনা করেন, আর যাঁহারা অব্যক্ত অক্ষর (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম)রূপে তোমার উপাসনা করেন, এই উভয়ের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ ?

শ্রীভগবানুবাচ—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২
যেত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কুটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততোমামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১
শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২

যে সমস্ত নিত্যযুক্ত ভক্ত আমাতে মনোনিবেশ পূর্ব্বক পরম শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই আমার মতে যুক্ততম (প্রধান) যোগী—অর্থাৎ তাঁহারাই যোগিশ্রেষ্ঠ। ২

ইন্দ্রিয়বর্গ সংযম পূর্ব্বক যে সকল সর্ব্বত্র-সমবুদ্ধি সর্ব্বভূত হিতব্রত জ্ঞানীগণ আমায় ধ্রুব অচল কূটস্থ চিন্তাতীত অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত অক্ষর বিশ্বব্যাপী স্বরূপের উপাসনা করেন, তাঁহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩। ৪।

আমার কেহ অব্যক্ত স্বরূপের উপাসনার জন্য যাঁহাদিগের চিত্ত আসক্ত পক্ষে হইয়াছে তাঁহাদিগের ক্লেশ অধিকতর; যেহেতু দেহধারী জীবের আমার অব্যক্ত স্বরূপের লাভ নিতান্ত দুঃসাধ্য। ৫

কিন্তু যাঁহারা একান্ত ভক্তিযোগের দ্বারা সমুদয় কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া আমারে ধ্যান করত উপাসনা করেন, হে পার্থ, আমি মৃত্যুযুক্ত সংসার সমূহ হইতে শীঘ্রই আমাতে নিবেশিত চিত্ত তাঁহাদিগের উদ্ধারকারী হই। ৬। ৭

আমাতেই মনঃ স্থির কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবেশ কর; তাহা হইলে উর্দ্ধদেশে আমাতেই (আমার ব্রহ্মস্বরূপেই) অবস্থিতি করিবে, সংশয় নাই। ৮

হে ধনঞ্জয় যদি আমাতে চিত্তস্থির রাখিতে না পার, তবে অভ্যাসযোগ দ্বারা অর্থাৎ সদ্‌গুরূপদিষ্ট উপায় দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে প্রযত্ন কর। ৯

চিত্ত সমাধানের নিমিত্ত অভ্যাসেও যদি অসমর্থ হও, তাহা হইলে আমার উদ্দেশে কর্ম্মের অনুষ্ঠান পরায়ণ হও। আমার উদ্দেশে কর্ম্মের আচরণ করিলেও সিদ্ধিলাভ করিবে। ১০

আমায় ভক্তিযোগ আশ্রয় করিয়া এইরূপে কর্ম্মের অনুষ্ঠানেও যদি অসমর্থ হও, তাহা হইলে আত্মসংযম পূর্ব্বক সমস্ত কর্ম্মের ফল কামনা পরিত্যাগ কর। ১১

সম্যক্ জ্ঞান রহিত অভ্যাস হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান শ্রেষ্ঠ; প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে প্রত্যক্ষ বিষয়ের ধ্যান শ্রেষ্ঠ; উক্তরূপ ধ্যান হইতে কথিতরূপ কর্ম্ম ফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ; এইরূপ ত্যাগ হইতে শীঘ্রই শান্তি হইয়া থাকে। (শান্তি= মুক্তি)।

ক্রমশঃ

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

জ্যোতি-কুমারী।

[গল্প]

(৫)

এব ধক্ ধক্ ধক্ করিয়া সহস্র জিহ্বায় অগ্নি ক্রমেই ভীষণ হইতে ষণতর হইতে লাগিল। যেদিক হইতে বায়ু বহিতেছিল, তাহার বিপরীত ক একেবারে ধূমে আচ্ছন্ন হইল; সে দিকে আর কিছুই দেখা যায় না। রিয়াম্—শুষ্ক শীর্ণ ম্রিয়মানা মিরিয়াম্, তিনদিক বেশ দেখিতে পাইতেছে; োকেরাও সেই সকল দিক হইতে তাহাকে প্রাসাদ উপরি আবদ্ধা খিতেছে। স্বয়ং টাইটস্ অশ্বারোহণে সৈন্যাধ্যক্ষ ভাবে বিচরণ করিতেছেন; িরিয়াম্ দেখিলেন, টাইটস্ তাহাকে প্রাণে না মারিতে আদেশ দিলেন। নোনী যুদ্ধ করিতে করিতে আসিল; মিরিয়ামকে দেখিল, চিনিল; যুদ্ধ রিতে করিতে বহ্নি সাগরে ঝম্প প্রদান করিল; মিরিয়াম্ মাতামহের রিণাম দেখিল; ভগবানকে স্মরণ করিল। বসিয়া পড়িল, শয়ন করিল; জ্ঞা হারাইল। বাহ্য সংজ্ঞা শূন্য, কিন্তু কত স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। নব ধর্ম্মী শাপন্থীদিগের কত পুরাণ কাহিনী, তাহার চক্ষে, প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত ইতে লাগিল। যেন কোন বাজীকর, তাহার সম্মুখে পট খুলিতেছে ও কিতেছে। স্বপ্ন হইতে ক্রমে সুষুপ্তি হইল। মোহ ভঙ্গের পর, একটু বেদনা পাইল; কিন্তু তখন অগ্নিরাশি চারিদিকে চৌগুণ জ্বলিতেছে।

য়ূদীদিগের সর্ব্বনাশ সাধন হইল। য়ূদীরা অতি প্রাচীন জাতি; সমৃদ্ধি ম্পন্ন জাতি; আপনাদিগকে পরমেশ্বরের প্রিয়তম জাতি বলিয়া বিশ্বাস করে। সেই বিশ্বাসে তাহারা দৃঢ় ভক্তি হৃদয়ে পোষণ করে। নর নারী— দেখিতে সুন্দর সুশ্রী; অনেকেই দীর্ঘজীবী। সঙ্গীতপটু; অন্যান্য কলায় বিশেষ পারদর্শী। যে কালের কথা বলিতেছি, তাহার এগারশত বার বৎসর পূর্ব্বে, জিহোবা ভগবানের উদ্দেশে য়ূদীরা এক বিশাল অপূর্ব্ব র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। সেই মন্দির কত মহাভক্ত কত রত্নরাজি সজ্জিত করিয়াছিল, তাহার সীমা নাই; কত সুন্দর ভাস্কর কার্য্যে,

কত অপূর্ব্ব চিত্রণে—প্রকোষ্ঠ প্রাচীর অলঙ্কৃত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। য়ুদীদিগের এই জিহোবা মন্দির জগতে অতুল্য ছিল; দুর্গ গ্রাস করিয়া ভীষণ অগ্নিরাশি যখন দুর্গ সংলগ্ন মন্দির ধ্বংস করিতে ছুটিল, তখন শত্রু মিত্র সকলের সন্ত্রাস উপস্থিত হইল। জগতের অমূল্য মন্দির রক্ষা করিবার উপায় কি? রোমানেরা কলা বিদ্যার আদর করিতেন, তাঁহারা কলা মন্দিরের ধ্বংসকারী রূপে জগতে চিরপরিচিত হইতে মহা লজ্জা বোধ করিলেন। টাইটস্ আদেশ দিলেন অগ্নি নির্ব্বাপিত কর, যেমন করিয়া পার মন্দির রক্ষা কর। আর রক্ষা কর! সে প্রলয়াগ্নি কি আর থামান যায়? তবু চেষ্টা হইতে লাগিল। ধূমে ধূমাচ্ছন্ন হইল। রৌদ্রের তেজ নাই।

মিরিয়্যামের পক্ষে কথঞ্চিৎ ভাল হইল; দুইদিনের দুই প্রহরের রৌদ্র মাথার উপর দিয়া গিয়াছে, তৃতীয় দিনের রৌদ্র ধূমে বুঝিতে পারিল না; কিন্তু ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণ যায়! ক্যালেব এখনও ভুলে নাই। সে কিরূপে কি জানি এক বোতল পানীয় আর খানিকটা শুকা রুটী একটা চোঙ্গায় পুরিয়া ঠিক মিরিয়্যামের পদতলে, ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। মিরিয়্যাম বুঝিল, কোন রূপে উহা নিকটে আনিয়া ক্ষুধা পিপাসা কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি করিল।

য়ুদীদের সর্ব্বনাশ হইতেছে। মন্দিরে বেড়া আগুন লাগিয়াছে। রোমানেরা য়ুদীদিগকে মারিয়া ফেলিতেছে, তাহাদের রক্তে অগ্নি নির্ব্বাণের চেষ্টা করিতেছে। নরশোণিত-স্বাদে, ধনঞ্জয় জ্বল্ জ্বল্ করিয়া শিখা-বিস্তার করিতেছে। হা ভগবানের প্রিয়তম পাত্র, ভগবানের মন্দির রক্ষা করিতে পারিলে না? হা রোম! গ্রীসের কলা শিল্প রক্ষা করিলে, আর এই হতভাগাগণের যুগ যুগ সঞ্চিত অপূর্ব্ব কলা কীর্ত্তি একেবারে ধ্বংস সাধন করিলে?

টাইটস্ কৈসর ইতিপূর্ব্বে দূর হইতে দেখিয়া মিরিয়্যাম্‌কে রক্ষা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন—এখন সে দিকের অগ্নি প্রায় নিবিয়াছে, দরজা ভাঙ্গিয়া কতকগুলি লোক সেই ছাদের উপরি উঠিল; মিরিয়্যাম্ তখন অবসন্ন হইয়া শুইয়াছিল; তাহার হাতের পায়ের শৃঙ্খল কাটিল; এক যুবা পুরুষ, তাহাকে স্কন্ধে তুলিয়া আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়া নামাইয়া লইয়া গেলেন।

সেইদিক দিয়া টাইটস্ যাইতে ছিলেন; তিনি বাহক যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেনাপতি! কাহাকে আপনি বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন?"

উত্তর "সেই কুমারীকে, যাহাকে আপনি রক্ষা করিতে আদেশ করেন।"

"ভাল; উহাকে তোমার জিম্মায় আমি রাখিলাম। ঐ কুমারী আমার বন্দিনী। যদি গৌরবে আমরা রোম নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারি, ঐ বন্দিনীও আমাদের গৌরব বর্দ্ধনের জন্য প্রকাশ্য ভাবে যাত্রী মধ্যে প্রদর্শিত হইবে; পরে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইলে, সেই পণের টাকায়, সৈনিকদের শুশ্রূষা হইবে।"

সেনাপতি বলিলেন, "আমি ইহাকে আমার শিবিরে আমার কন্যার ন্যায় রাখিব ও রোমে পাঠাইয়া দিব।" টাইটস্ বলিলেন, "তোমরা উপস্থিত সকলে আমার আদেশ ও সেনাপতির অঙ্গীকার শুনিলে, মনে রাখিও।"

কে জানে মিরিয়্যামের অদৃষ্টে কত কি আছে?

অপূর্ব্ব জিহোবা মন্দির পুড়িয়া ভস্মস্তূপ হইল, কিন্তু লড়াই থামিল না। যে সেনাপতি মিরিয়্যাম্‌কে উদ্ধার করিয়াছেন, যাঁহার রক্ষণে মিরিয়্যাম্ এখন জীবিত, তাঁহার পায়ে বল্লমের আঘাতে মহা ক্ষত হইয়াছে; তিনি সমর স্থান হইতে বিদায় পাইলেন, রোমে ফিরিয়া যাইতে আদিষ্ট হইলেন। লুণ্ঠিত বহুমূল্য দ্রব্য-সম্ভার ও মৃতপ্রায় মিরিয়্যাম্‌কে লইয়া তিনি জাহাজে করিয়া রোমে ফিরিবেন। জাহাজ টায়র হইতে ছাড়িবে; স্থল পথে শকটে তাঁহাদের টায়র যাইতে হইল। সন্ধ্যার সময় সকলে টায়রে পৌঁছিলেন। সমুদ্রোপকূলে শান্তিময় স্থানে আসিয়া সমুদ্র সমীরের মৃদুস্পর্শে মিরিয়্যামের সুনিদ্রা হইল। প্রভাতে মিরিয়্যাম বাতায়ন পথে অকূল সাগর দেখিতেছেন, আর যেন একটু একটু জ্ঞান সঞ্চার হইতেছে। ভাবিতেছেন, "বেশ সুন্দর ত কোথায়?"

মিরিয়্যাম্ উঠিয়া বসিলেন, দাঁড়াইয়া উঠিলেন, একপা একপা করিয়া উপবনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একটি বৃক্ষছায়ায়, একখানি শিলাখণ্ডে, সমুদ্রোপকূলে ধীরে ধীরে উপবেশন করিলেন, আবার ভাবিতেছেন, "বেশ সুন্দর, এ কোথায়—সেই স্থান নয়?"

তাঁহার রক্ষক সেনাপতি, খুঁজিতে খুঁজিতে তাঁহার নিকটে আসিলেন, মিরিয়্যাম সুস্থ হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহার আনন্দ আর ধরে না।

"বাছা আজি তুমি বেশ ভাল আছ।" "তা আছি" বলিয়া মিরিয়াম্ অতি সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই কি টায়র নগরী? এই উপবন কি আমার মাতামহের?" "তাই বটে; আমি কে বলিতে পার?" "আপনাকে আমি কি পূর্ব্বে দেখিয়াছি?" "দেখিয়াছ বৈ কি মা?" "তোমাকে এখন সৈন্যেরা সকলেই মোতিকুমারী বলে; ঐ গলার মোতির মালার জন্য। ঐ মোতির হার কে আনিয়াছিল, মনে আছে মা?"

মিরিয়াম্ অনেকক্ষণ ধরিয়া সেনাপতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর মার্কস্ প্রেরিত পুলিন্দা এই বেনোনী ভবনেই পাইয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িল। মনে পড়িল গ্যালস্ নামে একজন সৈনিক ঐ সকল রোম হইতে আনিয়াছিলেন। স্মরণ হইল তাঁহার সম্মুখস্থ উদারমূর্ত্তি সেই গ্যালস্। তখন যুদ্ধের সহিত ঝুনারী কত কথা কহিতে লাগিল। কথা হইতে হইতে মিরিয়াম্ জিজ্ঞাসা করিলেন "পিতঃ আপনি আমাকে এত স্নেহ করেন কেন?"

"অনেক কারণে মা, অনেক কারণে। প্রথমতঃ তুমি আমার সহচর মার্কসের প্রিয়বস্তু—হয়ত সেই মার্কস জীবিত নাই। দ্বিতীয়তঃ, তোমাকে মুমূর্ষু অবস্থায় আমি রক্ষা করি, তৃতীয়তঃ, আমার কন্যাটি জীবিত থাকিলে, ঠিক তোমার মত হইত"—বলিতে বলিতে বৃদ্ধ দুই বিন্দু অশ্রুপাত করিলেন। "মার্কস্ জীবিত নাই, আপনি কিরূপে বুঝিতেছেন?" "থাকিলেও তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে, যাহারা জীবিত শরীরে শত্রু কর্ত্তৃক বন্দী হয়, রোম তাহাদের জন্য প্রাণদণ্ডই এক মাত্র ব্যবস্থা করিয়াছেন।" মার্কস্ জীবিত আছেন কি না, জীবিত থাকিলে তাহাকে মিরিয়ামের অদৃষ্টের কথা জানান কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। অনেক অনুসন্ধানে ঈশানীদের মিত্র শ্রেণীর একটি লোক পাওয়া গেল। তাহার হস্তে মিরিয়াম্ পত্র দিলেন; বিশ্বাস বোধ করিলেন; গ্যালস্ তাহাকে পাথেয় স্বরূপ কিছু দিতে চাহিলে, এমন পারিতোষিকের প্রলোভন দিলে, সে বলিল, "পরের উপকার পারি ত প্রাণ দিয়া করি, তাহার জন্য পয়সা লইব কেন? সৎকর্ম্মের পুরস্কার ইহকালে হয় না, অন্যত্র হয়।" গ্যালস্ শুনিয়া বলিলেন, "এ দেশে অদ্ভুত জীব বিস্তর আছে।"

বহুতর ধন রত্ন, অনেকগুলি পীড়িত আহত সৈনিক, এবং উপযুক্ত রক্ষী লইয়া, শুভক্ষণে সুবাতাসে জাহাজ ছাড়িয়া দিল; একমাসে ইটালীর একটী নগরীতে পৌঁছিল। সেখান হইতে রোমে জল পথে যাইতে হইল। বিজয়ীদের সর্ব্বত্রই আদর ও সম্ভাষণ। গ্যালসের রক্ষণাবেক্ষণে মিরিয়াম্ সচ্ছন্দ শরীরে রোমে আসিলেন।

(৬)

বাস্তবিক মার্কসের কি হইয়াছে—তাহা আমাদের জানিতেও ত ইচ্ছা হইতেছে। সেই যে মৃতবৎ তাঁহাকে কোলে করিয়া নেহুস্তা গুপ্তদ্বার দিয়া লইয়া গেল, আর দ্বার বন্ধ হইল, মিরিয়াম্ বন্দিনী হইলেন;—তাহার পর, তাঁহার আর কোন সন্ধানইত পাওয়া যায় নাই; যূদী জাতি বিধ্বস্ত হইল, তাহাদের কত কালের পবিত্র জিহোবা মন্দির পুড়িয়া ক্ষার হইল, কিন্তু মার্কসের ত কোন সংবাদইত নাই। মার্কস যখন সেই ভগ্ন প্রাসাদের ভিন্ন প্রকোষ্ঠে নীত হইয়া বুঝিতে পারিলেন, তাঁহারা মিরিয়াম্‌কে শত্রু হস্তে দিয়া চলিয়া আসিয়াছেন তখন তাঁহার ক্ষোভের আর সীমা রহিল না। ক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে আস্ফালন, "প্রাচীর ভাঙ্গিব" "একলা যুদ্ধ করিয়া মিরিয়াম্‌কে উদ্ধার করিব।" সেই আস্ফালনের পর অবসাদ আসিল; ভগ্ন দেহে রুগ্ন মনে অবসাদ তাঁহাকে ধরাশায়ী করিল।

গুপ্ত পথে আইথিয়েল আসিয়া তাঁহাদের সন্ধান লইলেন; পরে লোক জন লইয়া আসিয়া মার্কস্‌কে শিবিকায় বহন করিয়া দুর্গম অরণ্য গুহা মধ্যে লইয়া গেলেন।

ঈশানী সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট লোক এখন এইরূপ শৃগালতরুক্ষুর মত বাস করিতেছিলেন। অন্ধ গুহায় মার্কস্ জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। ঈশানীদের মধ্যে সুচিকিৎসক ছিল। তাঁহার ক্ষতের চিকিৎসা সুন্দর রূপ হইতে লাগিল।

ডামাডোল থামিয়াছে। রোমান রক্ষীবর্গের শৈথিল্য হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে ঈশানীরা অন্যত্র যাইতে পারে—আর যাইতেও হইবে, কেন না সঞ্চিত খাদ্য প্রায় শেষ হইয়াছে। কিন্তু মার্কসের কি হইবে? মিরিয়াম্‌কে ঈশানীরা

রাজ রাজেশ্বরী বলিত। সেই রাজ রাজেশ্বরী মার্কসকে বাঁচাইতে গিয়া বন্দী হইয়াছে, লাঞ্ছিত হইয়াছে; সে যে মার্কস্‌কে ভালবাসে, সে আজি উপস্থিত থাকিলে, সেই মার্কস্‌কে আশ্রয় দিতে অনুরোধ করিত, সে অনুরোধ রক্ষা করিতে হইত; এখনও যেন সেই অনুরোধ আছে মনে করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। ঈশাণীক্ষেত্রে ঈশানীরা চলিল, মার্কস্‌কে যানারোহণে সঙ্গে করিয়া লইল। সেই জর্ডন তীরে আবার আসিল।

সে পুণ্যক্ষেত্রের এখন আর কিছু নাই। রোমান সৈন্য সমস্ত বিধ্বস্ত করিয়াছে। সেই শস্যবহুল উর্ব্বর-ক্ষেত্র—এখন কণ্টকাকীর্ণ ঊষর ভূমি। সেই সারি সারি পুণ্য পবিত্র কুটীরগুলি—সমস্তই পড়িয়া গিয়াছে। সেই সুবিশাল মন্ত্রণা মন্দির কেবল ভস্মস্তূপ; সেই চারি দিকের পাদপ আশ্রিত লতা কুঞ্জ—সকলই বন হইয়াছে। ঈশানীদের অতিথিশালা এখন শ্বাপদের বিলাস ভূমি।

আছে কেবল পর্ব্বত গুহায় লুক্কায়িত গুপ্ত শস্যাগার দুই চারিটি। তাহাতেই কথঞ্চিৎরূপে অর্দ্ধ বৎসরের আহারের সংস্থান হইল। নূতন শস্য পাকিয়া উঠিল; খামারে আনীত হইল; ঘর বাড়ী বাঁধা হইয়াছে; শস্য গৃহ জাত হইল। আবার ঈশানী ক্ষেত্র হাসিতে লাগিল।

মার্কস্ সবল সুস্থ হইলেন। যেখানে মিরিয়্যামের ভাস্কর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, সেইখানে ভাঙ্গা মার্ব্বেল পাথরগুলি পড়িয়া পড়িয়া দেখেন;

"যখন তুয়া বঁধু পড়ে মনে;
আমি চাহি বৃন্দাবন পানে॥"

পাঁচ মাস এইরূপে গেল। মিরিয়্যামের দূত, যে পত্র ও অঙ্গুরীয়ক লইয়া আসিতেছিল, সে রোমানদের কাছে ধরা পড়িয়া বন্দী ছিল; পত্র খোয়া গিয়াছে; অঙ্গুরীয়ক আছে, তাই নিশানা লইয়া আসিয়া মার্কস্ নেতার সঙ্গে দেখা করিল। মার্কস্ সমস্তই জানিতে পারিলেন। ঈশানীদের কাছে আপন মুক্তি ভিক্ষা চাহিলেন, বলিলেন "আমি দেশে যাইয়া যদি সময়ে পৌঁছিতে পারি মিরিয়্যাম্‌কে উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিব. সে বিবাহ করিলে, তাহাকে বিবাহ করিব, না করিলে, তাহাকে মুক্তি দান করিব।" ঈশানীদের মন্ত্রণা সভায় মার্কসের আবেদন গ্রাহ্য হইল। মার্কস্ ও

...ত্তা জাইথিয়েলের নিকট বিদায় লইয়া, রোমের জন্য যাত্রা করিলেন। ...াইথিয়েলের শেষ আশীর্ব্বাদ মিরিয়্যামের শিরে বর্ষিত হইতে লাগিল।

আর ক্যালেব? ক্যালেবের কি হইল? তাহাকে বেনোনী পাজিই বলুন, ...র যাই বলুন, সে কিন্তু প্রাণের সহিত মিরিয়্যাম্‌কে ভালবাসে; পৃথিবীর ...কল জিনিষের চেয়ে ভালবাসে; আপনার প্রাণ তুচ্ছ করিয়া কতবার মিরিয়্যাম্‌কে রক্ষা করিয়াছে। সেই যে সে খাদ্য ও পানীয়, চোঙ্গাতে করিয়া মিরিয়্যামের নিকট ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল; তাহার পর ত তাহাকে দেখা যায় নাই; সে গেল কোথায়? কোথায়? এ দিকে য়ূদীদের আসিবার কি আর উপায় আছে? তাহারা এখন শৃগাল কুকুরের ন্যায় বাস করিতেছে।

তবে কি ক্যালেব একবারও মিরিয়্যামের সন্ধান লয় নাই? তাও কি হয়? সন্ধান লইয়াছে বৈ কি? ভস্ম দুর্গের একটা দিক্ এখনও য়ূদীদের অধিকারে ছিল; ক্যালেব সেই খানে প্রহরী ছিল; সে পলাইয়া বাহিরে আসিয়া, একটি মৃত দেহ হইতে সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিল; আপনার পরিচ্ছদ শব দেহে পরাইয়া দিল; তাহার পর এক ঝুড়ি ফলমূল টাট্‌কা কিনিয়া লইয়া ফলোৎপাদনকারী কৃষকের বেশে রোমান শিবির মধ্যে প্রবেশ করিল। সন্ধানে জানিল যে, সেনাপতি গ্যালস্ মিরিয়্যাম্‌কে লইয়া টায়র গিয়াছেন, সেখান হইতে রোমে যাইবেন।

ক্যালেব যে দিন টায়র নগরে পৌঁছিল, সেই দিন দেখিতে পাইল, একখানি গরুৎমতী তরি হেলিতে দুলিতে বন্দর হইতে বেগে বাহির হইয়া যাইতেছে। অনুসন্ধানে জানিল, সেই খানিতেই গ্যালস্ ও মিরিয়্যাম্ আছে। ক্যালেব বিলম্বে ব্যথিত হইয়া মর্ম্মে মর্ম্মে গুম্‌রাইতে লাগিল।

যুদ্ধের পূর্ব্বেই ক্যালেব আপনার ঘর বাড়ী ভূসম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছিল। ...িয়া জহরৎ কিনিয়া একটি প্রাচীন ভৃত্যের নিকট রাখিয়াছিল। ইহার ...র, কৃষক-বেশী ক্যালেবকে আর দেখা গেল না। ডিমিট্রিয়স নামে এক ...ন মিসর দেশীয় বনিক টায়রে রাত্রিকালে দেখা দিল; রোমে বাণিজ্য করি-...ার জন্য বহুতর সওদা নূতন বণিক ক্রয় করিয়া জাহাজে বোঝাই দিল। ...াহাজে করিয়া নানা স্থানে বাণিজ্য করিয়া রোমের নিকটস্থ বন্দরে জাহাজ ...িল; স্থল পথে সেই সমস্ত সওদা বণিকের সঙ্গে রোমে রওনা হইল।

নদীয়া-কাহিনী।

বর্গীদিগের দ্বারা ক্রমাগত দশ বৎসর কাল যাবৎ দেশ এইরূপ পুনঃ পুন লুণ্ঠিত হইতে থাকে, এবং অমিততেজা বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দী বারে বারে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিলেও প্রায়শঃ প্রতিবৎসর বর্ষাগমে সুযোগ পাইলে তাহারা দর্শন দিতে থাকে। ইদানীং তাহারা আর সমবেত হইয়া সম্মুখ যুদ্ধ করিত না; সুতরাং তাহাদিগকে আশু দমন করার কোন আশা না দেখিয়া রাজনীতিজ্ঞ বৃদ্ধ নবাব ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপনা করেন। এই সন্ধির ফলে বর্গীরা উড়িয্যার সম্পূর্ণ স্বত্ব ও বাঙ্গালার চৌথ অর্থাৎ বার্ষিক রাজস্বের এক চতুর্থাংশ বাবদ দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা লাভ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে চিরদিনের জন্য বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এই দীর্ঘ কালব্যাপী বর্গীর হাঙ্গামার ফলে দেশে দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছিল—শস্যাদির অবস্থা শোচনীয় দাঁড়াইয়াছিল এবং বস্ত্র বয়নাদি সূক্ষ্ম শিল্পেরও সবিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল; তন্তুবায়গণ যুদ্ধের অবকাশ কালে যে কিছু বস্ত্রাদি বয়ন করিত তাহাও আশঙ্কা ও ব্যগ্রতা প্রযুক্ত তত উৎকৃষ্ট হইত না *। এইরূপে এই সময় হইতেই শান্তিপুর প্রভৃতির বস্ত্রাদি বয়ন ব্যবসায়ে দুরবস্থার সূত্রপাত হয়।

ক্রমাগত গুরুতর পরিশ্রমে বৃদ্ধ নবাবের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া গেল; তিনি তখন তাঁহার আদরের দুলাল, স্নেহের পুতুল দৌহিত্র সিরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দূরদর্শী বৃদ্ধ নবাব ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সিরাজ, বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার মসনদে উপবিষ্ট হয়েন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী ঘেসেটী বেগমকে বন্দী করিয়া তাঁহার মন্ত্রণাদাতা রাজবল্লভের অনুসন্ধান করিতে আদেশ দেন।

উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব কামুক প্রকৃতি নবীন নবাবের উপর তৎকালিন সকল লোকেরই বিরাগ জন্মিয়াছিল। সকলেই তাঁহার অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া তাঁহার হস্ত হইতে কিসে অব্যাহিত হয় তাহার পন্থা অনুসন্ধান

* Holwell's—Interesting Historical Events p. 151

করিতেছিলেন। রাজ্যের দু চারি জন বর্দ্ধিষ্ণু লোক একত্র হইলেই এ বিষয়ে গোপনে পরামর্শ করিতেন। কিন্তু কি উপায়ে এ কার্য্য সমাধা হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারিত না হওয়ায় ষড়যন্ত্রকারীগণ পরিশেষে জগৎ শেঠের মুরসিদাবাদস্থ ভবনে মিলিত হইলেন। এই সময়ে নদীয়াধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পরিজন ও ভৃত্যবর্গ লইয়া শিবনিবাসে বাস করিতেছিলেন। বীরোচিত সৎসাহসের অভাব থাকিলেও কূট রাজনীতিজ্ঞ কৃষ্ণচন্দ্র অতিশয় প্রাজ্ঞ ছিলেন সুতরাং সিরাজের বিপক্ষে ষড়যন্ত্রকারী, মীর জাফর, জগৎ শেঠ, রাজা মহেন্দ্র (দুর্লভরাম), রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ, রাজা কৃষ্ণদাস, রাণী ভবানী প্রমুখ ব্যক্তিগণ বহু তর্ক বিতর্ক করিয়াও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া নদীয়াধিপতিকে তাঁহাদের সহিত যোগ দিয়া সৎপরামর্শ দিবার নিমিত্ত এক পত্রিকা প্রেরণ করিয়া মুরসিদাবাদে আহ্বান করেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র পত্রিকার্থ অবগত হইয়া এককালে হর্ষ ও বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন। সেই পত্রে নবাবকে পদচ্যুত করিবার কথা লেখা ছিল। রাজা সেই দিন নিশীথ সময়ে এক নিভৃত স্থানে স্বীয় মন্ত্রী কালীপ্রসাদ সিংহ ও অন্যান্য বিশ্বস্ত অমাত্যবর্গকে আহ্বান করিয়া পত্র পাঠ পূর্ব্বক তাঁহাদের পরামর্শ চাহিলেন। পত্রার্থ এইরূপ—

"নবাবের অত্যাচারে মুরসিদাবাদের লোক সকল স্ব স্ব ঘর দ্বার ত্যাগ করিয়া পলাইতে উদ্যত। নবাব কাহারও কোন কথা শুনেন না। এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য আমরা বুঝিতে না পারিয়া আপনাকে আহ্বান করিতেছি; আপনি শীঘ্র আসিবেন।" সুচতুর কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদের আহ্বানে প্রথমে স্বয়ং না যাইয়া নিজ বিশ্বস্ত দেওয়ান কালীপ্রসাদকে তাঁহাদের উদ্দেশ্য অবগত হইবার নিমিত্ত মুরসিদাবাদ প্রেরণ করেন। পরে তাঁহার বাচনিক সমস্ত জ্ঞাত হইয়া স্বয়ং মুরসিদাবাদ যাত্রা করেন। পুনর্ব্বার জগৎ শেঠের বাটীতে মন্ত্রণা-সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় কেহ কেহ মুসলমানের পরিবর্ত্তে হিন্দু শাসকের প্রস্তাব করেন কিন্তু তাহাতে দূরদর্শী বিচক্ষণ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র উত্তর করেন "যে সভার মহামান্য মীরজাফর এক জন নেতা সে সভায় যবনাধিকার লোপের প্রস্তাব বাতুলতামাত্র; আমার মতে সেনাপতিকেই সহায় করিয়া নববলদৃপ্ত ইংরাজগণের সহিত যোগ

দিয়া বর্ত্তমান নবাবকে পদচ্যুত করা সহজসাধ্য হইবে। বিশেষতঃ ইংরাজ-গণের সহিত আমার বিশেষ সদ্ভাব আছে তাহারা আমারই অধিকারের সন্নিকটে বাস করে; সুতরাং এ বিষয়ে আমি বিশেষ চেষ্টা করিতে পারিব।' পরিশেষে কথঞ্চিৎ বাকবিতণ্ডার পর রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মতই সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয় এবং কথিত আছে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কালীঘাটে মায়ের পূজা দিবার ছলে কলিকাতায় ইংরাজদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন। এইরূপে নবাবের নৃশংস হস্ত হইতে অসহায় প্রজাবর্গের নিষ্কৃতি লাভ ও বাঙ্গালায় ইংরাজাধিকার বিস্তার এই উভয় ঘটনাই নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পরিণামদর্শীতার ফল বলিতে হইবে।

এইরূপে উদ্যোগ পাঠ শেষ হইলে কৌশলী ইংরাজ স্বেচ্ছায় সন্ধিবন্ধন পদদলিত করিয়া সেনাপতি মীরজাফরের গোপন আশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া মুষ্টিমেয় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পলাশীস্থ সিরাজের বিপুল বাহিনীর সম্মুখীন হইতে সাহসী হইয়াছিল। ২২শে জুন অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় সমর বৃটীশবাহিনী পলাশী অভিমুখে অগ্রসর হইল, এবং গভীর নিশীথে ভাগীরথী তীরস্থ বিশাল আম্রকুঞ্জে আশ্রয় করিয়া সে রাত্রি অতিবাহিত করিল। এই আম্রকানন তখন "লক্ষাবাগ" নামে অভিহিত হইত, কথিত আছে এই বাগানে লক্ষ আম্রবৃক্ষ থাকাতেই উহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছিল— কেহ কেহ বলেন ঐ স্থানে বহু শত পলাশ বৃক্ষ থাকায় ঐ স্থানের নাম পলাশী হইয়াছিল। এই পলাশী ক্ষেত্রে নবাব-সৈন্য ইংরাজেরা আসিবার দ্বাদশ ঘণ্টা অগ্রে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল। নবাব-পক্ষে ৩৫ হাজার পদাতিক পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহী ও ৪০টী কামান ছিল*। কিন্তু হইলে কি হয় এই বিপুলবাহিনীর অধিকাংশই ষড়যন্ত্রকারী মীরজাফর, ইয়ারলুৎফ ও দুর্লভরামের অধীনে চালিত হইতেছিল। ২৩শে জুন প্রাতঃকালে এই অগণিত নবাব বাহিনী ইংরাজের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। বিপর্য্যয় চক্রব্যূহ, বিশাল কাল বিচিত্রগতি রণহস্তী, রণকুশল সুসজ্জিত বিপুল অশ্বসেনা, ভীমকায় সুদক্ষ পদাতিক ও তাহাদের হস্তস্থিত বালার্ক কিরণ প্রতিভাত

* Vide Letter of the Secret Committee. Life I 263.

করাল করবাল কঠিন গিরিভেদী দুর্জ্জয় কামান ও প্রভাত সমীরে উড্ডীয়-মান অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি যবনের জয়পতাকা ও রথধ্বজ সমূহ মুষ্টিমেয় ইংরাজ দলের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত করিল। অমিততেজা অসমসাহসী দলপতির মনেও ত্রাসের সঞ্চার হইল *। মনে হইল যদি মীরজাফর প্রমুখ নবাবের সেনা-পতিবর্গ দুর্ভাগ্যক্রমে প্রকৃতই যুদ্ধে অগ্রসর হয়—যদি তাহাদের আশ্বাস-বাক্য যবনের চক্রান্তমাত্রই হয়, তবে ত একটী প্রাণীও সংবাদ দিতে ফিরিবে না। তাহাদের আশ্বাসবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ইংরাজ এতদূর অগ্রসর হইয়াছে; এখন হয় যুদ্ধ নয় কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন ব্যতীত উপায়ান্তর না দেখিয়া ক্লাইব সৈন্যসমাবেশে মন দিলেন এবং আক্রমণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। এই সময় ফরাসীগণই প্রথম কামান দাগিল। অতঃপর নবাব-সৈন্যের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বর্ষার বারি বরিষণের ন্যায় অজস্র গোলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল, কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী সেদিন ইংরাজের প্রতি অনুকূল, সুতরাং অধিকাংশ গোলাই হয় ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ইংরাজের পশ্চাতে পড়িতে লাগিল বা আম্রবৃক্ষে লাগিয়া বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। ক্বচিৎ ২।৪ জন হতমুখে পতিত হইতেছিল; কিন্তু এই স্বল্প মৃত্যু সংখ্যাই ইংরাজের সংখ্যা-ভাবে অতি ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। এই সময়ে নবাবের বিশ্বস্ত সেনাপতি মীর মদনের পদদ্বয় গোলা লাগিয়া উড়িয়া যাওয়ায় তাঁহাকে নবাব শিবিরে আনয়ন করা হইল; তথায় প্রভুর সাক্ষাতে অন্যান্য সেনাপতির দুরভিসন্ধির কথা বলিতে না বলিতে তিনি স্বর্গগত হইলেন। এত-ক্ষণে নবাবও তাঁহার সেনাপতিগণের দুরভিসন্ধি বেশ বুঝিয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাদের হস্তেই আত্মসমর্পণ করিলেন এবং মীর জাফরকে স্বীয় পট্টাবাসে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মীর জাফর এতক্ষণ নির্লিপ্তভাবে সসৈন্যে যুদ্ধক্রীড়া পরিদর্শন করিতেছিলেন; এক্ষণে মীরমদনের মৃত্যুর পর বাঙ্গালী বীর মোহনলালকে অমিত বিক্রমে শত্রুসৈন্যের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ইংরাজের প্রমাদ গণিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন। নবাবের স্থানে স্বীয় প্রাণের আশঙ্কায় মীরজাফর, পুত্র মীরণ ও হোসেন খাঁ প্রভৃতি বিশ্বস্ত অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে সশস্ত্র নবাব শিবিরে প্রবেশ

* Scrafton's Reflections.

করিলেন। কথিত আছে সিরাজ তখন আপনার ও প্রিয় জনের প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া স্বর্গগত নবাব আলীবর্দ্দির পুণ্য নাম স্মরণ করত দুরাত্মা মীর জাফরের সম্মুখে রাজমুকুট রাখিয়া স্বীয় সম্মান ও জীবন রক্ষার নিমিত্ত কাতর প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু মূঢ়ের মন তখন রাজ্যলাভেচ্ছায় মত্ত—সে বধির কর্ণে সিরাজের কাতরোক্তি আদৌ প্রবেশ লাভ করিল না। বরং এতাবৎ যে সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিল তাহা সুসাধনের উপায় দেখিয়া, মীর জাফর নবাবকে সে দিনের মত যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে পরামর্শ দিলেন। তাঁহার এই কপট বিজ্ঞতায় সরল প্রকৃতি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় নবাব প্রতারিত হইলেন এবং মোহনলালকে ও ফরাসী গোলন্দাজগণকে সেদিনের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে অনুমতি পাঠাইলেন। মোহনলাল প্রতিমুহূর্ত্তেই বিজয়ের আশা করিতেছিলেন সুতরাং সে সময়ে প্রত্যাগমনের সময় নহে বলিয়া নবাবের নিকট যু চালাইবার অনুমতি চাহিয়া পাঠান কিন্তু মীর জাফরের চক্রান্তে পুনরায় যুদ্ধ করিতে নিষেধাজ্ঞা পাইয়া অগত্যা অনিচ্ছাস্বত্ত্বে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন। সেনাপতির প্রত্যাবর্ত্তনে সৈন্যগণ ভয়াকুল হইল। ওদিকে চক্রান্তকারীগণের সৈন্যদের পলায়নপর দেখিয়া তাহারা আরও নিরুৎসাহ হইয়া রণে ভঙ্গ দিল *। এইরূপে সেদিনকার মহা সমরাভিনয় সমাহিত হইল। যদি আমূল প্রতারণাময় যুদ্ধাভিনয়কে মহাসমর বলিতে ইচ্ছা হয় বলিতে পার, কিন্তু ইহাতে ইংরাজের গৌরবের কিম্বা কৃতিত্বের কোন নিদর্শন নাই †। ইংরাজদলের মেজর কিলপ্যাট্রিক পলায়নপর নবাব সৈন্যের

* Happy it was for the Company that this numerous army made so little resistance that according to Mr. Scrafton there were only 70 men killed and wounded.

Bolts' Consideration on Indian affairs, Part I, p. 40

† Yes! as a victory, Plassey was, in its consequences, perhaps the greatest ever gained. But as a battle, it is not in my opinion, a matter to be very proud of. In the first place, it was not a fair fight. Who can doubt if the three principal generals of Sirazuddaulah had been faithful to their master, Plassey would not have been won. Up to the time of the death of Mirmadan Khan the

পশ্চাদ্ধাবন করিবার মানসে আম্রকুঞ্জ হইতে বহির্গত হইতে ইচ্ছা করিয়া সেনাপতির আজ্ঞা চাহিয়া পাঠান। ক্লাইব এই সময়ে নবাবের মৃগয়াকুঞ্জে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছিলেন *। সংবাদ শুনিয়া সোৎসাহে সানন্দে সুপ্তোত্থিত পলাশী-বিজয়ী বীর বাহিরে আসিলেন। এদিকে নবাব শিবির হইতে প্রত্যাগমন করিয়াই মীর জাফর ক্লাইবকে তৎক্ষণাৎ নবাব-শিবির আক্রমণের পরামর্শ দিলেন, এবং অন্যতম বিশ্বাসঘাতক রাজা দুর্লভরাম সিরাজকে রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তনের পরামর্শ দিলেন। এইরূপে সেই দিন পলাশী-ক্ষেত্রে মুসলমানের সৌভাগ্যরবি চিরতরে অস্তমিত হইল। এদিন নদীয়ার আর একটী স্মরণীয় দিন।

বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠকমাত্রেই হতভাগ্য সিরাজের পরিণাম অবগত আছেন—পলায়নপর সিরাজ কিরূপে মীর জাফর পুত্র মীরণ কর্ত্তৃক ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই জাফরগঞ্জের প্রাসাদে নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এইরূপে এই নিদারুণ বিয়োগান্ত নাটকের যবনিকা পতিত হইলে ক্লাইব মীর জাফরকে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার নবাব বলিয়া অভিবাদন করিলেন।

এইরূপে অল্পকালের মধ্যেই ইংরাজগণ অতি নগণ্য অবস্থা হইতে অতীব উচ্চ অবস্থায় উন্নীত হইলেন। কিছুকাল পূর্ব্বে যে ইংরাজ মোগলশাসন-কর্ত্তাকে পূজোপচারে ও তোষামোদে বশীভূত করিয়া এদেশে বাণিজ্যের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, কৌশলে ও অসীম অধ্যবসায় বলে সেই ইংরাজ আজ বঙ্গের ভাগ্যনিয়ন্তা হইয়া উঠিলেন এবং মীর জাফর নামে নবাব হইলেও কার্য্যতঃ ইংরাজগণই দেশ শাসন করিতে লাগিলেন।

English had made no progress; they had been forced to retire. They could have made no impression on their enemy had the Nabob's army, led by men loyal to their master, simply maintained their position. An advance against the French guns meant an exposure of their right flank to some 40 thousand men. It was not to be thought of. It was only when treason had done her work, when treason had driven the Nabob from the field, when treason had removed his army from its commanding position that Clive was able to advance without the certainty of being annihilated. Plassey then though decisive, can never be considered a great battle.
Malleson's Decisive Battles of India—P. 73

* Orme Vol, II 175

বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের অস্তিত্ব *।

(১)

পূর্ব্ব-ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি। পূর্ব্বভারতের "ভিক্ষু"গণ সিংহল চীন প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রধান প্রধান বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল পূর্ব্বভারতেই লিখিত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের চারিটী প্রধান তীর্থস্থান পূর্ব্বভারতেই অবস্থিত ছিল। কিন্তু তিন চারি শত বৎসর হইল বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যায়, এমন কি সমস্ত ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী খুঁজিয়া পাওয়া যায় না এইরূপই শোনা যায়। বৌদ্ধধর্ম্মের পারিভাষিক শব্দ সমূহ (technical terms) আমাদের সাহিত্য হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। কেবলমাত্র বিষ্ণুর নবম অবতাররূপে বুদ্ধের নাম আমাদের নিকট পরিজ্ঞাত। হিন্দুদর্শনকার এবং হিন্দুদর্শনের টীকাকারগণ কোন কোন স্থলে বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছেন, ইহাতেই কেবল বৌদ্ধ মতের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় †। অন্যান্য নিদর্শন অন্তর্হিত হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে ইহাই অনেকে বলিয়া থাকেন। কিন্তু যে দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম একাধিপত্য করিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সেই দেশ হইতে যে ইহা একেবারে লুপ্ত হইয়াছে ইহা বিশ্বাস করিতে সকল সময়ে প্রবৃত্তি হয় না। এক্ষণে বাঙ্গালায় ‡ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী আছে কি না তাহা জানিতে হইলে আমাদিগকে দুই বিভিন্ন পথ

---

* মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের Discovery of Living Buddhism in Bengal নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য। এই প্রবন্ধ হিন্দুসমিতির ২৫শে শ্রাবণের অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল।

† দৃষ্টান্ত—আপ্তগ্রহণেন চাযুক্তাঃ শাক্যভিক্ষুনিগ্রন্থক সংসারমোচকাদীনাং আগমাভাসানিরাকৃতা ভবন্তি।—বাচস্পতিমিশ্রঃ, তত্ত্বকৌমুদী, ৫ম কারিকা।

দুঃখস্বাভাবিকত্ববাদিভির্বৌদ্ধৈশ্চিত্তস্যৈবাত্মতাভ্যুপগমাৎ।

—বিজ্ঞানভিক্ষুঃ, সাংখ্যপ্রচনভাষ্য। ১ম অ, ৭ সূ।

‡ Eastern India—Bengal, Behar and Orissa.

অবলম্বন করিতে হইবে। (১) Hioun Tsang যে সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন সেই সময় হইতে যতদিন না বাঙ্গালার সাহিত্য এবং পুরাতন শিলালিপি প্রভৃতি হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের নিদর্শন সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়াছে ততদিন পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রমিক অবনতি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে হইবে। (২) যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন পূজাপদ্ধতি বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে কোনটির সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের বিভিন্ন পূজাপদ্ধতির কোন একটীর কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কি না তাহা বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইবে।

মুঙ্গীর (Mungir) হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত যে সমস্ত নগর Hioun Tsang পরিদর্শন করিয়াছিলেন তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৯৭ সংঘারাম (মঠ) ছিল এবং তাহাতে ১১৫০০ "ভিক্ষু" থাকিতেন; দেবমন্দিরের সংখ্যা ছিল ৪৪২। একজন "ভিক্ষু"র এক বৎসরের ব্যয়ভার অন্ততঃ এক শত গৃহস্থকে বহন করিতে হইত, সুতরাং সেই সময়ে ১১৫০০০০ গৃহস্থ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। Hioun Tsang কেবল ৮টী কি ৯টী নগরের কথা বলিয়াছেন; এই ৮টী কি ৯টী নগরের বৌদ্ধমতাবলম্বী লোকের সংখ্যা ১১৫০০০০;—সুতরাং সমস্ত দেশে যে অসংখ্য লোক বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সময় হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল। ইহা ষষ্ঠ শতাব্দীর কথা।

সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে গুপ্তবংশীয় নরপতিগণ মগধে রাজত্ব করিতেন। ইঁহারা বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। নবম শতাব্দীর শেষভাগে পালবংশীয় নৃপতিগণ মগধের সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। ইঁহাদের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের সমধিক প্রভাব ছিল। বিক্রমশিলার মঠ সর্ব্বজন-বিশ্রুত হইয়াছিল। দীপঙ্কর "ভিক্ষু" তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বিক্রমশিলার "ভিক্ষু"গণ নানাবিধ টীকা প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে স্রগ্‌ধরাস্তোত্র, বোধিচর্য্যাবতার এবং চক্র-কপাল তন্ত্রের টীকা প্রধান। এই সময়ের লিখিত অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি নেপালের মঠে রক্ষিত আছে। বোধ হয় মুসলমানগণের আক্রমন হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় বাঙ্গালা হইতে "ভিক্ষু"গণ যখন নেপালে পলায়ন করিয়াছিলেন সেই সময়ে সেই সকল পাণ্ডুলিপি লইয়া গিয়াছিলেন। এই সমস্ত কারণে বেশ প্রতীতি হয় যে সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম নিশ্চয়ই প্রচলিত

ছিল। পালবংশীয় নরপতিগণের পর হিন্দুরাজগণ রাজত্ব আরম্ভ করেন। ইহাদের সময়েও বৌদ্ধমঠের অস্তিত্ব বর্ত্তমান ছিল।

মুসলমানগণ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পালবংশীয় ও সেনবংশীয় নরপতিগণকে পরাভূত করিয়া মগধে আধিপত্য স্থাপন করে এবং মগধের রাজধানী ওদণ্ডপুরী নগরীতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ "ভিক্ষু"কে নিহত করে। কিন্তু পূর্ব্বভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারে লুপ্ত হয় নাই। ১৪৪৬ অব্দে মগধবাসী একজন কায়স্থ একখানি বৌদ্ধগ্রন্থের পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন, এই পাণ্ডুলিপি এখনও কেম্ব্রিজে (Cambridge) আছে। ডাক্তার হোয়ে (Dr. Hoey) মহেতে (Mahet) একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়া ছেন, শিলালিপির সময় ১২১৯ অব্দ; একটী মন্দির বুদ্ধের নামে উৎসর্গ করিবার কথা ইহাতে লিখিত আছে। চূড়ামণি দাস নামক চৈতন্যদেবের একজন জীবনী লেখক লিখিয়াছেন যে চৈতন্যের জন্মোপলক্ষে বৌদ্ধগণ আনন্দিত হইয়াছিল। চৈতন্যের সমসাময়িক সাতগাঁ-(Satgaon—সপ্তগ্রাম) বাসী একজন ধনী সুবর্ণবনিক বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন যখন সমস্ত জগৎ দুঃখাভিভূত তখন তিনি একাকী উদ্ধার লাভ করিতে চাহেন না। জগৎ দুঃখময় ইহা বৌদ্ধদিগের মত, হিন্দুদিগের নহে। শূলপানি (ইনি মুসলমান-আক্রমনের পরবর্ত্তি) লিখিয়াছেন বৌদ্ধ দেখিলেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তিনি "নগ্নাঃ" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "বৌদ্ধাদয়ঃ"। যদি সেই সময়ে বৌদ্ধগণ না থাকিত তাহা হইলে তিনি নগ্নশব্দের ঐরূপ অর্থ করিতেন কি?

নেপাল মহারাজের কাটমণ্ডুর লাইব্রেরীতে একখানি তালপত্রে লিখিত পুঁথি আছে। দুইজন "গৌড়দেশীয়োপাসক" বুদ্ধনির্ব্বাণের ১৮১৮ বৎসর পরে (অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর প্রারম্ভে) ইহার প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন। বাঙ্গালা (অথবা মৈথিলী) অক্ষরে কেম্ব্রিজ লাইব্রেরীতে একখানি "শিক্ষা সমুচ্চয়" আছে, সেখানি বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত; লেখা দেখিয়া অনুমান হয় ১৪শ শতাব্দীর লেখা। বোধিচর্য্যাবতারের প্রজ্ঞাপারমিতা অংশের একখানি টীকার মৈথিলী অক্ষরে লিখিত পাণ্ডুলিপি এসিয়াটিক সোসাইটিতে আছে। ইহা ৪০০।৫০০ বৎসর পূর্ব্বের লেখা বলিয়া বোধ হয়।

রামচন্দ্র কবিভারতী নামক একজন ব্রাহ্মণ বরেন্দ্রভূমির বীরবতী গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি কবি, ব্যাকরণ এবং অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া সিংহলে পরাক্রমবাহুর আশ্রয় গ্রহণ করেন; পরাক্রমবাহু ইহাকে বৌদ্ধমঠসকলের তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করেন (বুদ্ধাগমচক্রবর্ত্তি)। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পরাক্রমবাহু বর্ত্তমান ছিলেন। ইহা হইতে জানা যায় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল।

দেশাবলী বিবৃতি * নামক পুঁথি হইতে ষোড়শ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্মের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। বৈজলভূপতির আদেশানুসারে জগন্মোহন পণ্ডিত ঐতিহাস প্রণয়ন করেন। এই বৈজলভূপতি ১৫৭০ শকাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন †। জগন্মোহন একস্থানে মহেন্দ্রাদিত্যের বৌদ্ধরাজা ...তিচন্দ্রের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ইনি ইরাবতী তীরস্থ অমরায় একটি বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

বুদ্ধগুপ্তনাথের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় বঙ্গদেশের প্রান্ত-প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম বর্ত্তমান ছিল। বুদ্ধগুপ্ত সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে ভারত-বর্ষের অধিকাংশ স্থান পরিদর্শন করেন।

গয়ার বজ্রাসন বৌদ্ধদিগের তীর্থ বিশেষ। তাসুলামা ১৭৭৭ অব্দে বজ্রাসন দর্শন জন্য কতকগুলি লোক গয়ায় পাঠাইয়াছিলেন। বর্ম্মাবাসিগণ ১৮০৯ এমন কি ১৮২৩ অব্দে বজ্রাসন দেখিতে গয়ায় আসিয়াছিল ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। নাথুরাম নামক একজন বৌদ্ধ কর্ত্তৃক লিখিত বুদ্ধচরিত পাঠে অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বৌদ্ধধর্ম্মের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়।

বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রমিক অবনতি লক্ষ্য করিবার উপায় নির্দ্দিষ্ট হইল। কিন্তু প্রমাণ সমূহ এরূপ জটিল ও প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছে যে বিশেষ সাবধান সহকারে অনুসন্ধান না করিলে ফল লাভের কোন সম্ভাবনা নাই।

* No. 3582 M. S. of Asiatic Society.

† শাকে সপ্ততিবাণচন্দ্রগণিতে চ জাহ্নবীতটিনীতীরে মৃতো বৈজল ...ঃ।

পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের নিম্নশ্রেণী মধ্যে এক প্রকার পূজা প্রচলিত আছে, ইহাতে ব্রাহ্মণগণ পৌরহিত্য করেন না। ডোম, পোদ, হাড়ি প্রভৃতি ইহার পুরোহিত। পূজার মন্ত্র বাঙ্গালা ও সংস্কৃত মিশ্রিত—অশুদ্ধ। পূজা কোথায়ও মন্দিরে, কোথায়ও বৃক্ষতলে, কোথায়ও বা উন্মুক্ত প্রান্তরে হইয়া থাকে। ঠাকুর সাধারণতঃ পূর্ব্বাস্য করিয়া বসান হয়। এই বিষয় হিন্দুর দেবতার সহিত বিরোধ লক্ষিত হইতেছে। হিন্দুর দেবপ্রতিমা পশ্চিমাস্য অথবা দক্ষিণাস্য করিয়া বসান হয়। এই ঠাকুরের সম্মুখে শূকর, হংস প্রভৃতি বলিদান দেওয়া হইয়া থাকে *। ঠাকুরের নাম ধর্ম্মঠাকুর। ধর্ম্মরাজ, ধর্ম্মরায় নামেও ইনি অভিহিত হইয়া থাকেন।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

ধ্রুবতারা।

(সামাজিক উপন্যাস)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রণীত।

বহুকাল পূর্ব্বে বঙ্গে সামাজিক উপন্যাসের আবির্ভাব হইয়াছে। যে করি ৫৫ বৎসর পূর্ব্বে "মাসিক পত্রিকা" নামে মাসিক পত্রিকায় "আলালের ঘরের দুলালের" সূত্রপাত হয়। ইহাতে প্রচলিত সমাজের ঘটনাবলি উপন্যাস আকারে সাজান গোছান থাকে; ইংরাজীতে এমন এ বিস্তর। আবার ইংরাজিতে Historical Romance বা ঐতিহাসিক উপন্যা বলিয়া একখানি গ্রন্থ আছে; ঐ গ্রন্থ অবলম্বনে রামকমলের দুরাকাঙ্ক্ষা বৃথা ভ্রমণ লিখিত হয়, ভূদেব বাবুর "সফল স্বপ্ন" ও "অঙ্গুরীয়ক বিনিময়" লিখিত হয়; এখন ও শ্রীমান হারানচন্দ্র এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া উপন্যা

* হুগলী জেলান্তর্গত ভাঙ্গামোড়া গ্রামের ধর্ম্মপূজা দেখিয়াছি। এখা ছাগ-বলি দেওয়া হইয়া থাকে।

লিখিয়াছেন, কিন্তু 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' কথাটা প্রথমে 'দুর্গেশ নন্দিনীর' ললাটে বড় জ্বল্ জ্বল্ করিয়াছিল। আমরা এমন বহুতর লোক দেখিয়াছি, যাহারা দুর্গেশ-নন্দিনীর ঘটনা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করিতেন।

কিন্তু শেষ জীবনে বঙ্কিম বাবু ভুর ভাঙ্গিয়া দিলেন। রাজসিংহের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লিখিলেন "আমি পূর্ব্বে কখন ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। "দুর্গেশ-নন্দিনী" বা "চন্দ্রশেখর" বা "সীতারামকে" ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম। এ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রণয়নে কোন লেখকই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমি যে পারি নাই তাহা বলা বাহুল্য।"

সুতরাং বঙ্কিম বাবুর ফতোয়া ও স্বীকারোক্তিমতে, 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' অতলে গেল; যাউক;—কিন্তু সামাজিক উপন্যাস মাথা তুলিয়া উঠিতেছে। এই গুলিকেই আমি ঔপন্যাসিক ইতিহাস নাম দিয়াছিলাম,—বলিয়াছিলাম যাহা হইতেছে তাহাই উপন্যাসের অবয়বে এইগুলিতে বিন্যস্ত হয়। শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর করের পরিচয় প্রদানের অবসরে এই সকল কথা বলি, সেই সময় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের উল্লেখমাত্র করিয়াছিলাম। যতীন্দ্র বাবু "সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচারে" এবং 'উড়িষ্যার চিত্রে' প্রভূত যশঃ সঞ্চয় করিয়াছেন। আর তিনি যে যশের যোগ্য পাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাই সুবিধার কথা—তিনি সমালোচকের উৎসাহের ভিখারী নহেন।

"উড়িষ্যা চিত্রে" গ্রন্থকারের ফটো তুলিবার ক্ষমতার আমরা প্রথম পরিচয় পাই, বড় আহ্লাদের বিষয়, সেই ক্ষমতা এবার বাড়িয়াছে ব্যতীত কমে নাই। এই গ্রন্থে যতীন্দ্র বাবু, গণেশ বন্দনার মত, প্রথমেই কলিকাতার একটী মেসের ফটো তুলিয়া দেখাইয়াছেন। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য বশে কলিকাতার মেস প্রায় সকলেরই পরিচিত সামগ্রী; এবার কেহ দুঃখ করিতে পারিবেন না, যে উড়িষ্যার চিত্র ঠিক হইল না হইল, আমরা কেমন করিয়া বলিব? কলিকাতার মেসে যাহার পদার্পণ হয় নাই, তাহার জন্মই বৃথা। আর সেই পাকা উঠানের এক কোণে ঠোঙ্গাতে ও ভাতেতে গাদা করিয়া

রাখা; নীচে তোলায় অন্ধকার ঘরে ঠাকুর ও চাকরের তেল কুচকুচে অঙ্গে মসীময় বসন বিলাস; আর উপর তলার ঘরে ৩॥ পায়া টেপায়ের উপর Ganot বিজ্ঞান গ্রন্থের উপর ভাঙ্গা বুরুষ ও ত্রিকোণ মুকুর—এ সকল কি ভুলিবার জিনিস্ গা? এ হেন সুপরিচিত মেসের চিত্র সর্ব্বাগ্রে ধরিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন, দেখুন দেখি ঠিক হইয়াছে কি না? সকলকেই বলিতে হইবে, হাঁ ঠিক বটে। কলিকাতার সম্প্রদায় বিশেষের বৈটকখানা, ড্রইংরুম্ প্রভৃতি সকল চিত্রেই, এবং পল্লীগ্রামের শান্তি চিত্রে গ্রন্থকার সিদ্ধহস্ত। পল্লীগ্রামে গৃহস্থের অন্তঃপুরে, যখন বধূরা পরস্পর গোপনে আলাপ করেন, তখন সেই দৃশ্যের চিত্র অঙ্কনেও গ্রন্থকারের যেমন দক্ষতা, আবার শিক্ষিত তরুণ যুবকেরা যখন মাথামুণ্ড লইয়া তর্ক বিতর্ক করেন, তখনও গ্রন্থকারের সেইরূপ নিপুণতা। গ্রন্থের সর্ব্বত্রই গ্রন্থকারের সতর্ক চক্ষু, সহৃদয় প্রাণ, লিপিপটু লেখনী এবং যাহার মুখে যেমন সাজে সেইরূপ ভাব ও ভাষা—দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। গ্রন্থকার বলিয়াছেন, যে তিনি জীবনে একবার মাত্র আড়ি পাতিয়াছিলেন; এ অতিরিক্ত বিনয় আমাদের ভাল লাগিল না; আমরা দেখিতেছি, আড়ি পাতাই তাঁহার কাজ; সফল বটেই তিনি বটে। আমরা আশীর্ব্বাদ করি তিনি চিরজীবনই যেন এইরূপ আড়ি পাতিয়া স্বভাবের ও সমাজের রহস্য দেখিয়া, আস্তে আস্তে টিপি টিপি হাসিয়া, আমাদিগের নিকট সেই আড়িপাতার ফল জাহির করেন।

এখন, অগ্রে "ধ্রুবতারার" গল্পটি অতি সংক্ষেপে বলিব; নহিলে পাঠকের ফাঁকা লাগিবে।

ফরীদপুর সদরের দেড় ক্রোশ মধ্যে কাজলপুর গ্রাম। সেই গ্রামের কায়স্থ বংশীয় দত্ত বাড়ীর উপেন্দ্রনাথের ভিন্ন গ্রামের বনলতা নামে একটী বালিকার সহিত বিবাহ হইল। বনলতা বনলতাই বটে। মনে করিবেন, দুষ্মন্ত কি বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—"বুঝিলাম আজি বনলতার কাছে উদ্যানলতা পরাজিতা হইল।" এ সেকালের কথা; তখন নায়ক চাহিত নায়িকার স্বচ্ছ নির্ম্মল হৃদয়, তাহাতে নায়ক আপনার ফটো প্রতিফলিত করিত। মুকুরে একটী ছবি পড়িলেই আর কাহারও চিত্র তাহাতে পড়িত না। এখন তরুণ নায়ক চান্ তরুণীর accomplishments হারমোনিয়ম,

…স কলা ও কায়দা। চান্—খেলোয়াড়; নায়িকার হস্তে নায়ক খেলানা …তে পারিলেই আপনাকে চরিতার্থ মনে করেন। সুতরাং এবার উদ্যান- …র আওতায় বনলতাকে ক্রমেই ম্রিয়মানা হইতে হইয়াছে।

…বিবাহের সময় বনলতার বয়স বার বৎসর। উপেনের তখন ফাষ্ট …র—কাজেই ১৬।১৭। ক্রমে দুই এক বৎসর গেল। উপেনের পিতার …া হইল। সংসারের অবস্থা এরূপ হইল, যে উপেন যদিও ২৫৲ টাকার …ি পাইল, তথাপি tuition করিয়া কিছু না আনিলে উপেনের ও তাহার …া ভ্রাতার কলিকাতায় থাকিয়া পড়া শুনা চলে না।

…একটী, দুটীর পর, তিনেরটী এক রকম জুটিল। একজন ব্রাহ্মের দুইটী …া পড়াইতে হইবে; আর তাঁহার ভগিনীর বয়স ১৫।১৬ চারুলতা নাম; …হইল উপেনের 'ফাও' শিষ্যা। চারুলতা গায় বাজায় ইংরাজি পড়ে, …র কি করে, না করে, আমি ঠিক বলিতে পারিব না। তবে গোড়ায় …লিয়াছিলাম, তাই বটে, চারুলতা-উদ্যানলতা; কাটা ছাটা, ফিটফাট, …হার ফ্রেমে তাহার দেহ ঝুঁকিয়া আছে; তাহার নীচে দিয়া লাল …রের ইট সাজান পথ। এই একেলের উদ্যানলতার আওতায়, দূর …গ্রামের বনলতা ম্রিয়মানা হইতে লাগিল।

…বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই বুঝা গিয়াছিল, উপেন ছোকরা এখনকার দশ …শত জন, সহস্র জন ছাত্রের মত শিক্ষাবায়ুগ্রস্ত। সে দুই জন বৈষ্ণবীর …সে এক জন বুড়া বৈরাগীকে দেখিয়া চটিয়া লাল। সে বলে ইহাদের ভি… দিলেই পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। [যে দেশে ভিক্ষা দেয় না, সে দে… পাপ—কি আমাদের দেশের চেয়ে কম?] সে নব বধূকে বোর্ডিংএ …ার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, তাহার বন্ধু বীরেন তাহাকে বলিয়াছিল—"…মার মাতা যে গৃহের কর্ত্রী—তোমার বড় মা যে গৃহের অধিষ্ঠাত্রী …, সেই গৃহের কাছে বোর্ডিং স্কুল কোন্ ছার?"। কিন্তু এমন করিয়া …কে আগে কেহ শিখায় নাই। যে উচ্চ শিক্ষা বিষে, বাঙ্গালার …দ জর্জ্জরিত, উপেনও তাহাতেই অভিভূত।

…ইত এখনকার দিনের উপেন; সেই উপেন একেবারে কেয়ারী কুঞ্জ …িতা, ভ্রমর-ভর-স্পন্দিতা উদ্যানলতার সম্মুখ স্থাপিত হইল।

তাহার মোহ লাগিল। যাহার মোহ হয়, সে কি তাহা বুঝে? বুঝে না সে মনে করিল, আমি বুদ্ধিমান্ লোক, বুদ্ধি বিবেকে ইহাকে appreciate করিতে পারিতেছি। সে বন্ধু বান্ধবদের কাছে বলিল, এটা আমার Intellectual Love—বুদ্ধির ভালবাসা।

মূল ঘটনা সংস্থানে কিছু বিশেষত্ব নাই; স্ত্রীস্বাধীনতার মহলে, কত যুবক যে ছেলে পড়াতে গিয়া, আপনার মাথা খাইয়াছে, তাহার সীমা নাই। সুতরাং ঘটনা সংস্থানে কোন বিশেষত্ব নাই; তবে যেরূপ নিপুণতার সহিত, যেরূপ দক্ষ হস্তে উপেন্দ্রের অধঃপতন গ্রন্থকার চিত্রিত করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দেওয়া যায় না, কেবল প্রশংসা করাই চলে।

উপেনের মানসিক অধঃপতন যখন পূর্ণ হইয়াছে; তখন অরুণের উদয় হইল। মিঃ অরুণ ব্যানর্জি বারিষ্টার হইয়া কলিকাতায় দেখা দিলেন। চারুলতার ভ্রাতা পরেশ বাবুর বাড়ী অরুণ আসা যাওয়া করিতে লাগিলেন। খেলওয়াড় আবার নূতন খেলানা পাইল। খেলিতে লাগিল। কিন্তু আমা-দের Intellectual lover এর, আর তাহা ভাল লাগিল না। অরুণকে তাড়াইতে পারিলে, এখন উপেন বাঁচে। হায় রে Intellectual! তোর দশাই এই।

অরুণের সঙ্গে চারুলতার খেল্ কিছু বেশী বেশী দেখিয়া—উপেন একে-বারে উন্মত্ত হইল। সে কলিকাতার সদর রাস্তায় দাঁড়াইয়া, রোমিওর মত কেবল বাতায়ন নিরীক্ষণ করে, আর মনে মনে আওড়ায় It is the east and Juliet is the sun ; arise fair sun—পাহারাওয়ালা ত কবিত্ব বুঝিল না; সে চোর বলিয়া সন্দেহ করিল; উপেনকে অরুণ চারুর সম্মুখে লইয়া গেল। জান পচান আছে দেখিয়া পাহারাওয়ালা চলিয়া গেল। উপেনের এই লাঞ্ছনায় মাথা ঘুরিয়া গেল; সংজ্ঞা হারাইয়া পড়িয়া গেল। * * * এতেতেও কিন্তু ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিতে পারিল না। চারুলতাকে মন হইতে তাড়াইতে পারিল না।

একটু আরোগ্যলাভ করিয়া জানিল, সে বি এ, পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছে, তিন বিষয়ে ফার্ষ্ট ক্লাসে অনর পাস করিয়াছে,—আর বিলাত যাইবার জন্য বৃত্তিও পাইবে।

উপেন ও তাহার বন্ধু বীরেন প্রভৃতি পূর্ব্বেই জানিত অরুণ বানর্জির নামে বিলাতে বিবাহের চুক্তি ভঙ্গের নালিশ হইয়াছিল। বীরেনের কাছে উপেন প্রতিজ্ঞা করিল, সে বিলাত গিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া অরুণকে নিশ্চয়ই ধরাইয়া দিবে, আর অরুণের পূর্ব্বচরিত্র প্রকাশ করিয়া চারুলতাকে তাহার কবল হইতে উদ্ধার করিবে।

একে ত সেই উপেন্দ্রনাথ, তাহার পর তাহার শিক্ষাবিভ্রাটের গরমি, আবার তাহার পর অসহায়া অবলাকে বঞ্চকের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার মোহ—এই ত্র্যহস্পর্শে সমস্ত পণ্ড হইয়া গেল। বৈষ্ণব বৈরাগীকে সমাজের নর্দ্দামা বলিয়া উপেন্দ্রচন্দ্র সেই নর্দ্দামা পরিষ্কার করিবার আগ্রহ দেখাইয়া-ছিলেন; কোথায় রহিল এখন সে সমাজ, কোথায় রহিল কাজলপুরের প্রত্যাশা, কোথায় রহিল দত্তপরিবারের সে শান্তি, সে দয়া, সে আতিথ্য, আর কোথায় রহিল সেই বিধাতার বনলতা? সকল ফেলিয়া সকল পদ-দলিত করিয়া, দত্তপরিবারের সকলকে কাঁদাইয়া, বনলতাকে মুসড়াইয়া দিয়া, উপেন্দ্র—অসহায়ার উদ্ধার সাধন জন্য এখন বিলাত যাত্রী। হায় কলিকাল! তুমিই অধর্ম্মকে ধর্ম্মচ্ছদে সজ্জিত করিতে পার।

উপেনকে এই অধর্ম্মের পথ হইতে ফিরাইবার জন্য উপেনের দাদা নগেন্দ্র সকলকে কলিকাতায় লইয়া গেলেন। উপেন কাহারও কথা রক্ষা করিল না—এখনকার ছেলেরা কথা রক্ষা করাকে স্বাধীনতার ব্যতিক্রম বলিয়া বুঝে। যখন উপেনের বিলাত যাওয়াই স্থির হইল, তখন বনলতা বিদায় কালে বলিল,—“যদি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া চারুকে বিবাহ করিতে পার, তবে তাহাই করিও। আমি আর তোমার সুখের পথে কাঁটা হইয়া থাকিব না। আমাকে আসিয়া আর দেখিতে পাইবে না। আমি আজ তোমার চরণে চিরদিনের জন্য বিদায় লইতেছি। পরমেশ্বর করুন, আমি যেন আর জন্মে তোমাকেই স্বামী পাই, আর যেন তোমাকে সুখী করিতে পারি।”

এতক্ষণ কান্না চাপিয়া রাখিয়া, এখনকার ছেলেদের হক, না হক, নিন্দা করিয়া, শিষ্ট শান্ত হইয়া বেশ সমালোচনা করিতেছিলাম; আর ত এ ভাব রক্ষা করিতে পারি না; এখন কান্না চাপিতে কলহের ভাব মনে উঠিতেছে,

কলহের ভাব চাপিতে যাইয়া, কান্না পাইতেছে। কলহ গ্রন্থকারের নামেও বটে, তাঁহার বনলতার কথাতেও বটে।

বৎসে বনলতা! তুমি যখন পরজন্মে স্বামীকে সুখী করিবার বাঞ্ছাপূরণের জন্য বাঞ্ছাময়ের কাছে জানাইতেছ, তখন ইহজন্মের আশা ত্যাগ করিতেছ কেন? পরজন্ম পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পার, আর তিন বৎসর ভিষ্টিতে পার না! কেন বাছা তুমি হিন্দুর মেয়ে হইয়া, এমন আশু ফল-প্রত্যাশিনী হইবে? সে যেখানে যাউক, যাই করুক, তুমি যখন তাহাকে ধরিয়াছ, তখন সে তোমারই; সে বাঁকুক চুরুক, তার আর কোথাও যাইবার উপায় নাই; এ যদি না হয়, তাহা হইলে প্রেম মিথ্যা, সতীত্ব মিথ্যা, হিন্দুর হিন্দু মিথ্যা, ভগবান মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা। তুমি হিন্দুর মেয়ে তাড়াতাড়ি—কেন করিবে বাছা? তোমার সিঁথের সিন্দুরের শোভাই—সহিষ্ণুতায়।

বেটী কিন্তু বুঝিল না। এখনকার দিনের মেয়ে কি না! এখন ছেলেগুলাও যেমন গোঁয়ার-গোবিন্দ, মেয়েগুলাও তেমনই একগুঁয়ে। তুমি সূর্য্যমুখী—স্বামীকে বাগাইতে পারিলে না; অমনই কুলের বাহির হইয়া পড়িলে; কেন গা? "না, আমি তাঁহার সুখের পথে কণ্টক হইব না" বটে,—দেখো অভিমান কর নাই ত? বেশ করিয়া আপনার হৃদয় বুঝিয়া দেখ দেখি—অভিমান কোথাও নাই ত? তুমি কুন্দনন্দিনী বিষ খাইয়াছ—অভিমান কর নাই ত? তুমি কি বলিতেছ,—"ভগবতি বসুন্ধরে দেহি মে অন্তরং"—এত অভিমানেরই ভাষা। আবার ও কাহাকে কি বলিতেছে! "অথ কথং আর্য্যপুত্রেন স্মৃতোয়ংদুঃখভাগিজনঃ?" একটু অভিমান এখনও রহিয়াছে নয়? আছে বৈ কি; থাকে বৈ কি; অভিমান যে প্রণয়ের মানরজ্জু। তবে অভিমান বৃন্দাবনে যতটা থাকে, প্রভাসে ততটা থাকে না, সময়ে কমাইয়া দেয়; সেই জন্য আশু-ফল-প্রয়াসী হইতে নাই, তাড়াতাড়ি করিতে নাই—সময়ের দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিতে হয়।

আসল কথা কি জান, বাছারা! সতীত্ব একটী বিন্দু নহে, একটী রেখা নহে; সতীত্ব একটী বিশ্ব-গোলক। বিন্দু উহার কেন্দ্র বটে, কিন্তু বিন্দুকে পরিধি করিও না। বিন্দু তোমার হৃদয়ে বটে, হৃদয় তোমার ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু সতীত্বের অধিকার বিশ্ব-ব্যাপী। সময়ে উহা ব্যাপিয়া পড়ে, ফুটিয়া

উঠে, সৌরভ বিস্তার করে; সতীত্বের কুঁড়ি লইয়া তুমি মরিবে কেন? নয় দাও, ফুটিতে দাও। সতীত্ব অমর। ও ত মরে না, তবে তুমি সতী লক্ষ্মী, সেই সতীত্বের আধার,—তুমি মরিতে যাইবে কেন? দক্ষালয় হইতে যাইতে চাও, যাও, কিন্তু শিবহৃদয় হইতে সরিতে পাইবে না। আবার বলি, তুমি যখন উপেনকে ধরিয়াছ, তখন তাহার সাধ্য কি যে সে তোমা-ছাড়া চিরদিন থাকিতে পারে? ইহকালেও নয়, পরকালেও নয়।

বেটী কিন্তু বুঝিল না। যে মরিবে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারা যায় কি? পারা গেল না। রোগ করিয়া, ঔষধ না খাইয়া, সেবা না লইয়া, বনলতা শুকাইতে লাগিল। শেষে উপেনের ফটোখানি ধ্যান করিতে করিতে রুদ্র সতীলোকে চলিয়া গেল।

কাহাকে কি বলি বল? ক্ষুদ্র নর নারীর প্রাণপাত করিলে অপরাধ হয়; আর হিন্দুনারীর ব্রতপাত করিলে, কাহারও কিছু হয় না? তোমার ব্রত কি? তুমি আজীবন স্বামীর সেবা করিবে, তুমি যদি অভিমানে সে সেবা ভঙ্গ কর, তোমার ব্রত পাত হইল। ঘোর অধর্ম্ম হইল। তাই বলিতেছি কাহাকে কি বলি বল?

কাহিনীর অনুসরণ আর করিব না। কেন না ক্ষীণা পবিত্রা স্বচ্ছ স্রোতস্বতীর বিচরণ ক্ষেত্র দেখাইতে গিয়া গ্রন্থকার অনেক ঝোড় ঝাক্কার, বন জঙ্গল দিয়া আমাদিগকে লইয়া গিয়াছেন। এরূপ না করিলে, শুনিতে পাই বই লেখা নাকি ভাল হয় না। তাই হ'বে।

চারুলতা,—তা বলিয়া ঝোড় ঝাক্কার নহে। চারুলতা গল্পের প্রয়োজনীয় পদার্থ। উদ্যানলতায় অতৃপ্ত হইয়াই বনলতার স্বভাব সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারি। চোরা সিঙ্গি দিয়া দশভুজা প্রতিমার প্রতিভা উজ্জ্বল করিয়াছ; ভালই ত; দুইখানি নৈবেদ্য উহাদের দিবে, তাও দাও,—জগন্মাতার প্রতি-দ্বন্দীদের গৌরব করা চাই বৈ কি? কিন্তু গ্রন্থকারের টান যেন, উহা অপেক্ষাও কিছু বেশী। সে সকলই মার্জ্জনা করিতাম, যদি যে দিন উপেন উন্মত্ত ভাবে পোলিস্ কর্ত্তৃক চারুর সম্মুখে নীত হইল, সে দিন যদি চারুতে,—আর একটু মনুষ্যত্ব দেখিতে পাইতাম। পাহারাওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল "আপলোক এনকো পছনত্যা হ্যায়?" এই কথাতে চারুর মুখ গম্ভীর

হইল। সে কোন কথা বলিল না।" এমন মনুষ্যত্বহীনার আবার ধ্রুবতারা কি? স্বচ্ছ-সলিলা স্রোতোস্বিনী দেখার খাতিরে আমরা বন জঙ্গল বেড়াইতে স্বীকার, কিন্তু মিঃ চকরাভর্ত্তির ঝোড়, নূতন সংস্করণে যেন একেবারে কাটিয়া ছাঁটিয়া পোড়াইয়া দেওয়া হয়, ইহাই আমাদের একান্ত অনুরোধ। চকরাভর্ত্তি একটা কিম্ভূতকিমাকার বীভৎস পাপিষ্ঠ, কাব্য জগতের পয়ো-নালীতেও উহার স্থান হইতে পারে না। সমাজে যাহা আছে—তাহার সমস্ত কি তবে লিখিতে হইবে না? নিশ্চয়ই না। শ্মশানের চিত্র দেখিয়া থাকিবেন কিন্তু পূরীষের চিত্র হয় কি? তা হয় না।

বাস্তবিক চকরাভর্ত্তি এই পুস্তকের কলঙ্ক—এই কলঙ্ক যতীন বাবু এবার যেন মুছিয়া ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রভাবতী যায় যাউক, তাহাতেও গ্রন্থের ক্ষতি হইবে না।

শান্তির চিত্র অপেক্ষা গ্রন্থে অশান্তির চিত্র—অধিক জায়গা জুড়িয়া রহিয়াছে—এটি গ্রন্থের দোষ। শেষের একটা আল্‌গা কথায় এই দোষটা আরও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"বিষাদময় সংসারে মানব জীবনের সান্ত্বনা কি?" বাস্তবিক কি সংসার বিষাদময়? যতীন বাবুর প্রশস্ত হৃদয়ের ধারণা যে এইরূপ তাহা কখনই হইতে পারে না। কেন না ইহার একটু পূর্ব্বে তিনি নিজেই বলিয়াছেন "দত্তদিগের পুণ্যের সংসার, ক্রমে তাহার অবস্থা আবার ফিরিল।" অর্থাৎ পুণ্য থাকিলেই পরিণামে ভাল হয়। তবে আবার বিষাদময় কেন? যাহাই হউক, আমরা ওটা একটা আল্‌গা কথার মত ধরিলাম।

গ্রন্থকার গুণী, তাঁহার রচনায় সহস্র গুণপনা আছে; তবে কেন কতকগুলা আবর্জ্জনায়, এ হেন অপূর্ব্ব গ্রন্থ মলিন হইয়া থাকিবে? সেই জন্য আবার বলি, পাপের চিত্র কমাইয়া দাও, পুণ্যের চিত্র জলন্ত হইয়া উঠুক; পুণ্য সলিলা স্রোতস্বতীর কলগান আমরা সুস্পষ্ট শুনিতে পাইয়া, মনোপ্রাণ আরও জুড়াইতে থাকি।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

কদমতলা, চুঁচুড়া।

পূর্ণিমার ঊষা।

নিশি অবসানে নববধূ ঊষা
আধঘুমঘোরে জাগিয়া উঠি',
দেখিল সমুখে—ঢল ঢল চাঁদ,
ঘুমে ঢুলু ঢুলু নয়ন দুটী!
সারারাতি খেলি প্রমোদের খেলা
আকুল পরাণ ঘুমের আশে,
অবশ চরণ—আবেশে বিভোর—
ফিরিতেছে ধীরে আপন-বাসে!
পিছন ফিরিয়া দেখিল বালিকা,—
হাসিভরা মুখ অরুণ-পতি,
—"কালরাত্রি" গেল,—আসিছে মাতিয়া
নববধূ-পাশে সুমন্দ গতি!
দৃষ্টিপথ হ'তে পলাবারে চায়,
না পারে না চলে চরণ-দুটী;—
লাজে আরক্তিম হইল তখন,—
পারিল না আর পলাতে ছুটি'!
সরলারে দেখি সরল অরুণ
পসারিয়া ধরিল যুগল কর;—
পতির সোহাগে ভুলিয়া বালিকা,
ঢলিয়া পড়িল পতির 'পর!
মিলি গেল ঊষা অরুণের সাথে,
ফুটিল গগনে সোণার ছটা;
সতী সনে মিলি তরুণ অরুণ
জানা'ল জগতে মহিমা-ঘটা!

...মিতি, চুঁচুড়া। শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

মহর্ষি কণ্ব।

প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে সুখশয়ন বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া দেখিলেন তাত কাশ্যপ লজ্জাবনতমুখী শকুন্তলাকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দের সহিত বলিতেছেন, "বৎসে সৌভাগ্যক্রমে ধূমাকুলিতদৃষ্টি—যজমানের আহুতি অগ্নিতেই পড়িয়াছে। সুশিষ্যে প্রদত্ত বিদ্যার ন্যায় তোমার জন্য কোন দুঃখের কারণ নাই। অদ্যই ঋষিগণের সঙ্গে তোমাকে স্বামী-সন্নিধানে পাঠাইয়া দিব"। ইনি আদর্শ পিতা বটেন। এরূপ দেশকালপাত্রের উদারচরিত মহাপুরুষ লোকশিক্ষার চরম আদর্শস্থল। কন্যা ও পিতার সম্বন্ধ ইহা অপেক্ষা সুন্দর ও উচ্চতর হইতে পারে না।

এই ঘটনার কিয়ৎপরেই আমরা নাটকমধ্যে মহর্ষির প্রথম সশরীরে দর্শন পাই। প্রত্যূষস্নাতা শকুন্তলাকে প্রথমে পূজনীয়া আশ্রমতাপসীরা ধান্যহস্তে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন; তাহার পর সখীরা মাঙ্গল্য পুষ্প বিলেপনাদি দ্বারা এবং পরে বনস্পতিগণ প্রদত্ত অলঙ্কারাদি দ্বারা শকুন্তলার লাবণ্যময় দেহ অলঙ্কৃত করিলেন। এমন সময় জ্ঞানোত্তীর্ণ ভগবান কাশ্যপ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রথম কথাই অপূর্ব্ব স্নেহময়ঃ

"যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ংসংস্পৃষ্ট মুৎকণ্ঠয়া
কণ্ঠঃ স্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তি কলুষশ্চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমহো স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং ন্বু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ॥"

তিনি অরণ্যবাসী হইলেও কিরূপ স্নেহকাতর! তিনি কঠোর তপস্বী নন; বিশ্বপ্রেমে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ। ভাবি তনয়াবিরহে উৎকণ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিয়া পরক্ষণেই শকুন্তলাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ঃ

"যযাতেরিব শর্ম্মিষ্ঠা ভর্ত্তুর্বহুমতাভব।
সুতং ত্বমপি সম্রাজং সেব পুরুমবাপ্নুহি॥"

এবং তাঁহাকে সদ্যোহুত অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে বলিলেন; এবং প্রদক্ষিণ সমাপন হইলে পুনরায় বৈদিকচ্ছন্দে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে

গৌতমী প্রভৃতি শিষ্যাগণকে শকুন্তলার অগ্রে অগ্রে যাইয়া পথ দেখাইতে বলিলেন। তপোবন ছাড়িবার সময় মহর্ষি তপোবন তরুদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্॥
আদ্যেবঃ কুসুমপ্রসূতি সময়ে যস্যাভবত্যুৎসবঃ
সেয়ংযাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥

এই কথাগুলি শুনিয়া শরীর ঈষৎ রোমাঞ্চিত হয়। মহর্ষির অসীম প্রীতি কেবল মানুষের উপর নয়, ভগবৎসৃষ্ট প্রত্যেক পদার্থের উপর। মহর্ষি লতাগুলিকেও জীবন্ত মনে করেন। এরূপ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। মানুষের মনোবৃত্তির উপর বাহ্য প্রকৃতির অতুল প্রভাব। যে সকল তরুলতা ও তাহাদের কিসলয় পুষ্প ফলোদ্গম আমরা দেখিয়া আসিতেছি তাহাদের সহিত একটা স্নেহময় চিরসৌহার্দ্য সংস্থাপিত হয়। তাহাদের হঠাৎ ছাড়িয়া যাইতে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। তাহাদের অনুমতি না হইলে যেন তাহাদের ছাড়িতে ইচ্ছা করে না। মহাকবি এই ভাবটী এখানে বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছেন। ইংলণ্ডের কোন কোন বড় কবিও এইরূপ বাহ্যপ্রকৃতিকে জীবন্ত মনে করেন। Wordsworth এবং Tennyson তাঁহাদের কাব্যের অনেক স্থলে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। Tennyson, আবাল্যাভ্যস্ত প্রকৃতির শোভা, বহুদিন পরে, পুনরায় দেখিলে কিরূপ মনোভাব হয় তাহা বড় সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

"Tears, idle tears, I know not what they mean,
Tears from the depth of some divine despair
Rise in the heart and gather to the eyes,
In looking on the happy autumn fields,
And thinking of the days that are no more."

কালিদাস তাঁহার নাটকে স্বীয়প্রতিভার উপযুক্ত কাব্যকৌশল সহিত তরু-লতা মৃগ প্রভৃতিতে কিয়ৎপরিমাণে মানুষভাব আরোপ করিয়াছেন। ইহাতে অসঙ্গত বা অসম্বদ্ধ কিছুই নাই। ইহাতে একটা Psychological truth আছে এবং তদ্দ্বারা নাটকীয় পাত্রদের চরিত্র বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে।

শকুন্তলার লতাভগিনীর নাম বনজ্যোৎস্না। বিদায়কালে সখীদের ন্যায় এই লতাভগিনীকেও শাখারূপ বাহু ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। লতা ও পাদপের মিলনকে কবিরা সচরাচর তাহাদের উদ্বাহক্রিয়া বলিয়া বর্ণনা করেন। মহাকবি "কুমারে" এই উপমা বড় সুন্দর ও সম্পূর্ণ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন:

পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবক স্তনাভ্যঃ
স্ফুরৎপ্রবালোষ্ঠ মনোহরাভ্যঃ ।
লতাবধূভ্যস্তরবোঽপ্যবাপুঃ
বিনম্র শাখা ভুজ বন্ধনানি ॥

কিন্তু "শকুন্তলে" এই লতাপাদপ মিলন ব্যাপারে ইহা অপেক্ষা আরো একটু সুসঙ্গত এবং আশ্রমোচিত সরলতার আরোপিত হইয়াছে। বনজ্যোৎস্নার সহিত চূতপাদপের শুধু উদ্বাহক্রিয়া হইয়াছে তাহা নয়, আশ্রমের লোকেরা তাহাদের যেন মানুষ বলিয়া ধরিয়া লইতেছেন। ইহা শুধু আশ্রমবাসিকাদের বাল্যক্রীড়া নয়। স্বয়ং মহর্ষি বলিতেছেন ঃ

"আমি প্রথমে তোমার নিমিত্ত যাদৃশ স্বামীর ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তুমি পুণ্যবলে তাদৃশ স্বামী প্রাপ্ত হইয়াছ; এই নবমালিকাও চূতপাদপের সহিত মিলিত হইয়াছে। আমি এক্ষণে ইহার ও তোমার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়াছি।" মহর্ষিও এই নবমালিকা ও চূতপাদপে মনুষ্যত্ব আরোপ করিয়াছেন। তিনি ভগবানের মহিমা সর্ব্বত্রই দেখিয়া থাকেন; ক্ষুদ্র তৃণেতেও তাঁহার স্বীয় কন্যাদের ন্যায় স্নেহপূর্ণ ভাব। তিনি মহাজ্ঞানী মহর্ষি হইলেও তাঁহার হৃদয় কুসুমবৎ কোমল।

কালিদাস মহর্ষিকে একটু Superstitious করিয়াছেন। কোকিলের কলরবকে তিনি বনস্পতিগণের অনুমোদনসূচক প্রত্যুত্তর মনে করিয়া লইলেন। এ রকম Superstitions প্রায় সকলেরই। ইহা একটা মনের বিশ্বাসমাত্র। ঈশ্বরপ্রেমিকের এই বিশ্বাস সত্যও হইতে পারে। ইহা বিজ্ঞানবিরোধী নয়। ইহাও একটা Psychological truth। Coming events cast their shadows beforehand একটা অতি সত্য প্রবচন। মহাকবি Shakespere-এর অনেক নাটকে এই সত্যের উদাহরণ আছে। যাঁহারা মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহাদের

...ছে এই সত্য নিত্য প্রত্যক্ষীভূত। এরূপও হইতে পারে সেকালে ...দেশ যাত্রার সময়ে কোকিলধ্বনি শুভলক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। মহর্ষি ...নাকে এত জ্ঞানী মনে করিতেন না যে একটা নির্দ্দোষ লোকচলিত ...শ্বাসকে অশিক্ষিত স্ত্রীজনোচিত মূর্খতা বলিয়া হঠাৎ পরিত্যাগ করিবেন। ...হাও মহর্ষি-চরিত্রের একটী বিশিষ্ট গুণ।

বনদেবতাদিগের আশীর্ব্বাদ অলৌকিক হইলেও কালিদাসের কাব্যে ...হা নূতন নহে। তপোবনদেবতারা তাঁহার কাব্যের অঙ্গীভূত। ইয়োরো-...ীয় সাহিত্যের Nymphগণও সুবিখ্যাত। কালিদাসও মধ্যে মধ্যে তাঁহা-...দিগকে মনুষ্যচক্ষুর্গোচর করিয়া থাকেন। "কুমারে" কবি বনদেবতাদের ...উমার সহচরী করিয়া দিয়াছেন ঃ

"অনু প্রয়াতা বনদেবতাভ্যাং
অদৃশ্যত স্থাবররাজকন্যা।"

শকুন্তলা সখীদের নিকট হইতে ক্রমে বিদায় লইতেছেন। বড় হৃদয়-...বিদারক করুণ দৃশ্য। মহর্ষিও প্রাণে বড় ব্যথা পাইতেছেন। তথাপি ...তাঁহার কর্ত্তব্য ভুলিতেছেন না। একবার অনসূয়াকে বলিলেন, "অনসূয়ে রোদন করিও না শকুন্তলাকে স্থির করা তোমাদের দুজনের কর্ত্তব্য।" ...কুন্তলার পুত্রীকৃত মাতৃহীন মৃগশিশু তাঁহার বসনাঞ্চল আকর্ষণ করিলে, "কে আমার বসন টানিতেছে" বলিয়া ফিরিয়া দেখিলেন। করুণার্দ্র-হৃদয় মহর্ষি বিয়োগবিধুর ভাবে বলিলেন ঃ

"যস্ত্বয়া ব্রণবিরোপণমিঙ্গুদীনাং
তৈলং ন্যষিচ্যত মুখে কুশসূচিবিদ্ধে।
শ্যামাকমুষ্টিপরিবর্দ্ধিতকো জহাতি
সোঽয়ং ন পুত্রকৃতকঃ পদবীং মৃগস্তে ॥"

...কুন্তলাও তাঁহার বাল্যজীবনের কথা স্মরণ করিয়া এবং তাঁহাকে ছাড়িয়া ...চলিয়া যাইতে হইতেছে মনে করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। মহর্ষিই আবার ...তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন; বলিলেন, "একটু স্থির হইয়া দৃষ্টিশক্তির আবরক ...অশ্রুপ্রবাহ নিরুদ্ধ কর। উন্নতানত ভূমিতে তোমার পদস্খলন হইতেছে।" ...মহর্ষির শোকসংবরণ ক্ষমতা অসীম।

তিনি লোকাচারও মানিয়া থাকেন। "জলাশয় পর্য্যন্ত স্নিগ্ধ জনের যাওয়া কর্ত্তব্য" শিষ্যের এই কথায়, মহর্ষি কন্যাকে বিদায় দিবার জন্য ক্ষীরবৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইলেন। সেইখানে দাঁড়াইয়া মনে মনে চিন্তা করিয়া রাজাকে কি বলিবেন তাহা ঠিক করিয়া শিষ্যের নিকটে নিজ বক্তব্য বলিলেন। এই দুষ্যন্ত সন্দেশের মধ্যে সার কথা এই টুকু; "আমি তপস্বী, আপনি উচ্চবংশীয় রাজা; শকুন্তলার আপনার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া, আমার কন্যাকে আপনি অন্যান্য পত্নীর মধ্যে একজন মনে করিবেন এবং ইহার প্রতি সাধারণ গৌরব দেখাইবেন। ইহার অধিক সৌভাগ্য ভাগ্যায়ত্ত; আমার সে বিষয়ে কিছু বলা উচিত নয়"। সকলেই চায় আমার কন্যা শ্বশুরকুলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গৌরবপাত্র হউক। মহর্ষি কেবল সাধারণ-গৌরব চাহিলেন। তিনি স্বার্থশূন্য মহা-পুরুষ। যাহা উচিত, কেবল তাহাই চাহিলেন।

শকুন্তলাকে মহর্ষি শ্বশুরালয়ে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে উপদেশ দিলেন তাহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে প্রযোজ্য ঃ

শুশ্রূষস্বগুরূন্ কুরুপ্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপংগমঃ।
ভূয়িষ্ঠংভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদংযুবতয়োবামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥

সেকালে বহুবিবাহ ছিল। একালে "সপত্নীজনে" পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়া "স্বদাসীজনে" এই পাঠ ধরিলেই ঠিক হয়। বিবাহিতা কন্যার প্রতি ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সুন্দর উপদেশ হইতে পারে না। কন্যাকে এই উপদেশ দিয়া মহর্ষির মন ঠিক মানে নাই। বর্ষীয়সী রমণীরা হয় ত তাঁহা অপেক্ষা বেশী জানেন মনে করিয়া বলিলেন "গৌতমীর এ বিষয়ে কি মত"। গৌতমী বলিলেন "বধূর প্রতি এইই প্রকৃত উপদেশ" এবং শকুন্তলাকে তাহা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে বলিলেন। "বলবদপি শিক্ষিতানাং আত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ"; সেই জন্য গৌতমীর মতগ্রহণ। মহর্ষি সর্ব্বগুণভূষিত।

মহর্ষি সংসারী না হইলেও সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্যে তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি। শকুন্তলা বলিলেন "পিতঃ সখীরা কি এখান হইতে ফিরিবে?" পিতা

বলিলেন, "বৎসে ইমে অপি প্রদেয়ে"। ইহাদিগকেও উপযুক্ত পাত্রে প্রদান করিতে হইবে। তাহাদের আর বেশীদূর যাওয়া উচিত নয়। প্রবীণা গৌতমী শকুন্তলার সঙ্গে রাজভবনে যাইবেন। শকুন্তলা ভাবি পিতৃবিরহে বড়ই কাতর হইলেন। আদর্শ পিতা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন, "বৎসে, কেন কাতরা হইতেছ? স্বামীগৃহে গৃহিনী পদ পাইয়া সংসারের গুরুতর কর্ত্তব্যে অনুক্ষণ ব্যস্ত থাকিবে এবং শীঘ্রই কুলপাবন পুত্র প্রসব করিয়া আমার বিয়োগ জন্য শোক তত অনুভব করিবে না"। শকুন্তলা পিতাকে প্রণাম এবং উভয় সখীকে একসঙ্গে আলিঙ্গন করিলেন। শিষ্যেরা তাড়াতাড়ি করিতে লাগিলেন। শকুন্তলা আবার পিতার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আবার কবে তপোবন দেখিতে পাইবেন। কণ্ব বলিলেন,

"ভূত্বা চিরায় চতুরন্তমহীসপত্নী
দৌষ্যন্তিমপ্রতিরথং তনয়ং নিবেশ্য।
ভর্ত্রা তদর্পিতকুটুম্বভরেণ সার্দ্ধং
শান্তে করিষ্যসি পদং পুনরাশ্রমেঽস্মিন্॥"

ইহাতে বুদ্ধিমতী কন্যার কতকটা আশ্বস্ত হইবার কথা।

তাহার পর পিতা ও কন্যার কথা আর ফুরায় না। এবার গৌতমী উভয়কে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন এবং গমন বেলা অতিক্রান্ত হইতেছে বলিলেন। এইবার সত্য সত্য বিদায়কাল উপস্থিত। মহর্ষিও অনুচিত বিলম্ব দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বৎসে, তপোঽনুষ্ঠানের ব্যাঘাত হই-তেছে"। এই কথার পর শকুন্তলা আর বিলম্ব করিলেন না। বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি পিতার উপযুক্ত কন্যা। শেষ বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইয়া পিতাকে পুনরালিঙ্গন করিলেন এবং নিজেই পিতাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "আপনার শরীর তপশ্চরণ জন্য পীড়িত। আপনি আমার জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইবেন না"। এইবার মহর্ষি আর থাকিতে পারিলেন না। এবার সত্য সত্যই কন্যা চলিয়া যাইতেছে। এতক্ষণ মেঘ ঘনীভূত হইতেছিল। এবার বারিবর্ষণ হইল। মহর্ষি যেন কাঁদিয়া ফেলি-লেন। নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বৎসে, তুমি পূর্ব্বে কুটীরদ্বারে

নীবার ধান্যে যে পূজোপহার দিয়াছিলে, তাহা এক্ষণে অঙ্কুরিত হইয়াছে; তাহা দেখিয়া কি করিয়া আমার শোকের শান্তি হইবে"। পরমুহূর্ত্তেই বলিলেন "বৎসে পতিগৃহে গমন কর। পথে তোমার মঙ্গল হউক"। এই মহর্ষি কণ্ব অদ্ভুত চরিত। এই জন্য কবি বলিয়াছেন,

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোঽনুবিজ্ঞাতুমর্হতি॥"

কণ্ব মুনি লোকোত্তর চরিত্র। ক্রমে শকুন্তলা নয়নপথের অতীত হইলেন। সখীরা কাঁদিয়া ফেলিলেন, মহর্ষি এখনো দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "অনসূয়ে, তোমাদের সহধর্ম্মচারিণী চলিয়া গেলেন; শোক নিরোধ করিয়া আমার অনুগমন কর"। উভয় কন্যাই বলিলেন, "পিতঃ শকুন্তলা নাই বলিয়া যেন শূন্য তপোবনে প্রবেশ করিতেছি"। তত্ত্বজ্ঞানী মহামুনি বলিলেন, "স্নেহপ্রবৃত্তি এইরূপ দেখিয়া থাকে"। তার পর চিন্তাকুলভাবে পর্ণশালার দিকে যাইতে যাইতে যেন আপন মনেই বলিতে লাগিলেন ঃ

"আঃ, আজ শকুন্তলাকে স্বামিগৃহে পাঠাইয়া স্বাস্থ্যলাভ করিলাম। যেহেতু, কন্যা পরের সামগ্রী। গচ্ছিত অর্থ প্রত্যর্পণ করিলে চিত্ত যেমন অতিশয় নির্ম্মল ও নিশ্চিন্ত হয়, আজ শকুন্তলাকে তাহার পতিগৃহে পাঠাইয়া আমার মন সেইরূপ নিশ্চিন্ত হইয়াছে।" পিতা ও কন্যার পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে ইহাই যথার্থ তত্ত্বকথা। এরূপ সম্বন্ধ ভারতবর্ষীয় মহাকবির সর্ব্বত্রই। নাটক ভিন্ন আর কোথাও এমন উৎকৃষ্ট ভাবে দেখান হয় নাই। আদর্শ পিতার চরিত্র দেখাইবার জন্য মহাকবির এই মহর্ষিচরিত্র সৃষ্টি। মহাকবি Shakespereএর একখানি উৎকৃষ্ট নাটকে (Tempest) পিতা ও কন্যার এইরূপ একটী ছবি কিয়ৎপরিমাণে আমরা দেখিতে পাই। Prospero একমাত্র জীবন সম্বল তাঁহার একমাত্র কন্যা,—অনিন্দ্যসুন্দরী মিরাণ্ডা। তিনিও কন্যাকে উপযুক্ত নৈতিক শিক্ষা দিয়াছেন এবং তাঁহাকে সর্ব্বগুণ ভূষিতা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কন্যার প্রতি ব্যবহার যথেষ্ট পিতৃস্নেহপূর্ণ হইলেও একটু যেন কঠিনতাযুক্ত (severe)। তিনি কন্যার উপর যেটুকু পিতার অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন তাহাতে যে

একটু বাঁধাবাঁধি আছে। Shakespereএর বোধ হয় আদর্শ পিতা অঙ্কিত করিবার উদ্দেশ্য নয়। অন্যান্য নাটকীয় ঘটনা পরিস্ফুট করিবার জন্য Prosperoর সৃষ্টি। ভারতবর্ষীয় মহাকবি আদর্শচরিত ঋষি এবং আদর্শ পিতার ছবি বিশেষ ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। মহাকবি দেখাইয়াছেন রাজা দুষ্মন্ত উপযুক্ত বংশ হইতেই রমণীরত্ন লাভ করিয়াছেন। উপযুক্ত পিতা এবং যোগ্যা মাতা হইতেই মহাভাগ ভরত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

এক চতুর্থাঙ্কেই মহাকবি এই বিরাট ঋষিমূর্ত্তি দেখাইয়াছেন। নাটকের এই চতুর্থাঙ্কের পর আর মহর্ষি লোকলোচন-গোচর হয়েন নাই। কিন্তু তাঁহার বিরাট সত্তা ও মহামহিমময় চরিত আমাদের হৃদয়ে চিরকালের জন্য অঙ্কিত হইয়াছে। এই পুণ্যময় মহৎ আদর্শ জগতে প্রভূত মঙ্গলসাধন করিবে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন।

দ্বারকার পথে।

(৭)

আমরা ধোরাজী হইতে ফিরিয়া আসিতে সন্ধ্যা হইল—ঠিক সন্ধ্যা নয় গোধূলি। আসিয়াই অঙ্গার প্রস্তুতে মগ্ন হইয়াছিলাম। পূর্ণচন্দ্র বলিলেন খাবার ত পাওয়া গেল না—সঙ্গে যখন আমাদের সমস্তই আছে তখন খিচুড়ীর ব্যবস্থা করি না কেন? আমি বলিলাম সে অনেক হাঙ্গামা।

পূর্ণ।—হাঙ্গামা কিছুই নয়, আমি রান্না ঘর দেখিয়াছি সেটা ওয়েটিং রুমের পাশেই। একটা খালাসীকে দিয়া সাফ্ করাইতেছি। বুকিংক্লার্ক একজন উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ। তাঁকে বলিয়াছি তিনি তাঁহার তৈজস পত্র দিবেন। ষ্টেসন মাষ্টার মুসলমান তাঁহার কোন জিনিস না লইলেই হইল।

ষ্টেসন মাষ্টার এমন সময় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আপনারা নাকি রাঁধিবার যোগাড় করিতেছেন? আমি বলিলাম বাবুজীর রোক্ চাপিয়াছে। তখন তিনি সেই উৎকল ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া আমাদিগকে সাহায্য করিতে বলিলেন। দুই তিন জন লোক, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি পূর্ণ সাহায্যকারী হইল। সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া মাষ্টার মহাশয় বাসাতে জল খাইতে গেলেন। তিনি পরিবার সহ বাস করেন।

আমি ওয়েটিং রুমে যেমন ঢুকিলাম অমনি বিশাল শব্দে দরজা পড়িয়া গেল। চেষ্টা করিয়া আর দরজা খুলিতে পারিলাম না। একেবারে বাহির আসিবার যো নাই। ওদিকে জানালাটী মোটা কাচ দিয়া আবদ্ধ, খুলিবার যো নাই, আর দরজা বা জানালা নাই সুতরাং আমি কয়েদী। চীৎকার করিয়া দেখিলাম কেহ শুনিতে পায় না। তখন মনে হইল যদি বাহির হইতে দরজা না খোলা যায় বা না খুলে তবে আমার জীবন্ত গোর। কোথা নবেলে পড়িয়াছিলাম তাহা মনে আসিল। কি করি উপায় নাই—কেহ জানেও না যে আমি ঘরে ঢুকিয়াছি ও দ্বার আপনা হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ঘরে মিট মিট করিয়া একটী কেরোসিন চিম্নী জলিতেছিল। নহিলে ঘোর অন্ধকারে থাকিতে হইত। এদিকে শৌচের চেষ্টাও হইয়াছে সুতরাং জপ আহ্নিক করিবারও সুবিধা নাই। তখন বিপদে মধুসূদন নাম জপ করিতে আরম্ভ করিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে (আমার পক্ষে এক যুগ) পূর্ণ মশলার গুঁড়া লইতে ঘরে আসিল। পরে শুনিলাম সে দরজা খুলিতে বিফল প্রয়াস হইয়াছিল, এমন সময় মাষ্টার মহাশয় আসিয়া ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তিনি তখন কৌশল করিয়া দরজা খুলিলেন— আর প্রথম ঠাণ্ডা হাওয়া আমার পক্ষে যেন অমৃত স্পর্শ বোধ হইল। তিনি বলিলেন দরজায় স্প্রিং আছে। মাঝে মাঝে যাত্রী বিপদে পড়ে। তিনি না আসিলে আমারও বিপদ বড় কম হয় নাই।

সে যাহা হোক শৌচকার্য্য সারিয়া আহ্নিক সমাপন করিয়া বাহিরে আসিলাম; মাষ্টার মহাশয়ও তাঁহার হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। আমি দেখিলাম যে খুব মস্ত বড় উদার হৃদয় ও দয়া দাক্ষিণ্যাদি বিশেষ গুণে অলঙ্কৃত। এত গল্প হইল (অবশ্য রাজনীতি নহে) যে তাহা লিখিলে

খানা বড় পুঁথি হয়। সে গল্প আর বলিব না। মোটের উপর কেবল একটা কথা বলি। তিনি আমার গীর্ণার না যাওয়ায় বড়ই দুঃখিত হইলেন। এতদূর আসিয়া গীর্ণার দেখিলেন না—বার বার এই কথা বলিলেন; তাঁহার কথার ভাবে স্পষ্ট বুঝিলাম যে তিনি গীর্ণার পাহাড়ে সিদ্ধ সাধু থাকা বিশ্বাস করেন। Mysterious hill বলিয়া গীর্ণার আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাও শুনিলাম।

যাহাহৌক সহসা তাঁহার মুখে শুনিলাম যে প্রাতে ৭টার সময় একখানা মিক্স্‌ড্ (mixed) ট্রেণ ধোরাজী ছাড়িয়া পোরবন্দরে যাইবে ও বেলা দুপুর একটার সময় তথা পঁহুছিবে। কুলীদিগকে মাল বোঝাই দিবার উপদেশ দিতেছিলেন। সহসা ঐ কথা শুনিয়া আমি বলিলাম যখন mixed ট্রেণ রহিয়াছে তখন ঐ ট্রেণেই যাইব। তিনি বলিলেন আহারের বড় কষ্ট হইবে। ট্রেণ বড় বিলম্ব করে—মাঝে মাঝে ষ্টেসনে মাল তোলে নামায়। আমি বলিলাম দুই এক দিন উপবাস আমাদের অভ্যাসগত—তাতে ক্ষতি হইবে না, প্রাতেই যাইব। বন্ধুকে সে কথা জানাইলাম; তিনি শুনিয়া আনন্দিত হইলেন।

অতি প্রত্যুষে শৌচাচার শেষ করিয়া, মোট ঘাট বাঁধিয়া ঠিক করিলাম। এমন সময় উৎকল ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন "কাল আমি আপনার দর্শন পাই নাই। আজ তাই সকাল চা করিয়া আনিয়াছি। আপিসে আসুন— পান করিবেন।" আমি বলিলাম আপিসে অচেনা লোকের কি যাওয়া উচিত। প্রত্যুত্তরে শুনিলাম যে তিনি ভূতের মত পরিশ্রম আর করিতে পারেন না,—একেলা বুকিং ক্লার্ক ও টেলিগ্রাফ সিগ্‌নালার—ভোর হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত খাটুনী অথচ মাহিনা ২০৲; তিনি গত কল্য রিজাইন দিয়াছেন। বলিলেন আমাদের দেখিয়া তাঁর স্ফূর্ত্তি আসিল, তিনি আর এ কাজ করিবেন না। দেখিলাম ব্রাহ্মণ অতি সজ্জন ও উদার ও অতিথিবৎসল। রিজাইন দিয়াছেন শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। তিনি বলিলেন এরূপ চাকরীর অভাব নাই। মুসলমান ও পার্সীরা এদেশে রেলের সব চাকরী করে আর অন্য লোক পাওয়া যায় না। আমি কাজ জানি আমায় বসিয়া থাকিতে হইবে না। যাহা হউক, চা পানের পর গাড়ী আসিয়া প্লাট-

ফরমে লাগিল। আমি উৎকল মহাশয়ের সহিত কথা কহিতেছি এম
সময় আমার মোট সব ফাষ্ট ক্লাসে চাপাইয়া দিয়াছে। ইহারাই রাত্রিতে
আমার সেবা করিয়াছিল ; মনে করেছে বড় বাবু—১ম শ্রেণীর আরোহী।
যাহা হৌক ষ্টেসন মাষ্টার আসিলেন, বিদায় গ্রহণের কার্য্য দফায় দফায় শে
হইল। সকলেই গাড়ীর নিকট, আমি বলিলাম, মোট কোথা? তখ
১ম শ্রেণী দেখাইয়া দিলেন। আমি বলিলাম ভুল হইয়াছে ৩য় শ্রেণীতে
যাইবে। সকলে শুনিয়া অবাক্। তখন গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে সুতরাং মোট
শুদ্ধ পড়িয়া মোটের কিনারা করা হইল। মাষ্টার মহাশয় বার বার বলি
লেন, তৃতীয় শ্রেণীতে যাইতে কুণ্ঠা নাই—আপনি মহাশয় ব্যক্তি। ফাঁকতালে
একটা সুখ্যাতি অর্জ্জন হইল বলিয়া বিড়ম্বনার কথা ভাবিতেছি—এমন সম
পুলিস ও সেবাকারী লোকেরা আসিল। কিছু দিতে গেলাম—লইল না।
বুঝিলাম মাষ্টারের বারণ। আমি বলিলাম মুটেদের মাথা খান কেন!
তিনি বলিলেন অগ্রে আমার মাথাটা ত খাইয়াছেন। যাহা হৌক একদিনে
এত পুরাণ বন্ধুত্ব হওয়া বড় বেশী মনে পড়ে না। এদিকে গাড়ী ছে
হইতেছে দেখিয়া গার্ড ব্যগ্র হইল। বীণাধ্বনি—সঙ্গে সঙ্গে ছুটাছুটি হটাহটি
শেষ হইল আর উভয় পক্ষেই নেত্রকোণে অশ্রু ঝরিল। মনে হইল যে
স্বর্গভোগ করিয়া এখন পুণ্য ক্ষীণে পতন হইতেছে—কোথায় যাইতেছি!
যতক্ষণ দেখা যায় উভয় পক্ষই সুযোগ ত্যাগ করিলেন না। শেষে এবা
বিশ্রামের জন্য বসিয়া পড়িলাম। পূর্ণচন্দ্র বড় খুসী। আমি টাইমটেবেল
লইয়া পড়িলাম। দুই একটী বড় বড় হিন্দু সহরের পাশ দিয়া গাড়ী চলি
বেলা দুইটার আমলে পোরবন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

থপ্ করিয়া পোরবন্দরে পঁহুছিলে অনেকে বোধ হয় খুব খুসী হইবেন
কেহ বা ভিন্ন রুচির লোক থাকিতে পারেন। এত বড় "জর্নিটা" অমনি
এক নিশ্বাসের রামায়ণ হইবে, তিনি বলিবেন, সেটা কি ভাল? এই উভয়
পক্ষ বজায় রাখিবার জন্য পথের কথা কিছু বলি। আমাদের গাড়ী
ভারতবর্ষের দিকে পিছন করিয়া পশ্চিম-মুখো হইয়া অর্থাৎ আরব বা আরব
সাগরের দিকে মুখ করিয়া হু হু ছুটিতেছে। পোরবন্দর হইতেছে সর্বশেষ
পশ্চিম-প্রান্ত—ভারতের সর্ব্বশেষ পশ্চিম দ্রাঘিমা। যখনই এই কথা মনে

তেছিল তখনই হৃদয়ে একটা অপূর্ব্ব ভাব আসিতেছিল—সেটা আনন্দ ও
রাগ্য মিশ্রিত—কতকটা শ্মশান বৈরাগ্যের মত ত বটেই। যখন ভাবটা
হইয়া আসিল তখন চক্ষু আপনা হইতে মুদিত হইল, মানসাকাশে
সিয়া উঠিল—দ্বাপরের দ্বারকাপুরী। যেন আমাকে কেহ যদুবংশের
-জীবন ও জীবন-ইতিহাসের বায়োস্কোপ দেখাইতেছে। আমি কোন
বের মত নেশায় মজ্গুল্ হইয়া সমাধির আনন্দের সঙ্গে দর্শন-সুখ অনুভব
রিতেছি। ক্ষণপরে এ ভাবটা কাটিয়া গেল, কিন্তু যাইবার সময় সময়
মারিয়া গেল, "রৈবতক, রৈবতক" শব্দ করিয়া গেল। আমি প্রকাশ্যে
লিলাম পূর্ণ তোমারই দোষে গীর্ণার যাওয়া হইল না। ঐ কথা লইয়া
একটা ঝগড়া হইয়া গেল।

তার পর ভগবানের নাম সুধা পান করিয়া থাকিবার সামর্থ্য আমাদের
ছিল না। পথিপার্শ্বে পিত্তরক্ষার জন্য কিছু ফল ক্রয় করা গেল, আমাদের
সঙ্গেও ফল ছিল। ভারতের সর্ব্বত্র জীলীপী পাওয়া যায় কিন্তু বিলাতী
চিনির ভয়ে আমরা খরিদ করিতে পারি নাই।

আর একটা বলিবার কথা—হিন্দুরাজ্যের সহর। মধ্যে মধ্যে রেল
রাস্তার দুই পার্শ্বেই কলস দেখিতে পাওয়া যায়—তখনই বুঝা যায় যে একটি
সহর যাইতেছে। এইরূপ রেণু বা রেণুকা নাম শুনিয়াছিলাম কিন্তু ঠিক
মনে নাই। তবে উগ্লেভার কথা ভুলিবার নহে। উগ্লেভা একটা বড়
সহর—গণ্ডাল রাজ্যেই বটে। এই সকল অনুর্ব্বর প্রান্তর মধ্যে সহর সৃষ্টি
বড় আয়াসসাধ্য ব্যাপার। বহুকষ্টে হিন্দুরাজগণ দূর দেশ হইতে প্রস্তর
আনিয়া সহর গঠন করিয়াছিলেন। পানীয় জলের অভাব নিবারণ জন্য একটা
নদীকে ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলা হইয়াছে অর্থাৎ প্রশস্ত উচ্চ একটা প্রাচীর
নদীর গতিরোধ করিতেছে। আশে পাশে মৃত্তিকা খনন করিয়া একটি
ছোট হ্রদের মত হইয়াছে, তাহার একদিকে লাঙ্গুলের ন্যায় নদীটী। নদীর
জল প্রাচীরের ধারে আসিয়া জমিতেছে। সেখানেও জমিয়া একটা প্রকাণ্ড
হ্রদ হইয়াছে। কিন্তু অনবরত উপর হইতে যে নদীর জল আসিতেছে
তাহার উপায় কি? সে জল প্রাচীর ছাপাইয়া একটি জলপ্রপাত সৃষ্টি করিয়া
বাহির হইয়া যাইতেছে। যে জল জমিয়া আছে তাহাতে নিত্য নূতন জল

আসিয়া মিশিতেছে—আর বেশী স্রোতজল ঐরূপে বাহির হইয়া যাইতেছে। বারমাস জল ধরা আছে, কোন জলকষ্ট নাই। পুণাসহরে এইরূপ দেখিয়া ছিলাম মনে হয়। সে ছোট, এ এক বৃহদ্‌ব্যাপার। অপরাপর নদীতে এইরূপ জল ধরিবার ব্যবস্থা আছে।

আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছিলাম। গাড়ী ষ্টেসনে আসিয়া থামিলে, প্রায়ই প্রত্যেক ষ্টেসনে দেখিতাম, কতকগুলা কুকুর আসিয়া উপস্থিত। 'মড়া খেকো বা ঘিয়ে ভাজা নয়, বেশ হৃষ্ট পুষ্ট। প্লাটফরমে আসিয়া সতৃষ্ণনয়নে আরোহীদের নিকট যেন কিছু যাচ্ঞা করিতেছে। বোধ হইল এ দেশের লোকেরা উহাদিগকে এইরূপ স্থানে ও সময়ে খাবার দেয়—নহিলে ওরূপ করিবে কেন? আমরাও যথাসাধ্য দিয়াছিলাম। রহস্য এখানে নয়—রহস্য গাড়ী ছাড়িলে। যেমন ট্রেণ ছুটিল, সঙ্গে সঙ্গে সারমেয়-কদম্বও সমান্তরাল রেখায় ছুটিতে লাগিল ও উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিল। সে ছুট ভয়ানক ছুট। শেষে যখন আর ছুটিতে পারে না তখন এক এক জন করিয়া দাঁড়াইতে লাগিল, ক্রমে সকলে স্ব স্ব স্থানে (ষ্টেসনে) ফিরিয়া আসিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। সকল ষ্টেসনেই এই সারমেয়-দৌড় ব্যাপার। হাসির কথা এত খাবার কি ইহারা ট্রেণে পায় যে তাই ট্রেণ চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া ইহারা ধমকাইয়া ট্রেণ ফিরাইতে বা আটকাইতে চায় ও যায়। যাহাহউক ব্যাপার উল্লেখ যোগ্য বটে।

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের অস্তিত্ব।

(২)

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি যে বাঙ্গালার সাহিত্য এবং পুরাতন ...লিপি হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের অস্তিত্ব-বিষয়ক-প্রমাণাদি পাওয়া যায়। এক্ষণে ...দেশে যে সমস্ত পূজাপদ্ধতি প্রচলিত আছে তন্মধ্যে কোনটির সহিত ...ধর্ম্মের বিভিন্ন পূজাপদ্ধতির কোন একটির কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কি না ...া দেখিতে হইবে। বঙ্গদেশে নিম্নশ্রেণী মধ্যে ধর্ম্মপূজা প্রচলিত আছে ... পূর্ব্বেই সূচিত হইয়াছে। সেই ধর্ম্মপূজা কোন দেবতার পূজা ইহা ...যরূপে আলোচ্য।

...পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের নিম্নশ্রেণী মধ্যে এক প্রকার পূজা প্রচলিত ...ছ, ইহাতে ব্রাহ্মণগণ পৌরহিত্য করেন না। ডোম, পোদ, হাড়ি ...তি ইহার পুরোহিত। পূজার মন্ত্র বাঙ্গালা ও সংস্কৃত মিশ্রিত—অশুদ্ধ। ... কোথায়ও মন্দিরে, কোথায়ও বৃক্ষতলে, কোথাও বা উন্মুক্ত প্রান্তরে ...া থাকে। ঠাকুর সাধারণতঃ পূর্ব্বাস্য করিয়া বসান হয় এই বিষয়ে ...র দেবতার সহিত বিরোধ লক্ষিত হইতেছে। হিন্দুর দেব প্রতিমা ...মাস্য অথবা দক্ষিণাস্য করিয়া বসান হয়। এই ঠাকুরের সম্মুখে শূকর, ... প্রভৃতি বলিদান দেওয়া হইয়া থাকে। ঠাকুরের নাম ধর্ম্মঠাকুর। ...রাজ, ধর্ম্মরায় নামেও ইনি অভিহিত হইয়া থাকেন।

... "ধর্ম্ম"-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। ঘনরামের 'ধর্ম্মমঙ্গল' অনেকেরই নিকট ...চিত। ঘনরাম (চণ্ডাল পুরোহিত—নীচ শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ) ১৭১০ ...ব্দে ধর্ম্মমঙ্গল লিখিয়াছেন। ধর্ম্মমঙ্গল রচনার মূল অবলম্বন হাকন্দ ...ণ (?), ময়ূরভট্ট এই বিষয়ের প্রথম লেখক, ইহা ঘনরামের পুস্তক হইতে ... যায়। কলিকাতার দক্ষিণে রূপরামের গান প্রচলিত *। মেদিনীপুর ...ে মানিক গাঙ্গুলির গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। ঐ অঞ্চলে রামচন্দ্র বন্দ্যো-

* ...তাঙ্গাযোড়ায় যে ধর্ম্মমঙ্গল শুনিয়াছি, তাহার ভণিতায় গায়েন ...রূপরাম" বলিয়াছিল।

পাধ্যায়ের নামও 'ধর্ম্ম' গ্রন্থ লেখক বলিয়া পরিচিত। দীনেশ বাবু থেলারাম নামক এক ব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। গল্পাংশ এই সমস্ত লেখকেরই প্রায় সমান। রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি সকল স্থানেই অনুসৃত হইয়া থাকে। রামাই জাতিতে বাইতি।

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে কলিঙ্গ হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত দেশের বিষয় কিছু কিছু পাওয়া যায়। প্রধান প্রধান নগরীতে বাউরি গোয়ালা প্রভৃতির আধিপত্য ছিল। এতদ্বারা অনুমিত হয় তৎকালে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতির অভ্যুন্নতি হয় নাই। ঘনরাম বলেন রাজা ধর্ম্মপালের পুত্রের রাজত্ব সময়ে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা প্রচলিত হইয়াছিল। পালবংশীয় নরপতিগণ যদিও মগধে রাজত্ব করিতেন তথাপি আপনাদিগকে গৌড়েশ্বর নামে অভিহিত করিতেন। অন্য প্রমাণ হইতে জানা যায়, পালবংশীয় রাজাদের সময় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, ব্রাহ্মণগণের অভ্যুন্নতি হয় নাই।

উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে মাণিক গাঙ্গুলিই বোধ হয় প্রথম ধর্ম্মগ্রন্থ লেখক। হিন্দু হইয়া বৌদ্ধগ্রন্থ লেখা এদেশে নূতন নহে। কাশ্মীরের হিন্দু কবি ক্ষেমেন্দ্র তাঁহার বৌদ্ধবন্ধু শুক্লের অনুরোধে "বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা" লিখিয়াছিলেন, এই কল্পলতা এখন তিব্বতের প্রধান বৌদ্ধগ্রন্থ। ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের বেশে মাণিক গাঙ্গুলির নিকট উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিতে আদেশ করেন—

নিজ বীজমন্ত্র লিখি দিলেন সকল।
ইহা দেখি কবিতা রচিবে অবিকল॥
গায়েন হবেন তোর চতুর্থ সোদর।
জগত ভরিয়া যশ হবেক বিস্তর॥

যখন মাণিক তুঙ্গাড়ীতে ন্যায় পড়িতে যাইতেছিলেন তখন পথে ধর্ম্মের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মাণিক কিছু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে গ্রন্থ লিখিতে স্বীকৃত হইলেন।

ধর্ম্মপূজার ধ্যান হইতে জানা যায় যে ধর্ম্মপূজা বৌদ্ধধর্ম্মান্তর্গত। বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত শূয়োগাছীর একজন নিরক্ষর ধর্ম্মপূজকের নিকট মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে ধ্যান শুনিয়াছেন তাহা এই—

যস্যান্তো নাদিমধ্যো ন চ করচরণং নাস্তি কায়নিদানং
নাকারং নাদিরূপং নাস্তি জন্ম চ যস্য।
যোগীন্দ্রো জ্ঞানগম্যো সকল জনগতং সর্ব্বলোকৈকনাথং
তত্ত্বং তঞ্চ নিরঞ্জনং মরবরদ পাতু নঃ শূন্যমূর্ত্তিঃ॥

আই রেলের রাজবাঁধ ষ্টেসনের সন্নিহিত কোন গ্রামবাসী একজন ব্রাহ্মণের নিকট শাস্ত্রী মহাশয় অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ ধ্যান পাইয়াছেন—

যস্যান্তো নাদিমধ্যো ন চ করচরণৌ নাস্তি কায়ো ন নাদঃ
নাকারো নৈবরূপং ন চ ভয়মরণে নাস্তি জন্মানি যস্য॥
যোগীন্দ্রৈর্ধ্যানগম্যং সকলজনময়ং সর্ব্বলোকৈকনাথং
ভক্তানাং কামপূরং শুরনরবরদং চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্ত্তিং॥

শূন্য জগতের কারণ এ কথা হিন্দুগণ স্বীকার করেন না; শূন্যতা মহাশূন্যতা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিপাদ্য।

রামাই পণ্ডিতের বাঙ্গালা ধ্যান—

বর্ণযুগপতি সর্ব্বগুণধাম। শুন শুন সর্ব্বজন যুগের বিধান॥
যে দিনেতে ভৃঙ্গীভার আছিল মণ্ডলে।
বাসুকি নাগের জন্ম হইল সেইকালে॥
* * * * *
গাছের বাকল নহি পত্রে নহি ছায়া।
আগে ভাগে নিরঞ্জন নির্ম্মাইলেন কায়া॥ ইত্যাদি।

ধর্ম্মকে যুগপতি বলা হইয়াছে। নেপালের হিন্দুগণও এই যুগকে (কলি) বুদ্ধের 'পালা' বলিয়া থাকে।

যে দিনেতে ভৃঙ্গীভার আছিল মণ্ডলে।
বাসুকি নাগের জন্ম হইল সেইকালে॥

মণ্ডল অর্থে বৃত্ত (circle), শূন্যতা। যখন শূন্যমধ্যে ভৃঙ্গী আপনাকে উদ্ভূত করিল তখন বাসুকি নাগের জন্ম। ভৃঙ্গী অর্থে এখানে আদিবুদ্ধ বলিতে পারা যায়। শূন্য হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে ইহা এই কবিতা হইতেও জানা যায়। ইহা বৌদ্ধমত। নাগ বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত সর্ব্বদা সম্বন্ধিত। অমোঘসিদ্ধ নামক ধ্যানীবুদ্ধের আসন—নাগ।

ধর্ম্মের অসীম পরাক্রম। যে তাঁহার নিন্দা করে তাহাকে যৎপরোনাস্তি শাস্তিভোগ করিতে হয়। একদা মার্কণ্ডমুনি ধর্ম্মের পূজা দেখিয়া বলিলেন—

মিথ্যাই আলমচাঁদা, মিথ্যাই বাজনা বাজে, মিথ্যাই ধর্ম্ম উজল।
ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে * । * * * *

অমনি মার্কণ্ডের মুখে কুষ্ঠব্যাধির আবির্ভাব হইল †। "ধর্ম্মরাজ যজ্ঞনিন্দা করে" দেখিয়া জয়দেবের দশাবতার স্তোত্র স্মরণ হয়—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিত পশুঘাতং
কেশবধৃতবুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে।

বুদ্ধ বেদনিন্দাকারী নহেন, বেদের যে অংশ যজ্ঞসম্বন্ধীয় তাহারই নিন্দা করেন। রামচন্দ্র কবিভারতী লিখিয়াছেন—

'যত্রচ্ছাগতুরঙ্গমাবণবিধিঃ বেদেহপি তং নিন্দসি।'

ধর্ম্মরাজও যজ্ঞ নিন্দা করেন।

রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতির এক স্থানে আছে—

আদ্য ভূপতি নিমাব দেহারা ধর্ম্ম যথা আদি স্থান।
নবখণ্ড পৃথিবী ঠেকেছে মেদিনী
শ্রীধর্ম্মদেবতা সিংহলে বহুত সম্মান ॥

সিংহলে ধর্ম্মের সম্মান দেখিয়া ধর্ম্ম যে বুদ্ধ তদ্বিষয়ে বিশ্বাস করিতে স্বতঃই প্রবৃত্তি হয়, কারণ সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত।

শীতলাদেবী। অধিকাংশ "ধর্ম্ম"-মন্দিরে শীতলা দেবী বিরাজমানা। ৪৫ নং জানবাজার ষ্ট্রীটস্থ ধর্ম্মের মন্দিরের শীতলামূর্ত্তি ধর্ম্মঠাকুরের মূর্ত্তি অপেক্ষা বৃহত্তর। নেপালে প্রায় সমস্ত বুদ্ধমন্দিরের প্রবেশ পথে হারিতী

* রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি।

† "আদ্যের ধবল দিল মুখেতে জাঁতিয়ে।"

ধবল ধর্ম্মের নিজস্ব রোগ, যেমন বসন্ত শীতলার নিজস্ব। বোধ হয় এই জন্যই লোকে বলিয়া থাকে—

"ধর্ম্মের ঘরে কুটের (কুষ্ঠরোগীর) অভাব নেই"।

ীর মন্দির অবস্থিত। হারিতী দেবী শীতলা। স্বয়ম্ভূক্ষেত্রে "স্তূপের" * ...র-পশ্চিম কোণে হারিতীর মন্দির অবস্থিত। কাটমণ্ডু নগরীতে সিংহ-...র্ববাহ বিহারের প্রবেশ পথের দক্ষিণপার্শ্বে হারিতীর মন্দির অবস্থিত। ...ং স্বয়ম্ভুপুরাণে লিখিত আছে কোন বিহার হারিতী-মন্দির-বিরহিত ...বে না †।

চূণ-"মানসিক"। তমলুকের ৭ ক্রোশ দূরবর্ত্তী ময়নাগড়ে একটী ...র্ম্ম"-মন্দির আছে। ধবল (কুষ্ঠ) হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সেই ...নের লোকেরা "ধর্ম্ম"কে চূণ 'মানসিক' করে। কোন হিন্দু কোন ...দেবতাকে চূণ 'মানসিক' করে, ইহা শুনি নাই। কিন্তু নেপালে এবং ...য়ম্ভুক্ষেত্রে চূণ 'মানসিক'রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্বয়ম্ভুচৈত্যের ...োরণপ্রান্তে উপাসকগণ চূণ উৎসর্গ করিয়া থাকে। অগ্নিপুরেও চুণ ব্যব-...হৃত হইয়া থাকে।

ধর্ম্মের মন্দিরে ধর্ম্মের আকৃতি। ময়নাতে এইরূপ প্রবাদ আছে যে ...র্গমধ্যস্থিত পুষ্করিণী হইতে "ধর্ম্ম," এক খণ্ড প্রস্তর এবং একটী শঙ্খ পাওয়া ...গিয়াছিল। প্রস্তরখণ্ড এবং শঙ্খটী এখন দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল ..."ধর্ম্ম" এখনও বর্ত্তমান আছেন। বৌদ্ধতীর্থস্থানে চৈত্যকেই "ধর্ম্ম" বলা হয়। ...এই চৈত্যের চতুর্দ্দিকে পাঁচটী ধ্যানী বুদ্ধের মন্দির থাকে। চৈত্যের আকৃতি ...কূর্ম্মের ন্যায়। ময়নাতে যে 'ধর্ম্মের' যে মূর্ত্তি আছে তাহাও কূর্ম্মাকার। ...পাঁচটী ধ্যানীবুদ্ধের মন্দির চারিদিকে না থাকায় কূর্ম্মাকার ধর্ম্মের ৪টী ...পদ ও মস্তক দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া পাঁচটী ধ্যানীবুদ্ধের স্থান পূরণ ...করিয়াছে। গোঘাটে যে স্বরূপনারাণ ‡ আছেন, তিনিও কূর্ম্মাকৃতি।

* স্তূপ—বৌদ্ধবিহার। † বৃহৎ স্বয়ম্ভূপুরাণ পৃ ৪২৮।

‡ এই স্বরূপনারাণ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পূজিত। বাল্যকালে যখন ...জাহানাবাদান্তর্গত (এক্ষণে আরামবাগ) হরিহরপুরে গিয়াছিলাম তখন ...এই স্বরূপনারাণ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া গোঘাট হইতে হরিহরপুরে ...আনীত হইতে দেখিয়াছিলাম। ধর্ম্মঠাকুর প্রায়ই ডোম প্রভৃতির দ্বারা ...পূজিত, তথাপি ব্রাহ্মণগণ যে কোন সময়ে ইচ্ছা করেন ধর্ম্মের মন্দিরে প্রবেশ ...করিতে পারেন। যে স্থানে ব্রাহ্মণ অধিবাসীর সংখ্যা অধিক সেইস্থানে

হুগলী জেলার অন্তর্গত ভাঙ্গামোড়া গ্রামে যে ধর্ম্মঠাকুর (বাঁকুড়া রায়) দেখিয়াছি, তিনিও কূর্ম্মাকৃতি। জ্যৈষ্ঠ মাসে দ্বাদশ দিন ইঁহার উৎসব হইয়া থাকে। এই উৎসবকে সেখানকার লোকেরা "আবাল গাজন" বলিয়া থাকে। এই 'আবাল গাজনের' সময় বাঁকুড়া রায় মন্দির সম্মুখস্থ আটচালায় পূজিত হইয়া থাকেন। এই সময় মন্দিরস্থ আসন বা বেদী শূন্য না রাখিয়া ডোম পণ্ডিত তাহাতে ভিজা চাল সাজাইয়া একটী কূর্ম্মমূর্ত্তি প্রস্তুত করে। কূর্ম্মমূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে অন্যান্য অনেক মূর্ত্তি থাকে। পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম সেগুলি দিক্‌পালগণের মূর্ত্তি, হনুমানের মূর্ত্তি ইত্যাদি। গাজনের সময় মন্দিরে ঠাকুর থাকেন না বলিয়াই সেখানে কূর্ম্মমূর্ত্তি অঙ্কিত হয়। এই কূর্ম্মমূর্ত্তিই ধর্ম্মপূজকদের 'যথাসর্ব্বস্ব'। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে বৌদ্ধচৈত্যের আকৃতি কূর্ম্মের ন্যায়। ইহা হইতে ধর্ম্ম ও বুদ্ধের কোন সম্বন্ধ আছে মনে হয় না কি? আরও এক কথা, ধর্ম্মের কূর্ম্মাকৃতি প্রস্তরের গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিত্তলের টুকরা বসান থাকে; বৌদ্ধচৈত্যেও ঐরূপ প্রোথিত পিত্তল দেখিতে পাওয়া যায়।

ধর্ম্মঠাকুরের প্রায় দুই জন পুরোহিত দেখা যায়—একজন নীচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, আর একজন ডোম। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ ধর্ম্মপূজায় যে সমস্ত 'মানসিক' করেন, তৎসমুদয় ব্রাহ্মণ পুরোহিত উৎসর্গ করেন। কোন কোন স্থলে নীচ শ্রেণীস্থ ডোম পুরোহিতের একান্ত অভাব হওয়াতে ব্রাহ্মণ পুরোহিত মন্দির নিজস্ব করিয়া লন। এইরূপে স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের আধিপত্য হইয়াছে।

বৌদ্ধমন্দিরেও ব্রাহ্মণদিগের প্রবেশাধিকার আছে। স্বয়ম্ভুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণগণ ঠাকুরকে পূজা ও স্পর্শ করিতে পারেন। নেপালে "বান্দা"গণ সাধারণতঃ পৌরহিত্য করিয়া থাকেন। বান্দার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণী "গুভাজু"; ইঁহারা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যাবতীয় শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। "বান্দা"বংশে জন্ম গ্রহণ না করিলে কেহই বান্দা হইতে পারে না, গুভাজু বংশে জন্মগ্রহণ না করিলে কেহই গুভাজু হইতে পারে না। কিন্তু নেপালীরা ব্রাহ্মণ সন্তানকে বান্দা অথবা গুভাজুর পদ প্রদান করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না।

শূণ্যবাদ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ধর্ম্মপূজকগণ শূণ্যবাদী অর্থাৎ
... হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে ইহাই ইঁহাদিগের মত। এই মত
...মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। শাস্ত্রী মহাশয় রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতির কিয়দংশ
...গ্রহ করিয়াছেন। বৌদ্ধগ্রন্থের ন্যায় কোন দেবতা বিশেষের বন্দনা না
...রাই এই পদ্ধতি আরম্ভ হইয়াছে। একস্থানের আরম্ভ এইরূপ—
"শ্রীশ্রীধর্ম্মায় নমঃ। অথ শূণ্যপুরাণ লিখ্যতে।" এই পদ্ধতি বাঙ্গালা
...ায় লিখিত। কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

নাই রেক নাই রূপ নাই ছিল বর্ণ চিহ্ন।
রবি শশী নাই ছিল নাই রাত্রি দিন॥
নাই ছিল জল স্থল নাই ছিল আকাশ।
মেরুমন্দার না ছিল না ছিল কৈলাশ॥
* * *
নাই সৃষ্টি ছিল আর নাই সুর নর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু না ছিল না ছিল আধার॥
* * *
চারিবেদ নাই ছিল শাস্ত্রের বিচার।
গুপ্ত বেদ করিলেন প্রভু করতার॥

... এক বা ততোধিক সনাতন বস্তু হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে,
...ইহাই হিন্দুদর্শনের মত। পারমিতা (বৌদ্ধগ্রন্থ) শূণ্যবাদ স্বীকার করে;
...াই পণ্ডিতের শূণ্যবাদ পারমিতার শূণ্যবাদের ন্যায়। উপরোদ্ধৃত অংশে
"...ভু" শব্দ দেখিয়া কেহ কেহ ইহার সনাতনত্ব প্রমাণ করিতে চাহেন;
কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই 'প্রভু' শূণ্যমূর্ত্তি।
...াঁটালের একজন ধর্ম্মপূজক সৃষ্টি সম্বন্ধে এইরূপ বলেন—

স্বর্গ মর্ত্ত্য না ছিল না ছিল যে পাতাল।
উৎপত্তি না ছিল না ছিল যম কাল॥
* * *
মায়ে না দিলেন উদরে ঠাঁই।
শূণ্যভরে জন্মিলেন অনাদ্য গোঁসাঞি॥

নিরঞ্জন নৈরাকার বুঝিতে না পারি।
আপনি করিলেন প্রভু আপনার কায়া ॥
হস্তপদ স্কন্ধ চক্ষু নিরঞ্জনের হইল।
নয়ন মিলাইয়া তিনি সৃষ্টি মিলাইল ॥
দেখিলেন নবখণ্ড ব্রহ্মা অগ্নিময়।
তস্মাৎ দেব নিরঞ্জনায় নম।

ধর্ম্ম কি? আমরা দেখিলাম ধর্ম্মপূজক এবং বৌদ্ধ উভয়েই শূন্যবাদ স্বীকার করেন। ধর্ম্মের মূর্ত্তি এবং বুদ্ধের চৈত্য উভয়েই—পিত্তলের চক্ষু বসান আছে। নেপালের বৌদ্ধদিগের ন্যায় ধর্ম্মপূজকগণও শীতলাকে "ধর্ম্ম" মন্দিরে স্থান দিয়া থাকেন। অন্যান্য বিষয়েও সাম্য দেখান হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে ধর্ম্মই বুদ্ধ। যদি ধর্ম্মই বুদ্ধ, তাহা হইলে বুদ্ধনাম না হইয়া ধর্ম্ম নাম হইল কেন? ধর্ম্মনামও বৌদ্ধদিগের নিকট অপরিচিত নহে। বৌদ্ধ চৈত্যকে তাঁহারা "ধর্ম্ম" বলিয়া থাকেন। ধর্ম্ম, বুদ্ধ ও সংঘ এই ত্রিমূর্ত্তির (?) (Trinity) মধ্যে ধর্ম্মই তিব্বতে ও নেপালে প্রধান বলিয়া খ্যাত। বৌদ্ধধর্ম্ম যে ধর্ম্মপূজা নাম পাইবে ইহার অন্য কারণও আছে। বৌদ্ধগণ—আপনাদের ধর্ম্মকে বৌদ্ধধর্ম্ম না বলিয়া সদ্ধর্ম্ম বা ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। হিন্দুগণই তাঁহাদিগকে বৌদ্ধ বা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া থাকেন। তাঁহারা আপনাদিগকে "সদ্ধর্ম্মচিন্তকাঃ" বলিয়া অভিহিত করেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন—ব্রাহ্মণগণ ডোম প্রভৃতির পৌরহিত্য করিতে অস্বীকার করায় তাহারা আপনাদের পূজা আপনারাই করিয়া থাকে, বস্তুতঃ ধর্ম্মপূজা হিন্দুধর্ম্মেরই অন্তর্গত; সেই জন্যই ধর্ম্মপূজকদিগের সহিত ব্রাহ্মণগণের কোন বিরোধ নাই। এক্ষণে বিরোধ নাই বটে, কিন্তু কখনও যে ছিল না তাহা নহে। নিম্নলিখিত উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যাইবে যে ধর্ম্মপূজকগণ ব্রাহ্মণগণের সহিত বেশ সদ্ভাব রাখিত না, এমন কি ব্রাহ্মণের উচ্ছেদের জন্য মুসলমানদিগের সহিত যোগ দিয়াছিল।

শ্রীনিরঞ্জনের উষ্মা।

জাজপুর পুরবেদি সোলসয় ঘরবেদি বেদি লয় কর্ণয় যুন
দক্ষিণ্যা মাগিতে যায় যার ঘরে নাঞি পায় সাঁপ দিয়া পড়ায় ভুবন

মালদহে লাগে কর দিনয় কর্ণযুন ॥
মালদহে লাগে কর, না চিনে আপন পর, জালের নাহিক দিশপাশ।
বলিষ্ঠ হইল বড়, দশ বিশ হোয়্যা জড়, সধর্ম্মিরে * করয়ে বিনাশ ॥
বেদে করে উচ্চারণ, বেরয়ায় অগ্নি ঘনে ঘন, দেখিয়া সভাই কম্পমান।
মনেতে পাইয়া মর্ম্ম, সভে বলে রাখ ধর্ম্ম, তোমা বিনা কে করে পরিত্রাণ ॥
এইরূপে দ্বিজগণ, করে ছিষ্টি সংহারণ, এ বড় হৈইল অবিচার।
বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম্ম, মনেতে পাইয়া মর্ম্ম, মায়াতে হইল অন্ধকার ॥
ধর্ম্ম হৈল্যা যবনরূপি, মাথায়েতে কাল টুপি, হাতে শোভে ত্রিরুচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয়, ত্রিভুবনে লাগে ভয়, খোদায় বলিয়া এক নাম ॥
নিরঞ্জন নিরাকার, হৈল্যা ভেস্ত † অবতার, মুখেতে বলেন দম্বাদার ‡।
যতেক দেবতাগণ, সবে হয়্যা একমন, আনন্দেতে পরিল ইজার ॥
ব্রহ্মা হৈল মঁহাম্মদ, বিষ্ণু হৈল পেকাম্বর, আদম্ফ হৈল্যা শূলপাণি।
গণেশ হইয়া গাজি, কার্ত্তিক হৈইল কাজি, ফকির হইল যত মুণি ॥
তেজিয়া আপন ভেক, নারদ হৈইল্যা শেক, পুরন্দর হইল মৌলনা ॥
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে, পদাতিক হয়্যা সবে, সবে মেলি বাজায় বাজনা ॥
আপুনি চণ্ডিকা দেবি, তিহঁ হৈল্যা হায়া বিবি §, পদ্মাবতি হল্য বিবি নুর ¶।
যতেক দেবতাগণ, হয়্যা সবে এক মন, প্রবেশ করিল জাজপুর ‖ ॥
দেউল দেহারা ° ভাঙ্গে, কাড়্যা ফিড়্যা খায় রঙ্গে, পাথড় পাথড় বলে বোল।
ধরিয়া ধর্ম্মের পায়, রামাই পণ্ডিত গায়, ই বড় বিষম গণ্ডগোল ॥

---

* ধর্ম্মোপাসক। † স্বর্গে অবতার হইলেন; ভেস্ত = আবেস্তা।

‡ মুসলমান পর্ব্ববিশেষে উচ্চ পতাকা বাহিত হইয়া থাকে, সেই সময়ে 'দম্বাদার' শব্দ উচ্চারিত হয়।

§ হায়া = সন্ধ্যা (?)। ¶ নুর = আলোক।

‖ এই জাজপুর রাঢ়দেশে অবস্থিত। মাণিক গাঙ্গুলির গ্রন্থ হইতে জানা যায়, এই জাজপুর ধর্ম্মপূজার একটী প্রধান তীর্থ। উপরোদ্ধৃত "উষ্মা" হইতে বোধ হয়, যখন মুসলমানেরা জাজপুরে প্রবেশ করে, তখন ব্রাহ্মণগণের ব্যবহারে উত্যক্ত ধর্ম্মোপাসকগণ মুসলমানদিগের সহিত যোগ দিয়াছিল।

° মন্দির ও দেবপ্রতিমা।

বাঙ্গালার প্রায় প্রতি গ্রামেই ধর্ম্মের পূজা হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইতে পারে। গায়েন পালা আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বে কতকগুলি ধর্ম্মের বন্দনা করিয়া থাকে। ইহা হইতে কতকগুলি নাম পাওয়া যায়। মাণিক গাঙ্গুলি কতকগুলির নামোল্লেখ করিয়াছেন—

প্রথমে বন্দিব জয় জয় পরাৎপর।
স্থানে স্থানে মূর্ত্তিভেদে মহিমা বিস্তার॥
বেলডিহার বাঁকুড়া রায়ে বন্দি একমনে।
অসংখ্য প্রণতি শীতল সিংহের চরণে॥
ফুল্লরের—ফতে সিং বৈতলের বাঁকুড়া রায়।
শুদ্ধভাবে বন্দি দোঁহে নত হয়ে কায়॥
পাণ্ডুগ্রামের বুড়া ধর্ম্মে বন্দিয়া সাদরে।
শ্যামবাজারের দলুরায়ে দিয়ে জয় জয়কারে॥
দেপুরে জগৎ রায়ে জোড় করি কর।
গোপালপুরের কাঁকড়া বিছায় বন্দি তার পর॥
সিয়াসের কাঁলাচাঁদে ঞিদাসের * বাঁকুড়া রায়।
বন্দিব বিস্তর নতি নত হয়ে কায়॥
গোপুরের † স্বরূপনারাণ স্বর্ণসিংহাসনে।
বন্দিয়া বন্দিব মঙ্গলপুরের রূপনারাণে॥
পশ্চিমপাড়ার যাত্রাসিদ্ধি বন্দিব তাঁহায়।
বড়ুজা গ্রামের বন্দিব মোহন রায়॥
গুছুড়া গ্রামের বন্দি শীতলনারাণে।
আলগুড়চিনার খুদিরায়ে বন্দি সাবধানে॥
আকুটিকুল্লার মালার ‡ ধর্ম্মের করিয়া স্তবন।
বন্দিপুরের শ্যামরায়ের বন্দিয়া চরণ॥
জাড়া গ্রামে কালুরায়ে কামিন্যা সহিত।
জাজপুরে দেহারে বন্দি দাচর্য্য করি চিত॥

* বাঁকুড়া জেলান্তর্গত ইন্দাস (?) † গোঘাট (?)
‡ মাল্লা অর্থে জেলে। জেলেরাও ধর্ম্মপূজা করিয়া থাকে এবং ধর্ম্ম

ধর্ম্মোপাসকগণকে বৌদ্ধ বলিবার যে যে কারণ পাওয়া যায় তাহা বিবৃত ন। যদি ধর্ম্মপূজা বৌদ্ধধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা লে এখনও বাঙ্গালায় অসংখ্য বৌদ্ধ আছে স্বীকার করিতে হইবে। ালা হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম একেবারে লুপ্ত হইয়াছে, একথা আর বলা যাইতে রিবে না। এইরূপ সিদ্ধান্ত হওয়াই স্বাভাবিক। যে ধর্ম্ম সমস্ত ভারত-র উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার একান্ত নাশ অসম্ভব।

ডোম, পোদ প্রভৃতি শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় থাকে। হিন্দুর সহিত ঘরকন্না পাতাইয়া বেশ দিন কাটাইতেছে, ং ধর্ম্মপূজাও আপনাদের মধ্যে প্রচলিত রাখিয়াছে। সত্য সত্যই যদি র্ম্মপূজা হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত না হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তর্গত হয় তাহা হইলে হাদিগকে "শূন্য" খেলাঘর ভাঙ্গিতে হইবে এবং আপনাদিগকে বৌদ্ধ লিয়া পরিচয় দিতে হইবে। কিন্তু ক্ষতি আমাদের কি তাহাদের ইহা নিশ্চিত বলা সুকঠিন।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

গা গাহিয়া থাকে। ইহারা গানের সহিত যে নাচিয়া থাকে তাহাতে বিশেষত্ব আছে। মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তদুপরি তক্তা পাতিয়া ইহারা সেই তক্তার উপর নাচিয়া থাকে। তাহাতেই তাল রক্ষা হয়, অন্য বাজনা বাজে না এই নাচকে 'পাটা পাড়া নাচ' বলে।

মোতি-কুমারী।

[গল্প]

(৭)

সমস্ত পাত্র পাত্রী ক্রমে রোম নগরীতে আসিয়া জুটিয়াছে। রোমে দুটা কথা এখন বলিতে হয়।

রোম নগরী তখন অতুল সমৃদ্ধি-সম্পন্ন। সে সমৃদ্ধি, বোধ করি, কখনও কোন নগরের হয় নাই। লণ্ডন নগরী এখনকার দিনে অতুল সমৃদ্ধি-সম্পন্ন কিন্তু সে কেবল বাণিজ্য সম্পত্তি; প্রধানত কল-কারখানা কারবারের সমৃদ্ধি, রোমেরও তাহা ছিল, তবে বাণিজ্যও এত ছিল না, এবং এরূপ কল-কারখানাও হয় নাই। তবে রোমে ইন্দ্রভবন সদৃশ সুরম্য প্রাসাদ ছিল, অসংখ্য দেবায়তন ছিল, মর্ম্মর চত্বর ছিল; কারুকার্য্য শোভিত রঙ্গভূমি ছিল; আমরা পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি, নৃশংসতার রঙ্গক্ষেত্র মল্লভূমি ছিল। রোমের সমৃদ্ধির এই গুলাই হইল কলঙ্ক।

গ্যালস্ রাত্রিকালে চুপে চুপে যাইয়া, আপনার নিভৃত ভবনে মিরিয়্যাম্‌কে আপনার বনিতার হস্তে অর্পণ করিলেন। মিরিয়্যামের সৌভাগ্যক্রমে তিনি খৃষ্টপন্থী, গ্যালস্ তাহা জানিতেন না। এখন জানিতে পারিয়া, রুষ্ট না হইয়া, বরং হৃষ্ট হইলেন; বুঝিলেন মিরিয়্যামের পরিবর্ত্তন ভালরূপেই হইবে। তাত হইতেছে, কিন্তু তা বলিয়া মিরিয়্যাম্ কি জানে আছে? তাও কি কখনও হয়? যে, সময় আসিলেই দাসীরূপে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইবে, সে কখনই মনের শান্তি পাইতে পারে না; দুই একজন খৃষ্টান পাদরী গ্যালসের বাড়ীতে আসিতেন, নব ধর্ম্মের প্রাণ-ভরা উপদেশ হইত; শান্তির ছায়া পড়িত, কিন্তু পরক্ষণেই আবার আশঙ্কায় মর্ম্ম আসিত। দাসত্ব লাঞ্ছনার অবস্থা চিরকালই; কিন্তু দাসীত্বের যাতনা এমন মর্ম্ম লাঞ্ছনা হয়, যে তাহাতে শান্তি তিষ্ঠিতেই পারে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেস্পেশিয়ান্ এখন রোমের সম্রাট। তাঁহার দুই পুত্র —একজন টাইটস্‌কে আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি মিরিয়্যাম্ তাঁহার বর্ণিত। তাঁহার ভ্রাতা ডোমিশিয়ান্ এখন পিতার নিকট রোমেই আছেন। ডোমিশিয়ান উদ্ধত, গর্ব্বী, স্বেচ্ছাচারী। একদিন বাতায়ন হইতে

মিরিয়্যাম্ ডোমিশিয়ানকে দেখিল, দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। গ্যালসের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা এ কে গা?" "কে আবার, বাছা! ও সেই হতভাগা ডোমিশিয়ান্"। মিরিয়্যাম্ হয়ত মনের মধ্যে ভাবিল—ঐ যদি আমাকে ক্রয় করে? —মিরিয়্যাম্ থর থর কাঁপিতে লাগিল।

ভাল কথা—মার্কস্ কোথা? গ্যালস্ বিশেষ অনুসন্ধান করিতেছিলেন; কিন্তু কিছুতেই জানা গেল না—মার্কস্ বা নেহুস্তা কোথায়।

ক্রমে এইরূপে ছয় মাসকাল গেল। টাইটস আসিলেন। বিজয় গৌরবে রোম টল মল করিতে লাগিল।

গ্যালসের উপর আদেশ হইল, মিরিয়্যাম্‌কে রাজসভায় হাজির করিতে। শুনিয়া মিরিয়্যাম্ কাঁপিল। গ্যালস্ বুঝাইয়া সুঝাইয়া মিরিয়্যাম্‌কে শিবিকা করিয়া রাজসভায় লইয়া গেলেন।

সভা দেওয়ান-এ-আম নহে, দেওয়ান্-এ-খাস্। দুই চারিটি কর্ম্মচারী; মধ্যস্থলে সম্রাট্ বেস্পেশিয়ান্, দুই পার্শ্বে দুই পুত্র টাইটস্ ও ডোমিশিয়ান্। রাজাহীন, ডোমিশিয়ান্ মোতিকুমারীকে পাইবার জন্য পিতার নিকট কত আবদার, আক্রোশ করিল, ভ্রাতার সঙ্গে রাগারাগি করিল; কিছু হইল না; টাইটস্ যে বলিয়াছিলেন, মিরিয়্যাম্ উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইবে; অনেকগুলি কুমারী ঐরূপে বিক্রীত হইবে। বিক্রয় লব্ধ অর্থ আহত রুগ্ন সেনাদিগের পরিচর্য্যায় ব্যয়িত হইবে। সেই কথাই স্থির রহিল।

দেখিতে দেখিতে বিজয়োৎসবের দিন আসিল। বিজয় পতাকায়, বিজয় মাল্যে রোমের রাজপথ তোরণ প্রাকার সমস্ত অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। বিজয় ঘোষণার দুন্দুভি-নিনাদে সমগ্র নগর শব্দায়মান হইল। যে নির্দ্দিষ্ট রাজপথ দিয়া মিসল্ চলিবে, কেবল সেই সকল রাজপথ নয়, সেই সকল পথের পার্শ্বস্থ গৃহদ্বার বাতায়ন প্রাসাদ প্রাতঃকাল হইতে পরিপূর্ণ হইল। সকলেই উৎকৃষ্ট সজ্জায় সজ্জীভূত। অশ্বারোহী নগরপালগণ, অনবরত চতুর্দ্দিকে অশ্বচালন করিয়া লোক সংঘকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে; গভীর জনতার মধ্য দিয়া অশ্বচালনা করিয়া, কীলক প্রহারে যেমন দারুকাণ্ড খণ্ড করে, তেমনি করিয়া জনতাকে বিভাগ করিতেছে, অশ্বারোহীরা চলিয়া গেলে, আবার জনতা জলরাশির মত মিশিয়া যাইতেছে।

অতি প্রত্যূষে গ্যালস্ মিরিয়্যামকে শিবিকায় লইয়া আইসিস্ দেবীর মন্দিরের পথে লইয়া যান; তখনও ঘোর ঘোর ছিল, নহিলে তাঁহারা দেখিতে পাইতেন, বিপুলশ্রমে শ্রান্ত অশ্বদ্বয়োপরি, দুই জন আরোহী তখনও অতি দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিয়া রোমে প্রবেশ করিল। দুই জন পুরুষ বেশী বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে এক জন যেন ছদ্মবেশিনী স্ত্রীলোক হইবে। ইহারাই মার্কস্ ও নেহুস্তা।

নেহুস্তা জিজ্ঞাসা করিল "আপনিও কি এই বিজয়োৎসবে যোগদান করিবেন?" মার্কস্ "কাহার সঙ্গে কোথায় যাইব?" "কেন টাইটসের পার্শ্বে—আপনি তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু।"

মার্কস্ বলিলেন "যাহারা শত্রু হস্তে জীবন্ত বন্দী হয়, তাহাদের জন্য রোমের প্রাণদণ্ড ব্যবস্থা। যদি মিরিয়্যাম্‌কে না দেখিতাম, আমি নিজেই আত্মহত্যা করিতাম। তাও পারি নাই; এখন রোম আমাকে অনুমতি না দিলে, আমি রোমে প্রবেশ করিতেই পারি না।"

"তবে এখন কর্ত্তব্য কি?"

"কর্ত্তব্য—আমার নিভৃত নিবাসে গিয়া গোপনে দেখা—সেই পথে মিস্‌র যাইবে,—দেখিব, মিরিয়্যাম্‌কে লইয়া যায় কিনা—না যায়, বুঝিব, মিরিয়্যাম্ জীবিত নাই, বা তাহাকে আর কোথাও বিক্রয় করিয়াছে।"

আর কথা নাই—দুইটি অশ্ব পাশাপাশি চলিতে পারিল না, আগে পিছে হইয়া ক্রমে মার্কসের ভবনের সম্মুখে আসিল। ঘুরিয়া গলির দিকে খিড়্‌কীর পথে গেল। মার্কস্ অবতরণ করিলেন। অনেক ডাকাডাকির পর দুয়ার খুলিল। প্রভুভক্ত কর্ম্মচারী—বিলম্বে প্রভুকে চিনিতে পারিয়া—আহ্লাদে অভ্যর্থনা করিল। মার্কস্ তাহাকে নানাহারের জোগাড় করিতে বলিয়া সেই ভবনে অর্থ সামর্থ্য কিরূপ আছে জিজ্ঞাসা করিলেন। কর্ম্মচারী দেখিল, অপর ব্যক্তি ঘোড়ার তত্ত্বিরে দূরে ব্যস্ত আছে। চুপে চুপে বলিল "অর্থের অসদ্ভাব হইবে না; এত অর্থ সঞ্চিত করিয়াছি, যে তাহা লইয়া কি করা যাইবে, স্থির করিতে পারি না।"

"বেশ, বেশ,—ত্রিশ ঘণ্টা ঘোড়ায় আসিতেছি—এখন খাবার জোগাড় কর।"

আহারাদির পর নেহুস্তা মার্কসের নিকট আসিলে, মার্কস্ জানিলেন, সেই দিন মিরিয়্যাম্‌কে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করা হইবে। আরও নিলেন ডোমিশিয়ান মিরিয়্যাম্‌কে ক্রয় করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। নি যদি ডাক বাড়াইয়া অতি উচ্চ মূল্যেও মিরিয়্যাম্‌কে ক্রয় করিতে , তথাপি ডোমিশিয়ানের কোপ হইতে আমার রক্ষা পাওয়া ভার।" বিপদে পড়িবার পূর্ব্বে এত উতলা হইবার প্রয়োজন কি? আগে ম্‌কে ত হস্তগত করুন। দেখা যাক্ মিরিয়্যাম্‌কে বন্দিনীরূপে যায় কিনা? সেইটী অগ্রের কার্য্য।" তাঁহারা বাতায়ন পথে দাঁড়াইয়া ক্ষণ করিতে লাগিলেন।

নেহুস্তা ও মার্কস্ যাত্রী মধ্যে মিরিয়্যাম্‌কে দেখিল। মিরিয়্যাম্ নেহুস্তাকে চিনিল। মার্কস্ কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া বলিলেন, "মোতি-কুমারী" কিরূপে কখন বিক্রীত হইবে, তাহার সমস্ত সঠিক সংবাদ গোপনে করিয়া আমাকে সন্ধ্যার মধ্যে সংবাদ দিবে; কেহ যেন কিছু জানিতে পারে।" কর্ম্মচারী চলিয়া গেল।

* * *

সে সব কথায় আর কাজ কি? সুন্দরী যুবতী কুমারীদিগকে লইয়া মের সেই ডাক ডাকাডাকি—সে সব কথা নাই শুনিলেন, সে দৃশ্য নাই লেন। রোম গিয়াছে, এখন রোমের কলঙ্ক কাহিনীর কথায় আর কি? রোম রাজকর্ম্মচারী দিয়া যে কাজ করাইত, এখনকার দিনে তে অতি নীচ দালালেও তাহা করিতে লজ্জা বোধ করে।

ডোমিশিয়ানের কর্ম্মচারী ডাকিল; ডিমিট্রিয়াস্ বণিক ডাকিল; নেহুস্তা সকলের অপেক্ষা উচ্চ মূল্যে—অসম্ভব মূল্যে ডাক খতম করাইয়া—গোপন পথে মিরিয়্যাম্‌কে লইয়া মার্কসের ভবনে প্রবেশ করিল, ডিমিট্রিয়াস্ বণিক তখনই তাহা সন্ধান রাখিল। অর্থাৎ সেই অভাগা ক্যালেব ইহাঁদিগকে অনুসরণ করিয়াছিল।

মার্কস্ মিরিয়্যামের দেখা সাক্ষাৎ হইল। মার্কস্ প্রভু—মিরিয়্যাম্ দাসী। আবার সেই মাতৃ আজ্ঞা প্রতিবন্ধক দাঁড়াইল। মার্কস্ মিরিয়্যাম্‌কে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিলেন। মিরিয়্যাম্‌কে লইয়া নেহুস্তা প্রভাতে চলিয়া

যাইবে, স্থির হইল। মিরিয়্যামের মর্ম্ম বিদীর্ণ হইল, কিন্তু মাতৃ আজ্ঞা পালনের প্রভা সেই ক্ষত মর্ম্মে উজ্জ্বলীকৃতা হইল। প্রণয় মিলনের অপেক্ষা মাতৃ আজ্ঞা গরীয়সী মহিমাময়ী।

ক্যালেবের জীবনের দুইটি মাত্র লক্ষ্য ছিল। "য়ুদীদের রাজা হইব, আর মিরিয়্যাম্‌কে রাণী করিব।" রোম য়ুদীদের ছিন্ন ভিন্ন করিল; সুতরাং তাহাদের রাজা হওয়া হইল না। এখন মিরিয়্যাম্ জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য ছিল। ক্যালেব আপনার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া ছিল—কিন্তু সে পণে মিরিয়্যাম্‌কে পায় নাই। নেহুস্তা যতই ছদ্মবেশে থাকুক, ক্যালেব তাহাকে চিনিয়াছিল। সন্ধান করিয়া মার্কসের বাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। কিন্তু জানিত না যে সেটা মার্কসের বাড়ী। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া সেই বাড়ীর পাহারায় রহিল। প্রভাতে শুনিল, সেটা মার্কসের বাড়ী। আরও শুনিল মার্কস্ জীবিত নাই কিন্তু শেষ কথাটা বিশ্বাস করিল না। মনে মনে গুমরাইতে লাগিল; আপনার আফিসে আসিয়া

ক্যালেব আপনার আফিসে বিমনা বসিয়া আছে, এমন সময় ডোমিশিয়ানের লোক আসিল। ক্যালেব ডাক ডাকিয়াছিল; মার্কসের মোতিকুমারীর দিকে ঝোঁক ছিল; হয়ত কে ডাকিয়া লইয়া গেল কোথায় লইয়া গেল, এ সকল বিষয় সন্ধান রাখে, এই বিষয়ে ডোমিশিয়ানের লোক আসিয়াছে। মার্কসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইল। স্থির হইল ক্যালেব মার্কস্‌কে ধরাইয়া দিবে; সে মিরিয়্যাম্‌কে পাইবে, তাহার ধন সম্পত্তি চায় না।

সমস্ত সৈন্য বিভাগের কার্য্যের ভার ভ্রাতা ডোমিশিয়ানের হস্তে হস্তান্তর করিয়া টাইটস্ স্থানান্তরে নিভৃত বাস করিতেছেন। ডোমিশিয়ানের আদেশে মার্কস্ যখন নিজ ভবনে গ্রেপ্তার হইলেন, তখন নেহুস্তা। মিরিয়্যাম্ চলিয়া গিয়াছেন। মার্কস্ বিচারের জন্য ডোমিশিয়ানের সম্মুখে নীত হইলেন; ক্যালেব তাঁহার বিরুদ্ধে 'সাক্ষি' দিতে আসিয়াছে। মার্কসের চক্ষু ক্যালেবের উপর পড়িল; তিনি বুঝিলেন, এই পাপিষ্ঠ হইতে এই কাণ্ড প্রধানত হইয়াছে।

ডোমিশিয়ানের বিচারে মার্কসের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হইল বটে; কি

ভেস্পেশিয়ানের কাছে আপীলের অনুমতি পাইলেন। আপাতত বন্দী হইয়া থাকিবেন।

নেহুস্তা ও মিরিয়্যাম্ প্রথমেই গ্যালসের বাড়ীতে গেলেন। গ্যালস্ আপনার স্ত্রীকে সঙ্গে দিয়া তাঁহাদিগকে খ্রীষ্টানদের নিভৃত পল্লীতে পাঠাইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরেই ডোমিশিয়ানের লোকেরা তাঁহাদের খুঁজিতে আসিল; দেখা ত পাইল না, কোন অনুসন্ধানও পাইল না।

রোম বিস্তীর্ণ নগরী; তাহার একদিকে একটি কদর্য্য ভাগে খ্রীষ্টানেরা বাস করিত। সকলেই মাটীর কাজ, কাঠের কাজ,—করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিত। সমস্ত উপার্জ্জন একত্র করিয়া বর্ষীয়ানগণ সকলকে প্রয়োজন মত বিভাগ করিয়া দিতেন। কিয়দংশ বিপন্নের সাহায্য জন্য রাখা হইত। যিনি শ্রেষ্ঠ পাদরী, তিনিও ছুতারের কার্য্য করিতেন। যীশু খৃষ্টের মর্ত্ত্য পিতা ছুতার ছিলেন। মিরিয়্যাম্ মাটীর পঞ্চপাত্র, ঝাড় ও প্রদীপ তৈয়ার করিতেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এইরূপে সুখেই কাটিয়া যাইতে লাগিল।

পাদরী সূত্রধর বেশে মার্কসের নিকটে যাতায়াত করিতে লাগিলেন; তিনি মিরিয়্যামের সংবাদ দিতেন, আর নব-দেব যীশুর অপূর্ব্ব জীবনবৃত্ত বিবৃত করিয়া মার্কস্‌কে খ্রীষ্টধর্ম্মের অমৃতময়ী কথা শুনাইতেন। মার্কস্ শুনিতেন, কিন্তু দীক্ষিত হইতে পারিলেন না। তাঁহার অর্থে গোপনে গোপনে একখানি জাহাজ ক্রয় করা হইল, বিশ্বস্ত খ্রীষ্টান মাঝিমাল্লা নিযুক্ত হইল। গ্যালস্ ও তাঁহার স্ত্রী তাহাদের সমস্ত বিক্রয় করিয়া, মিরিয়্যাম্ ও নেহুস্তাকে সঙ্গে লইয়া সীরিয়া যাত্রা করিলেন। মার্কস্ অবশ্য এ সকল সংবাদ পাইতেন।

মিরিয়্যামের অনুসন্ধানে ডোমিশিয়ান ব্যর্থ হইয়া ক্রমে শৈথিল্য দিয়াছেন। কিন্তু ক্যালেবের একটুও শৈথিল্য নাই। এটা ডোমিশিয়ানের একটা খেয়াল; কিন্তু ক্যালেবের হইল প্রাণের দায়; সে মিরিয়্যাম্‌কে প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসিত। এই দুইমাস কাল ক্যালেব প্রতিনিয়ত গ্যালসের বাড়ী চৌকী দিয়াছে। জানিতে পারিয়াছে, যে গ্যালস্ সমস্ত বেচিয়া কিনে জাহাজে করিয়া সীরিয়া মুলুকে যাইবেন; কিন্তু মিরিয়্যামেরা

যে ঙ্গসে যাইবে তাহা সে জানিতে পারে নাই। তাহারা রোমে যা
কিনা, তাহাও সে জানে না।

দৈবাৎ একদিন একটা সূত্র পাইল। তাহার একটি দীপাধার ও দীপে
প্রয়োজন ছিল। এক দোকানে গিয়া, একটি বিচিত্র দীপাধার দেখিল—এক
শিলাখণ্ডের পার্শ্বে দুইটী তাল গাছ, জড়াজড়ি করিয়া উঠিয়াছে; তাহাদের
দুইটি পত্রবৃন্ত হইতে একটি শৃঙ্খল ঝুলিয়া পড়িয়াছে, তাহাতেই একটি ক্ষি
দীপ ঝুলিতেছে। কারু-কার্য্য অদ্ভুত,—দেখিতে দেখিতে সেই শৈশব যৌবনে
ঈশানী ক্ষেত্র মনে পড়িল; তেমনিই জোড়া তাল তলায়, তেমনিই শি
খণ্ডে বসিয়া, ক্যালেব কর্দ্দমাক্ত জর্দ্দন জলে মাছ ধরিত মনে পড়িল; কিশোরী
মিরিয়্যাম্‌কে চক্ষুর সমক্ষে দেখিতে লাগিল। সেইটি ক্রয় করিল, জিজ্ঞাসা
করিল, "কারিকর কোথাকার গা?" "একজন খৃষ্টান্ পাদরী আমাদের
পাইকের, তিনি গলির ভিতর অনেক গরীব দুঃখী কারিকর লইয়া বা
করেন।" সন্ধান করিয়া সেইখানে গেল; একটি বালিকার কাছে শুনিল,
কারিকর চৌতালার সিঁড়ির ঘরে আর একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে বাস করে।

রাত্রি পোহাইলেই জাহাজ ছাড়িবে, কিন্তু সন্ধ্যার সময় নেহু
মিরিয়্যামের সম্মুখে ক্যালেব উপস্থিত।

নেহুস্তা ডোমিশিয়ানের সহিত ক্যালেবের ষড়যন্ত্র সকলই জানিত; সে
সকল কথা বলিয়া ক্যালেবকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিল। মিরিয়্যাম্ বলিল,
"জানি তুমি আমাদের সমস্ত পণ্ড করিতে পার, সেই ভয়ে যে তোমার
কোন কথা শুনিব, তাহা শুনিব না; মার্কসের ক্ষতি করিতে চাও কর,
কিন্তু তুমি আমাকে পাইবে না; তুমি আমাকে ভালবাস, তাহা জানি
কিন্তু আমি তোমাকে কখন ভালবাসি নাই। মার্কস্‌কে ভালবাসি কি
খৃষ্টান নয় বলিয়া, তাহাকে বিবাহ করি নাই—তুমি নিতান্ত বাতুল তাই
আমার প্রত্যাশা কর।"

বলিতে বলিতে মিরিয়্যাম্ লাবণ্যময়ী লতার মত বাতায়ন বেদীর
ঢলিয়া পড়িল। ক্যালেব এক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে
অস্ফুট স্বরে বলিল—"আমি পারিব না।" এইবার মিরিয়্যাম্ ক্যালেবের
দিকে এক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল।

ক্যালেব বলিতে লাগিল "মিরিয়্যাম্ শৈশবে, কৈশোরে,—যখন তোমা-
কে ভালবাসিয়াছিলাম, তখন সেই ভালবাসায় স্বর্গের সুখ পাইতাম। তখন
তোমার প্রতি লোভ হয় নাই। যখন লোভের উদয় হইল, তখন এই হৃদয়ে
নরক সমানে অধিকার করিল। নরকের বিষ—মার্কসের দিকে বর্ষিত
হইতে লাগিল। এই স্বর্গ নরক লইয়া এতদিন কাটাইয়াছি। অদ্য
তোমার কথায়, আমার নরকের মোহ কাটিল। আমি তোমাকে পাইবার
চেষ্টা আর করিব না, মার্কসের অনিষ্ট চেষ্টাও করিব না, যাহাতে তাঁহার
মঙ্গল হয়, সে চেষ্টা করিব। তোমার সরলতায় আমি নরক হইতে রক্ষা
পাইলাম। মিরিয়্যাম্ এই শেষ দেখা—।"

নামিতে গিয়া ক্যালেব পা পিছলাইয়া ভাঙ্গা সিঁড়িতে পড়িয়া গেল।
নেহুস্তা অমনই তাহাকে বধ করিতে উদ্যতা। বস্ত্র মধ্যে অস্ত্র নেহুস্তা
সর্ব্বদাই রাখিত।

মিরিয়্যাম্ নেহুস্তাকে নিরস্ত করিলেন। বলিলেন "উহাকে ছুরিকা
মারিবে—কি তোমাকে ধরাইয়া দিব,—হয় হৌক আমাকে ডোমিশিয়ানের
সম্মুখে যাইতে।" নেহুস্তা বলিল "নির্ব্বোধ উহার কথায় বিশ্বাস করিলি—
সমস্ত পণ্ড করিলি!" ক্যালেব উঠিয়া বলিল, "নেহুস্তা আমাকে মারিলেই
সমস্ত পণ্ড হইত—নেহুস্তা তুমি বৃদ্ধা হইয়াছ কিন্তু স্বর্গ নরকের খেলা বুঝিতে
পারিলে না।" ক্যালেব এবার মিরিয়্যামের হস্ত চুম্বন করিয়া, তাহার নিকট
হইতে বিদায় লইল। বিদ্যুতের মত চলিয়া গেল।

ক্যালেব তাহার কথা রক্ষা করিয়াছিল। মিরিয়্যাম্, নেহুস্তা, গ্যালস্
ও তাহার স্ত্রীকে লইয়া ছোট জাহাজ খানি সমুদ্রে যাত্রা করিল।

এই ঘটনার সপ্তাহ মধ্যেই টাইটস্ রোমে ফিরিয়া আসিলেন। মার্কসের
আপীল তাঁহার কাছে উঠিল। তিনি রায় দিলেন, যে "মার্কস্ পরম
সাহসী বীর পুরুষ; তবে রোমের নিয়ম যখন তিনি লঙ্ঘন করিয়াছেন,
এবং ডোমিশিয়ান যখন তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন, তিনি দোষী
বটে, তিনি সপ্তাহ মধ্যে ইটালী দেশ ত্যাগ করিয়া তিন বৎসর দেশান্তরে
থাকিবেন। তাহার পর রোমে ফিরিয়া আসিবেন। অদ্যই তিনি কারা-
মুক্ত হইয়া সন্ধ্যাকালে আপন ভবনে নীত হইবেন।"

পাপিষ্ঠ ডোমিশিয়ান পূর্ব্বেই মিরিয়্যাম্‌কে পাওয়া সম্বন্ধে হতাশ হইয়াছিল, তাহার পর টাইটসের এই আদেশ তাহাকে বিষের মত বোধ হইল, সঙ্গে শুনিল যে মিরিয়্যাম্ জাহাজ ডুবিতে মারা পড়িয়াছে—রাগে ক্ষোভে গুপ্ত ঘাতুক দ্বারা সেই সন্ধ্যাকালেই মার্কস্‌কে হত্যা করিতে সঙ্কল্প করিল।

ক্যালেব এই সংবাদ ডোমিশিয়ানের কর্ম্মচারীর নিকট হইতে জানিতে পারিলেন। ক্যালেবই জাহাজ ডুবির সংবাদ সর্ব্বাগ্রে জানিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ক্যালেব দুইখানি পত্র লিখিয়া রাখিয়া, রোমান পরিচ্ছদে দেহ আবৃত করিয়া, স্বীয় ভবন হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ইহার কিছু পূর্ব্বে খৃষ্টান পাদরী মার্কসের সহিত দেখা করিতে কারা-উদ্যানে গেলেন। দেখেন—মার্কস্ আত্মহত্যা করিবার জন্য অস্ত্র উত্তোলন করিতেছেন। মনে করিলেন, মিরিয়্যামের মৃত্যু সংবাদেই মার্কস্ এইরূপ বিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু মার্কস্ বাস্তবিক তখন পর্য্যন্ত জাহাজ ডুবির কথা কিছুই জানিতেন না, তিনি টাইটসের বিচারে বিক্ষুব্ধ হইয়া আত্মহত্যার উদ্যোগ করিতেছিলেন মাত্র। পাদরী পুঙ্গব তাঁহাকে ওরূপ পাপের কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। বলিলেন "মার্কস তুমি সম্পদে খৃষ্টকে চিনিতে পার নাই, এখন বিপৎ কালে, তাঁহার চরিত চিন্তা কর; তিনি দয়াময়, তোমায় উদ্ধার করিবেন।"

মার্কস্ বলিলেন "এই কয়মাস তাঁহার চরিত ধ্যান করিয়া বেশ বুঝিয়াছি তিনি দয়াময়, তাঁহার দয়া অসীম; কিন্তু এতদিন যে তাঁহার উপাসক হই নাই, তাহার কারণ ছিল,—আমি খৃষ্টান হইলে মিরিয়্যাম্ ঘৃণা করিত, আপনিও মনে করিতেন, এমন কি আমিও মনে করিতাম, এ মিরিয়্যামের জন্যই—আমি খৃষ্টান হইয়াছি—এখন সে ভাবনা আর নাই-মিরিয়্যাম্ ইহলোকে নাই,—সুতরাং এখন তাঁহার পদাশ্রয়ে যাইতে আর বাধা কি?"

পাদরী মহা প্রীত হইয়া, সেইস্থানে তখনই জল-অভিষেকে মার্কসকে খৃষ্ট উপাসনায় দীক্ষিত করিলেন। উভয়ে মার্কসের ভবনে যাত্রা করিলেন। কারারক্ষী দুইজন সঙ্গে গেল মাত্র; কেহই নিবারণ করিল না। টাইটসের আদেশই সেইরূপ ছিল।

মার্কস্ ও পাদরী মার্কসের ভবনে প্রবেশ করিলেন, সদর দ্বার খোলা রহিয়াছে। প্রবেশ পথে একটা শবদেহ মত কিছু পায়ে ঠেকিল; বরাবরই দ্বার খোলা, ঘরের মধ্যে লোহ সিন্দুক ভাঙ্গা, কর্ম্মচারী এবং পরিচারিকা বাঁধা রহিয়াছে। এত বিষম ব্যাপার। দুইজনেই জীবিত— বন্ধন খোলা হইলে হইয়া কর্ম্মচারী বলিল, "বণিক ডিমিট্রিয়াসের প্রেরিত দস্যু আসিয়া তাহাদের দুর্দ্দশা করিয়াছে, আর ধন রত্ন লইয়া গিয়াছে;" তাহারা মনে করিয়াছিল, দুয়ারে তাহারা মার্কস্‌কে হত্যা করিয়াছে। আলোক লইয়া দেখা গেল, ক্যালেবের মৃত দেহ! একজন হরকরা ক্যালেবের পত্র মার্কস্‌কে দিল—তাহাতে ক্যালেব লিখিয়াছে "ডোমিশিয়ান আজি তোমাকে তোমার দুয়ার পথে মারিবার জন্য ঘাতুক নিযুক্ত করিয়াছে, আমি তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য, আর মিরিয়্যামের কাছে তোমার অগ্রে পৌঁছিবার জন্য বাহির হইলাম। বোধ হয় ঘাতুকদের হস্তে আমার মৃত্যু হইবে; মার্জ্জনা অনেক রেষারেষি করিয়াছি—ক্ষমা করিও।"

পত্র পাঠ করিয়া ক্যালেবের মহত্ত্বে দুইজনেই অবাক্ হইলেন।

মার্কসের রোম পরিত্যাগের উদ্যোগ হইল। মার্কস্ না মরিয়া ক্যালেব মরিয়াছে,—একথা ডোমিশিয়ান জানিবার পূর্ব্বেই পলাইতে হইবে। পরদিন প্রত্যূষেই মার্কস্ এবং পাদরী সদ্যই ছাড়িবে এমন একখানি জাহাজে আরোহী হইলেন। জাহাজ মিশরে সেকেন্দ্রা সহরে যাইবে। জাহাজ সময়ে ছাড়িল বটে, কিন্তু ঝড় তুফান কাটাইয়া বন্দরে বন্দরে যাইয়া সেকেন্দ্রা সহরে পৌঁছিতে তিন মাস লাগিল। তখন জল ফুরাইয়াছে, খাদ্য ফুরাইয়াছে, কষ্টের একশেষ হইয়াছে। দেখিল আর একখানি জাহাজ বন্দরে নোঙ্গর করিয়া রহিয়াছে। যদি একটু জল পাওয়া যায়, তা এই দারুণ তৃষ্ণা হইতে রক্ষা হয়, ভাবিয়া একখানি জালিবোট ভাসাইয়া সেই জাহাজের পার্শ্বে পাদরী ও মার্কস্ গেলেন, সেখানি খৃষ্টানদের জাহাজ, ইহাদের খৃষ্টান দেখিয়া, জাহাজের উপরে উঠিতে দিল।

উভয়ে শুনিতে পাইলেন মধুর কণ্ঠে গীত হইতেছে;—

ভালবাসে যেইজন—
তার হয় না মরণ।

যতই লাঞ্ছনা হৌক, শেষে অবশ্য মিলন।

কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া উভয়ে পরস্পর মুখ দেখাদেখি করিতে লাগিলেন—চেনা স্বর নয়?

যেখানে গান হইতেছিল, সেই খানে উভয়ে গেলেন—মিরিয়াম গায়িকা মার্কস্‌কে দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন।

মিরিয়্যামের জাহাজ ডুবির সংবাদ মিথ্যা— জাহাজ খানা বিপদে পড়িয়াছিল বটে। সেই রাত্রিতে পূর্ব্ব কথা সকলই হইল—ক্যালেবের মৃত্যু কথা মিরিয়্যাম্ শুনিয়া বিস্মিত হইলেন না। লাঞ্ছনা, যন্ত্রণার মধ্যে মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধান সকলেই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন।

পরদিন পাদরী পুঙ্গব পৌরহিত্য করিলেন, গ্যালস্ মিরিয়্যামকে মার্কস্ করে সম্প্রদান করিলেন, পলিতকেশী ভ্রুকুটিনয়না নেহুস্তা, মিরিয়্যামের মাতৃনামে নবদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিল। ইংরাজি গ্রন্থে লেখা নাই, আমরা কিন্তু বলিতেছি দুই জাহাজে খুব ভোজের ধুম হইয়াছিল। নেহুস্তা নাকি নাচিয়াছিল।

[সমাপ্ত]

সিংভূমে তসরের চাষ।

" দেশভ্রমণ " শীর্ষক পত্রগুলি পাঠ করিয়া, " পূর্ণিমার " পাঠক সিংভূম জেলার পরিচয় পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। সুতরাং সিংভূমের পরিচয় আর নূতন করিয়া লিখিলাম না। একখানি পত্রে তসর-চাষ সম্বন্ধে মোটামুটি প্রধান কথা উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে তসর-চাষ বিষয়ে সকল কথা বিশদভাবে বিবৃত করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

দেশীয় তিন প্রকার রেশম।

আমাদের দেশে প্রধানতঃ তিনপ্রকার রেশম তৈয়ার হইয়া থাকে,—(১) গরদ (২) তসর (৩) এড়ি বা এণ্ডি। ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি

বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি তসরের জন্য এবং আসাম
গরদের জন্য, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি তসরের জন্য এবং আসাম
...ণ্ডির জন্য বিখ্যাত। গরদের ও তসরের গুটি হইতে অনায়াসে পরিষ্কার
... রেশমীসূতা তোলা যায়, কিন্তু গরদ ও তসরের গুটির ন্যায় এড়ির গুটি হই-
...তে অনায়াসে সূতা তুলিতে পারা যায় না; সমস্ত গুটিকে তুলার মত পিঁজিয়া
... চরকা ও টেকোর সাহায্যে সূতা কাটিতে হয়। গরদের গুটি বনে
...ন্ম হয় না। মনুষ্য অনেক পরিশ্রম করিয়া তাহাদিগের বাটীতে
নিজেদের তত্ত্বাবধানে তুঁত ও কুল গাছে এই গুটির আবাদ করে। মনুষ্যের
...ন্তের ভিতর ইহাদের জন্ম বলিয়া ইহাদের জন্ম মৃত্যু অনেক পরিমাণে
মনুষ্যের হস্তে। নিজেদের সন্তান সন্ততি যেরূপ ভাবে যত্নের সহিত
লালন পালন করিতে হয়, তাহা অপেক্ষা শত গুণ অধিক যত্ন ও পরিশ্রম
করিয়া গরদ কীটের লালন পালন করিতে হয়। পক্ষান্তরে তসর ও এণ্ডির
গুটি বনে জঙ্গলে নানাস্থানে জন্মিয়া থাকে। রেড়ী, ভেরাণ্ডা অথবা,
বিশুদ্ধ ভাষায় এরণ্ড গাছে গুটি জন্মায় বলিয়া, ইহাকে এড়ি অথবা এণ্ডি
বলে। আর আসন, শাল, অর্জ্জুন প্রভৃতি পার্ব্বতীয় গাছে তসর গুটির জন্ম।
কেবল যে অরণ্য মধ্যে তসর ও এণ্ডির জন্ম তাহা নহে। খোলা মাঠের
উপর, মুক্তবায়ুতে ঐ সকল গাছের উপর লোকে নিজেদের তত্ত্বাবধানে
ইহাদের আবাদ করিতেছে। কিন্তু বুঝা যাইতেছে যে ইহাদের জন্ম মৃত্যুর
উপর মানুষের কোন হাত নাই, সম্পূর্ণই ভগবানের হাত। অর্থাৎ ফাঁকা
জায়গায়, মুক্ত বাতাসে ইহাদিগের জন্ম বলিয়া ইহাদের জন্ম মৃত্যু পূর্ণ
মাত্রায় জল, ঝড়, রৌদ্র, প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। তবে মানুষে, পশু,
পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি ইহাদিগের স্বাভাবিক শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা
করিবার জন্য সকল সময়েই বিশেষ রূপে চেষ্টা করে। আমরা গরদ ও
এড়িকে বাদ দিয়া, তসর সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিতেছি।

কিরূপ স্থানে ও কোন্ কোন্ গাছে তসরগুটি উৎপাদন করা উচিত।

সিংভূমে প্রধানতঃ আসন বা সাজ (Terminalia tomentosa) গাছে
ও অর্জ্জুন গাছে (Terminalia arjuna) তসরগুটির চাষ করা হয়।
জঙ্গলের মধ্যে আরও অনেক গাছে গুটি—দেখিতে পাওয়া যায়, যথা;—

শাল, ধব (Anogeissus latifolia), ও কুল। কিন্তু সকল গাছ অপেক্ষা আসন ও অর্জ্জুন গাছই তসরগুটির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। যে সকল গাছের ডালপালা একেবারে মুড়াইয়া ছাঁটিয়া দিলেও, পর বৎসরে আবার বেশ নূতন বড় বড় ডালপালা বাহির হয়, অথচ প্রতি বৎসরে ডালকাটার দরুণ, গাছ নিস্তেজ হইয়া পড়ে না, সেই সকল গাছই তসরগুটির জন্য প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। আসন ও অর্জ্জুন গাছে ঐ সকল গুণ অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান। তবে অর্জ্জুন গাছের ত্বক অতিশয় মসৃণ, সেই জন্য অল্প বৃষ্টি হইলেই তসর কীট গাছ হইতে পিছ্‌লাইয়া নিম্নে জমিতে পড়িয়া যায়। কিন্তু আসন গাছের ছাল অতিশয় খস্‌খসে ও ফাটা ফাটা, কাজেই গাছ হইতে কীট পিছ্‌লাইয়া পড়িয়া যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

সকল গাছের পাতা অপেক্ষা আসন, অর্জ্জুন ও শাল গাছের পাতা খাইতে তসর কীট বড় ভালবাসে। শাল গাছও মুড়াইয়া ছাঁটিয়া দিলে নিস্তেজ হয় না, কিন্তু আসনের মত শীঘ্র ডালপালা বাহির হয় না। তসর চাষ করিবার জন্য প্রতি বৎসর শালের মাথা মুড়াইয়া, কাটিয়া এই বামী গাছ নষ্ট করিতে কাহার ইচ্ছা হয়? নতুবা অনেকের মতে শাল, আসন অপেক্ষাও তসর চাষের পক্ষে উপযোগী। সুতরাং আসন ও অর্জ্জুন গাছেই চাষ করা যুক্তিযুক্ত। তাহার মধ্যে আসন গাছ সর্ব্ববিষয়ে বিশেষ উপযোগী বুঝিতে পারা যাইতেছে। এই আসন, অর্জ্জুন, ও শাল তিনটিই পাহাড়ীয়া গাছ। বাঙ্গালি শাল ও অর্জ্জুন গাছ দেখিয়া থাকিলেও আসন গাছ বোধ হয় অনেকেরই নয়ন গোচর হয় নাই। অর্জ্জুন গাছের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে।

প্রথমেই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কোন স্থান তসর চাষ করিবার জন্য বিশেষ উপযোগী,—পাহাড়ের নিকট যে সকল জঙ্গল আসন গাছে পূর্ণ, সেই স্থান? না গ্রামের নিকট খোলা ক্ষেত্রে, যে স্থানে বিস্তর আসন গাছ আছে? সিংভূমের ও সাঁওতাল পরগণার লোকেরা নিবিড় জঙ্গলেরমধ্যে তসর চাষ না করিয়া খোলামাঠের মধ্যে চাষ করে বলিয়া, এই দুইস্থানের তসরগুটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বৃষ্টি কিম্বা শিশির পাতে গাছের পাতা ভিজিয়া গেলে, তসরকীট সে পাতা খায় না। নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে কেবল মাত্র

র উপর দিয়া একটু বাতাস বহে, সুতরাং গাছের নিম্ন অংশের পাতা হইতে বিশেষ বিলম্ব হয়। খোলামাঠে আট দশ হাত অন্তর গাছ কলে রৌদ্র ও বায়ু ইচ্ছামত গাছের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, সুতরাং রোক্ত কোনরূপ বিপদ ঘটে না। আর, হলুদ, আদা, এরোরুট, তুলা, বাদাম, আনারস, গাজর, প্রভৃতি যে সকল ফসল গাছের ছায়ায় ৎ আওতায় ভাল জন্মায়, সেই সকল ফসল অনায়াসে বৃক্ষের মধ্যস্থিত হইতে উৎপন্ন করা যাইতে পারে। তসর ও ফসলের চাষ উভয়েই ত্র সম্পন্ন হয়। সিংভূমের স্থানে স্থানে ধান ক্ষেতে তসরের চাষ হইয়া থাকে। সুতরাং গ্রামের সন্নিকটে ক্ষেতের উপর তসরের করাই বিধেয় বলিয়া মনে হইতেছে। গ্রামের সন্নিকটে চাষ করার কারিতা সম্বন্ধে আরও একটী কথা বলা যাইতে পারে;—পাহাড়ের জঙ্গলে চাষ করিলে, গুটির তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য, গ্রাম হইতে লোক আনাইয়া, জঙ্গলের নিকট কিছু দিনের জন্য পাতার ড়ের মধ্যে বসবাস করাইতে হয়। স্ব স্ব ভিঠা ছাড়িয়া কয়েক মাসের জন্য অন্যত্র বাস করিতে, ও পরে গুটির সময় ফুরাইয়া গেলে তথা হইতে পুনরায় গ্রামে ফিরিয়া আসিতে, কেহই স্বীকৃত হয় না। সুতরাং গুটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লোকাভাব হইবার সম্ভাবনা।

তসর চাষের উপযোগী গাছ তৈয়ার করা।

বড় করিয়া চাষ করিতে হইলে রোপন করিয়া ইচ্ছামত আসনের গাছ তৈয়ার করা উচিত। প্রথমে অল্প জমী উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া তাহার উপর বীজ ছড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। গর্ত্ত করিয়া মাটীর মধ্যে বীজ লাগাইলে কোন মতেই গাছ বাহির হইবে না। অর্জ্জুন ও শালের ঠিক এক প্রকারের ধাত। বীজগুলি কেবল মাটির উপরে পড়িয়া থাকিবে। চারাগুলি অর্দ্ধহস্ত পরিমিত দীর্ঘ হইলে, বর্ষার প্রারম্ভে, উহাদিগকে তথা হইতে তুলিয়া অন্যত্র বসাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ৩।৪ বৎসর পর্য্যন্ত গাছের ডালপালা না কাটিয়া বাড়িতে দেওয়া হয়; পরে জমী হইতে ৪ ফুটের মধ্যে যে সকল ডালপালা বাহির হয়, সেগুলি কাটিয়া ফেলা আবশ্যক, এবং গাছকে ৪।৫ হাতের অধিক বড় করা অনাবশ্যক। ৪।৫

হাতের উপরের ডালপালা সমেত একেবারে মাথা কাটিয়া দেওয়া হয়। গাছে এক বৎসর কীট জন্মান হইলে, পর বৎসর গাছকে বিশ্রাম করিবার অবসর দেওয়া হয়। এইরূপ ভাবে এক বৎসর অন্তর গাছের উপর তসরের চাষ করা উচিত। মাননীয় ৺ নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মত যে, এক গাছে চারিবৎসর গুটি উৎপন্ন করিবার পর গুটি উৎপাদন বিষয়ে সেই বৃক্ষ আর ব্যবহার না করাই ভাল। কিন্তু এইরূপ করিলে ব্যবসা চালান দুরূহ হইয়া পড়ে। এক বৎসর চাষ করিয়া ডালপালা সম্পূর্ণরূপে মুড়াইয়া ছাঁটিয়া দিলেও, এক বৎসরের মধ্যে আবার বেশ বড় বড় ডালপালা গজাইয়া উঠে। ইচ্ছা করিয়া ডালপালা ছাঁটিতে হয় না; প্রথমতঃ, কীটে গাছের সকল পাতা খাইয়া ফেলে, সুতরাং গাছে একটিও পাতা থাকে না; পরে গুটি সংগ্রহ করিতে হইলে ডাল সমেত গুটি জড় করা হয়। কাজেই গুটি সংগ্রহের পর, বাকি ডালগুলি কাটিয়া গাছ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়।

গুটিপোকার চারিটি বিভিন্ন অবস্থা।

চাষ করিবার উপযোগী গাছ তৈয়ার হইয়াছে। এক্ষণে তসরের জন্য বীজ আনয়ন করিয়া, ঐ গাছে লাগাইতে হইবে। গুটির বীজ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে তসরকীটের জন্মের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিব। পূর্ণযৌবন প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে গুটিপোকার চারিটি বিভিন্ন অবস্থা ক্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে।

১। মাতৃগর্ভ হইতে পতিত হইবার পর ৯। ১০ দিন পর্য্যন্ত ডিম্বাবস্থা

২। ডিম ফুটিবার পর হইতে ১ মাস হইতে ২ মাস পর্য্যন্ত কীটাবস্থা (caterpillar) এই কীটাবস্থা প্রাপ্ত পোকাকে আমরা সচরাচর গুটিপোকা বলিয়া থাকি। এই অবস্থায় কীটগণ চারিবার দেহের উপরি ভাগের ত্বক পরিত্যাগ করে। ইহা সাপেরখোলস্ ছাড়ার মত। ইংরাজীতে ইহাকে Moulting বলে।

৩। চারিবার খোলস ছাড়িবার পর, ইহারা মুখ হইতে লালা বাহির করিতে করিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্ব দেহের চতুর্দ্দিকে গুটি তৈয়ার করে, এবং সম্পূর্ণরূপে স্বকৃত গুটির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়।

গুটিপোকার তৃতীয় অবস্থার কাল সমান নহে। ২০ দিন, ১ মাস, মাস হইতে প্রায় ১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন কোন পোকা এই অবস্থায় গুটির আবদ্ধ থাকে। গুটির মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিবার পথ নাই; তবে উপরের আচ্ছাদনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া অল্প পরিমাণে বায়ু ভিতরে প্রবেশ করে মাত্র। এই অবস্থায় ইহাদের চোখ্ মুখ প্রভৃতি সকলই লোপ পায়। তখন ইহারা গাঢ় রক্ত বর্ণের ডিম্বাকৃতি জীবে পরিণত হয়। বদ্ধ গুটির মধ্যে আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া, স্থির ও ধীরভাবে, কাল যাপন করে বলিয়া, এ দেশের লোকদিগের বিশ্বাস যে ঐ অবস্থায় কীটগণ যোগাসনে বসিয়া ভগবৎ চিন্তায় বিভোর, সুতরাং তাহারা বাহ্যজ্ঞান শূন্য; যোগ করিতে করিতে শরীরের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তবুও তাহাদিগের ভ্রূক্ষেপ নাই। এই তৃতীয় অবস্থাপ্রাপ্ত কীটগণকে ইংরাজীতে chrysalids কহে। এই দেশের বিশ্বাসানুযায়ী এই প্রবন্ধে কীটের এই অবস্থা যোগাবস্থা বলিয়া কথিত হইবে।

৪। যোগাবসান হইলেই নানা বর্ণের রঞ্জিত পক্ষাদি সংযুক্ত প্রজাপতির আকার ধারণ করিয়া কীট গুটির ঊর্দ্ধদেশ কাটিয়া তথা হইতে বাহির হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় কীটকে গুটি-প্রজাপতি (moth) বলা যায়। ইহাই কীটগণের পূর্ণ যৌবন কাল। কোন গুটি হইতে পুং ও কোন গুটি হইতে স্ত্রীপ্রজাপতি বাহির হয়। তবে স্ত্রীপ্রজাপতির সংখ্যাই অধিক। কোন্ গুটিপোকা কোন্ জাতীয় প্রজাপতিতে পরিণত হইবে, তাহা, কীটাবস্থা দেখিয়া বলিয়া দিতে পারা যায় না। তবে, গুটির যোগাবস্থা দেখিয়া পুং কিম্বা স্ত্রী স্থির করা যায়। পুং ও স্ত্রী গুটি-প্রজাপতির মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য লক্ষিত হয়;— স্ত্রীপ্রজাপতি——

১। পুরুষ অপেক্ষা স্ফীত উদর।

২। দেহের বর্ণ পুরুষের ন্যায় ঘোর নহে।

৩। পুরুষের পক্ষদ্বয়ের উপরিভাগ বঁড়সির মত বক্র curved; কিন্তু স্ত্রীপক্ষদ্বয়ে বক্রতা অতি অল্প।

৪। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর শুণ্ড বা শুঁয়া Feelers or Antennae আকারে ছোট ও সূক্ষ্ম।

গুটি হইতে প্রজাপতি বাহির হইলে, উল্লিখিত বিষয় সকল নিরীক্ষ করিয়া কোন্ জাতীয় প্রজাপতি স্থির করা হয়। পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত স্ত্রীপ্রজা পতি গুটি হইতে বাহির হইয়াই পুং প্রজাপতির সহিত সঙ্গমে প্রবৃত্ত হয়, এ সঙ্গমের পরদিন হইতেই ডিম্ব প্রসব করিতে আরম্ভ করে। স্ত্রীপ্রজাপতি গর্ভে ডিম্ব লইয়াই গুটি হইতে বাহির হয়। পুং প্রজাপতির সহিত মিলি হইবার পূর্ব্বে, তাহাদিগকে অধিক নাড়াচাড়া করিলে, তাহারা অপরিপ ডিম্ব প্রসব করে। কিন্তু সেই সকল ডিম্ব ফুটিয়া কীট বাহির হয় না সুতরাং পুং ও স্ত্রী প্রজাপতির মিলনের পর, স্ত্রী প্রজাপতি যে ডিম্ব প্রস করে, তাহাই সম্পূর্ণরূপে পরিপক্ক ডিম্ব এবং সেই ডিম্বই ৯। ১০ দিনের মধ্যে ফুটিয়া কীট উৎপাদন করে। এক্ষণে গুটিপোকার চারিটি বিভিন্ন অব একরূপ বুঝিতে পারা গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

হেমন্তে বঙ্গলক্ষ্মী।

চঞ্চলতা চঞ্চলার দেখা নাহি যায় আর
পরিণত মাতৃমূর্ত্তি দেখ এইবার;
প্রেমময়ী, দয়াময়ী, স্নেহময়ী, শান্তিময়ী,
সন্তানপালিনী দেবী করুণা-আধার!

ধান লয়ে মুঠি ভরি' হরষে যতন করি
বিকীরণ করেছেন প্রতি ক্ষেত্র-মাঝে,
বারিপাতে সেই ধান লক্ষশীর্ষে শোভমান,
প্রতি ক্ষেত্রে কমলার অঞ্চল বিরাজে!

মৃদুবায়ু ধন্য মানি সোনার অঞ্চলখানি,
দোলায়ে জানায় বিশ্বে লক্ষ্মী-আগমন,
দেখিয়া মায়ের শোভা জগ-জন মনোলোভা,
আনন্দ-সাগর মাঝে বিশ্ব নিমগন!

ঘন বর্ষা বারি পাতে নিদাঘের উষ্ণ বাতে,
তৃণসম তুচ্ছ করি যেই কৃষীকুল
করেছে বিষম শ্রম, হেরি লক্ষ্মী-আগমন
আজি তারা জ্ঞানহারা, বিকল, আকুল!

দুখ দৈন্য সব ভুলি মায়ের চরণ ধূলি,
যতনে তুলিয়া লয় আপনার মাথে;
সফল যতন হেরি আপন কুটীর ঘেরি
নবীন উৎসবে মাতে বন্ধুগণ সাথে!

সকাল সাঁঝের বেলা হেরি মাঠে সোনা-খেলা,
বুকভরা আশাসিন্ধু উথলিয়া উঠে;
সুখের স্বপন কত ভাঙ্গে গড়ে অবিরত,
বিষাদ-বাঁধন যত ক্ষণ মাঝে টুটে!

ধান চ'লে পাকা সোনা দিয়া গেছে আলিপনা,
কৃষক-মাথে বহি' আনে প্রতিমা রমার;
লক্ষ্মীর করুণ-দিঠে সব আশা যায় মিটে,
লক্ষ্মী দৃষ্টি যার 'পরে কি ভাবনা তার!

মাতৃনাম উঠে ফুটে দিগন্ত কাঁপিয়া উঠে,
প্রতিধ্বনি গায় শুধু সেই মাতৃগান;
হেমন্তে জলন্ত-মূর্ত্তি বসুধা ভরিয়া স্ফূর্ত্তি,
ডাকিতে পারিলে নাহে,—দুখ অবসান!

শ্রীচন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্য।

সমালোচনা।

[বিধবা বিবাহ।]

এ মাসে ৫ খানি মাত্র মাসিক পত্র দেখিতেছি। পূর্ণিমার কার্য্যাধ্যক্ষ মুখে শুনিয়াছি, অনেকেই নাকি পূর্ণিমার সঙ্গে পরিবর্ত্তন করেন না;— কেন;—বেশ বুঝিতে পারি না। এমন দিনে আমরা আপনা আপনি মধ্যে, যদি একটু আধটু ত্যাগ স্বীকার না করিতে পারি, তবে স্বদেশীটা কি কেবল আমাদের মুখের কথা নহে? জানি পূর্ণিমা—অপদার্থ—স্বা তোমরা পাঁচজনে সপদার্থ; সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করি, সপদার্থ যদি অপদার্থকে দেখা না দেন, তবে অপদার্থ ক্রমে সপদার্থ হইবে কি রূপে? সকল কথা সকলেই জানেন; তবু আর একবার বলিতে দোষ কি? দুঃখে কান্না কেঁদে ফেলিতে পারিলেই বুকের ভারটা খানিক কমিয়া যায়।

দুঃখের কথা বলিলাম, আহ্লাদের কথাও বলি; এবার একখানি নূতন মাসিক পত্রের তিন সংখ্যা আমরা নূতন পাইয়াছি, উপাসনা। আমার পক্ষে একেবারে নূতন, আমি পূর্ব্বে কখনও উপাসনার চেহারা পর্য্যন্ত দেখি নাই। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় যাহার কর্ণধার, রাজশ্রী নলিনীর যাহার স্বত্বাধিকারী, সে মাসিক পত্র যে ভাল হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি! কিন্তু কেবল নাম ডাকের জন্য ভাল বলি না,—প্রবন্ধগুলি বেশ দেখ, বিশেষ বঙ্কিম বাবুর বিশেষত্ব প্রবন্ধ বড়ই ভাল লাগিল। তবে উপাসনা কোন বিশেষত্ব আছে কিনা, এই তিন সংখ্যা দেখিয়া কিরূপে বুঝিব? প্রার্থনা করি, যেন বিশেষত্ব থাকে; এবং উপাসনা ফুলের তোড়া না হইয়া ফলের বাগান হয়।

শ্রাবণের ও ভাদ্রের কৃষক—বেশ সুন্দর।

ভাদ্রের স্বদেশীতে সাহিত্য চর্চ্চা যেন একটু কমিয়াছে বলি বোধ হইতেছে। ১১টি প্রবন্ধ মধ্যে, তিনটি সময়োপযোগী 'স্বদেশী' প্রবন্ধ আছে (১) "বাঙ্গালীর ব্যবসা," (২) "এবোকট্" (৩) "পশু পশু"। স্বদেশীতে সাহিত্য-প্রবণতার বিষয়ে, আমরা কয়বারই একটু আধটু ঠুকিতেছি; এবার মন্দের ভাগ বলিতে হইবে।

সয়রুল মোতাখরীণ। ৺ গৌরসুন্দর মৈত্র কর্ত্তৃক মূল পারস্য পুস্তক হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদিত। প্রকাশক শ্রীযোগীন্দ্র প্রসাদ মৈত্র। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষতের ছাপ মারা এইখানি পাওয়া গিয়াছে। মলাটে ছাপান আছে নমুনা। কোন মৃত ব্যক্তির কৃতকার্য্য সমালোচনা চলে না। তবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মহাগৌরবস্থ জিনিষ; তাঁহারা নমুনা পাঠানতেই বোধ হয় যেন সমালোচনা ইচ্ছা করেন। বহুদিন হইল বঙ্কিম বাবু এই গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, এত দিন পরে সেই অনুরোধ রক্ষা হইতেছে—বিলম্বে কার্য্য সিদ্ধি মনে করিয়া, আমরা নমুনা পাইয়াই মহা আহ্লাদিত হইলাম। কিন্তু গোড়াটা খানিক পড়িতে না পড়িতেই হর্ষে বিষাদ হইল। অনুবাদের ভাষা নিতান্ত অস্পষ্ট ও খাপছাড়া রকমের। তাহার পর ব্রিগ্‌স্ কৃত অনুবাদ বাহির করিলাম—অনেক স্থানেই মিলে না। যেখানে ইংরাজিতে আছে Four hours before day break সেখানে বাঙ্গালায় আছে 'দিবা চারি দণ্ড অতীত হইলে,' বাঙ্গালা পড়িলে মনে হয়, বাদসাহ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মোহম্মদ কামবক্শকে, বিজাপুর যাইতে ১৭ই জিলকদ সোমবার আদেশ করেন; ইংরাজি পড়িলে বোধ হয়, তাহার পূর্ব বৃহস্পতিবারে আদেশ করিয়াছিলেন, যে সোমবারে তাঁহাকে বাহির হইতে হইবে।

আমাদের বিষম বিপদ। পার্শী জানি না, বাঙ্গালা ইংরাজীর এ গোল কিরূপে মিটাইব?

সাহিত্য পরিষৎ হইতে খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'রসায়নী বিদ্যা' পাইয়াছিলাম। তাহাতে পরিষতের অবহেলা এবং ত্রুটি জাজ্বল্য দেখিয়াছি। মুখে বলিয়াছিলাম, লেখায় কিছু বলি নাই। এবার না জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিতে পারি না, এরূপ অস্পষ্ট বাঙ্গালায় মৃত ব্যক্তির লেখা গ্রন্থ ছাপিয়া ফল কি? ইহাতে মৃতের অসম্মান হইবে, পাঠকের বিরক্ত হইবে, এবং কাহারও কোন উপকার হইবে না।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের হিন্দু পত্রিকা একত্র। পত্রিকা এত পিছাইয়া কেন?

শ্রাবণের পন্থা—এবারও শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ লিখিত 'রাসতত্ত্ব'

প্রভুপাদ শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী লিখিত "রূপসনাতন ও জীব গোস্বামী" প্রভৃতি প্রবন্ধ আছে।

ভাদ্রের উদ্বোধন; শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত পূর্ব্বমত চলিতেছে।

"ধর্ম্মপ্রচারক" ভাদ্র; মহামণ্ডল সমাচারে দেখিতেছি, দৌলতপুর হিন্দু একেডেমিকে মহামণ্ডলের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। ভাল হইয়াছে—এখন যদি মহামণ্ডলের সাহায্য দানে একেডেমির উপযুক্ত লাবোরেটরি বা বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে বলিব, মহামণ্ডল সত্যই কার্য্যকর, নতুবা কেবল নাম-কর বা অনর্থ কর।

ভারতী আশ্বিন। চন্দ্রে কলঙ্ক—ভারতীতে ভুল! তাহাতে আবার শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরের লিখিত "হাম্বির" প্রবন্ধে। "এক দিন ঘোর অমাবস্যার রাত্রি, বনের ভিতর দিয়া পথ দেখে চলা অসম্ভব, হাম্বির একটা প্রকাণ্ড শাল গাছে চড়লেন * * * হাম্বির নিজেকে বেশ করে, গাছের সঙ্গে বেঁধে নিদ্রা গেলেন। অনেক রাত্রে হাম্বিরের ঘুম ভাঙ্গিল— * * আকাশের মাঝখানে চাঁদ এখনও ঝল মল করছে।" এমন ভুল এ প্রবন্ধে থাকিবে কেন! পর প্রবন্ধ "মহিলা শিল্প-সমিতি" এই প্রবন্ধে সমিতির ও মহিলা শিল্পাশ্রমের প্রতিষ্ঠার অব্দ দিতে বিষম ভুল হইয়াছে। দুইটী ১২১৩ সাল লেখা হইয়াছে। মাঝের কথাগুলি পড়িলে, বোঝা যায় তাহা হইতেই পারে না। ভারতীর ভুল বলিয়াই, এত খুঁটিনাটি করিলাম—সম্পাদিকা মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রাবণের বামাবোধিনী। ইহাতে বামাবোধিনীর পিতৃদেব স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্তের প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে, সৌম্যশ্রী মুখ মধ্যে, উজ্জ্বল চক্ষু দুটির অপূর্ব সৌন্দর্য্য জল জল করিতেছে! এই প্রতিকৃতিখানি দর্শন করিয়া শ্রীবিপ্রচরণ বসুর কবিতা বেশ সুন্দর ও সময়োপযোগী। ৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ভবনের এখন অবস্থা কিরূপ, শ্রীমতী অম্বুজা সুন্দরী গুপ্ত 'দেব নিবাস' কবিতায় বর্ণনা করিয়াছেন; সমস্ত কবিতাটিই ভাল, তবে তাহার মধ্যে একটি পংক্তি—অমূল্য— (দেবনিবাসে)

সুখ শূন্য শান্তি আছে ম্লানমূর্ত্তি ধরে।

দেখিতেছি বামাবোধিনীতে 'বিধবা-বিবাহ' বিষয়ে চর্চ্চা হইতেছে; প্রবন্ধে পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর লিখিত আছে। পূর্ব্বে কি ছিল, না ছিল, মনে নাই, বা দেখি নাই, এবার যাহা আছে, তাহারই উপর দুই চারিটি কথা বলিব। আমরা বিধবা বিবাহের বিরোধী কিন্তু তা বলিয়া প্রবন্ধ লেখকের ভাব ভঙ্গির ও ভাষার প্রশংসা করিতে ছাড়িব না। তিনি বেশ ধীরে সুস্থে আপনার বক্তব্য প্রকাশ করিতেছেন।

লেখক প্রশ্ন করিয়াছেন "ব্রহ্মচারিণী বিধবাগণ ভক্তির পাত্রী ও প্রশংসনীয়া বলিয়া ধর্ম্মপরায়ণা, পতিপরায়ণা বিবাহিতা বিধবাগণকে নিন্দার বা ঘৃণার চক্ষে দেখিলে,—তাহা কি বাতুলের কার্য্য নয়?" আমরা একটি প্রশ্ন করিব। যে সকল দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে, তা ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি সভ্য দেশেই হৌক, আর নিউজিলাণ্ড ফিজিলাণ্ড প্রভৃতি অসভ্য দেশেই হৌক, সেই সকল দেশে একই অবস্থাপন্ন দুইজন বিধবার মধ্যে, একজন যদি পরে বিবাহ করে, আর একজন ব্রহ্মচর্য্য করিয়া কাটায়, তবে সেই সকল দেশেই সেই শেষোক্ত বিধবাকে পূর্ব্বোক্ত বিধবা অপেক্ষা অধিকতর শ্রদ্ধা ভক্তি করে কি না? যদি করে, তবে আপনি যাহাকে বাতুলতা বলিতেছেন, তাহা পৃথিবীময় পরিব্যাপ্তা বলিতে হইবে। আপনিইত বলিতেছেন "ব্রহ্মচর্য্যই বৈধব্যাবস্থায় শ্রেষ্ঠ ব্রত;" সেই শ্রেষ্ঠ ব্রত যাহাতে সকলে গ্রহণ করে, সেই চেষ্টাইত শাস্ত্র ও সমাজ করিবেন?

লেখক সমগ্র পূরাণ ইতিহাস হইতে চারিটি বিধবা বিবাহের কথা বলিয়াছেন, বলিয়াছেন, আর পাওয়া যায় না। (১) মদন পত্নী মায়াবতী, (২) বালীপত্নী তারা, (৩) রাবণ পত্নী মন্দোদরী (৪) নাগ কন্যা উলুপী; বাস্তবিক এই দৃষ্টান্তগুলি, বিধবা বিবাহের পক্ষে যায় না বিপক্ষে যায়? মদন পত্নী দেবতা—কথাই আছে:—

দেবতার বেলা, লীলা খেলা,
পাপ হয় মানুষের বেলা।

বিশেষ মায়াবতী পূর্ব্ব পতিকেই দ্বিতীয় বার পতিত্বে পাইয়াছিলেন, সেরূপ পাইবার সম্ভাবনা আছে কি?

তাহার পর, তারা, মন্দোদরী এবং উলুপী। তারা—বানরী। মন্দোদরী

—রাক্ষসী। উলুপী—নাগকন্যা। এই সকল অনার্য্যা নারীর, এই সকল অনার্য্য কাণ্ড হইতে কি আর্য্যগণের সামাজিক ব্যবহার শিখিতে হইবে! কথা হইতেছে বর্ণাশ্রমীর উচ্চশ্রেণীর বিধবা মধ্যে পুরুষান্তর গ্রহণ কখন প্রচলিত ছিল না; থাকিলে, তাহার মন্ত্র থাকিত, সম্প্রদানের বিধি থাকিত, সম্প্রদানকালে কোন গোত্রের উল্লেখ করিতে হইবে, তাহা স্পষ্ট বলা থাকিত; আর কত কি থাকিত। দেখুন—এক দত্তক গ্রহণ, কোটির মধ্যে একজনকে গ্রহণ করিতে হয় কিনা সন্দেহ; কিন্তু তাহার কত বিধি, বিধান, বিচার দেখুন দেখি—আর বিধবার বিবাহ হইলে, কোন পক্ষের সন্তান কিরূপ ভাগে কোন স্বামীর বিষয় পাইবে, তাহার কোন কথা নাই কেন? এইরূপ মন্ত্র নাই, বিধি ব্যবস্থা নাই এ কথা ভৃগু সংহিতায় ধরা হইয়াছে; কিন্তু বুঝালে বুঝিবে না—তাহার আর উপায় কি?

লেখক লিখিয়াছেন "এ দেশে মুসলমান সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে।" আমরা বলি সর্ব্ব শ্রেণী মধ্যে নহে। সৈয়দ গোষ্ঠি মধ্যে একেবারে নাই।

লেখক এই বিষয়ে শাস্ত্র জানিবার জন্য সকলকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বিধবা বিবাহ' বিষয়ক পুস্তক পাঠ করিতে বলিয়াছেন। আমরা নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে নিবেদন করি, যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তক পড়িবেন, তাঁহারা সে সঙ্গে আর দুইখানি পুস্তক পড়েন।

১। ভূতপূর্ব্ব সব্‌জজ এখন স্বর্গগত নন্দকুমারচন্দ্র ভট্ট বিরচিত 'বিধবা বিবাহ' বিষয়ক প্রবন্ধ সকলের সমালোচনা। গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম নাই। ১২৭৪ সালে মুদ্রিত।

২। 'বিধবা বিবাহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ' শ্রীপ্রসন্ন কুমার শর্ম্ম প্রণীত। ১২৭৪ সালে মুদ্রিত।

প্রসন্নকুমার শর্ম্ম—প্রসন্নকুমার দানীয়েল। তৎকালের District Engineer ময়মনসিং।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

কদমতলা, চুঁচুড়া।

এলি কি গো—জগদম্বে! জগতে আবার?

ভুলাতে অতীত কথা— দুর্নিবার মনোব্যথা,
মুছাইতে নয়নের চির অশ্রুধার,—
এলি কিগো! জগদম্বে! জগতে আবার?
কিন্তু একি দেখি বেশ? লুটায় চাঁচর কেশ,
মহামেঘ প্রভা-বর্ণ কেন মা তোমার?
কোথা' সে সুবর্ণ কান্তি—শোভার আধার?

করে খড়্গ তীক্ষ্ণ ধার— কেন কেন মা তোমার?
ভীম আস্য, লোল জিহ্বা, আসব আবেশে!
শ্যাম-অঙ্গ রুধিরের স্রোতে যায় ভেসে!
নর মুণ্ড মালা গলে, পদ ভরে ধরা টলে,
ছিন্ন-কর-কাঞ্চী—হায় শোভে ক'টী দেশে!
কেন এলি ক্ষেমঙ্করি! ভয়ঙ্করী বেশে?

এই তো সে'দিন গেলি, কেন পুনঃ ফিরে এলি?
দেখিতে সন্তান ধ্বংস, চ'খের-সম্মুখে—
ছিছিছি—পাষাণ সুতে! এলি কোন্ মুখে?
সপ্ত কোটী শব দেহ, জাগিবেনা আর কেহ,
শুনিয়া "মা ভৈঃ" রব, মাগো তোর মুখে;
কে পূজিবে তোরে? শক্তি আছে কার বুকে?

অর্থশূন্য মন্ত্র পাঠে, মৃন্ময় মূর্ত্তির ঠাটে,
তণ্ডুল কদলী চিনি, দিয়ে উপহার,
যশঃ, পুণ্য, ধন-আশা পূর্ণ হ'ল কার?

হা নিষ্ঠুর—হা পাষাণি! পূজিয়া ও পা'দু'খানি,
কোন্ জড় দেহে হ'ল জীবন সঞ্চার?
কারে দিলি মহা সিদ্ধি, শক্তি সাধনার?

এই তো সে' বসুন্ধরা— তেমনি দারিদ্র্য ভরা,
ফল শূন্য তরু-লতা, মেঘে নাহি জল!
তোরে পূজে, কোন্ আশা পূর্ণ হ'ল বল?
কোথা' সে মায়ের স্নেহ, অনন্ত অপরিমেয়,
কোথা' সান্ত্বনার বাণী করুণা তরল?
পারিলে কি মুছা'তে, মা! নয়নের জল?

হা—পাষাণি! চ'ক্ষু খেয়ে, একবার দেখ্ চেয়ে—
শ্মশান হ'য়েছে তোর সোনার সংসার!
লক্ষ্মী—কেঁদে ছেড়ে গেছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার!
চেয়ে শুধু ঊর্দ্ধ মুখে— তুষানল ধরি' বুকে,
স্তম্ভিত পরাণে, সহি' শত-অত্যাচার,
কোটী কণ্ঠে নর নারী করে হাহাকার!!

ছাড়িয়া সাধের "চাষ"— কৃষক সেজেছে "দাস"
কামার, কুমার, তাঁতি, শিরে হানে কর।
ঘরে ঘরে—ব্যথিতের মর্ম্মভেদী স্বর!
এক মুষ্টি ভিক্ষা-তরে, দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরে,
কত ছিছি—কত গালি—কত অনাদর—
কত পদাঘাত—হায়—বুকের উপর!

দারুণ দুর্ভিক্ষ আসি'— ধরণী ফেলেছে গ্রাসি'—
হিংসা—দ্বেষ—ব্যভিচার—রমণী হরণ,
নিত্য নিত্য নরহত্যা—অকাল মরণ,

গৃহ দাহ—মহামারী— প্রবঞ্চনা দাগাদারী,
ম্লেচ্ছ আসি' শিক্ষা দেয়, হিন্দু-আচরণ!
দেখ্ তোর সন্তানের—কি অধঃপতন!

মা তোর সন্তান যা'রা, সবাই পৌরুষ-হারা
কখনো পতন হয় কখনো উত্থান,
জানি, চির প্রকৃতির এই তো বিধান!
এদের কি একই ভাবে— চির দিন কেটে যাবে?
এমনি নীরব মুখে ত্যজিবে কি প্রাণ—
অন্নের অভাবে, অন্ন-পূর্ণার সন্তান?

"রাজ রাজেশ্বরী" বেশে— এসে, দরিদ্রের দেশে—
মোদের দুর্দ্দশা—দেখে গেছ' একবার!
বঙ্গে—চির-অমাবস্যা—চির অন্ধকার—
শ্মশান এ বঙ্গ ভূমি— তাই কি জননি! তুমি—
"শ্মশান বাসিনী" রূপে, এসেছ' এবার?
দাও—তবে "মহাসিদ্ধি" শক্তি সাধনার॥

চুঁচুড়া, শ্রীব্রজবল্লভ রায়, কাব্যকণ্ঠবিশারদ।

সিংভূমে তসরের চাষ।

(২)

তসর বীজ। গৃহজাত গুটির দিন দিন অবনতির কারণ।

এইবার তসর বীজের কথা বলা হইতেছে। বন হইতে তসর গুটি আনয়ন করিয়া বীজরূপে ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু বনের বৃহৎ ও শক্ত গুটি কাটিয়া প্রজাপতি বাহির হইতে অধিক সময় লাগে; এবং কতদিনে প্রজাপতি বাহির হইবে, তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। সেই জন্য লোকেরা

গৃহজাত ছোট ও পাতলা গুটি বীজের জন্য ব্যবহার করে। কিন্তু এইরূপ দুর্ব্বল গুটি বীজের জন্য ব্যবহার করার দরুণ, দিন দিন তসর গুটির অবনতি হইতেছে। অবনতির আরও অন্যান্য কারণ আছে। বনের মধ্যে এত অধিক গুটি একগাছে দেখিতে পাওয়া যায় না; তাহারা তথায় ইচ্ছামত গমনাগমন এবং মনোমত খাদ্য আহার করে। বনে গাছের কেবল মাত্র ঊর্দ্ধদেশে গুটি দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু মানুষে তাহাদিগের স্বাভাবিক শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, তাহাদিগকে গাছের ৫। ৬ ফিট মাত্র উপরে লাগাইয়া দেয়। আবার এক গাছের পাতা খাইয়া ফেলিলে, তাহাদিগকে অন্য গাছে লাগাইয়া দেওয়া হয়। তাহারা বনে যেরূপ এক গাছ হইতে নামিয়া অপর গাছের উপর উঠে, সেরূপ মনুষ্যের তত্ত্বাবধানে করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সম্পূর্ণরূপে পরিচালনা হয় না। এইরূপে নানা কারণে গৃহজাত গুটির দিন দিন অবনতি হইতেছে। ২।৩ বৎসর অন্তর বন হইতে উত্তম বীজ আনয়ন করিয়া ব্যবহার করিলে, গৃহজাত গুটির দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা কম। সুতরাং বন হইতে ভাল গুটি আনিয়া বীজরূপে ব্যবহার করিতে পারিলেই উত্তম।

গুটি পোকা উৎপাদন ও পালন করিবার বিশিষ্ট পন্থা।

বন হইতে গুটি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া গৃহে রাখা হয়। এই সকল গুটি হইতে শীঘ্র শীঘ্র গুটি প্রজাপতি বাহির করিবার জন্য ৺ নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। গুটির মুখ কাটিয়া তাহার ভিতর হইতে যোগাবস্থা প্রাপ্ত কীটকে বাহির করা হয়। পরে সেই কীটকে ভিজা করাতের গুঁড়ার মধ্যে, কিম্বা ছাইএর ভিতরে রাখিয়া দিলে, শীঘ্রই প্রজাপতি বাহির হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল কাটা গুটির বাজারে কোন দাম নাই। তবে নিজেরা সেই কাটা গুটি হইতে সূতা তুলিতে পারিলে ভাল।

প্রায় বৈকালে ৩। ৪ টার সময় গুটি কাটিতে আরম্ভ করিয়া, ৮। ৯ রাত্রিতে গুটির ভিতর হইতে প্রজাপতি বাহির হয়। পুং প্রজাপতি হইলে, তাহার কোন যত্ন না লইয়া, ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আর স্ত্রী প্রজাপতিগুলিকে, অতি সন্তর্পণে পাতার উপর বসাইয়া, গৃহের সন্নিকটে কোন গাছের

পাতার সহিত আটকাইয়া দেওয়া হয়। গাছে না লাগাইয়া কখনও বা গৃহের দাওয়ার চালের ধারে তাহাদিগকে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। তবে সে রাত্রে দাওয়াতে যাহাতে কোনরূপ আলোক প্রবেশ না করে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। এই সময়ে স্ত্রী প্রজাপতিকে অধিক নাড়াচাড়া করিলে সে অপরিপক্ক ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাদুড়ে প্রজাপতি খাইতে বড় ভালবাসে, তাহারা এই সময়ে অতিশয় উৎপাত করিয়া থাকে, সেই জন্য গৃহের নিকটে কোন গাছে কিম্বা দাওয়ায় তাহাদিগকে ঝুলাইয়া রাখিয়া, সমস্ত রাত্রি বাদুরের হাত হইতে রক্ষা করিতে হয়। বাদুড়ের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিলে, প্রাতে দেখা যায়, যে সেই সকল স্ত্রীপ্রজাপতি পুরুষ প্রজাপতির সহিত সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। যে সকল পুরুষ প্রজাপতিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই সকল প্রজাপতি কিম্বা নিকটে বন থাকিলে সেই স্থানের তসর গুটি হইতে অন্য পুং প্রজাপতি, মধ্য রাত্রিতে আসিয়া স্ত্রীগণের সহিত সংযুক্ত হয়। প্রজাপতির জোর না ভাঙ্গিয়া সেই অবস্থায় পাতা সমেত তাহাদিগকে গৃহে আনয়ন করা হয়। বৈকালে চারিটার মধ্যেও পুরুষ প্রজাপতি স্ত্রীকে স্ব ইচ্ছায় ছাড়িয়া না গেলে, আঙ্গুলের দ্বারা টোকা মারিয়া তাহাদিগের জোড় ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। পুং প্রজাপতিগুলিকে গৃহপালিত পক্ষীদিগকে খাইতে দেওয়া যায় নতুবা তাহাদিগকে দূরে ফেলিয়া দেওয়া হয়। স্ত্রীপ্রজাপতিকে পাতার উপর রাখিয়া বাঁশের কিম্বা পাতার টুকরির মধ্যে রাখা হয়। জোড় ভাঙ্গিয়া দিবা মাত্র উহারা ডিম্ব প্রসব করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে তিন দিন ক্রমাগত তাহারা ডিম পাড়ে। তিন দিনে একটা প্রজাপতি ১০০ হইতে ২০০ পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে। ভিন্ন ভিন্ন প্রজাপতি একদিনে যে সকল ডিম পাড়িয়াছে, সেইগুলি পৃথক করিয়া রাখা হয়। ডিমগুলির গায়ে আটার মত একটা চট্‌চটে পদার্থ লাগিয়া থাকে। অতি সন্তর্পণে ছায়ের উপর ঘসিয়া ডিম্ব পরিষ্কার করা হয়। পরে পাতার দোনার মত একটী খোল তৈয়ার করিয়া ৯০ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত ডিম এক একটী দোনায় ভরিয়া গৃহে রাখিয়া দেয়। ৯ কিম্বা ১০ দিনে এই ডিম্ব ফুটিয়া কীট বাহির হয়। তখন দোনার উপরে বৃষ্টি নিবারণের জন্য পাতার আচ্ছাদন দিয়া গাছের পাতার সহিত

কাটি দিয়া দোনা আটকাইয়া দেয়। আবহাওয়া জনিত কোনরূপ দুর্ঘটনা না ঘটিলে ১০০টী ডিম হইতে প্রায় ৪০। ৫০টী কীট বাহির হয়। প্রত্যেক গাছে ৫। ৬টী করিয়া দোনা লাগাইয়া দেওয়া উচিত। যাহাতে গাছের চতুর্দ্দিকে কীট বেশ চারাইয়া পড়িতে পারে, এইরূপ ভাবে গাছের ভিন্ন ভিন্ন দিকে দোনা ঝুলাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ৭। ৮ দিনের মধ্যে ডিম্ব ফুটিয়া কীট বাহির হইলে, সেই সকল কীটের অধিকাংশই কীটাবস্থায় মরিয়া যায়।

কীটাবস্থা প্রাপ্ত হইবার পর ৫ হইতে ৯ দিনের মধ্যে ইহারা প্রথম বার গাত্রের ত্বক ত্যাগ করে। প্রথম খোলস্ ছাড়িবার পর একদিন ইহারা কিছুই আহার করে না। প্রথম খোলস্ ছাড়িবার পরে ১২ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় বার খোলস্ পরিত্যাগ করে। তাহার পর ইহারা দুই দিন অনাহারে থাকে। তৃতীয় বার খোলস্ ছাড়ার সময় ইহার ১০। ১২ দিন পরে। এই সময়ে ইহারা তিনদিন কোনরূপ আহার্য্য গ্রহণ করে না। চতুর্থ অথবা সর্ব্বশেষ ত্বকত্যাগ, ইহার ১০ দিন পরে, অর্থাৎ কীটাবস্থা প্রাপ্ত হইবার ৫। ৬ সপ্তাহের মধ্যে সংঘটিত হয়। ত্বক পরিত্যাগ করিয়া ইহারা চারিদিন অনাহারে কালযাপন করে, এবং সেই হেতু অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সেই সময়ে স্বাভাবিক ঋতুর কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইলে অর্থাৎ অস্বাভাবিক রৌদ্র, বৃষ্টি, কিম্বা ঝড় হইলে, তাহারা অকালে মারা পড়ে। ইহারা নিজেদের পরিত্যক্ত খোলস্ ভক্ষণ করে। খোলস্ আহার করিবার পর কীটগণের গাত্র হইতে কেমন একটা দুর্গন্ধ বাহির হয়, এবং সেই গন্ধ পাইয়া পিপীলিকাকুল গাছে উঠিয়া ইহাদিগের অনিষ্ট সাধন করে। এক গাছের সমস্ত পাতা খাইয়া ফেলিলে, ইহাদিগকে অন্য গাছে স্থানান্তরিত করা হয়। চতুর্থ বার খোলস্ ছাড়িয়া উপবাসের পারণের পর, পুনরায় হৃষ্টপুষ্ট হইয়া ইহারা মুখ হইতে লালা বাহির করিতে করিতে নিজেদের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গুটি তৈয়ার করিতে আরম্ভ করে; এবং ক্রমে স্বকৃত গুটির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ হয়। গুটি তৈয়ার হওয়া মাত্র প্রথম দুই তিন দিন গুটি অল্প গরম থাকে; এবং এই দুই তিন দিন, গুটির ভিতরে, পোকা কীটাবস্থায় অবস্থান করে। তবে তখন ইহাদিগের গা থাকে না; সেগুলি কোথায় অদৃশ্য হইয়া পড়ে। ২। ৩ দিন পরেই গুটি

শক্ত হয় এবং পোকাও কীটাবস্থা হইতে গুটির ভিতরে যোগাবস্থায় পরিণত হয়। গুটি বেশ শক্ত হইলে এবং কীট যোগাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে বুঝিলে, গুটি গুলি ছোট ছোট ডাল শুদ্ধ ভাঙ্গিয়া গৃহে আনা হয়। কোন কোন শ্রেণীর গুটি হইতে আবার প্রজাপতি বাহির হয়। এইরূপে এক এক শ্রেণীর গুটি হইতে বৎসরের মধ্যে দুই তিনটী "ফসল" পাওয়া যাইতে পারে। আবার কোন কোন গুটি একবার মাত্র ফুটিয়া বাহির হয়, পুনরায় যোগাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া গুটির মধ্যে মরিয়া যায়।

সূতা তুলিবার জন্য সজীব গুটি কিরূপ ভাবে মারিয়া ফেলা হয়।

এই সকল সজীব গুটিগুলি ইচ্ছা করিলে, শীঘ্রই হাটে বীজরূপে বিক্রয় করিতে পারা যায়। নতুবা ঐ সকল গুটি হইতে অন্য ফসল পাইবার প্রত্যাশা না করিলে, গরম বাষ্পের ভাবরায় গুটি গুলিকে মারিয়া ফেলা হয়। একটী কলসীর মধ্যে গুটিগুলি রাখিয়া কলসীর মুখের ভিতর দিয়া কয়েকখানি বাঁখারী প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়, যেন গুটি পূর্ণ কলস উপুড় করিয়া দিলেও গুটিগুলি পড়িয়া না যায়। অগ্নির উপর অপর একটি কলসে জল ফুটান হয়; এবং এই কলসের মুখের উপরে গুটিপূর্ণ কলসটী উল্টাইয়া বসাইয়া দেওয়া হয়; ক্রমাগত আধ ঘণ্টা জল ফুটাইলে, জল হইতে গরম বাষ্প উপরের কলস মধ্যস্থিত গুটিতে গিয়া লাগিলে, গুটি গুলি মরিয়া যায়। পরে সেগুলিকে রৌদ্রে উত্তপ্ত করিয়া লইয়া, সূতা তুলিবার নিমিত্ত রাখিয়া দেওয়া নিয়ম।

সূতা তুলিবার জন্য গুটি সিদ্ধ করা।

গুটি হইতে সূতা তুলিবার জন্য, ছাই ও সাজিমাটীর সহিত মিশ্রিত জলে গুটি গুলিকে প্রথমে সিদ্ধ করিতে হয়। ৫০০ গুটি জলে ফুটাইবার নিমিত্ত, আধ সের ছাই, ও আধ ছটাক সাজিমাটী ব্যবহার করা হয়। আধ ঘণ্টা কাল, এইরূপ ক্ষারের জলে গুটিগুলি সিদ্ধ করিয়া, পরে পরিষ্কার জলে সেই গুলিকে ধুইয়া ফেলা উচিত। তৎপরে গুটিগুলিকে রৌদ্রে শুকাইতে না দিয়া, শুক্‌না ছাইএর উপর কাপড় পাতিয়া সেই কাপড়ের উপর গুটিগুলিকে রাখা হয়, এবং আর একখানি কাপড়ে শুক্‌না ছাই লইয়া তাহাদিগের উপরে চাপা দেওয়া হয়। এইরূপ করিলে গুটির গাত্র

হইতে প্রায় সমস্ত জল ছাইএ টানিয়া লয়; এবং গুটিগুলি মাঝারি রকম শুষ্ক হয়। গুটি বিশেষ শক্ত হইলে, অর্দ্ধঘণ্টায় সকল গুটী বেশ সুসিদ্ধ হয় না; তখন সেইগুলিকে বাছিয়া, আবার পরদিন, অন্য গুটীরসহিত সিদ্ধ করা উচিত। বিশেষ, কঠিন গুটীর জন্য, ক্ষারও অধিক পরিমাণে আবশ্যক হয়। এ দেশের লোকেরা ছাইএর জলে গুটি সিদ্ধ করে বটে, কিন্তু ক্যালিকো (calico)৲ কাপড়ের ভিতর দিয়া ক্রমাগত ছাইগুলি ছাঁকিলে, জল যখন তৈলাক্ত হয়, তখন সেই জলে গুটি সিদ্ধ করা উচিত। ছাইএর জলে গুটি সিদ্ধ করিলে রেশম বেশ সাদা ও পরিষ্কার হয়; কিন্তু অধিক মাত্রায় সাজিমাটী ব্যবহৃত হইলে রেশম কম জোর হয়, এবং তাহার বর্ণ বিকৃত হইয়া যায়।

সূতা তুলিবার নিয়ম।

অর্দ্ধ শুষ্কাবস্থায় গুটি হইতে সূতা তুলিতে হয়। একেবারে শুষ্ক হইয়া যাইতেছে বুঝিতে পারিলে, মাঝে মাঝে, তাহাদিগের উপর জলের ছিটা দেওয়া কর্ত্তব্য। বাম হাতে করিয়া ৪।৫ টী গুটি হইতে একেবারে সূতা তুলিতে আরম্ভ করে, এবং দক্ষিণ হস্তে নাটাই লইয়া সঙ্গে সঙ্গে সেই সূতা নাটাইতে জড়াইতে থাকে। সূতা যখন নাটাইএ জড়াইতে থাকে, তখন সেই ৪।৫ গাছি থাই একত্রে পাকাইয়া যায়। এই প্রকারে সূতা তুলিলে, এক ব্যক্তি দিনের মধ্যে ৫০টী হইতে ১০০টী পর্য্যন্ত গুটির সূতা উঠাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ দেশে যাহারা গুটির চাষ করিয়া থাকে, তাহারা প্রায়ই সূতা তুলিতে জানে না। তাঁতির ঘরের স্ত্রীলোকেরাই এখানে সচরাচর গুটি হইতে সূতা তুলিয়া থাকে। গুটির প্রকার ভেদে, এক কাহন গুটিতে তিন পোয়া হইতে আরম্ভ করিয়া দুই সের পর্য্যন্ত তসর পাওয়া যায়। সেইরূপ, গুটির প্রকার ভেদে, এক কাহন গুটির দাম ২৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

গুটি পোকার শত্রু ও সেই সকলের নিবারণের উপায়।

ঋতুর স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন গুটি পোকার বিষম শত্রু। অধিক শীতে ইহারা মারা যায়; ঝড় ঝাপটা লাগিলে, ইহারা গাছ হইতে পড়িয়া যায়; দুই তিন দিন ক্রমাগত বৃষ্টি হইলে, গাছের পাতা ভিজিয়া থাকে, তখন

তাহারা কিছুই আহার না করিয়া ক্ষুধায় মারা যায়। আবার কতকগুলি উপবাসী থাকিয়া এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, যে তাহারা সময়ে গাত্রের ত্বক পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুতরাং আবহাওয়ায় একটু বৈষম্য লক্ষিত হইলেই ইহাদিগের মরণ। এই সকল দৈবদুর্ব্বিপাক হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার উপায় নাই। দৈব বিপর্য্যয় ভিন্ন ইহাদের আরও নানাবিধ শত্রু আছে;—কাঠবিড়ালী, গিরগিটী, পক্ষী, পিপীলিকা, বোল্‌তা, কেন্নাই, "চাঁয়া" নামে এক প্রকার পতঙ্গ, "চাবুন্‌ [illegible]য়া" বলিয়া গোবরে পোকার ন্যায় এক প্রকার মারাত্মক কীট, বিছা, প্রভৃতি বহু জীব ইহাদিগের পরম শত্রু। গাছে কীটপূর্ণ দোনা আঁটিয়া দিবার পূর্ব্বে, গাছের প্রত্যেক পাতা ও ডাল পোকামাকড় শূন্য করিয়া ঝাড়িয়া দিতে হয়, এবং পরে পিপীলিকা প্রভৃতির নিকট হইতে ইহাদিগকে ত্রাণ করিবার নিমিত্ত, গাছের গুঁড়ির চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া স্থানে স্থানে আল্‌কাতরা মাখাইয়া দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া, দোনার চারিদিকে ও যে পাতায় দোনা আটকাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার চতুর্পার্শ্বে ভেলার তেল মাখাইয়া পিপ্‌ড়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা হয়। আর অন্যান্য শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য, উপরিভাগে আঠা লাগান, মাছ ধরা ছিপের ন্যায় দীর্ঘ সরু যষ্টি লইয়া সদা সর্ব্বদা প্রহরি নিযুক্ত থাকে। তসর ক্ষেত্রের নিকটে কোনরূপ পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপে দিন রাত্রি রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া গুটি পোকাকে জীবিত রাখিতে হয়।

তসর গুটির রোগ।

তসর গুটি নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটী রোগের উল্লেখ করিতেছি;—

১। অনেক দিন অনাবৃষ্টির পর হঠাৎ বৃষ্টিপাত হইলে, গাছের পাতা ভিজিয়া নরম হয়। অনাবৃষ্টির সময় কীটেরা যে পাতা খাইতে অভ্যস্ত ছিল, বৃষ্টির পর হঠাৎ নরম রসাল পাতা খাইতে আরম্ভ করিলে ইহাদের পেটের অসুখ করে। তখন ইহারা আহার পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষের ডালে ডালে অস্থির ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। সেই সময় ইহাদের

মুখ ও মলদ্বার দিয়া এক প্রকার জলীয় পদার্থ নির্গত হয়। এই রোগের ইংরাজী নাম Grasserie। ইহাকে বাঙ্গালায় "রসা" ও এই স্থানে "হাজিরে" বলে। ইহা অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাধি। এই ব্যাধি এক কালে প্রায় সকল কীটকেই আক্রমণ করিয়া মারিয়া ফেলে।

২। পৌষ মাঘ মাসে অত্যন্ত শীত পড়িলে কীটগণের মধ্যে একরূপ ব্যাধির আবির্ভাব হয়। এই রোগে গুটি পোকা তূলার ন্যায় সাদা হইয়া যায়, এবং কুঞ্চিত হইয়া গাছ হইতে পড়িয়া গিয়া মারা পড়ে। কীটগণ তূলার ন্যায় শ্বেতবর্ণ ধারণ করে বলিয়া, এই ব্যাধিকে "কাপ্‌সি" অথবা তূলা রোগ বলে।

৩। বর্ষাকালে, আহার্য্য সামগ্রী গলার নিম্নে আটকাইয়া গিয়া, কীটেরা এক প্রকার রোগে আক্রান্ত হয়। এই রোগে আক্রান্ত হইলে সম্মুখের পা ডালে আটকাইয়া, শরীরের নিম্নাংশ গাছ হইতে ঝুলাইয়া দেয়। পরে গলার মধ্যস্থিত খাদ্য পচিতে আরম্ভ করিলে, কীটগণ কালী বর্ণ হইয়া পচিয়া মারা যায়। ইংরাজীতে এই ব্যাধিকে Flacherie বলে। বোধহয় এইরূপ রোগকেই বাঙ্গালায় "কালশিরা" বলে।

৪। কীট দুর্ব্বল হইলে, খোলস্ ছাড়িতে না পারিয়া, শরীরের মাঝখানে খোলস্ আটকাইয়া গিয়া, অনেক সময় মারা যায়। এই দেশের লোকেরা এই রোগকে "বোরকি" বলে।

কেবল মাত্র দুই চারিটী প্রধান ব্যাধির উল্লেখ করিলাম। এই সকল রোগ ভিন্ন কীটগণের মধ্যে সময়ে সময়ে নানা প্রকার আনুবীক্ষণিক উদ্ভিদ্ (Fungoid) রোগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধে সেই সকল রোগের আলোচনা করিবার সময় নাই। অনাবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টির সময়েই কীটগণের মধ্যে নানা রোগ দেখা যায়, এবং দুই একটি রোগ ভিন্ন অধিকাংশই সংক্রামক রোগে পরিণত হয়। এই সময়ে যে কোন প্রকার রোগ হইতে গুটিপোকার মৃত্যু হউক না কেন, মৃত পোকাগুলিকে যেখানে সেখানে ফেলিয়া পচিতে না দিয়া, এক স্থানে জড় করিয়া মাটীর নীচে পুঁতিয়া কিম্বা পোড়াইয়া ফেলা উচিত। এইরূপ করিলে রোগের সংক্রমণ অনেকাংশে হ্রাস হয়।

বিভিন্ন প্রকার তসর গুটি।

সিংভূমে নানা প্রকার তসর গুটি জন্মিয়া থাকে; তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েক প্রকারের নাম করিতেছি।

১। মুগা;—এই জাতীয় গুটি পোকা বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে গুটি কাটিলে, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে পুনরায় গুটি তৈয়ার করে; অথবা বর্ষার সময় গুটি কাটিলে, শীতের সময় অগ্রহায়ণ মাসে পুনরায় গুটি প্রস্তুত করে। মুগা গুটি বনে জন্মায়। বন হইতে মুগার বীজ আনিয়া চাষ করিলে, সেই বীজ হইতে বর্ষা কালে অথবা শীত কালে যে গুটি পাওয়া যায়, তাহাকে (ক) "জাটা ডাবা" বলে। এই জাটাডাবা হইতে পরে যে ফসল উৎপন্ন হয়, তাহাকে (খ) "আসল ডাবা" বলে। বন হইতে প্রতি বৎসর মুগা বীজ আনয়ন না করিয়া চাষিরা গৃহজাত "ডাবা" বহু দিবস যাবৎ বীজরূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে; সেই জন্য "ডাবা"র দিন দিন অবনতি হইতেছে। আবার গৃহজাত "ডাবা"কে বনের মুগা বলিয়া খরিদদার দিগকে ঠকাইয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করে। কিন্তু কয়েকটী লক্ষণের দ্বারা গৃহজাত গুটিকে অনায়াসে চিনিতে পারা যায়;—(১)গৃহজাত গুটির ডাটার বং বনের গুটি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ফিকে, এবং আকারে বড় ও সরু (২) বুনো গুটি অপেক্ষা গৃহের গুটি অল্প মোলায়েম ও পাতলা এবং গুটির বর্ণও একটু ফিকে। সকল প্রকারের গুটি অপেক্ষা মুগা হইতে অধিক পরিমাণে রেশম পাওয়া যায়। মুগা ও দাবা গুটি আকারেও বৃহৎ।

এই মুগা হইতে আবার অনেক সময়ে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে প্রজাপতি বাহির হয়, এবং প্রায় চারিমাস পরে মাঘ মাসের শেষে আবার গুটি পাওয়া যায়। এই গুটিকে (গ) "বুগুই" বলে। বুগুই গুটিগুলি বেশ মসৃণ ও আকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। অধিক পরিমাণে রেশম না পাইলেও, সর্ব্বোৎকৃষ্ট রেশম এই বুগুই ফসল হইতেই পাওয়া যায়। আবার, কখন কখন প্রায় এক বৎসর পরে শ্রাবণ ভাদ্র মাসে, মুগা হইতে পুনরায় গুটি পাওয়া যায়। এই গুটিকে (ঘ) 'মুদা' কহে। 'মুদা' ও অনেক সময়ে বীজের জন্য ব্যবহৃত হয়। এখন দেখা যাইতেছে যে, বন হইতে আনিত এই মুগা গুটিতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের গুটি পাওয়া যায়।

২। লাড়িয়া ;—এই গুটির জন্মও অরণ্য মধ্যে। বর্ষার প্রারম্ভে এই গুটি বন হইতে সংগ্রহ করা হয়। ভাদ্রের গোড়ায় গুটি কাটিয়া প্রজাপতি বাহির হয়, এবং সেই প্রজাপতির শাবকগণ পুনরায় কার্ত্তিক মাসে গুটি প্রস্তত করে। লাড়িয়া হইতে বৎসরে একটী মাত্র ফসল পাওয়া যায়। ৺ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে লাড়িয়া হইতে বৎসরে তিনটী ফসল পাওয়া যায়। কিন্তু এদেশের অভিজ্ঞ তসর চাষীর নিকট অবগত হইলাম যে লাড়িয়া হইতে একটীর অধিক কখনও ফসল পাওয়া যায় না।

কেবল কয়েকটী মাত্র গুটির উল্লেখ করা হইল। এই সকল গুটি ভিন্ন ধূলিয়া, আমপাতিয়া, ঝাড়ুই, মোরাং, প্রভৃতি নানা রকমের গুটি চাঁইবাসার হাটে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

মেখলা।

[গল্প]

(১)

মেখলা—সুন্দরী, নব-যুবতী, সকলেই বলে তাহার ন্যায় সর্ব্বসৌষ্ঠবসম্পন্না সুন্দরী আর দেখা যায় না।

মেখলার এখনও বিবাহ হয় নাই, তাহার সমান ঘর জুটে নাই—যেখানে ঘর জুটিয়াছে সেখানে পাত্র ভাল হয় নাই, তাহাতেও বিবাহ বন্ধ থাকিবে কিনা সন্দেহ; মেখলার খুল্লতাত অরবিন্দের মত—যেমন কন্যা তেমনি পাত্র না পাইলে কিছুতেই তাহার বিবাহ দিবেন না।

মেখলা বিদুষী—বিবাহের জন্য বড় কাতরা নহে, তবে পাড়ার দশ জন দশ কথা বলিতে ছাড়িবে কেন—অবশ্য মন্দ প্রকৃতিরাই এই বিষয়টা লইয়া অধিক 'জটলা' রটলা করিয়া থাকে; মেখলা আপন মনে হাসে আর ভাবে—ভগবান কি ইহাদিগকে সুমতি দিতে পারেন না?

মেখলা আর ঘরের বাহির হয় না, কোন কোন দিন জননী বা অপর কোন সঙ্গিনীর সহিত নদীতে স্নানার্থ গমন করে, আর প্রকৃতির শোভা দেখিয়া কখন কখন স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, অপরে ভাবে মেয়েটা বিয়ের জন্যই অমন করে।

এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

(২)

আর বিবাহ না দিলে নয়—সমান ঘরে যা হ'ক একটা পাত্র জুটিল। মেখলার পিতা নাই, জননী কিরণমালা অরবিন্দের কোন আপত্তি শুনিল না—অরবিন্দের সরল হৃদয়ে একটু আঘাত লাগিল—বিবাহের দিন স্থির হইল—তবে এখনও এক মাস না গেলে নয়, তাহাতে ক্ষতি কি?

মেখলার মুখে কোন কথা নাই, মনের মধ্যে কিন্তু বড় গোলমাল—লেখা পড়া আর ভাল লাগে না—খুল্লতাত অরবিন্দও ভাল করিয়া কথা কয় না—উপায় কি?

ইচ্ছা-শক্তির অবাধ গতি, মেখলা এবার আপন মনে একটা সঙ্কল্প স্থির করিল—তবে সে আশা পূর্ণ হইবে কিনা ইহাও ভাবনা। যাহাই হউক আশা পরিত্যাগ করিল না—মনটা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা ভাল।

(৩)

গুণাকর বড় সুপুরুষ—পূর্ণযৌবনসম্পন্ন—গুণবান—বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু উদাসীন প্রায়, তাহার উপর গৃহে শান্তি নাই—যতক্ষণ বাটী ছাড়িয়া অন্যত্র থাকেন ততক্ষণই শান্তি। অন্ধকারাচ্ছন্ন নদীতট অথবা জ্যোৎস্না প্লাবিত—কুসুম-কানন বা বনস্থলী হৃদয়ে কি যেন তৃপ্তি-সুধা বর্ষণ করে; কিন্তু তাহাতেও বাধা, নানা লোকে নানা কথা কয়, কেহ কেহ বিবিধ উপায়ে তাহাতে বাধা দেয়—কুটুম্বের দেশ সুতরাং কতকটা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

একদিন সন্ধ্যার পর গুণাকর হৃদয়-ভার লাঘবের আশায় আপন মনে নদীতটে বসিয়া অনুচ্চ স্বরে গাহিতে লাগিলেন :—

কেন শিবে অশিবে না নাশিবে;
কে আর তবে এ ভবে আসিবে।

আছিলাম সুখে আপন আবাসে,
কেন বা আনিলে এ ঘোর প্রবাসে,
এখন বদ্ধমায়াপাশে, মরিগো হুতাশে—
হতাশে— অবশে—ক্রমে অলসে গ্রাসিবে ;
আমি নিশিদিন তাই ভেবে সারা,
ভাবি শুধু কোথা ইচ্ছাময়ী তারা,
তুমি ভবদারা, মুছাও অশ্রুধারা
দাও হৃদে বল যাহে শমনে নাশিবে ;
ওগো, তোমারি ইচ্ছায় আসিলাম ভবে,
সঙ্কটে শঙ্করী দেখা কেন নাহি তবে,
এখন সংসার-সংগ্রামে, তোমারি ঐ নামে
যদি যায় প্রাণ, কে তবে তোরে ডাকিবে ॥

সহসা হৃদয়ে—কাহার ছবি ফুটিয়া উঠিল, গান থামিল—ধীরে ধীরে নিশীথে নদীতটে তাহার পার্শ্বে আসিয়া মেখলা কোমল-মধুর স্বরে ডাকিল—'গুণাকর'।

উভয়েই উভয়ের পরিচিত, গ্রাম-সম্বন্ধে।

(৪)

গুণাকর বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন,—এত রাত্রে মেখলা একাকিনী এখানে !

গুণাকরের পার্শ্বে বসিয়া মেখলা বলিল—তুমি এখানে ? গুণাকর গম্ভীর ভাবে বলিলেন—আমি নিত্যই আসি। মেখলা হাসিয়া বলিল—আমিও নিত্যই আসিব।

গুণাকর অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন—কারণ ?

মেখলা অম্লান বদনে বলিল—আমি তোমাকে ভালবাসি। গুণাকর প্রথমে ভাবিয়াছিলেন হয় ত তাঁহাকে কোনরূপ বিপদে ফেলিবার জন্যই কাহার এইরূপ চক্র কিন্তু মেখলার সরলতায়—তাঁহার হৃদয় অন্য ভাবে পরিপূর্ণ হইল এবং ধীরে ধীরে বলিলেন—আমার ভাগ্যে এ কথাটা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, যে ভালবাসিবার সে ত কই ভালবাসে না।

মেখলা এবার মুখ একটু নত করিয়া বলিল—সেই জন্যই আমি তোমাকে ভালবাসিব স্থির করিয়াছি। গুণাকর মেখলার বদন মণ্ডলে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—আপত্তি নাই—কিন্তু আমাকে ভালবাসিয়া তোমার সুখ কি ?

মেখলা মুখ তুলিল, নয়নে নয়ন মিলিল—হৃদয়-বল দ্বিগুণ হইল, গম্ভীর স্বরে বলিল—সে ভাবনা আমার, তোমার ত নয়। তোমাকে যাহা দিতেছি, তুমি তাহা লইবে কিনা ?

গুণাকর মেখলার স্বেচ্ছাপ্রসারিত কোমল কর-পল্লব আপনার করে লইয়া দৃঢ় স্বরে বলিলেন—জীবনে মরণে এই বন্ধন। তটিণী কুলু কুলু, কল, কল, করিয়া উঠিল, পবন একটু জোরে বহিল, প্রকৃতি স্তিমিত গম্ভীর ভাবে ডুবিল। মেখলা দাঁড়াইয়া বলিল—এখন তুমিও আজ গৃহে যাও, আমিও গৃহে যাই।

উভয়ে লোকলোচনের অজ্ঞাতে স্ব স্ব কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দূরে দূরে থাকিয়া আর একজন মাত্র এই ব্যাপার দেখিয়া মনে মনে বড় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি অরবিন্দ।

(৫)

হাসি, মেখলার চির-সঙ্গিনী, সম্বন্ধে ভগিনী, মেখলাকে নির্জ্জনে পাইয়া ক্ষেপাইল—

আমাদের মেখলার বিয়ে,
কোথা পাবরে বাজিয়ে।
বরের মাথায় পাকা চুল, ঠিক যেন সে কেশের ফুল
বয়স গুণ্‌তে হয় গো ভুল, সট্‌কে যায়রে ফুরিয়ে ;
মুখ্যি কুলীন কেশো রোগী, দাঁত নাইক তবু ভোগী
নয়কো বুড়ো নয়কো যোগী চল্‌তে পড়ে কুজিয়ে ॥

মেখলা, হাসির মস্ত খোপাটা আচ্ছা করিয়া নাড়িয়া বলিল—

আমার বরটী ভাবিয়ে,
সবাই দেখে চাহিয়ে,
বিয়ে হলে হাসি আমার মরবে ছট্‌ফটিয়ে ;

বলবে আমায় ঐটী দেনা,
আমারটা তুই আজই নেনা,
আমার বরের হ'বে কেনা, কোলে পড়বে গড়িয়ে।

হাসি খুব হাসিয়া বলিল—সত্তি, মাইরি, তোর দিব্বি, আমার মাথা খাস!

মেখলা মুখ ব্যাদন পূর্ব্বক উভয় হস্তে হাসির মাথাটা ধরিয়া কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিল—

না থাক, খাব না, আমার বিয়ে দেখবে কে, আমোদ করবে কে—বিমল ফিরে এলেই বা কি বলবো!

হাসির স্বামীর নাম বিমল-বিকাশ—নিরুদ্দিষ্ট।

হাসি এবার একটু গম্ভীর ভাবে বলিল—বল্‌না কে বর, কোথায়! মেখলা হাসির গাম্ভীর্য্যে হাসিয়া বলিল—কা'কেও বল্‌বিনি, আজ দেখাব, আমার সঙ্গে যাস।

হাসি হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল, মেখলা পাঠাগারে প্রবেশ করিল।

(৬)

কিরণমালা অরবিন্দকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিল—ঠাকুরপো, ভাইঝির বিয়ে দেবে যোগাড় কই?

অরবিন্দ মৃদু মধুরে বলিল—ও বুড়ো বরের বিয়েয় পাড়ার লোক কেউ আসবে না, বাজিয়ে বা ব্রাহ্মণ কিছুই পাব না। কিরণমালা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিলঃ—তবে কি হ'বে, জাত যে যায়, সমান ঘরও আর পাব না। অরবিন্দ গম্ভীর ভাবে বলিল—আমি কি করবো, অমনি নমঃ নমঃ করে সেরে দেওয়া যা'বে, না হয় গন্ধর্ব্ব বিয়ে হবে।

কিরণমালা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে মুখ ভার করিয়া বলিল—সে কি রকম?

অরবিন্দ অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিল—এই তুমি আমার গলায় মালা দিলে, আমি তোমার গলায় মালা দিলুম, বস্ বিয়ে হ'য়ে গেল, তার পর দিব্বি ঘর কন্না কর। কিরণমালা সমধিক বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল—সে কি ঠাকুর পো! আমি তোমার গলায় মালা দিতে যাবো কেন?

অরবিন্দ এবার একটু হাসিয়া বলিল—আহা, বউদি, সত্তিইকি তুমি দিচ্চ, তবে ও বিয়েটা ঐ রকম।

কিরণমালা সাগ্রহে বলিল—তা'কি বিধবার সঙ্গেও হয়?

অরবিন্দ এবার খুব হাসিয়া বলিল—না, তোমার দেখ্‌চি একান্ত বিয়ে করবার মত, আমি কি তোমার বিয়ের কথা বলচি? মেখলা কি বিধবা?

কিরণমালা এবার কাতর কণ্ঠে বলিল—তা যে বরে বিয়ে দিচ্চ, বাছা আমার দুদিন পরে তাই হয় ত হ'বে, ঐ মেখলার বয়সী উমার কি হ'ল বল না।

অরবিন্দ অবসর বুঝিয়া বলিল—তবে এ বিয়ে না দিলেই পার।

কিরণমালা করুণ নেত্রে চাহিয়া বলিল—দুপক্ষে পাকা হ'ল যে? অরবিন্দ মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—হাঁ, ভারি ত বিয়ে তার আবার পাকা, তুমিই ত বল, বড় ত বিয়ে তা'র দুপায় আল্‌তা।

কিরণমালা রুক্ষ কণ্ঠে বলিল—তবে তখন মত কল্লে কেন?

অরবিন্দ আবার গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল—কি করবো, তুমি নেহাত বল্লে—ঠাকুর পোর চেষ্টা যা'তে আমার মেয়ের বিবাহ না হয়, অমন ঘর—।

কিরণমালা বসনাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিল—তা যাহ'ক ভাই, রাগ করোনা, এখন মানে মানে বিয়েটা দিয়ে ফেল, মেয়ের ভাগ্যে যা থাকে হ'বে।

অরবিন্দ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল—কিরণমালা বলিল—আহা আজ যদি সে থাক্‌তো, যাই এ দিক্‌কার সব গোছাইগে।

কিরণমালা চলিয়া গেল—যাইতে যাইতে ভাবিল—বিধবার বিয়ে হয় না কি?

(৭)

গুণাকর ঘাটে বসিয়া আছে, চন্দ্রদেব নীরবে তাহার সর্ব্বাঙ্গে কিরণ ঢালিতেছেন, চন্দ্রকরোজ্জ্বল তটিনী সম্মুখে কুলু কুলু করিয়া তাহার সহিত কত রঙ্গ করিতেছেন, পবন মৃদুমন্দ গতিতে আসিয়া বলিতেছেন—

'ভাবিও না, সে আসিতেছে'। ভাবুক তথাপি ভাবে মগ্ন, সহসা কোমল অঙ্গুলি সংস্পর্শে ভাবুক চক্ষু চাহিলেন, দেখিলেন দুই পার্শ্বে দুই নব যুবতী।

হাসির বড় দোষ কিছুতেই হাসি চাপিতে পারে না, হাসিয়া বলিল—গুণাকর, তুমি মেখলার বর? গুণাকর মৃদু হাসিয়া বলিলেন—কে বলিল!

হাসি গুণাকরের কানে কানে বলিল—মেখলা নিজে।

মেখলা গুণাকরের গা ঘেসিয়া বসিল, তটিনী অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল।

হাসি গুণাকরের সম্মুখে আসিয়া বলিল—এইবার বিয়ে কেমন?

গুণাকর চক্ষু মুছিয়া বলিলেন—

এখনও কত প্রতিবন্ধক!

মেখলা উঠিয়া বলিল—তবে চল, কেহ কোথাও নাই?

গুণাকর মেখলার হাত ধরিয়া বসাইয়া বলিলেন—বিবাহ না হয় তাহাই হইবে।

হাসি বসনাঞ্চলে নয়ন মুছিয়া বলিল—আর অবসর হইবে কি?

গুণাকর দৃঢ় স্বরে বলিলেন—প্রকৃত প্রেমের পথে বাধা দিবার কেহ কোথাও নাই।

মেখলা দক্ষিণ হস্তে গুণাকরের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বসিল। হাসি উভয়ের দিকে নিষ্পন্দ চাহিয়া রহিল। অরবিন্দ, মেখলা ও হাসির অলক্ষ্যে উভয়ের অনুসরণ করিয়াছিলেন, অলক্ষ্যে থাকিয়াই গৃহে ফিরিলেন। গুণাকর মেখলা, হাসি প্রভৃতিও ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিলেন।

(৮)

কিরণমালা মেখলার কবরী বন্ধন করিতে করিতে বলিলেন—মেখলা আর যেখানে সেখানে যেয়ো না, চারিদিকে লোক জন, কুটুম্বালয়ে কেহ বলিয়া দিতে পারে।

মেখলা মস্তক অবনত করিয়া রহিল। অরবিন্দ আসিয়া বলিলেন—মেখলা পড়িবার ঘরে যাও, হাসি ডাকচে।

মেখলা চলিয়া গেল।

কিরণমালা হাসিয়া বলিলেন—ঠাকুরপো, আজ তোমার স্বরটা ভারা ভাঙ্গা কেন?

অরবিন্দ হাসিয়া বলিলেন—বিয়ের সময় ভাঙ্গতো, না হয় আজ থেকেই ভাঙ্গলো। তুমি মেখলাকে কি বল্‌ছিলে? কিরণমালা কোমল কণ্ঠে বলিল—যেখানে সেখানে যায় তাই বারণ কচ্ছিলুম, কেও দেখে পাছে কুটুম্ব বাড়ী বলে দেয়।

অরবিন্দ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—তোমার মেয়ে তুমি বারণ করতে পার, কিন্তু আমি বলি মেয়ে ছেলে দিন রাত ঘরে বসে থাকলে বাঁচবে কেন?

কিরণমালা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন—দুটী ভাই এক।

অরবিন্দ সবিষাদে বলিলেন—তা'হলে আমি বেঁচে থাকবো কেন, তা'র সঙ্গে যেতুম, আমি অকর্ম্মণ্য তাই বেঁচে আছি।

অরবিন্দের চক্ষে জল পড়িল, কিরণমালা বসনাঞ্চলে সেই অশ্রু মুছাইয়া বলিলেন—ঠাকুরপো সংসার তুমিই রেখেচ, তুমি আমার দেবর লক্ষ্মণ; ছিঃ শুভ কর্ম্মের সময় চখের জল ফেলতে নাই, আমি মেয়ে মানুষ আমাকে কোথায় তুমি বোঝাবে!

অরবিন্দ ভগ্ন কণ্ঠে বলিলেন—এটা শুভ কর্ম্ম নয়, সম্পূর্ণ অশুভ, আর এক সময় বলবো এখন আসি।

অরবিন্দ চলিয়া গেলেন, কিরণমালা ভাবিতে বসিলেন—ঠাকুরপোর চখে আজ জল কেন?

শ্রীশ্যামলাল মজুমদার।

দ্বারকার পথে।

(৮)

পোরবন্দর মাঝারি সহর—খুব প্রকাণ্ড বড় নয়। সেই অনুপাতে ইহার রাস্তা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এরূপ প্রশস্ত রাস্তা আমি বোধ হয় জব্বলপুর ছাড়া আর কোথাও দেখি নাই। সমুদ্র বক্ষ হইতে দেখিলে ইহার সৌন্দর্য্য যথার্থ উপলব্ধি হয়। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অবস্থিত তট ধৌত করিয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ চলিয়া যাইতেছে। নগরের সংস্থানও অর্দ্ধচন্দ্রাকারে কেন না যে শৈল মালার ক্রোড়ে এই নগরের সংস্থান তাহাও অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অবস্থিত। সমুদ্র বক্ষ হইতে শৈল কোলে নগর, নগরের কোলে সমুদ্র—ছোট হইতে ক্রমে বড় হইয়া অনন্তে মিশিয়া গিয়াছে—দেখিতে অতি রমণীয়। অর্দ্ধচন্দ্র নগরের দুইটি শৃঙ্গ বা কোণ আছে একটি দক্ষিণ দিকে—অন্যটি বাম দিকে (অবশ্য দর্শক সমুদ্র বক্ষ হইতে দেখিতেছেন) দক্ষিণদিকে সর্ব্বশেষ ভাগে পোরবন্দরের রাণার বিশাল উদ্যান। তাহার বাম ভাগে রাজ প্রাসাদ, তাহার বাম ভাগে চিড়িয়াখানা, তাহার বাম ভাগে রাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য রাজ-সৌধাবলী। তার পর তাহার বামদিকে প্রায় মাইল টা যাইলে নগর আরম্ভ হইয়াছে। ঐরূপ অর্দ্ধচন্দ্রের বাম কোণে (সমুদ্র হইতে দেখিলে) সমুদ্রের বালুকার উপর (অবশ্য এই স্থান প্রায়ই ডুবে না) পূর্ব্বগত রাণাদিগের সমাধি মন্দির। সে গুলিকে সারি সারি দেখিয়া আমার অস্মদ্দেশের দ্বাদশ শিবের মন্দির বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। শ্বেত মার্ব্বল প্রস্তরে প্রস্তুত, দূর হইতে ধপ্ ধপ্ করিতেছে, নীল সমুদ্র জলের তটে স্বর্ণাভ সমুদ্র সৈকতের উপর শ্বেত সমাধি-মন্দিরগুলি সমুদ্র বক্ষ হইতে অতি সুন্দর দেখায়। সমাধি মন্দির শ্রেণীর দক্ষিণ ভাগে একটি সমুদ্রের পীন খাঁড়ি সহরের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে বাণিজ্যের বড়ই সুবিধা হইয়াছে। সমুদ্রে-গমন-কারী বহুশত নৌকা সেই খাঁড়িতে বাঁধা আছে। এই সকল নৌকা দেশীয় মাল্লারা চালায়। তাহাদের অসীম শারীরিক বল, প্রত্যুৎপন্নমতি, ক্ষিপ্র-হস্ততা, বুদ্ধিকৌশল,

ও অমায়িক ব্যবহার—যেন বালক। আলী নামক এক ব্যক্তির সহত আমার আলাপ হইয়াছিল ইহারা সমুদ্রে যাইতে কিছু মাত্র ভয় করে না। ইহারা গরীব দুঃখীর মা—বাপ। ষ্টীমারে করাচি যাইলে ৭৲ ভাড়া কিন্তু ইহাদের নৌকায় যাইলে বার আনা মাত্র। ইহারা অনায়াসে করাচি বোম্বাই, কচমাণ্ডবী, ভিরাত্তন (প্রভাস পত্তন) দ্বারকা, বেট দ্বারকা প্রভৃতি স্থানে যায়। তবে হাওয়া না থাকিলে ইহারা যাইতে পারে না, ইহারা বলে পবন আমাদের ঘোড়া। সে যাহাহৌক খাঁড়ি পার হইলেই অবশ্য দক্ষিণে সোমনাথের মন্দির। সমুদ্র বক্ষ হইতে সোমনাথের মন্দিরের ধ্বজা বেশ লক্ষ্য করা যায়। এই সোমনাথের মন্দির নূতন হইয়াছে। শিব লিঙ্গ ছিল কিন্তু আচ্ছাদন ছিল না। মহাজনেরা চাঁদা করিয়া এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন, সৎকার্য্যই করিয়াছেন। এক দল স্ত্রীলোক দেখিয়াছিলাম, তাহারা ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে, কেহ বা সোমনাথের মন্দিরের জন্য কেহ বা গোরক্ষিণী সভার জন্য। সোমনাথের মন্দির পার হইলেই জাহাজওয়ালাদের আফিস অর্থাৎ কিলিক নিকসন এণ্ড কোং। একজন বোম্বাইয়ের দেশীয় সদাগরের জাহাজ ও ব্যবসা এই কোম্পানি অধুনা কিনিয়া লইয়াছেন শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। মনে হইল কেন এমন হইল। বোম্বাই সহরে ত ধনী ও সদাগরের অভাব নাই। যাহা হৌক তারপর বৃটিস ইণ্ডিয়ান ষ্টীম নেভিগেসন কোং অর্থাৎ আমাদের পরিচিত ম্যাকিনন মেকিঞ্জি। ইঁহাদের আফিস ও কিলিক নিকসনদের আফিস এই দুইটিই প্রধান। তন্মধ্যে ম্যাকিনন কোম্পানি গবর্ণমেণ্টের মেল বোম্বাই হইতে করাচি ও করাচি হইতে বোম্বাই লইয়া যান বলিয়া তাঁহাদের গৌরব ও বেশী—জাহাজের ভাড়াও বেশী, আড়ম্বর ও অযত্নও বেশী। আমি একবার এ কোম্পানির, আরবার ও কোম্পানির জাহাজে চাপিয়াছিলাম সুতরাং সবই জানি। সদাগরী আফিসগুলি পার হইলেই একটি বৃহৎ ধর্ম্মশালা ও তৎপরে আলোক স্তম্ভ; বলিতে ভুলিয়াছি সদাগরি আফিসগুলি পর্য্যন্ত সমুদ্র সৈকতের উপর। অনেক সময়ে বোধ হইল সমুদ্রের জল ওঠে তাই এত বালি। আমার মনে হইয়াছিল বর্ষায় সমুদ্রের জল উঠে তারপর মনে হইল বর্ষায় সমুদ্রের জল

উঠে কি না ঠিক নাই, কেন না পূর্ব্বে বোধোদয়ে পাঠ করিয়াছিলাম নদী পাত দ্বারা সমুদ্রের জল বৃদ্ধি হয় না। ধর্ম্মশালা বা ধরমশালার পরেই লাইট হাউস বা আলোকস্তম্ভ। আমাদের দেশে যেমন চটকলের চিমনী অমনি একটি স্তম্ভ। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাহাতে আলো দেওয়া হয়। এই আলো একবার নিবিয়া যায় আবার আলেয়ার মত দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। সমুদ্র গামী জাহাজ বহুদূর হইতে দূরবীন সাহায্যে এই আলো দেখিতে পায়। এই আলো দেখিয়া নগরের সংস্থান ও দিক্‌নির্ণয় হয়। আলো একবার নিবিয়া যায় ও আবার জ্বলিয়া উঠে ইহার তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য এই যে জাহাজ দূর হইতে বুঝিতে পারিবে এইটা আলোক স্তম্ভ। সহরে কত কত স্থির আলো আছে। স্থির আলো হইলে আলোক স্তম্ভ নির্ণয় করা যে বড় কঠিন হইবে। সমুদ্রে যেখানে জল মগ্ন শৈল আছে সেখানেও ঐরূপ আলোক স্তম্ভ আছে। কোন কোন স্থলে আলোক বামে দক্ষিণে নড়িয়া থাকে—ঠিক যেন হাত নাড়িয়া বারণ করিতেছে—জাহাজ এদিকে আসিও না, আসিলে প্রাণে মরিবে। এ ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে মেঘ বৃষ্টি ঝড় বিদ্যুতে এই আলোক স্তম্ভগুলি নাবিকদের প্রাণ দাতা ও পরিত্রাতা। আলোক স্তম্ভের পর সহরের অন্যান্য সৌধ শ্রেণী, তাহার পর আর বিশেষ বর্ণনা করিবার আবশ্যকতা নাই। সে দেশের লোক এই সহরটিকে সুদামা পুরী বলে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সখা সুদামের পুরী। শ্রীকৃষ্ণের পুরী হইল দ্বারকায়; সহরের মধ্যস্থলে সুদাম দেবতার সুবৃহৎ মন্দিরের উপর সমুদ্র বায়ু হিল্লোলে পতাকা সর্ব্বদা উড়িতেছে। সুদামা ঠাকুরের ঠিক সম্মুখে এক বিস্তীর্ণ সান বাঁধান প্রাঙ্গণ তাহার উপর এক প্রকাণ্ড হল তাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফরাস বিছাইয়া বড় বড় মজলিস মাইকেল হয়। ঝাড় লণ্ঠনও টাঙ্গান আছে। এই সব হল মন্দিরাদির জীর্ণ সংস্কার করিয়াছেন মহাজনেরা। তাঁহারা সভা সমিতি করেন। মজলিস মাইকেলের কথা যাহা বলিয়াছি তাহা ধর্ম্মবিষয়ক। একাদশীর দিন, পূর্ণিমার দিন, বিশেষ বিশেষ পর্ব্বে বা পর্ব্বাহে ঐরূপ মজলিস হয়। কোন বিখ্যাত ধর্ম্ম প্রচারক আসিলে বা বড় সন্ন্যাসী বা মহাত্মা আসিলে বা ব্রহ্মচারী আসিলে তাঁহারা এই খানেই বক্তৃতা করেন বা ধর্ম্মোপদেশ দেন।

পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি বালিকা বিদ্যালয় আছে। বিলাতী দ্রব্যের খুব আদর। বিলাতী চিনি ও লিবারপুল লবণ সদর্পে রাজত্ব করিতেছে। স্বদেশীর নাম গন্ধ নাই। রাণা খুব সভ্য ও হুঁসিয়ার, দেবতা-সন্তুষ্ট করিবার জন্য এই সবই ব্যবস্থা আছে তাহার উপর আছে ডফারিণ মেয়ে হাঁসপাতাল ও লেডী ডাক্তার। আমি যখন গিয়াছিলাম তখন লেডী ডাক্তার ছিলেন একজন বাঙ্গালি। সৌভাগ্য ক্রমে আমার লর্ড ডাক্তারের সহিত ও দেখা হইয়াছিল, সে কথা অবসর পাইত—পরে।

পোরবন্দর একটি সমুদ্রগামী জাহাজের ষ্টেসন, এখান হইতে যে কোন ভারতের বন্দরে যাওয়া যায়। ইহা বাণিজ্য প্রধান স্থান। সুতরাং সদাগর দালাল কমিশনএজেণ্ট সিপ সরকার প্রভৃতি বাণিজ্য সংক্রান্ত লোকে পরিপূর্ণ। পোরবন্দর হইতে চলা পথেও দ্বারকা যাওয়া যায়, প্রায় ৬১ মাইল দূর। বলদ-শকটও পাওয়া যায় ৭।৮৲ ভাড়া ও অশ্ব-শকটও পাওয়া যায় ২৫৲ হইতে ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত ভাড়া। জাহাজ ভাড়া ২য় শ্রেণী টাকা তিনেক। চলা পথে গেলে ৩।৪ টি হিন্দু রাজ্য মধ্য দিয়া যাইতে হয় এবং তাঁহারা যাত্রীদের নিকট তীর্থকর লইয়া থাকেন। শুনিয়াছি সেই টাকায় ঐ রাস্তা মেরামৎ হয়। আমার মনে হয় এ সব নূতন ব্যাপার ইংরেজ সহ মিলনে ইহাদের সৃষ্টি। স্বীকার করি এই রাস্তা পার্ব্বত্য রাস্তা চড়াই উৎরাই অনেক আছে ও জল হইলে অনেক স্থলে রাস্তা ধ্বসিয়া যাওয়ায় প্রতি বৎসর জীর্ণ সংস্কারের প্রয়োজন হয় কিন্তু তা বলিয়া হিন্দুরাজার তীর্থযাত্রীর নিকট কর লওয়া কত দূর সঙ্গত তাহা না হয় পাঠক পাঠিকা বিচার করিবেন। শুনিয়া আমার ত বড় বিরক্ত বোধ হইয়াছিল।

ধর্ম্মশালা সম্বন্ধে এই স্থানে দুই এক কথা বলিয়া রাখি। যাঁহারা পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করেন নাই তাঁহারা ধর্ম্মশালা বা ধরমশালা কি তাহা জানেন না—তাঁহাদের জন্যই এই কথা বলিবার প্রয়োজন। ধনী লোকে তীর্থ স্থানে বা তীর্থ যাত্রার পথে এক একটি বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেখানে পাইখানা থাকে, পাতকুয়া থাকে আর খবরদারী করিবার জন্য একজন লোক থাকে। কতকগুলি ঘর থাকিবার জন্য আর কতকগুলি

ঘর রাঁধিবার জন্য, উনুন পর্য্যন্ত পাতা আছে। যাত্রী গিয়া একটা ঘর দখল করিল। জিনিষ পত্র চাল্ ডাল বাহির করিয়া রাঁধিয়া বাড়িয়া খাইয়া চলিয়া গেল। সঙ্গে চাকর না থাকে ধরমশালার চাকরই তোমার সমস্ত যোগাড় করিয়া দিবে, জিনিষ পত্র কিনিয়া আনিয়া দিবে, জল তুলিয়া দিবে, স্নান করাইয়া দিবে, তাহাকে কিছু বক্‌সিস্ দিলেই হল। কোন কোন স্থলে যাত্রী দত্ত পয়সা হইতে ঐ চাকরের মাহিনা হয় কিন্তু সে অতি বিরল। কোন কোন ধর্ম্মশালায় চাল ডাল তরি তরকারী কাষ্ঠ দান করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহা কেহ লয় কেহ তীর্থ স্থান বলিয়া লয় না। কিন্তু সর্ব্বত্র সাধু সন্ন্যাসীর অবারিত দ্বার। বড় বড় তীর্থ স্থানে বহু সংখ্যক ধর্ম্মশালা দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুরাজগণ হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য মাড়োয়ারি বনিক পর্য্যন্ত এই শুভকার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। কিন্তু হৃষীকেশে যেমন ধর্ম্মশালার সুব্যবস্থা দেখিয়াছিলাম এমন কুত্রাপি দেখি নাই। প্রকাণ্ড বাড়ী, 'অনেক ঘর, ঘৃত ময়দা আটা গুড় প্রভৃতিতে ভাণ্ডার ঠাসা। প্রত্যেক দিন প্রভাতে সাধু সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হয় ও ইচ্ছামত দ্রব্যাদি লইয়া যায়। তা যাহা চায় তাহা পায়—কেহ বা রাঁধিয়া খায়। ধর্ম্মশালায় অনেকগুলি গাভী আছে তাহাদের দুগ্ধে নানা প্রকার মাখম ঘৃতাদি প্রস্তুত হয়। আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ধর্ম্মশালায় কাজ করেন সাধুরা। স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া কোন সাধু ভাণ্ডার-রক্ষক, কেহ বা গো সেবা করেন, কেহ বা চাকরের কাজ করেন, কেহ বা দ্বারবান। গাভীরা চরিতে যায় সন্ধ্যা বেলা আসিয়া দুধ দেয়। দেখিতে বড় সুন্দর।

হৃষীকেশ হইতে বদরী নারায়ণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ৪ ক্রোশ অন্তরে একটি করিয়া ধর্ম্মশালা আছে। জলন্দরে প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালা আছে। জলন্দর হইতে জ্বালামুখীর রাস্তায়ও ধর্ম্মশালা দেখিয়াছিলাম। দ্বারকায় অসংখ্য ধর্ম্মশালা—"গোপীতালাও" স্থানেও বেট বা দ্বীপ দ্বারকায়ও অনেক ধর্ম্মশালা দেখিয়াছিলাম। মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাধু সন্ন্যাসীর অবারিত দ্বার, একটা গেরুয়া বসন হইলেই হইল—হিন্দুধর্ম্ম এখনও এত সতেজ।

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

নদীয়া-কাহিনী।

সেকালের ইংরাজ কোম্পানীর দপ্তর অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সমসাময়িক ইংরাজগণ কর্ত্তৃক অতীব সম্মানিত হইলেও যথাকালে রাজস্ব দিতে না পারায় কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণের নিকট বিশেষ অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। কোন কোন ইংরাজ কর্ম্মচারী তাঁহার জাতি নাশের ব্যবস্থা, তদীয় পুত্র শিবচন্দ্রকে জামিন স্বরূপ কয়েদ রাখিবার এবং তাঁহার হস্ত হইতে নদীয়া শাসনের ক্ষমতা গ্রহণের প্রস্তাব করেন *। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ২০ শে আগষ্ট তারিখের গবর্ণমেন্টের মন্তব্যে দেখা যায় যে তদানীন্তন নদীয়ার রাজস্ব ৯ লক্ষ মুদ্রা ধার্য্য

* Mr. Luke Scrafton writes from Maradabag to Government complaining of the arrears of revenue due in Nadia— ' It is possible that by threatening the Raja with loss of his caste and such corporal punishments as are in practice among those people, something more may be extorted from him. However, I suppose Raydullub will either pay the balance out of the treasury or pay the 9 lacks for the ensuing year, therefore, it is requisite some methods must be taken to make the best of the ensuing year. As the chief cause of balance is the Raja's extravagance, it, therefore, appears to me to send a trusty person into his country to collect his revenue for him, to deprive the Raja of all power in his country, allowing him only Rs. 10,000 per annum or whatever your honor &c may think proper for his expenses and keep the son in Calcutta as security for the father's good behaviour ; if this method is persued, it is probable the Hon'ble Company may within two years receive the full of Toncaws on him. Vide Long's Selections from Unpublished Records No. 337.

ছিল। এই ৯ লক্ষ মুদ্রার মধ্যে ৬৪,৩৪৮ টাকা কোম্পানীর রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ৮৩৫,৯৫২ টাকা নদীয়া রাজকে মুসলমান সরকারে রাজস্ব দিতে হইত। নদীয়া পূর্ব্ব হইতেই মীরজাফরের অঙ্গীকৃত তন্‌খার নিমিত্ত ইংরাজের নিকট বন্ধক থাকায় শেষোক্ত খাজানাও ইংরাজ কোম্পানীকে দিতে হইত। সে সময়ে রাজ্যের আভ্যন্তরিক গোলযোগের জন্য কৃষ্ণচন্দ্রের পক্ষে যথা সময়ে রাজস্ব সংগ্রহ করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। সেকারণ তিনি ক্রমাগত নানা ওজর করিয়া রাজস্ব দিতে বিলম্ব করিতে থাকেন *। অবশেষে কৃষ্ণচন্দ্র বাকী রাজস্ব কিস্তিবন্দী অনুযায়ী বিনা

* From Rayrayan, December, 1760:—

" Your favourable letter acquainting me of your health I have received and am much rejoiced as to what you wrote with your favourable pen concerning the Zemindar of Nadia. The Company's business and that of the Nabab, His Excellency considers as the same, and we are of that opinion also,and therefore what can I say in regard to Nadia Zemindar. It is now two months he has put us off by saying first that his Dasohara holidays were coming on and afterwards that his Deowaly holidays were at hand and now he has complained to you that his wife is sick, but his reasons for being so backward to come to the city is lest he should be obliged to pay his debt and if he does not come to the city, the money will never be paid and will be of no service. You must be acquainted from many people how much the Nabab is distressed for money to pay his troops, for this reason, I have sent people to bring the Nadia Zemindar and therefore I beg that you will write to the Zemindar to proceed speedily to the city with the money for the months revenue which he has not paid according to the kistbandi and forward the rest with the utmost expedeture.

Long's Selections of U. P. R. No 5&10.

ওজরে কোম্পানীর কুঠীতে চালান দিবেন অঙ্গীকারে এক চুক্তি পত্র লিখিয়া দিয়া সে যাত্রা অব্যাহতি লাভ করেন *।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করায় বান্সিটার্ট সাহেব বাঙ্গালার কোম্পানীর কুঠীর গভর্নর ও অধ্যক্ষ হন। ইংরাজদিগকে অঙ্গীকৃত অর্থ পরিশোধ করিতে না পারায় সকৌন্সিল বান্সিটার্ট সাহেব মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার সুদক্ষ জামাতা মীরকাশিমকে নবাব মনোনীত করেন। মীরকাশিম স্বাধীনচেতা, তেজস্বী ও সুশাসক বলিয়া খ্যাত। তিনি বঙ্গ মসনদে উপবিষ্ট হইয়া সর্ব্বাগ্রে কোম্পানীর দাবীর টাকা পরিশোধ করেন। তিনি যেরূপ স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন তাহাতে কোম্পানীর সহিত সদ্ভাব যে স্থায়ী হইবে না তাহা তিনি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সেই উদ্দেশ্যে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। যে সকল ভূস্বামী ইংরাজদিগের পক্ষভুক্ত বলিয়া সন্দেহ হইল তাহাদিগকে মুঙ্গের দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। সপুত্র কৃষ্ণচন্দ্রও তন্মধ্যে ছিলেন। নবাবের আদেশে জগৎশেঠ, রাজবল্লভ প্রভৃতি অন্যান্য বন্দীর সহিত সপুত্র কৃষ্ণচন্দ্রেরও প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হয় কিন্তু কৌশলী কৃষ্ণচন্দ্র " যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ " মনে করিয়া নবাবের কর্ম্মচারীগণকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া তৎকালোচিত যজ্ঞের আয়োজন করেন এবং পূজান্তে তাঁহাদের যোগ গ্রহণের নিমিত্ত সকাতর প্রার্থনা করেন। সেজন্য তাঁহাদের প্রাণদণ্ডে বিলম্ব ঘটে। এদিকে বিজয় লক্ষ্মী ইংরাজের সহায় হওয়ায় নবাব পরাজিত হইয়া মুঙ্গের ত্যাগ করিতে বাধ্য হন সুতরাং সপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র সে যাত্রা রক্ষা পান। মীরকাশিম গুরগণ খাঁ প্রমুখ সেনাপতি-

* " I promise to pay the above sum of Rs. 835,952 agreeable to the kist-bandi without delay or failure. I will pay the same into the Company's Factory. I have made this that it may remain in full force and virtue. Dated the 23rd of Julhaid (Sic) and the 4th August of Bengal year 1166.

Vide Hunter's Statistical account Vol. II page 159.

বর্গের বিশ্বাসঘাতকতায় বার বার পরাজিত হইয়া * পরিশেষে অযোধ্যায় পলায়ন করেন; পরে অযোধ্যার নবাব ও দিল্লীশ্বর সাহ আলমের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজদিগকে আক্রমণ করেন। কিন্তু ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বকসারের যুদ্ধে পরাজিত হন এবং অল্পদিন মধ্যেই মানবলীলা সম্বরণ করেন।

* এই সকল যুদ্ধের অনেকগুলিই অগ্রদ্বীপ, পলাশী প্রভৃতি নদীয়ান্তর্গত স্থানে সংঘটিত হয়। এ বিষয়ে আজিও সুদূর পল্লীগ্রামে ২।১ জন অতি বৃদ্ধের মুখে গ্রাম্য কবিতা শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহারাও সে গুলি তাঁহাদের পিতা পিতামহ প্রভৃতির মুখে শুনিয়াছেন এবং কষ্টে কিছু কিছু এখনও মনে করিতে পারেন। এ সকল কবিতার ভাব বা ভাষার লালিত্য কিছু না থাকিলেও আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের ধন বলিয়া আমাদের চির আদরের।

শুন সবে এক ভাবে কাব্য রসের কথা।
নবাবে লুটিল কুঠী সহর কলিকাতা ॥ (?)

জবরের খবর শুনি তুরত মুনি কোম্পানী কহিছে।
তোয়ের কর দেখি গোরা কত তেলেঙ্গা আছে ॥
সামনে শুলকী গেড়ে তুল্লে তেড়ে বাণের মুলুক দিয়ে।
কাকঁলে নদী আসছে যেন হিরে শত হ'য়ে ॥

বাঙ্গালা মুখে করে ॥

বাঙ্গালা মুখে করে পাল্সী ভরে দেখতে লাগে ভাল।
সাজিল তেলেঙ্গা গোরা কুর্ত্তি লালে লাল ॥

মোকামপুর পলাশীতে।

মোকামপুর পলাশীতে সিপুই সাথে সঙ্গে তুড়ুক সোয়ার।
আগুণ পানী নাহি মানে করে মার মার ॥

পড়িল মামুদ তকি।

পড়িল মামুদ তকি দোনের আঁখি পুড়ছে মনের আগে।
তা দেখে শয়ান খাঁ দাঁতে কাটে ঘাস ॥

ইত্যাদি

এইরূপে দেশব্যাপী রাষ্ট্র বিপ্লবের উপসংহার হইলেও দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিতে বহুদিন লাগিয়াছিল। এ সময়ে নদীয়া রাজ্যে একরূপ অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল। দেশ মধ্যে দস্যু ও তস্কর ভীতি অসম্ভব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; তাহাদের দারুণ অত্যাচারে কত সোনার সংসার শ্মশানে পরিণত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সামান্য ধনশালী বা গৃহস্থ লোকের কথা দূরে থাকুক, এই সকল অসমসাহসিক দস্যুনিচয় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ কোম্পানীর কুঠীও লুণ্ঠন করিতে পশ্চাদ্‌পদ হইত না। এই সকল লুণ্ঠন কাহিনীর দুইটী ঘটনা জলন্ত অক্ষরে ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। একটী তদানীন্তন কোম্পানীর শান্তিপুরের কাপড়ের কুঠী লুণ্ঠন করিয়া কোম্পানীর গোমস্তা মনোহর ভট্টাচার্য্যকে লইয়া যাওয়া এবং অপরটী সায়েস্তা খাঁ নামক মুরসিদাবাদের জনৈক মুসলমান সওদাগরের কর্ম্মচারী মহম্মদ মোবারিক ও মৃজা বদলু প্রভৃতির নিকট হইতে নদীয়ার সীমানায় ত্রয়োদশ সহস্র মুদ্রা লুণ্ঠন করা। শেষোক্ত ব্যাপারটী লইয়া দেশ মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া যায়। সায়েস্তাখাঁ বাদসাহ সরকারে যাইয়া এ বিষয়ে জানাইলে তথা হইতে তদানীন্তন কোম্পানীর গভর্ণরের উপর এ বিষয়ের বিচারের নিমিত্ত এক পরোয়ানা জারি হয় এবং গভর্ণর সাহেব তাৎকালিক নদীয়ার মুসলমান কালেক্টরকে এ বিষয়ে সম্যক তদন্ত করিয়া দোষীর শাস্তি বিধান ও নদীয়া রাজের গোমস্তা প্রভৃতি যে কোন ব্যক্তির অমনোযোগিতায় এ কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে তাহাদের সকলের শাস্তি বিধান ও অপহৃত অর্থ আদায় পূর্ব্বক অভিযোগকারী সায়েস্তা খাঁকে পুনঃপ্রদানের অনুমতি প্রদান করেন।

তাৎকালিক নদীয়ার দস্যু দলপতিদিগের মধ্যে একজনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সে ব্যক্তি বিশ্বনাথ বাবু। বিশ্বনাথ জাতিতে বাগদী এবং ব্যবসায় ততোধিক হীন হইলেও তাহার উদার চরিত্র ও বীরোচিত সুন্দর গঠন, ভদ্রোচিত দানশৌণ্ডতা তাহাকে "বাবু" আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। তাহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—দরিদ্র অসহায় প্রজাকুলকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে রক্ষা করা। বিশ্বনাথ কৃপণ ধনীর যম ছিল। অকুণ্ঠ কৃপণের ধনে দরিদ্র পোষণ তাহার বড় আনন্দের কার্য্য ছিল।

বিশ্বনাথ কত কন্যাদায়গ্রস্থ দরিদ্রের বিবাহের ব্যয় কুলান করিয়াছে, কত অসহায় পরিবারের সংসার প্রতিপালন করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কৃষ্ণনগরের দশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী আসান-নগরে বিশ্বনাথের বাস ভবন ছিল। বিশ্বনাথের পুত্রাদি না হওয়ায় বৈদ্যনাথ নামক এক গোপ বালককে সে পালক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিল; এই বৈদ্যনাথ হইতে শেষ জীবনে বিশ্বনাথকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। বিশ্বনাথের যে সকল সহযোগী ছিল তাহাদের মধ্যে কৃষ্ণসর্দ্দার, নলদা এবং সন্ন্যাসী, ইহারা প্রধান ছিল। ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে এক একটী বিশেষত্ব বিদ্যমান ছিল। নলদা ডুব দিয়া জলের ভিতর বহুক্ষণ শ্বাস প্রশ্বাস রোধ করিয়া থকিতে পারিত। বিশ্বনাথ স্বয়ং দস্যুচিত বহুগুণে শোভিত ছিল। রণ্‌পা নামক দীর্ঘ বংশ যষ্টী অবলম্বনে সে এক রাত্রে বিংশতি ক্রোশ পথ গমন করিয়া আবার তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগমন করিতে সক্ষম ছিল। বিশ্বনাথের সুবৃহৎ দলে সহস্রাধিক বলবান ব্যক্তি সর্ব্বদা সশস্ত্র প্রস্তুত থাকিত। এই সুবৃহৎ দলের প্রত্যেকের উপর তাহার অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রভুত্ব বর্ত্তমান ছিল। ইহাদের প্রত্যেকের উপর বিশ্বনাথের কঠোর আদেশ ছিল যেন কেহ কদাচ স্ত্রীলোক, শিশু ও গোজাতির উপর কোন অত্যাচার না করে। বিশ্বনাথ বাবু এই সুবিপুল দস্যু দলের সহিত প্রকাশ্য ভাবে পালকী চড়িয়া দস্যুতা করিতে গমন করিত। বিশ্বনাথের আর একটী নিয়ম ছিল পূর্ব্বাহ্নে গৃহস্থকে পত্র দ্বারা সতর্ক করা। উক্ত পত্র এই মর্ম্মে লিখিত হইত "মহাশয় মহাশয়! যদি পত্র বাহক মারফৎ প্রার্থিত অর্থ প্রদান করেন বিশেষ বাধিত হইব, অন্যথা প্রস্তুত থাকিবেন শীঘ্রই আপনার শ্রীচরণ দর্শনে গমন করিব।"

একবার বিশ্বনাথ কালী পূজার দিন অর্থ সঙ্কুলান করিতে না পারায় সমৃদ্ধি সহকারে মায়ের পূজা হয় না দেখিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে উপবিষ্ট আছে এমন সময়ে তাহার গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল যে কালনার গদীতে বৈদ্যপুরের নন্দীরা এই মাত্র নগদ দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছে। এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে সবিশেষ পুলকিত হইয়া বিশ্বনাথ তৎক্ষণাৎ মাত্র তিন জন সঙ্গী সমভিব্যাহারে নৌকা যোগে কালনায় উপস্থিত হইয়া তেরা

দারোগার নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে বাধ্য করিয়া এক একরার লিখাইয়া লইয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়াই গদীতে উপস্থিত হইল। ঐ একরার এই মর্ম্মে লিখিত হইল যে দারোগার বিশেষ যোগ-সাজগে এ কার্য্য সমাহিত হইল। এইরূপে সেই কার্য্যের যথাযথ অনুসন্ধানের মূলোচ্ছেদ করিয়া বিশ্বনাথ স্বীয় বিক্রমে গদী লুণ্ঠন পূর্ব্বক সেই রাত্রেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল।

আর একবার বিশ্বনাথের দল সংবাদ পায় যে নদীয়ার ইনডিগো কনসার্নের ফ্যাডি সাহেবের বাঙ্গালায় সেই দিন কলিকাতা হইতে বহু সহস্র মুদ্রা রায়তদিগকে দাদন দিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। এই সংবাদে উৎসাহিত হইয়া বিশ্বনাথের দল রাত্রে ফ্যাডির বাঙ্গালা আক্রমণ করে। মিসেস ফ্যাডি রাত্রের অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহাদের অজ্ঞাতসারে কোনরূপে নিকটস্থ পুষ্করিনীতে কাল হাঁড়ি মাথায় দিয়া দস্যু দলের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটাইয়া প্রাণ রক্ষা করেন। কিন্তু ফ্যাডি সাহেব শীঘ্রই ধৃত হইয়া দলপতির সম্মুখে নীত হইলে দূরদর্শী বিশ্বনাথ একজন সাহেবের প্রাণ নাশ করিলে সমগ্র সাহেব লোক তাহার কিরূপ ভীষণ প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে স্মরণ করিয়া সাহেবকে মুক্ত করিতে আজ্ঞা দেন। কিন্তু দলস্থ সকলেই এক বাক্যে ফ্যাডি সাহেবকে বিনাশ করিতে মত প্রকাশ করে এমন কি দলস্থ এক জন সবিশেষ উত্তেজিত হইয়া ফ্যাডিকে সংহার মানসে তরবারি উত্তোলন করিলে বিশ্বনাথ ক্ষিপ্র হস্তে তাহার আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া সাহেবের প্রাণ রক্ষা করেন। পরিশেষে বহু বাকবিতণ্ডার পর সাহেবকে মুক্তি দেওয়াই স্থির হইলে বিশ্বনাথ সাহেবকে তাঁহার ভগবানের নামে শপথ করাইয়া অঙ্গীকার করাইয়া লন যেন মুক্ত হইয়া কিছুতেই তাঁহাদের বিপক্ষতাচরণ না করেন। ফ্যাডি সাহেব এইরূপে মুক্ত হইয়া দস্যুর নিকট প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাই নহে মনে করিয়া বরাবর তাৎকালিক নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ইলিয়ট সাহেবের নিকট গমনপূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণন করেন। ইলিয়ট সাহেব কলিকাতা হইতে ব্যালকুয়ার সাহেবের অধীনে কতকগুলি বলিষ্ঠ ইউরোপীয় গোরা আনাইয়া ও শান্তিপুর হইতে বহুসংখ্যক প্রসিদ্ধ গাড়ো গোষ্ঠী সংগ্রহ করিয়া বিশ্বনাথের পালিত পুত্র বৈদ্য

নাথের সাহায্যে শীঘ্রই বিশ্বনাথকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হন। বিচারে বিশ্বনাথ ও তাহার দ্বাদশ জন সঙ্গীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয় এবং নদী তীরস্থ বটবৃক্ষে তাহাদের ফাঁসি হয়। বিশ্বনাথ মৃত্যুর পূর্ব্বে মাত্র দুই জনের উপর বিশেষ কোপ প্রকাশ করে। প্রথম তাহার বিশ্বাসঘাতক পালিত পুত্র বৈদ্যনাথ, দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গকারী ক্যাডি সাহেব।

রাজ্যের যখন এরূপ অরাজক অবস্থা তখন ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মে মাসে ক্লাইব ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট হইতে লর্ড উপাধি ভূষিত হইয়া মুসলমানের সহিত বিবাদ নিষ্পত্ত্য করিবার নিমিত্ত কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ কর্ত্তৃক এদেশে পুনঃ প্রেরিত হন। তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলে চতুর্দ্দিক হইতে নবাব ও জমিদারগণ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিতে নজর প্রেরণ করিতে লাগিলেন। নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রও পঞ্চ মোহর ও তৎকালোচিত সৌজন্যপূর্ণ লিপি প্রেরণ করিয়া ভাগ্যবান ক্লাইবের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ক্লাইবের আগমনের পূর্ব্বেই মীরকাসিমের মৃত্যু হয় এবং মীরজাফর দ্বিতীয় বার নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত হন; কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহারও মৃত্যু হওয়ায় তৎপুত্র নাজিমদ্দৌলা ইংরাজগণ কর্ত্তৃক নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ক্লাইব মুরসিদাবাদে যাইয়া নূতন নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বন্দোবস্ত করিলেন যে সৈন্য সংক্রান্ত ও রাজ্য রক্ষা সম্বন্ধীয় অন্যান্য ভার ইংরাজ কর্ম্মচারীগণের হস্তে থাকিবে; কর সংগ্রহ, শাসন ও বিচার প্রভৃতি কার্য্য নবাবের কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইবে এবং ঐ সকল কার্য্য ও সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নবাব বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকা পাইবেন। অনন্তর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট তারিখের প্রদত্ত বাদসাহী সনন্দ বলে ইংরাজ বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে বণিক ইংরাজ ঘটনা চক্রে দেশের রাজা হইয়া পড়িলেন।

শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক।

সমালোচনা।

গতমাসে আমরা দুঃখ করিয়াছিলাম, যে আমাদের সহযোগী সহযোগিনীরা আমাদের সহিত অদল বদলের অনুগ্রহ করেন না। এবার আর সে দুঃখ নাই, পূর্ণিমার অধ্যক্ষের নিকট হইতে আমরা অনেকগুলি মাসিক মাত্র পত্রিকা পাইয়াছি। এমন কি সংস্কৃত বিদ্যোদয়ের পর্য্যন্ত পুনরুদয় হইয়াছে। নূতন পুরাতন সকলকেই স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি।

১। প্রথমেই প্রবাসীর কথা বলিতে হয়। প্রবাসী উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র। ছাপা কাগজ ও চিত্রের ত তুলনাই হয় না। লেখাও অনেক সময়ে ভাল; তবে সংস্করণের দিকে প্রবাসীর একটু বেশী ঝোঁক আছে। তা থাকিবারই কথা—সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, উন্নতিশীল ব্রাহ্ম। সংস্কারক দলের একখানি পত্র থাকে, তা ভাল—মতামত বুঝিতে কষ্ট হয় না, তবে শাস্ত্রের নামে সংস্করণ চালান যেন কেমন কেমন লাগে। এই সংখ্যা হইতেই একটা নমুনা দিতেছিঃ—শুভ বিবাহ তত্ত্বের সমালোচনায় বলা হইয়াছে "শাস্ত্র বচন যত উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে শাস্ত্র প্রণয়ন কালে এদেশে বালিকা-বিবাহ প্রচলিত ছিল না।" এইটি জুলুম্। বল, বালিকা বিবাহ ভাল নয়, তাহার এই এই যুক্তি ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু শাস্ত্র প্রণয়ন কালে বালিকা বিবাহ প্রচলিত ছিল না; একথার কোন মূল পাওয়া যায় না। পুরুষের বেশী বয়সে আর মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ হয়, ইহাই যেন শাস্ত্রের অভিমত বলিয়া বোধ হয়। আমরা প্রবাসীর ঝোঁক দেখাইবার জন্য এই কথার উল্লেখ করিলাম মাত্র। এটি উদ্বাহ তত্ত্বের সমালোচনা নহে। সে পুস্তক দেখিই নাই। প্রবাসীর চিত্রগুলি—সুন্দর অতি সুন্দর কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিস্তারিত বিবরণ দিলে, যেন, সোনায় সোহাগা হয় বলিয়া বোধ হয়। উড়িষ্যার পাঠশালার চিত্রে উড়িয়া বালকেরা পাঠশালায় বসিয়া তালপত্রে লিখিতেছে এইরূপ হইলে ভাল হইত।

প্রবাসীর 'গোরা' নামে গল্প রবি বাবুর লেখনী প্রসূত। গোরা গল্পে

মানব চিন্তার যেরূপ বিশ্লেষণ হইতেছে, সেরূপ বিশ্লেষণ, বাঙ্গালা ভাষায় ত নাইই, ইংরাজীতেও অল্প দেখা যায়। বিক্‌টর হুগোতে আছে। এইরূপ বিশ্লেষণে রবি বাবু অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইতেছেন। এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মানব চিন্তার ব্যবচ্ছেদ করা অতি সূক্ষ্ম অন্তর্দর্শীর কার্য্য। কিন্তু এরূপ ব্যবচ্ছেদ দর্শনের অঙ্গ বোধ করি কাব্যের অঙ্গ নহে। কাব্যানুযোগী চান, (Synthesis) প্রতিমা, তাহাতে সূক্ষ্ম শিল্প অবশ্যই থাকা চাই, কিন্তু সে সমস্ত শিল্প প্রাপ্ত-কেন্দ্র হইয়া সংযত ভাবে থাকিবে। আর যাহা কেন্দ্র গত আছে, তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে দার্শনিক ভাল বাসেন। দার্শনিক পাঠক সকল দেশেই কম, আমাদের দেশে আবার নিতান্ত কম; কাজেই গোরা গল্পের অদ্ভুত বিশ্লেষণ তাঁহাদের ভাল লাগিতেছেনা। এই বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া যদি দুই চারিটি প্রতিমা ফুটিয়া উঠে, তাহা হইলে, গোরার গল্প সমধিক আদরের সামগ্রী হইবে।

২। প্রবাসীর কথা অগ্রে বলা হইল বলিয়া বঙ্গদর্শনকে আমরা উপেক্ষা করিলাম, এমনটা কেহ যেন মনে না করেন। নবপর্য্যায়ের বঙ্গদর্শনে পুরাতন পর্য্যায়ের মত ভ্রূকুটি কুটিল ভ্রূভঙ্গিমার সঙ্গে সঙ্গে, অধরে মধুর হাসি না থাকুক, বঙ্গদর্শন বাঙ্গালা মাসিকের গৌরব রক্ষা করিতেছে।

বঙ্গদর্শনের কথায় শ্রীশচন্দ্রের অকাল মৃত্যুর জন্য আমরা শোক প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। শ্রীশচন্দ্রের সেই চারিদিকে কানী ভরা উজ্জ্বল চক্ষুর বুকভরা চাহনি আর ত দেখিতে পাইব না! বঙ্গের সাহিত্য-সেবীগণের উপর পোড়া কালের কুটিল কটাক্ষপাত বড় বিষম হইয়া উঠিল। এই উপলক্ষে 'স্মরণে' শীর্ষক ক্ষুদ্র কবিতা বড় সুন্দর।

৩। বিদ্যোদয়—বাঙ্গালার এক মাত্র সংস্কৃত মাসিক পত্র। ভাটপাড়া হইতে শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। আজ সাঁইত্রিশ বৎসর চলিতেছে, অতি দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইয়া থাকে, তবু বোধ হয় যেন অনেকে ইহার গৌরব বুঝেন না নতুবা এখনও জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের সংখ্যা কেন ইহাতে (১) প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—এখন বিদ্যাসুন্দর বাহির হইতেছে জানিনা এই বিদ্যাসুন্দর কতদিনের বা কাহার লিখিত, হয় সে কথা পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে, পড়ি নাই বলিয়া জানি না। (২) ইংরাজী

উৎকৃষ্ট নাটকের পরিচয় সংস্কৃতজ্ঞগণকে দিবার জন্য প্রসিদ্ধ সেক্সপিয়রের প্রসিদ্ধ হামলেট অনুবাদিত হইতেছে। অনুবাদ উৎকৃষ্ট তবে খানিকটা সংস্কৃত, খানিকটা ইংরাজী, এরূপভাবে না দিয়া অনুবাদের উপরে মূল ইংরাজি অংশ দিলেই যেন ভাল হয়। আরও অনেকবিধ প্রকরণ বিদ্যোদয়ে আছে—সংস্কৃত পরীক্ষার প্রশ্নাবলির সমালোচনা থাকিলে, বোধ হয় বিদ্যোদয় আরও সময়োপযোগী হইবে, এবং চতুষ্পাঠীর ছাত্রবৃন্দ আগ্রহে বিদ্যোদয় পাঠ করিবেন।

৪। সাহিত্য সংহিতা (সাহিত্য সভার মাসিক পত্র)। শোভাবাজারের রাজাদের কল্যাণে সাহিত্য পরিষতের একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সভা আছে—তাহাই সাহিত্য সভা। সংহিতা তাহারই মুখ পত্র। সে ভালই। যেখানে মন ভাঙ্গিয়াছে—সেখানে দেহ আর একহয়ে থাকিবে কিরূপ? দেখিতেছি সাহিত্য সংহিতায়—সাহিত্য সভায় পঠিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—অন্য প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়, এবং প্রাচীন বঙ্গগ্রন্থও প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডে "দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণীর," ও "ধর্ম্ম মঙ্গলের" খণ্ডশ প্রকাশ দেখিলাম। যোগেন্দ্র চন্দ্রের চেষ্টায়—ধর্ম্মমঙ্গল বঙ্গ গৃহস্থের ঘরে ঘরে উঠিয়াছে—আরও কি ধর্ম্ম মঙ্গলের প্রচার আবশ্যক? জানি না—হয় ত কিছু নূতনত্ব আছে। তা থাকুক—এই খণ্ড ধর্ম্ম মঙ্গলে যে স্পষ্ট ছাপার ভুল অনেক রহিয়াছে—তাহার উপায় কি? রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নীলু দম্‌কাকে, তাহার গান শুনিয়া জিজ্ঞাসা করেন "নীলু আজি একি তাল?" নীলু জোড় হস্তে উত্তর করিয়াছিল, "আজ্ঞে, আজি বেতাল।" তাই নাকি?

৫। কার্ত্তিকের ভারতীতে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর একটি বড় সুন্দর প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। "কি ও কেন।" ভারতের কলাশিল্প জিনিষটা কি? ও কেন তাহার আলোচনা করিতে হয়। এমন কেনর যে উত্তর দিতে হয়, এটি আমাদের অদৃষ্ট। এখন পিতা মাতার সেবায় নিত্য পরাঙ্মুখ যুবকগণ 'স্বদেশীর' নৈমিত্তিক সেবা করিয়া প্রশংসা প্রাপ্ত হয়, বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবায় স্বগ্রামে থাকিলে কৈফিয়ৎ দিতে হয়। দেশের তাঁতির কাপড় পড়িলে ভ্রূকুটিপাত সহ্য করিতে হয়। অবনীন্দ্র বাবু যে ভারতের চিত্র শিল্পের সেবা পরায়ণ হইয়া কৈফিয়ৎ গ্রস্ত

হইয়াছেন, তাহা বিচিত্র নহে। কৈফিয়ৎও নরম গরম কার্য্যকাগে ভাল হইয়াছে। তবে ভারতীয় চিত্র শিল্প বা ভাস্কর্য্য, জিনিষটার বৈচিত্র কি তাহা তিনি বুঝাইয়া দেন নাই; রাগিয়া বলিয়াছেন, কাণাকে আর কি বুঝাইব? কথাটা ঠিক—কিন্তু রাগ করিলে চলিবে না। অবনীন্দ্র বাবু কেবল তুলিকাধারী চিত্রকর নহেন, তিনি বুঝাইবার জন্ত যখন লেখনী ধারণ করেন, তখনও সিদ্ধ হস্তে সেই লেখনী চালনা করিয়া থাকেন। আমরা অন্ধ বটে কিন্তু তাঁহার সিদ্ধ হস্তের পদ্ম মধুমনী লেখনীর চালনায়, আমাদের চক্ষু ফুটিবে—অন্ধকে দয়া কর, বাবা—ভারতীতে প্রবন্ধ লিখিয়া, ভারতীয় চিত্র শিল্প জিনিষটা কি, তাহা ভাল করিয়া আমাদের বুঝাইয়া দাও।

৬। কমলা বড় পিছাইয়া আছে। মে মাসের সংখ্যা পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। ভাল লোক লেখেন, লেখাও বেশ—কিন্তু এত পিছাইয়া থাকিলে চলিবে কেন?

৭। কোহিনূর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ। বড় পিছাইয়া আছেন। কোহিনূর হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি উদ্দেশ্যে প্রকাশিত। বাস্তবিক হিন্দু ধর্ম্মের ও হিন্দু সমাজের যদি পুনঃস্থাপন হয়, তাহা হইলে, মুসলমানের সহিত হিন্দুর বিরোধ হইবার কোন কারণ নাই। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ অধিকতর জীবন্ত ছিল, কৈ বিরোধ ত ছিল না? তবে এখন আশঙ্কা কেন?

৮। উপাসনা পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। এখনও বুঝিতে পারি নাই, উপাসনার গতি কোন দিকে। এক স্থানে পড়িলাম—"উপাসনা পত্রিকা শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের জন্ত পরিচালিত হইয়া থাকে; এই জন্ত উপরি উদ্ধৃত ইংরাজি টুকুর অনুবাদ না দিলেও চলিতে পারে।" এখানে শিক্ষিত অর্থে ইংরাজিতে শিক্ষিত। কেবল ইংরাজি শিক্ষিতে কি, এ বেদান্ত-বিচার? 'পরলোক রহস্য' এবং 'দেবতা ও মানুষ' লইয়া, কার কাটাইতে পারেন? আমাদের বোধ হয় পারেন না। নতুবা উপাসনা সুন্দর হইয়াও তেমন আদর পায় নাই কেন?

৯। মুকুল, কার্ত্তিক। বালক বালিকাদিগের জন্ত সচিত্র মাসিক পত্র। চতুর্দ্দশ বর্ষ চলিতেছে—উত্তম। কিন্তু ইহাতে বিলাতের পার্লা

মেণ্টের কথা কেন? একথা জিজ্ঞাসা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল ছেলেপিলে বলিয়া নয়, যুবকেরা পর্য্যন্ত দেখা যায়, দেশের কিছুই জানে না। যাহারা পঞ্চায়ৎ জানে না, তাহাদের পার্লামেণ্ট কি—তাহা বুঝানর প্রয়োজন কি? যাহাতে সমাজের পরিচয়, দেশের পরিচয়—এখন অপেক্ষা অধিকতর রূপে ছাত্রেরা পায়, তাহার উপায় করা, আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য।

১০। পল্লীচিত্র দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম সংখ্যা ও দ্বিতীয় সংখ্যা ভাদ্র ও আশ্বিনের। বাগেরহাট হইতে প্রকাশিত। এই ক্ষুদ্র পত্রিকা—রত্ন-কণিকা। ভাবে ভাষায় অনেক স্থলে কাঁচা হাতের পরিচয় থাকিলেও, সম্পাদক, প্রকাশক ও লেখকগণের, উদ্যম, উদ্যোগ, সাহস এবং যত্নের প্রশংসা একমুখে করা যায় না। ইহার উপর যদি নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায় থাকে, অগ্রে শিক্ষা করিয়া তবে শিক্ষা দিব, এই জ্ঞান যদি বলবৎ থাকে, তবে ভরসা করা যায়, পল্লী চিত্র দুই চারি বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালার পল্লী মধ্যে সৎশিক্ষা বিস্তারের প্রকৃষ্ট উপাদান হইবে। আরও ভরসা করা যায়, পল্লী চিত্র সহরের আবর্জ্জনা হইতে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন এবং ইংরাজী কথাটা মনে রাখিবেন God made the country, man made the town. পল্লী প্রান্তর ভগবানের, নগর চত্বর মানবের মাত্র।

১১। পন্থা (ভাদ্র) বিশেষ সম্প্রদায়ের পত্র, বিশেষ শ্রেণীর পাঠকের জন্ত লিখিত, সাধারণ পাঠ্য পূর্ণিমার সমালোচনা চলে না—আর আমি তাহা পারিবও না।

১২। উদ্বোধন (ভাদ্র ও আশ্বিন) ইহাও বিশেষ শ্রেণীর—পত্র বটে, তবে সর্ব্বজনের সুখপাঠ্য অনেক কথা থাকে। আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথা নিতান্ত অমৃতময়ী, পাঠ করিলে অমরত্ব লাভ হয়। বাঙ্গালায় এই সকল কথা যতই প্রচার হইবে, ততই মঙ্গল।

১৩। ধর্ম্ম প্রচারক (আশ্বিন) হইতে নবদ্বীপ সমাজের অনুষ্ঠান পত্র বিষদংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নবদ্বীপ সমাজে যোগ-দান করিলে, মহতী কীর্ত্তি স্থাপিত হইবে। আমরা স্বদেশ চিনিতে পারিব।

"আমাদের বর্ণাশ্রম সমাজ রক্ষা করিতে হইলে, ব্রাহ্মণ রক্ষার উপায় বিধান করাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণত্ব রক্ষিত হইলে বৈদিক ধর্ম্মের রক্ষা হইবে। কেননা সমুদায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই ব্রাহ্মণের অধীন। ব্রাহ্মণই সকল বর্ণের গুরু, অধিনায়ক এবং সৎপথের প্রদর্শক। কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয় যে, শাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণেরাও প্রায়শঃ ধনহীন ও আশ্রয়হীন হইয়া এবং ক্বচিৎ বা লোভাদির বশীভূত হইয়া সমাজ রক্ষা বিষয়ে শিথিল প্রযত্ন হইয়াছেন। সুতরাং শাস্ত্রব্যবসায়িগণের মধ্যে একতার হানি হইয়াছে, এবং তাহার ফলে অনেকেই জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ সামাজিক বিশৃঙ্খলার সহায়তা করিতেছেন। এই স্বাতন্ত্র্যের এবং বিচ্ছিন্ন ভাবের প্রতিকারার্থে প্রথমতঃ শাস্ত্রব্যবসায়িগণের মধ্যে একতা স্থাপনের চেষ্টা করাই নবদ্বীপ সমাজ প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য। শাস্ত্রাধ্যাপক মহাশয়গণ সমাজ গুরু স্বরূপে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে এবং স্ব স্ব মর্য্যাদা রক্ষায় যত্নশীল হইলে ক্রমশঃ সমাজ প্রবিষ্ট সমস্ত দোষেরই পরিহার হইবে—এ আশা দুরাশা নহে। সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া শাস্ত্রব্যবসায়ী কতিপয় প্রধান প্রধান ব্যক্তি বঙ্গদেশের সকল স্থানের অধ্যাপক মহাশয়দিগকে একতাসূত্রে গ্রথিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। যিনি যে স্থানে থাকিয়াই প্রাচীন রীতি অনুসারে স্বাধীন ভাবে শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেছেন, তিনি এই নবদ্বীপ সমাজভুক্ত হউন এবং সকলে মিলিয়া বঙ্গদেশে বর্ণাশ্রম সমাজের প্রকৃত অধিনায়কতা করুন, ইহাই বাঞ্ছিত এবং প্রার্থনীয়। সামান্যাকারে অধ্যয়ন অধ্যাপনার যাহাতে উৎকর্ষ হয়, স্ব স্ব সম্প্রদায় বিহিত সদাচারের সুপ্রতিষ্ঠা হয়, সদ্‌ব্রাহ্মণগণের তপস্যার সুযোগ হয়, ব্রহ্মচর্য্যের পুনঃপ্রবর্ত্তন হয় এবং বেদবেদাঙ্গের অধ্যয়ন অধ্যাপনার বিধান হয়—তদর্থেই নবদ্বীপ সমাজ সর্ব্বতোভাবে যত্নবান হইবে। যিনি স্বকীয় অনুভবে সমাজে মঙ্গল এবং ধর্ম্মবিদ্রোহ ও সমাজবিদ্রোহের বারণ ইচ্ছা করেন তিনি এই লোকহিতকর কার্য্যে অগ্রসর হইবেন।"

১৪। বামাবোধিনী (ভাদ্র ও আশ্বিন) বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী লেখক, উন্নতিশীল মহাশয়দিগকে, তাঁহাদের সৎসাহস নাই বলিয়া অনেক কথা বলিয়াছেন। বলিয়াছেন "হিন্দু-সমাজে যাঁহারা উদারতার পরিচয়

দেন * * * তাঁহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ দিতে বা করিতে কয়জনকে দেখা যায়? হায়! এমন করিয়া কি তাঁহারা সমাজকে উন্নত করিবেন?" লেখককে কাজেই জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্তি হয়—এত কথা এত লোককে বলিলেন, নিজের নামটি, প্রকাশ করিতে সৎ সাহস হইল না কেন? "হায়! এমন করিয়া কি সমাজকে উন্নত করিবে?"

১৫। মহাজন বন্ধু (ভাদ্র আশ্বিন) ভাদ্র সংখ্যার প্রথমেই মহাজন বন্ধু লিখিয়াছেন "ভারতের যে দলের সহিত গবর্নমেণ্টের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, সেই শিক্ষিত দলের একজন মনস্বী গত শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা নামক মাসিক পত্রে মহাজন বন্ধুর সমালোচনা করিয়াছেন।" আমি নাম দিয়া পূর্ণিমায় লিখি, তথাপি মহাজন বন্ধু 'মনস্বী' বলিয়াছেন, এ সার্টিফিকেট মাথায় পাতিয়া লইলাম, কিন্তু যে দলের সহিত গবর্নমেণ্টের বিরোধ সেই দলের আমি একজন—এই বিষম কথার আন্তরিক প্রতিবাদ করিতেছি। ভয়ে নহে, সত্যের মুখ চাহিয়া। আমি ক্ষুদ্র হইলেও আমার মত মতাবলম্বী অন্ততঃ লক্ষ লোক আছেন, আমি তাঁহাদের মুখ চাহিয়া বলিতেছি, আমরা ঘোরতর স্বদেশী সুতরাং শান্তিপ্রিয়। গবর্নমেণ্টের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নাই। বয়কট করিয়া, ইংরেজ সওদাগরদিগের পকেটে হাত দিয়া, (সুরেন্দ্রবাবুর ভাষায়) গাঁট কাটার কার্য্য করিয়া ইংরাজ জাতির মত আমাদিগের দুর্দ্দশার দিকে আকৃষ্ট করিব, করিয়া ভগ্ন দণ্ড জোড়া লাগাইব,—এমন দুরাশা আমরা কখন করি নাই, করিব না। সুতরাং আমাদের সহিত গবর্ণমেণ্টের বিরোধ নাই।

১। আমরা শান্তি-প্রিয়; কাজেই কৃষির উন্নতির ও বিস্তৃতির পক্ষপাতী গবর্নমেণ্টও কৃষির পক্ষপাতী। কৃষিতে শান্তি ও পল্লীর উন্নতি আছে, মহাজন বন্ধু পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়াছেন।

২। আমরা বিলাতী লবণ বা জাবার চিনি চাহিনা—আহারে অপবিত্র স্পর্শ হওয়ার আশঙ্কায়। ইহাতে গবর্নমেণ্টের সহিত বিরোধিতা কিছু নাই। লবণ এখন আসে জর্ম্মনী হইতে; চিনি আসে যব বা মরীচি দ্বীপ হইতে।

৩। দেশী হৌক, বিদেশী হৌক, আমরা সকলরূপ বিলাসের দ্রব্য ত্যাগ

করিতে সকলকে পরামর্শ দিই—নতুবা আমরা ব্যয় সঙ্কুলান করিতে পারি না।

৪। আমরা ফঙ্গ বেণে, চক্‌চকে জিনিষ ত্যাগ করিতে বলি; বাসকহ পরিহার করিতে হইবে বলিয়া। আর কতকাল ছেলে খেলা করিয়া কাটাইব বল? এই সকল জিনিষ বিদেশ হইতেই বেশী আসে।

৫। বিপুল মূল ধনে বড় বড় কাপড়ের কল বা অন্য কল বসিলে, ভারতের বা বঙ্গের উন্নতি হইবে, এমন বিশ্বাস বা ধারণা আমাদের নাই। জগৎ জুড়িয়া বড় বড় কল কারখানা আছে, সর্ব্বত্রই দেখা যায়, কল কারখানার কল্যানে মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোক খুব ধনী হইতেছে, আর লক্ষ লক্ষ লোক দীন হীন দাসত্বে নিযুক্ত আছে—কতকগুলির আবার সে দাসত্বও জুটেনা, তাহারা ভব ঘুরে বা ভিক্ষুক, অথবা চোর দস্যু হইতেছে। এইরূপ নাগরিক উন্নতির আমরা প্রয়াসী নহি। আমরা পল্লীর উন্নতি চাই। কাঁটাগোড়ে, বা কাঞ্চন নগরে, প্রেমচাঁদ বা দ্বারিকা নিধি পঞ্চাশ জন কারিগর লইয়া যে কারখানা করেন, তাহারই উন্নতি এবং তার বিস্তৃতি দেখিতে আমরা চাই—বর্মিংহাম্ বা শেফীল্‌ডের মত লক্ষ লক্ষ কুলি মজুর লইয়া কারখানা বসাইতে আমরা চাহি না। ইহাতেও গবর্নমেণ্টের সঙ্গে আমাদের বিরোধ নাই। আসল কথা ইংরাজের সঙ্গে বা ইংরাজ গবর্নমেণ্টের সঙ্গে, এই সকল ব্যাপারে আমাদের কিছু মাত্র বিরোধ নাই। আমাদের বিরোধ ইংরেজের সঙ্গে নহে, ইংরেজিয়ানার সঙ্গে। আমরা অশনে বসনে, কাজ কারবারে, ব্যবসায় বাণিজ্যে কিছুতেই ইংরেজিয়ানা ভাল বাসি না; ইচ্ছা করি, সকলেই ঐরূপ ইংরেজিয়ানা ভারত পক্ষে পরিহার করেন। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা এইরূপ স্বদেশী ও স্বধর্ম্মী ছিলেন, কৈ তাঁহারা ত কখন, পাঠান রাজের বা মোগল বাদশাহের বা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত এই সকল ব্যাপারে বিরোধ করেন নাই। আমরাই বা এখন করিব কেন?

কদমতলা, চুঁচুড়া। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

বউ কথা কও।

স্তব্ধ চারি দিক!
কোন পাখী নাহি গায়, বিশ্ব যেন শূন্য প্রায়,
গ্রাম্যপথে চলে না পথিক।
ধূসরা ঊষসি—
এখনো আঁচলে তারা, পাণ্ডু চাঁদ জ্যোতি-হারা,
সমীরণ উঠেনি নিশ্বসি',
কুল বনে পশি'।

বিশ্ব তন্দ্রাতুর।
নিশি না হইতে ভোর, ভাঙায়ে ঘুমের ঘোর,
কোথা হ'তে উঠে হেন সুর—
'বউ কথা কও।'
বুঝি বা আদিম প্রাতে, কে যেন ধরিয়া হাতে
ব'লেছিল—"সুপ্রসন্ন হও,
বধূ কথা কও।"

নিমীল-নয়ন—
প্রকৃতি ঘুমায়েছিল, কে যেন জাগা'য়ে দিল,
আজো তাই শুনি সেই স্বন—
"বধূ কথা কও!"
তাই কি শিখেছে পাখি, দিকে দিকে উঠে ডাকি—
সকরুণ—'বউ কথা কও;
অকরুণ নও।'

ল'য়ে প্রেমরাশি,
শত অপরাধী হ'য়ে কবে কে গিয়াছে ক'রে—
"কথা কও—আছি উপবাসী!
হে মৌনী সুন্দরি!
নাহি প্রেম—নাহি স্নেহ, নাহি অন্তরের কেহ
দিতে ভাষা ওষ্ঠপুট ভরি',
তোমার, সুন্দরি।

অয়ি প্রেমহীনা,
খুলিবে গুণ্ঠন কবে, কবে হায় কথা ক'বে
থামিবে করুণ বিশ্ববীণা—
'বধূ কথা কও।'
হে মানিনি, হে সুন্দরি, কথা কও, ক্ষমা করি,
সঁপি পদে প্রেমঅর্ঘ্য লও—
'বধূ কথা কও।'

হে অভিমানিনি,
এত কি কঠিন পণ, যুগে যুগে আকিঞ্চন,
তবু তুমি মৌনী-উদাসিনী!
তুমি কারো নও;
ব্যর্থ প্রেম রাশি তাই উঠিছে করুণ গাই'—
দিবা সন্ধ্যা—'বউ কথা কও'
সুপ্রসন্ন হও।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

সহানুভূতি।

সহানুভূতি। Sympathy: Sym = together, Equal ; pathos = feeling —সমবেদনা। সহানুভূতি হইতেছে মানব হৃদয়ের বৃত্তি। বৃত্তি ভাল মন্দ দুই প্রকারের। এক শ্রেণীর বৃত্তি যাহা স্বর্গের দিকে ভগবানের দিকে লইয়া যায়, অপর শ্রেণীর যাহা নরকের দ্বারে লইয়া যায়। পণ্ডিত শশধর ঊর্দ্ধ স্রোতস্বিনী ও অধঃ স্রোতস্বিনী বলিয়া বৃত্তিগুলির বিভাগ করিয়াছিলেন। জেন্দাবেস্তায় (অথর্ব্ব বেদেরই রূপান্তর) বলা হইয়াছে যে দুইজন কর্ত্তা আছে, একজন সৎকর্ম্মের অপরজন অসৎ কর্ম্মের; অর্মজ্দ ও আহির্মান।

মানব হৃদয়ের যে সকল বৃত্তি আছে তাহাদের অনুশীলন দ্বারা উন্নতি করাইতে হয়। হৃদয়ে অঙ্কুর আছে, অঙ্কুরে সার দেও, জল সেচন কর, উত্তাপ দাও, অনাতপ দাও, ক্রমে অঙ্কুর একটি বৃক্ষে পরিণত হইবে। আবার ভাল করিয়া পাঠ্ করিতে পারেন, তবে ফল প্রদান করিবে। হিন্দুদিগের গুরুগণ শিষ্যের কর্ণে বীজ মন্ত্র প্রদান করেন। শিষ্য সাধনা জপ প্রভৃতি অনুশীলন দ্বারা সেই বীজ অঙ্কুরিত করেন, পরে বৃক্ষরূপী হইলে সেই বীজ ফল প্রদান করে—মানুষ তখন সিদ্ধ হয়। সাধকের আশা পূর্ণ হয়। মানুষ তখন দেবতা হইয়া যান। জীব শিব কথা মিথ্যা নহে, তবে অনুশীলন চাই। শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবু তাঁহার ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার একস্থলে বলিয়াছেন, শিক্ষিত ব্যক্তিও যদি সৎ প্রবৃত্তির অনুশীলন না করে, তবে অসৎসঙ্গে পতিত হইয়া, সে শীঘ্রই গর্দ্দভরূপে তৃণ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করে। আর তাহার বিপরীত, ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতি রেকা—সে কেবল অনুশীলনের ফল।

তাই বলি "সহানুভূতি" বলিয়া আমাদের হৃদয়ের যে সৎ প্রবৃত্তি আছে, তাহার অনুশীলন দ্বারা পুষ্টি করিতে হইবে। যদি বলেন, কেন করিব? তাহা হইলে তাঁহার সহিত আমাদের আর কোন তর্ক নাই। যে মনে করিলে, ঘরে আগুণ দিতে পারে, কিন্তু দেয় না বা সর্ব্বদা দেয়

না। ইহাতে পুণ্য নাই কিন্তু একটি দহ্যমান ঘরকে অগ্নি মুক্ত করায় পুণ্য আছে। যদি কাহারও ভাল হইতে ইচ্ছা হয়, যদি ভাল কাজ করিয়া কেহ নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতে ইচ্ছুক হন, তবে তাঁহাকেও বলি অপরাপর সৎ বৃত্তিগুলির ন্যায় সহানুভূতির "অনুশীলন" চাই। ইহার অনুশীলন কেবল চিন্তায় হয় না—ইহার অনুশীলন কার্য্য দ্বারা হয়।

এই সহানুভূতি বৃত্তি বলে জগতে ইতিহাস গঠিত হইয়াছে। আপনারা ক্রুসেড বা ধর্ম্ম যুদ্ধের কথা শুনিয়াছেন। য়ুরোপের যে উন্নতি হইয়াছে তাহার মূল কারণ এসিয়া। এক একটি ভাবের তরঙ্গ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে, য়ুরোপের মানবের মনরূপ তটে বার বার আঘাত করিয়াছে—সেই আঘাতের ফলে প্রতিঘাত হইয়াছে, ক্রমে য়ুরোপের চক্ষু খুলিয়া গিয়াছে। নূতন দেখিয়া নূতন শিখিয়া সে একটা নিজে নূতন হইয়া পড়িয়াছে। মুসলমান যখন এক হস্তে উন্মুক্ত কোরাণ ধারণ করিয়া ও অন্য হস্তে উন্মুক্ত তরবারি ধারণ করিয়া য়ুরোপ মুখে, এমন কি স্পেন পর্য্যন্ত ছুটিয়াছিল—তখন য়ুরোপ একবার শিখিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিল। যখন যীশু খৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন, তখন য়ুরোপ তাহার কোন সন্ধানই পান নাই, কিন্তু যখন রোম নগরে লোক নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে আরম্ভ হইল, তখন য়ুরোপের শিখিবার আর একটি দিন গিয়াছে। তার পর আবার শিখিবার দিন আসিয়াছিল বহুবর্ষব্যাপী ক্রুসেড্ বা ধর্ম্মযুদ্ধ সময়ে। যেরুশিলাম নগর খৃষ্টান-দের তীর্থ স্থান, আমাদের যেমন কাশী, মুসলমানদের মক্কা।

খৃষ্টান তীর্থ যাত্রীর উপর নিদারুণ অত্যাচার হইয়াছিল। যাত্রীরা সকলে ফিরিতে পাইতেন না—যাঁহারা ফিরিতেন, য়ুরোপের দেশে দেশে, নগরে নগরে, আপনাদের দুঃখ কাহিনী গাহিয়া বেড়াইতেন ও ধর্ম্মের তীর্থ-যাত্রীর অবমাননা জন্য তপ্ত অশ্রু ত্যাগ করিতেন। শুনিয়া শুনিয়া য়ুরোপের শান্তিভঙ্গ হইল, সহানুভূতির প্রবল বন্যায় য়ুরোপ ভাসিয়া গেল—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, ইতালি প্রভৃতি সকল দেশ এক হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল, তীর্থ-যাত্রীর অপমান আর আমরা সহ্য করিব না, পবিত্র তীর্থ যেরুসালেম আর বিধর্ম্মীর হস্তে থাকিবে না। যুদ্ধং দেহি। য়ুরোপ

সহানুভূতির এই প্রবল আবেগে ভূকম্পনের ন্যায় থর থর কাঁপিয়াছিল। এই সহানুভূতির ফলে দ্বাদশ বর্ষব্যাপী মহাসমর হইয়াছিল। ইতিহাস লিখিতেছি না; সুতরাং এইখানে ঐ কথার শেষ করিলাম। কিরূপে ইতিহাস গঠিত হইয়াছে, সহানুভূতি তাহার মধ্যে কতটা কাজ করিয়াছে, তাহাই দেখাইতছি।

স্পেন ও পর্টুগালে যে শত বর্ষব্যাপী সমর হইয়াছিল, সেও সহানুভূতির ফল।

যখন নেপোলিয়ান বোনাপার্টীর অত্যাচারে ক্ষুদ্র ইংলণ্ড দ্বীপ হইতে রুষিয়া মহাদেশ পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল—যখন এরূপ অত্যাচার দেখিয়া সকলে শিহরিয়া উঠিলেন, তখনি অপর জাতি ও ইংরেজ যোট বাঁধিয়াছিল। সেই সহানুভূতির ফলেই য়ুরোপ এক হইয়াছিল, জলের ন্যায় রক্ত প্রবাহ ছুটিয়াছিল, ফনটেনব্লু ও ওয়াটরলু ক্ষেত্রে সেই সহানুভূতি ব্রতের উদ্‌যাপন হইয়াছিল।

কেবল যে সহানুভূতির ফলে যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়াছে এমন নহে, কেবল যে ধরিত্রী মানুষের রক্তে কলঙ্কিত হইয়াছেন, এমন নহে, সহানুভূতি বিনা রক্তপাতেও অনেক কাজ করিয়াছে। আয়ার্লণ্ডে দুর্ভিক্ষ হইলে ভারতবাসী কেন চাঁদা দিয়া সাহায্য করিয়াছিল? পৃথিবী যখন ঝটিকাঘাতে কদলী বৃক্ষের ন্যায় থর থর কাঁপিয়াছিল, যখন সুদূর আটলাণ্টিক বক্ষে জামেকার রাজধানী ধূলায় পরিণত হইয়াছিল, তখন পৃথিবীর লোকের নয়ন কোণে কেন তপ্ত অশ্রু ঝরিয়াছিল? কেন তখন সযতনে পৃথিবীর নর নারী আপনাদের কোষ তন্তু উন্মুক্ত করিয়াছিল? কেন তখন অনেকে দক্ষিণ হস্ত কি করিতেছে, বাম হস্তকে জানিতে দেয় নাই? যখন শ্বেত নর নারী কাঙ্গাড়া ভূকম্পনে হিমালয়ের সানুদেশে প্রোথিত অবস্থায় যমের দ্বার দেশে নীত হইয়াছিল, তখন পঞ্জাবী প্রমুখ কৃষ্ণকায় ভারত-সন্তান-গণই না অর্থ সামর্থ্য, ধন, দেহ, প্রাণ দিয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্ব প্রকারে সাহায্য করিয়াছিল? হাওয়ার্ডের হৃদয় বিশাল ও উদার ছিল বলিয়াই ইংলণ্ডে জেলের সংস্কার হইয়াছিল। উইলবারফোর্স সহানুভূতি জরে জ্বরমান হইয়াছিলেন বলিয়াই ২২ বৎসর অকাতর পরিশ্রম করিয়া শেষে

আমেরিকায় দাস ব্যবসা প্রথা রহিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সহানুভূতির ফলেই অধুনা মুসলমানের সাহায্য জন্য নিজাম রাজ্যে হিন্দুর অর্থ যাইতেছে।

আর এক প্রকার সহানুভূতি আছে, তাহার নাম আপনারা জানেন। তাহাকে "শান্তিপুরে" বলে। যে সহানুভূতির ফলে শান্তিপুরবাসী কুটুম্বকে বলেন "বেলা বড় অধিক হইয়াছে, এত বেলায় গৃহস্থের বাড়ী হইতে কি যাইতে আছে? তবে তুমি যখন থাকিবে না, তখন পথে দোকানে জল খাইয়া যাইও। পয়সা না থাকিলে উড়ানি বা ছাতা বাঁধা দিয়া জল খাইও—আমার মাথা খাও যেন ভুলিও না।" এইরূপ শান্তিপুরে সহানুভূতি আমরা এখন পাইতেছি—ট্রান্‌স্‌ভালে। মহারাণীর ঘোষণা পত্রের বলে সকল বৃটীস প্রজা এক, অতএব "এস ভারতবাসী আঙ্গুলের ছাপ দাও, দেখো যেন রাস্তা দিয়া চলিও না, দেখো যেন আমাদের গাড়ীতে উঠিও না—দেখো যেন ভিন্ন পাড়ায় তোমার বাসা হয়।"

"এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বসো,
একবার নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি হে॥"

—বৈষ্ণব কবি প্রেমানন্দে গাহিয়া ছিলেন। আর আজ জাত্যানন্দে উৎফুল্ল হইয়া বীর বুয়রজাতি স্ফুট স্বরে গাহিতেছেন—

"এস এস গাঁধি এস, জেলের পোষাকে এস,
একবার ঐ বেশে তোমায় সহর ভ্রমাই হে"।

সহানুভূতি কি না?

ইংলণ্ড বড় স্বদেশ বৎসল, স্বজাতি বৎসল এবং সহানুভূতিতে ইহাদের হৃদয় পরিপূর্ণ। আপনারা দেখিয়াছেন, ভারতে দুর্ভিক্ষ হইলে Mansion House Fund খোলা হইয়াছিল। ইংলণ্ডে "বালক বালিকার প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারনী সভা" আছে। ইহাদের সহানুভূতির মাত্রা এত বেশী যে মানব মণ্ডল ছাপাইয়া ইঁহাদের সহানুভূতি পশু মণ্ডলে গিয়া পঁহুছিয়াছে। সুতরাং ইঁহারা "পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারনী সভা" পর্য্যন্ত করিয়াছেন। ইঁহাদের এটি এত আদরের জিনিষ যে যেখানে যান

সঙ্গে করিয়া এইগুলি লইয়া যান। আমাদের ভারতেও "পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারনী সভা" হইয়াছে। কাঁকড়ার দাড়া ভাঙ্গিয়াছিল বলিয়া মহনীর দণ্ড হইয়াছিল, কলিকাতা হাইকোর্টের নজিরে প্রকাশ। এই সব দেখিয়া শুনিয়া ও ট্রান্‌স্‌ভালের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মনে হয়—অদৃষ্টকে ধিক্কার—

"ঠাকুর তুমি ত দয়াল বট
আমারই কেবল ভাগ্য খাট।"

এই যে শেষোক্ত কথাটি বলিলাম, ইহা রহস্যের জন্য নয়—যদিও কাহারও রহস্য কাহারও মৃত্যু সমান—ঈশপের গল্পে আছে। বালকেরা ভেকগণের উপর ঢিল মারিতেছিল। বালকের পক্ষে রহস্য, ভেকের কিন্তু প্রাণান্ত। ইহাতে বুয়র জাতির স্বজাতি বৎসলতা দেখা যায় এবং ইহারই ফলে ইঁহাদের এত উন্নতি। আমাদের দেশে এই সহানুভূতির বিশেষ অভাব বলিয়াই আমাদের এত কষ্ট। রাম ভুগিতেছে, রাম দুঃখে পড়িয়াছে, রাম মোকদ্দমার দায়ে পড়িয়াছে, তা আমার কি? তাঁতিরা খাইতে পাইতেছে না, তাঁতের কার্য্য ছাড়িয়া চাকরী স্বীকার করিতেছে, খানসামা হইতেছে, তা আমার কি? জোলারা খাইতে পাইতেছে না, তা আমার কি? ইহাতেই এদেশের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে।

ব্যক্তিগত সহানুভূতি ও দয়া দ্বারা ব্যক্তিগত দুঃখ নিবারিত হইতে পারে। ক্ষুধিতকে অন্ন দান, পীড়িতকে ঔষধ দান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান, গৃহহীনকে আশ্রয় দান, এই সকল কার্য্য ব্যক্তিগত কার্য্যের বা চেষ্টা বা উদ্যমের দ্বারা হইতে পারে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন, এক মুটা চাল ভিক্ষুককে বাড়ীর ছেলে অনায়াসে দিতে পারে কিন্তু কাশী বা বৈদ্যনাথ পর্য্যন্ত রেলভাড়া দিতে হইলে বাড়ীর কর্ত্তাকে জানাইতে হয়। সেইরূপ প্রতিবেশী বা রাহী জনের বা পথ ভ্রান্ত পথিকের জন্য ব্যক্তিগত সহানুভূতিই যথেষ্ট, কিন্তু যখন বরিশাল বা উড়িষ্যা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বা মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে হইবে, তখন তোমার আমার একেলার চেষ্টায় কি হইবে? তখন সমগ্র জাতির সমবেত চেষ্টার ও স্থির উদ্যমের আবশ্যকতা। উপদেশ অনেকেই দেন, অনেকেই শুনেন, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত;

উপদেশানুসারে কেহ কার্য্য করেন না। পারসিক কবি হাফেজ বলিয়াছেন—দেওয়ালের গায়ে যদি উপদেশ লেখা থাকে, গ্রহণ কর, মঙ্গল হইবে। বোধ হয় সে দেশের লোকে তখন উপদেশ শুনিত। যাহাহৌক আমাদের দেশের লোক সকলে এক জোট হইয়া যে কার্য্য করিতে শিখিয়াছেন ইহা অপেক্ষা আনন্দের কথা আর কি আছে? বরিশালের দুর্ভিক্ষ, বসীরহাটের, খানাকুলের দুর্ভিক্ষে ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের দুর্ভিক্ষে ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। উড়িষ্যাবাসীও বঙ্গবাসীর নিকট এ বিষয়ে উপকৃত। তাই বলি সহানুভূতির ফল ফলিয়াছে।

জাতিগত সহানুভূতিতে বিভিন্নতা আছে। কোন কোন জাতি গরু কাটিয়া জুতা দান করিয়া থাকেন। কাঁকড়ার দাড়া ভাঙ্গায় যাঁহার প্রাণে ব্যথা লাগে, সে কেমন করিয়া পশু হত্যা সহ্য করে, বলিতে পারেন। একজন ভিখারী ভিক্ষা চাহিলে বা রাস্তায় বাহির হইলে তাহাকে জেলে দিব কিন্তু শত সহস্র ভিখারী দল বাঁধিয়া আসিলে বেকার বলিয়া আদর করিয়া আহারের সংস্থান করিয়া দিব—এমনও ত দেখিয়াছেন? ইহা আমাদের চক্ষে বিড়ম্বনা বলিয়া বোধ হয়। বিড়ম্বনা চিরকালই আছে ও থাকিবে, শুনিয়াছি সাজাহান বাদসাহের আমলে ভারতে গো-হত্যা হইত না, আর আলমগিরের আমলে দেব দেবীর মুণ্ড উড়িয়া গেল কিন্তু অপরের দোষ গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা নাই। আমরা নীর ত্যাগ করিয়া হংসের ন্যায় কেবল, ক্ষীর মাত্র গ্রহণ করিব এবং সর্ব্ব নিয়ন্তা ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিব যেন বিড়ম্বনায় পতিত না হইয়া সর্ব্ব ভাবে সহানুভূতি ও দয়ার বিকাশ দেখাইয়া সমাজে মনুষ্য নাম সার্থক করি। মা মহাশক্তি এই শক্তি দাও মা, মা জগদ্ধাত্রী তুমি যে পালন কর্ত্রী।

যাঁহারা ধর্ম্ম প্রচারক বা যাঁহারা নূতন ধর্ম্ম উদ্ভাবন করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই সহানুভূতির অবতার। ঈশা মূসা শ্রীচৈতন্য কার্লাইলেওটজী ইঁহাদের সার্ব্বজনীন প্রেম ও সহানুভূতির কথা কে না জানে? ইঁহারা প্রেমের দায়ে সহানুভূতির দায়ে কত কষ্ট—শারীরিক ও মানসিক—উভয়বিধ কত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, মর্ম্মভেদী কত দুঃখ সন্তাপ ভোগ

করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জ্ঞাত আছেন। ঈশা যীশু খৃষ্টকে দুরন্ত লোকে ক্রুশে হত্যা করিয়াছিল—গাত্রে পেরেক বিঁধিয়া দিয়া প্রাণে মারিয়াছিল। তিনি নিজের রক্ত দিয়া ভূমণ্ডলের পাপীর পাপ ধৌত করিয়াছিলেন। তিনি নিজে মস্তক পাতিয়া পাপীর পাপ ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। যীশুখৃষ্টের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের নামও আমরা করিতে পারি। মূর্ত্তিমতী স্নেহস্বরূপিনী মাতা, যিনি আবার পুত্র শোকে ম্রিয়মানা, সাক্ষাৎ প্রেমের অবতার স্বরূপ সতী বিষ্ণুপ্রিয়া, হৃদয়প্রতিম বন্ধুবর্গ, স্নেহাস্পদ ছাত্রবৃন্দ, এ সব একেবারে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, সংসার ত্যাগ করিয়া, চলিয়া গিয়াছিলেন জগতে প্রেম বিলাইতে—শ্রীশ্রীচৈতন্য। যে ভক্ত বলিয়াছেন, ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

ঈশা মূসা শ্রীচৈতন্য
তোমার প্রেমের ঘোরে অচৈতন্য।

তিনি যথার্থই বলিয়াছেন।——

যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে,
বলে—মেরেছ বেশ করেছ আবার মার,
কিন্তু একবার হরি বল—

তাঁহাদেরই একজন শ্রীচৈতন্য। জগাই মাধাই উদ্ধারের কথা জগতে চিরকালই অমৃত বর্ষণ করিবে। কিন্তু এই সকল দেবতার বা দেবোপম মানুষের সহানুভূতি মনুষ্যের দুঃখেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। কেবল মানুষের দুঃখে নয়, পশুর দুঃখেও প্রাণ কাঁদিয়াছিল, এমন মহানুভব সহানুভূতির অবতার ভারতবর্ষই দেখাইয়াছেন। পাঠক মহাশয়কে আর বলিয়া দিতে হইবে না, আমরা বুদ্ধদেবের কথা বলিতেছি; ইনি সহানুভূতির সম্রাট।

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয় হৃদয় দর্শিত পশু ঘাতং
কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর
জয় জগদীশ হরে।

আজ পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারনী সভা স্বরূপ কৃশ্চন জাতির বিড়ম্বনা

আমাদিগকে সহানুভূতির সম্রাট বুদ্ধদেব বা শাক্যমুনির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। যে কথা স্মরণ করিয়া হিন্দুরা বুদ্ধদেবকে নবমাবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; আর যে কথা স্মরণ করিয়া প্রেমোন্মাদে জয়দেব তাঁহার মধু অপেক্ষা মধু সুললিত ছন্দে ভাবে ভোর হইয়া গাহিয়াছেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেররহহ শ্রুতিজাতং
সদয় হৃদয় দর্শিত পশু ঘাতং
কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীরং
জয় জগদীশ হরে।

কে না সেই কপিলবাস্তুর রাজপুত্রের কথা জানে? কে না জানে কি করিয়া তিনি জরামৃত্যু ভিক্ষুক দর্শনে জগৎকে তৃণবৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এক মুহূর্ত্তে পিতা মাতা, প্রিয় পরিজন, সন্তান, প্রাণের প্রাণ প্রিয়তমা গোপাকে চির জীবনের মত কি করিয়া বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা অভিজ্ঞ মাত্রেই জানেন। কি করিয়া তিনি নিজে যোগসিদ্ধ হইয়া বোধি সত্ত্ব স্বরূপ হইয়া জগতে প্রেমভক্তি বিলাইয়াছিলেন, তাহা সাধক ও ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। কি করিয়া তিনি পশু ঘাত নিবারণ করিয়াছিলেন, একা পশুরক্ত নিঃসৃত নদীর বেগ ফিরাইয়াছিলেন, নদীও শুষ্ক করিয়াছিলেন, একা ব্রাহ্মণদের সহিত যুদ্ধ করিয়া পশু প্রাণ সংরক্ষণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা মনে করিয়া, অহিংসা পরমোধর্ম্ম তার স্মরে উচ্চারণ করিয়া বলুন, জয় জয় শাক্যমুনি। জয় প্রেমের জয়—জয় সহানুভূতির জয়।

একটা সৎ বৃত্তি ধরিয়া থাকিলেই, তাহার শেষ পর্য্যন্ত যাইতে পারিলেই ভগবানকে পাওয়া যায়, কিন্তু ভগবান কঠিন পরীক্ষা লয়েন। একটি উদাহরণ দিই। কর্ণ দান করিতে আরম্ভ করিলেন, দান চলিতে লাগিল —যশে ভূমণ্ডল ব্যাপ্ত হইল। ইন্দ্র দেখিলেন, কর্ণের অভেদ্য কবচ কুণ্ডল আছে। ভবিষ্যৎ কুরুক্ষেত্র সমরে পুত্র অর্জ্জুনের অনিষ্ট হইতে পারে তাই তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া আসিয়া কর্ণের নিকট কবচ কুণ্ডল দান চাহিলেন। কর্ণ দ্বিরুক্তি না করিয়া কবচ ও কুণ্ডল দান করিলেন। ভবিষ্যতে তাঁহার যে এই জন্য ঘোর অনিষ্ট হইবে তাহা

বুঝিলেন না এমন নয়, তথাপি দান প্রবৃত্তি এত প্রবলা যে দান করিয়া ফেলিলেন। এটা একটা দানের উদাহরণ মাত্র, কিন্তু আমাদের আসল উদাহরণ এটি নয়। প্রকৃত উদাহরণ হইতেছে, বৃষকেতুর ব্যাপার। বৃষকেতু কর্ণের পুত্র। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন, "কর্ণ আমি উপবাসী আছি—একাদশী করিয়াছি, তুমি আমাকে পারণ করাও।" কর্ণ শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন, কি দ্রব্য আনিব বলুন

পক্ষ মাংস মৃগ মাংস যেবা রুচি হয়
আজ্ঞা কর কোন মাংস আনি মহাশয়।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি তোমার শিশু পুত্র বৃষকেতুর মাংস খাইব। স্ত্রী পুরুষে তোমরা করাত ধরিয়া তাহার মস্তক চিরিবে। কর্ণ এই গুরুতর পরীক্ষা পার হইলেন। স্ত্রী পুরুষে করাত ধরিয়া বৃষকেতুর মস্তকচ্ছেদন করিলেন ও পদ্মাবতী সেই মাংস নানা প্রকারে রাঁধিয়া দিলেন। পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই। পদ্মাবতী বৃষকেতুর মুণ্ডটা লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে সেইটি কোলে করিয়া ক্রন্দন করিবেন, তাহাকে চুম্বন করিবেন ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি মুণ্ডের অম্বল খাইব, তখন পদ্মাবতী মুণ্ড বাহির করিয়া অম্বল রাঁধিয়া দিলেন। তখনও পরীক্ষা শেষ হয় নাই। ব্রাহ্মণ বলিলেন, তোমরা স্ত্রী পুরুষে আমার সঙ্গে একত্রে ভোজন না করিলে, আমি একাদশীর পারণ করিব না—চলিয়া যাইব। স্ত্রী পুরুষে তাহাতেই রাজি। তখন ভগবান দেখিলেন যে কর্ণকে পারিবার যো নাই, পরীক্ষায় সুচারুরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তখন বলিলেন, যাও রাস্তা হইতে একটি শিশু ডাকিয়া আন, শিশুকে না খাওয়াইয়া আমি খাই না। সে না হয় আমাদের সঙ্গে ভোজন করিবে। তখন পাত হইল। রাস্তায় ছেলেরা খেলা করিতেছে, কর্ণ জানিতেন—তাই রাস্তায় ছেলে ডাকিতে গেলেন। গিয়া দেখেন যে বৃষকেতু অপর বালকের সঙ্গে খেলা করিতেছে। কর্ণ অবাক্—বুঝিলেন কোন দেবতা তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছেন। বৃষকেতুকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া পদ্মাবতী সহ ব্রাহ্মণের চরণে লোটাইয়া পড়িলেন। ভগবান তখন প্রকাশ হইয়া কর্ণকে বরদানে কৃতার্থ করিলেন। সেই দিন হইতেই প্রকৃতরূপে কর্ণ দাতা

কর্ণ রূপে জগতে পূজিত হইলেন। মনে রাখিবেন কর্ণ প্রকাশ্যে সুতপুত্র ছিলেন। কর্ণ একটা সৎ প্রবৃত্তি—দান—ধরিয়া চলিয়াছিলেন, দেখিলেন ভগবান কি কঠোর পরীক্ষা করিলেন। কিন্তু তিনি পরীক্ষা দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত দান-বৃত্তি রাখিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ভগবান পাইলেন। সেইরূপ অপর কোন একটা সু-প্রবৃত্তি ধরিয়া থাকিলেও ভগবান পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ রূপ কঠোর পরীক্ষা আছে।

একলব্যের গুরু ভক্তিও কম নয়। দ্রোণ নিকৃষ্ট জাতির পুত্র বলিয়া প্রত্যাখান করিলে, সে মৃত্তিকায় দ্রোণ নির্ম্মাণ করিয়া একান্ত ভক্তি বলে সেই গুরুর নিকটই সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। দ্রোণ যখন অর্জ্জুনকে বড় করিবার জন্য দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি গুরু দক্ষিণা স্বরূপ দান চাহিলেন, সে অকাতরে ডান হাতের বুড়া আঙ্গুল কাটিয়া দিয়া গুরুরূপী ভগবানের কৃপা পাইয়াছিল। ঐরূপ যুধিষ্ঠির সত্য কথার পরীক্ষা দিয়াছিলেন। বলি যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে "সূর্য্যের বরে তোমার মাতা কুন্তী স্থির যৌবনা—কাহারও এড়াইবার যো নাই, তোমার মা—কে দেখিয়া যুধিষ্ঠির তোমার কামোদ্ভব হয় কি?" যুধিষ্ঠির বলিলেন—"হয়, কিন্তু কোন কার্য্যে বিকাশ হয় না, তৎক্ষণাৎ বিচার দ্বারা মনকে প্রবোধিত করি।" বলি মশারির ভিতর হইতে বাহির হইয়া আহ্লাদে যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন—জগতে তুমিই যথার্থ সত্যবাদী। তাই তুমি ভগবানের কৃপা পাইয়াছ, তাই পাণ্ডব সখা তোমার হাত ধরা। জ্ঞান ভাণ্ডার মহাভারতে এইরূপ কত উদাহরণ আছে। সহানুভূতি ধরিয়া থাকিলেও ভগবান পাওয়া যায়, বুদ্ধদেব পাইয়াছিলেন। তাই বলি, ভাইয়ে দেশে যেন বিজয়ার কোলাকুলি কেবল মাত্র বুক ঠোকায় পর্য্যবসিত না হয়। যথার্থ ভাই ভাই হও, যথার্থ সহানুভূতি দেখাও তবে তোমাদের ও দেশের মঙ্গল হইবে, তবে ত মহাশক্তি কৃপা করিবেন। তবে ত তিনি মুখ তুলিয়া চাহিবেন।

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস।

(২)

ব্রাহ্মণ যুগ। বৈদিক যুগের কিছু পরেই ব্রাহ্মণ যুগ। অথর্ব্ব বেদের অধিকাংশই তৈত্তিরীয় বা ঐতরেয় ব্রাহ্মণের পর লেখা হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ—ইহা একরকম স্থির করিয়াছেন। আমরাও অথর্ব্ব বেদকে ব্রাহ্মণ যুগের মধ্যে ধরিয়া লইলাম। বৈদিক যুগে—আয়ুর্ব্বেদের শৈশব, ব্রাহ্মণ যুগে আয়ুর্ব্বেদ আরো পুষ্টাবয়ব। ব্রাহ্মণ যুগ—বিলাসের যুগ। আর্য্যগণ তখন ঐশ্বর্য্যশালী। যুদ্ধ বিগ্রহ—শান্ত, দ্বন্দ্বভাব তিরোহিত, আর্য্যগণ নিশ্চিন্ত; ঐশ্বর্য্যের কোলে বসিয়া, অবসর সুখে—ভৈষজ্য তত্ত্বের অন্বেষণে, তাঁহারা অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন।

তখন, রাম ভার্গবেয় বিশ্বন্তরকে নূতন প্রণালীতে সোম প্রস্তুত করিবার উপদেশ দিলেন। বৈদিক যুগে সোম প্রস্তুত করিতে বিলম্ব হইত, ব্রাহ্মণ যুগে—সদা সদাই সোম প্রস্তুত হইতে লাগিল। এ সময়ে শারীর বিদ্যারও উন্নতি হইয়াছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যজ্ঞাহত পশুর শারীর যন্ত্রচ্ছেদের বিশিষ্ট আদেশ দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাতে শল্যতন্ত্র-শিক্ষার্থীগণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহারা পশুর অন্ত্রাদি ছেদন করিয়া শব ব্যবচ্ছেদের কার্য্য সারিয়া লইতেন।

যাঁহারা ঐশ্বর্য্যশালী, তাঁহারা বিলাসী; আবার বিলাসীও প্রায় আলস্য-পরায়ণ। আলস্য—চিরকালই যমরাজার প্রধান সদস্য। কাজেই ব্রাহ্মণ যুগে, অনেক নূতন নূতন রোগ দেখা দিতে লাগিল। তাই আমরা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ, এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায়—দকোদর, প্লীহোদর, পাণ্ডু, মেহ, শ্বিত্র, রাজ-যক্ষ্মা, অকাল বার্দ্ধক্য প্রভৃতি ব্যসন জাত রোগের নাম প্রথম দেখিতে পাই।

এই সময় দেবর্ষি নারদ, লোকগণকে ব্যসনের অপকারিতা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন [ঐ- ব্রা-৭ম। ১৩] কিন্তু তাঁহার উপদেশ কেহই শুনিল না, রোগও কমিল না। তখন, পরদুঃখ কাতর ভরদ্বাজ, শ্যাপর্ণ,

বুধিল, কাশ্যপ, বৈজবাপ, গোভিল প্রভৃতি মহর্ষিবর্গকে, সঙ্গে লইয়া পীড়িতের চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। দশমূল, শণ, তিল, পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলে), পাঠা [নিমুকা] অপামার্গ [আপাং], অশ্বত্থ, গুগ্‌গুলু, কুমারী [ঘৃতকুমারী] প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য, ঔষধের উপাদান স্বরূপ গৃহীত হইতে লাগিল। অথর্ব্ব বেদের—দশবৃক্ষ—২।১, যবস্ত তে তিলস্ত—২।৮, শংনো দেবী পৃশ্নিপর্ণী—২।২৬, পাঠা মিংদ্রো জলাষ ভেষজ, কুমারীং সহনোভ্রগেন, ইদং হিরণ্যং গুগ্‌গুল্বায়া মোক্ষো—২।২৭।

এই অংশ দেখিলেই, আপনারা তাহা বুঝিতে পারিবেন।

ক্রমে, ধাতু, উপধাতু, এবং নানাবিধ খনিজ পদার্থের গুণ পরীক্ষা হইল, তাহাদের আমায়িক প্রয়োগও নির্ণীত হইল। এইরূপে, নানাবিধ ঔষধ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে—ভৈষজ্যতত্ত্বে স্থান পাইল।

আর্য্য-রাজত্ব তখন পাঞ্জাব হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, ধনবান গাড়ী চড়িতে শিখিয়াছে, গো, বৃষ, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি পশুর আদরও বাড়িয়াছে। প্রয়োজন বুঝিয়া একদল শল্য-বৈদ্য পশু চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন, আর একদল—যানারোহণে কাহারো দুর্ঘটনা ঘটিলে—তাহার চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ যুগেই জগতে প্রথম পশু চিকিৎসা আরম্ভ হইয়াছিল। মহর্ষি শুপর্ণ প্রণীত "পশ্বাময়াবলোকঃ" নামক পশুচিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থই তাহার প্রমাণ। এই গ্রন্থ অসম্পূর্ণ অবস্থায় এখনো পাওয়া যায়। ইহাতে গবাদি পশুর লক্ষণ, তাহাদের রোগ এবং উক্ত রোগের চিকিৎসা সুন্দর ভাবে বর্ণিত আছে।

পুরুষ—যেখানে বিলাসী, সেখানে নারীও বিলাসিনী। ব্রাহ্মণ যুগে আর এক শ্রেণীর শল্য বৈদ্য ছিলেন, প্রসব কালে—ধনি-মহিলার সাহায্য করাই তাঁহাদের কার্য্য ছিল। এখনও দেখিতে পাওয়া যায়—শ্রম-কাতরা বড় লোকের গৃহিনীগণ, প্রসব কালে যতটা বিভ্রাটে পড়েন, দরিদ্র মহিলারা ততটা পড়েন না। অনেক স্থলেই আজ কাল লেডী ডাক্তারের সাহায্য ভিন্ন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না। হয় তো যন্ত্রের সাহায্যে শিশুকে কাটিয়া বাহির করিতে হয়। এরূপ দুর্ঘটনা আমরা এখন যতটা শুনিতে পাই, আমাদের পিতৃ পিতামহের আমলে এতটা ছিল না। ইহার কারণ এখনকার গৃহি-

নীরা পরিশ্রম-বিমুখী, প্রাচীনারা তাহা ছিলেন না। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অঙ্গ-চালনার নিতান্ত প্রয়োজন। এই অঙ্গ পরিচালনার নামই ব্যায়াম। সূতিকা শয্যাশায়ী শিশুও হস্ত পদাদি সঞ্চালন করে, সুতরাং ইহা প্রকৃতি গত। আমাদের অন্তঃপুর-বাসিনীরা—ব্যায়াম করিতে চাহেন না বলিয়াই এত অস্বাস্থ্যবতী। এই "ব্যায়াম" শব্দে—কেহ যেন মনে না করেন—আমি মেয়ে মানুষকে মুগুর ভাঁজিতে বলিতেছি! আমাদের গৃহিনীদের জন্য—প্রতিদিন নিয়মিতরূপে যে সকল গৃহকার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাতেই তাঁহাদের ব্যায়ামের কার্য্য হয়। রন্ধন করা, বাটনাবাটা, জল তোলা, পল্লী-বাসিনী হইলে—ধান ভানা, এ সকল কার্য্যে—নারী জাতির যথেষ্ট অঙ্গ চালনা হইয়া থাকে। আজ কাল, ষাট মুদ্রা আয়ের গৃহস্বামীর গৃহেও—ঝী চাকরের আমদানী। এই জন্যই ঘরে ঘরে প্রসব-বিভ্রাট! গৃহ-স্থালীর কাজ যদি ঝী-বামুনেই সব করিল, আর গৃহিনী যদি—সূচী-কার্য্য ও নভেলের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করিলেন, তবে আর সে অলস সংসারের অন্তঃপুরে—অম্লোদ্‌গার, উদরাধ্মান, অপস্মার ও ব্যাপন্ন গর্ভ দেখা দিবেনা কেন? যে নারী প্রসবে কষ্ট পাইতেছে, সে যদি তৎক্ষণাৎ কতকগুলি শস্য লইয়া হামান্ দিস্তায় কুটিতে পারে, অচিরেই তাহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে। জতুকর্ণ মুনি—তাঁহার কোন শিষ্যকে ইহা উপদেশ দিয়াছিলেন। গর্ভাবস্থায়—গুরুশ্রম করিবে না, কিন্তু একেবারে বসিয়াও থাকিবে না—কিছু কিছু পরিশ্রম করা চাই *।

যাক্, এক প্রসব বিভ্রাটের কথা তুলিয়া অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। আর দু'চারিটি কথা বলিয়াই ব্রাহ্মণ যুগের উপসংহার করিব।

ব্রাহ্মণ যুগে আর এক শ্রেণীর শল্য বৈদ্য ছিলেন—তাঁহারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ব্রণ চিকিৎসা [ক্ষত] করিয়া বেড়াইতেন, † এ সময়ে ব্রণ চিকিৎসারও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

---

* ইংরাজ মহিলারা রন্ধনাদি না করুন, অশ্বারোহণ করেন, ইহাতেই তাঁহাদের অঙ্গ চালনা হয়। আমাদের রাজপুত মহিলারাও যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিতেন।

† শত পথ ব্রাহ্মণ ৪র্থ ১।৫।৮

"ছাড়িয়া পতির পাশ কেন আইলা পরবাস,
আপনার কি সাধিলা মান॥
সদি, সতিনী কোন্দল করে, দ্বিগুণ বলিবে তারে,
অভিমানে ঘর ছাড় কেনি।"

ফুল্লরা এইরূপ কত নৈতিক উপদেশ, ও পৌরাণিক সতীর উপাখ্যান বলিয়াও চণ্ডীর মন স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট করিতে পারিল না। এই স্থানে ফুল্লরার যে মূর্ত্তি তাহা সাধ্বী সাবিত্রীরই উপযোগী। দেবী এত উপদেশের পর আবার ফুল্লরার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র স্বামীর নির্ম্মল চরিত্রে দোষারোপ করিলেন,—

"আমি ত নিজে আসি নাই
এনেছে তোমার পতি বান্ধি নিজ গুণে।
হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ বায়্যা বীরে॥"

এবার আর সহিল না। কাঙ্গালিনী পতিপ্রেম পাগলিনী ফুল্লরা অতি দুঃখ কষ্টের মধ্যে থাকিয়াও আপনার ক্ষুদ্র কুটীরটীর অধীশ্বর স্বামীর হৃদয় রাজ্যে আপনি অধীশ্বরী হইয়া সুখী ছিল। স্বামীসোহাগিনীর স্বামীর চরিত্রে দোষারোপ সহিল না। দ্রুত পদে স্বামীর নিকট যাইয়া অভিমানিনী বাষ্পাকুললোচনা সাধ্বী বলিল,—

"পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।
কাহার যোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে॥
বামন হইয়া হাত বাড়াইলে শশী।
আখেটির * ঘরে শোভা পাইবে উর্ব্বশী॥"

কেবল স্বামীর বিপদাশঙ্কায় সাধ্বী অস্থির; আপনার সতিনী বলিয়া যত দুঃখ, স্বামীর বিপদ দেখিয়া সাধ্বী তাহার শতগুণ বিষাদ ভোগ করিতে লাগিল। শেষে দেবীর অনুগ্রহে সকল বিবাদ মিটিয়া গেল। আমরা পরে দেখিতে পাইব, ফুল্লরার কথায় বীর কালকেতুর বীরত্বে কলঙ্ক পড়িয়াছে। স্বামীর চরিত্র চালনায় সতীর বিশেষ সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য, কবিকঙ্কণের ইহাই উপদেশ।

* আখেটী = ব্যাধ।

খুল্লনা ও লহনা।

তাল ভঙ্গদোষে অপ্সরী রত্নমালা মর্ত্ত্যে লক্ষপতি বণিকের গৃহে খুল্লনা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। খুল্লনা ধনী বণিকের মেয়ে; দেখিতে বেশ ফুট্ ফুটে মেয়েটি। পিতা মাতার আদরে সারাদিন খেলা করিয়া বেড়ায়। বেশ আমোদে আহ্লাদে সখিগণ সঙ্গে কালাতিপাত করে। যৌবনে উজানী নগরের তরুণ যুবক ধনপতি সদাগরের সহিত বিবাহ হইল। গৃহে দারুণ সতিনী। প্রথমে সতিনী লহনা বেশ আদর যত্ন করিল, কিন্তু পরে কুপরামর্শে খুল্লনাকে বিষনয়নে দেখিল। বিবাহের কিছুদিন পরেই ধনপতিকে গৌড়ে যাইতে হইল। লহনা দুর্ব্বলা দাসীর পরামর্শে সদাগরের নাম জাল করিয়া একখানি পত্র লেখাইল;—

"খুল্লনার নিবে তুমি অঙ্গ আভরণ।
নিয়োজিত কর তারে ছেলি অপেক্ষণ॥"

খুল্লনার অতিশয় পতি-ভক্তি; সেই ভক্তির প্রভাবে সে সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচার শক্তি পাইয়াছে। সে পত্র দেখিয়াই জাল বলিয়া উড়াইয়া দিল। তাহাতে লহনা রাগিল। খুল্লনারও যে রাগ হয় নাই, তাহা নহে। উভয়ে কিছু কলহ হইল; খুল্লনা পরাজিতা হইয়া ছাগরক্ষণে স্বীকার করিল। প্রতিদিন বনে বনে সে ছাগল চরাইয়া বেড়ায়, খুঞা কাপড় পরে, ঢেঁকিশালে শয়ন করে। সৌন্দর্য্যভরা শ্যামল কাননের প্রস্ফুটিত ফুলরাশির মেলার স্থানে খুল্লনা প্রতিদিন যায়। নব বসন্ত সমাগমে তরু লতা সকলেই নববেশে সজ্জিত হইয়া নবীন অতিথিকে সমাদর করিল; উদ্ভিন্নযৌবনা খুল্লনা স্বামীর বার্ত্তা না পাইয়া, স্বামী দর্শন না পাইয়া বড়ই মনোকষ্ট পাইল। প্রকৃতির সকল পদার্থের নিকট সাধ্বী স্বামীর অভাব জানাইয়া কাঁদিয়া বেড়ায়;—

"লতায় বেষ্টিত রামা দেখিয়া অশোক।
খুল্লনা বলেন সই তুমি বড়লোক॥
সই সই বলি রামা কোলে কৈল লতা।
স্বরূপে বলনা সই তপ কৈলে কোথা॥"

কেননা লতা স্বামী-তরুর দেহ জড়াইয়া সুখে অবস্থান করিতেছে; আবার

ভ্রমর ভ্রমরীর বিহার দেখিয়া খুল্লনা করযোড়ে বলিতেছে ;—

" চিত্ত চমকিত যদি গাও গীত,
খাও ভ্রমরীর মাথা ॥ "

তাহাতেও গুণ্ গুণ্ থামিল না। আবার কোকিলের কুহুরবে চমকিত হইয়া খুল্লনা কাঁদিয়া বেড়াইল। সারা প্রকৃতি-অঙ্গে স্বামীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইল ; সকলেরই কাছে নতশিরা। এত দুঃখেও খুল্লনা লহনার ভয়ে ভীত। কোকিলের স্বরে ভয়ে ভয়ে যেন খুল্লনা বলিতেছে ;—

" হেন লয় মোর মনে, আসি কিবা এইধামে,
পিকরূপী হইল লহনা ॥"

তখন খুল্লনা কোকিলকে করজোড়ে বলিতেছে ;—

" সদাগর আছে যথা কেন নাহি যাও তথা,
এই বনে ডাক অকারণ ॥ "

এত দুঃখে, এত কষ্টে, খুল্লনা একবারও স্বামীর প্রতি দোষারোপ করিল না। চণ্ডিকা দেবী খুল্লনাকে বর দিলেন, শীঘ্র স্বামী দেশে ফিরিবেন—খুল্লনা তাহাতে বড়ই প্রফুল্ল হইল।

লহনা বেশ সরল মেয়ে ; প্রথমে সে খুল্লনাকে আপনার ভগিনীর মত দেখিত। কিসে খুল্লনার শরীর সুস্থ থাকিবে, কিসে স্বামীর মনোরঞ্জন হইবে, সে সর্ব্বদা তাহাই ভাবিত। এক কথায় " লহনার খুল্লনা পরাণ।"

লহনা কিন্তু ক্রূরের হৃদয়ে এ সপত্নী-প্রেম সহ্য হইল না। রামের রাজ্যাভিষেক শুনিয়া যে কৈকেয়ী মন্থরাকে আপনার বহুমূল্য কণ্ঠাভরণ দিতে গিয়াছিলেন, সেই কৈকেয়ী আবার প্ররোচনা বলে রামকে বনবাস দিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। লহনারও তাহাই হইল। বেশ সরল, সাধা সিধে মেয়ে ; আপনার একজন সঙ্গিনী হইল দেখিয়া তাহাকে খুবই আদর করিল, কিন্তু সেই লহনা আবার প্ররোচনা বলে খুল্লনাকে ঘনবিজন-কানন মধ্যে ছাগ-চারণে নিযুক্ত করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই। এদিকে খুল্লনাকে বর দিয়া চণ্ডিকা-দেবী লহনাকে স্বপ্নে ভয় দেখাইলেন ;—" আপনি বন্ধ্যা হইয়া তুই খুল্লনাকে বনে ছাগল চরাইতে পাঠাইলি ? তোর সব ঘুচাইব ;

সাধু আসুক দেশে, ঘুচাইব লাস * বেশে,
ইহার উচিত দিব শাতি † ॥ "

সেই স্বপ্নে লহনার মোহ ভাঙ্গিল। আবার সে—খুল্লনা কোথায়, খুল্লনা কোথায়—বলিয়া ছুটাছুটী করিল ; খুল্লনাকে বলিল ;—

" ক্ষমহ আমার দোষ, দূর কর অভিরোষ,
কোল দেহ আসিয়া বহিনী ॥

* * *

আমি তোরে কহি দঢ় যেই সহে সেই বড়,
মনে নাহি রাখহ বিবাদ ॥ "

সে মধুর স্নেহসিক্ত বাক্যে খুল্লনার মন ভিজিল। আবার দুই সতিনী এক হইয়া মিলিল ; লহনা আবার খুল্লনাকে আদর যত্ন করিল।

লহনা-খুল্লনার প্রেম দেখিয়া ক্রূরা দাসীর মন আবার জ্বলিয়া উঠিল। লহনা আবার তাহার প্ররোচনায় স্বামী-বশীকরণ ও খুল্লনাকে শাস্তি দিবার ঔষধ সংগ্রহ করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সাধু দেশে ফিরিল। মিষ্ট কথায় দুই স্ত্রীকেই সাধু সন্তুষ্ট করিল। খুল্লনা রন্ধন করিয়া স্বামীকে ভোজন করাইল। সাধু রাত্রে শয়ন করিল। খুল্লনা স্বামীর নিকট গিয়া দেখিল, স্বামী মৃত। তখন পাগলিনী খুল্লনা স্বামীর মৃত দেহ কোলে করিয়া যে হৃদয় বিদারক ক্রন্দন করিল তাহাতে আমরা কেবল সাধ্বীর স্বামীর কথাই শুনিতে পাই —" তুমি কেন রাক্ষসগণী আমাকে বিবাহ করিলে, এই অলক্ষণাকে বিবাহ করিয়াই তুমি অকালে মরিলে ! "—সে ক্রন্দন যে শুনিবে তাহাকেই কাঁদিতে হইবে। কবির করুণ ক্রন্দন বর্ণনায় কৃতিত্ব এইখানেই বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। সে কাতর ক্রন্দনে দেবীর মনে দয়ার উদ্রেক হইল, তিনি সাধুকে আবার জীবিত করিলেন। খুল্লনা পতির সংজ্ঞা দেখিয়া হাতে চাঁদ পাইল। তখন সুখ দুঃখের কথা ; অভিমানিনী খুল্লনা বলিল ;—

" তোমার কপট বাণী মূল কাটি ঢাল পানী,
দূরে গেল্যা কোন্দল ভেজায়্যা ॥

---

* লাস = বিলাস। † শাতি = শান্তি।

উথলে আমার বাণী শ্রাবণের যেন পানী,
সমুদ্রের যেমন তরঙ্গ।
যত দুঃখ দিল সতা কহিব কতেক কথা,
তোমার নিদ্রার হয় ভঙ্গ॥"

খুল্লনার পতিভক্তি সেই স্থানে বড়ই উজ্জ্বল হইয়াছে। সে আপনার দুঃখ-কাহিনী শুনাইতে দূর-প্রত্যাগত স্বামীর নিদ্রার ব্যাঘাত করিতে প্রস্তুত নহে। ঐ এক ছোট কথাতেই কবি সকল মনের কথা ব্যক্ত করাইয়াছেন। খুল্লনার সকল কথা শুনিয়া সাধু লহনাকে ভৎর্সনা করিল। লহনা রমণী; সেও ছাড়িবার পাত্রী নহে, স্বামীর নিকট সেও খুল্লনার নানা দোষ দেখাইল। স্বামী সে কথায় কর্ণপাত করিল না।

সাধুর পিতৃশ্রাদ্ধে খুল্লনার চরিত্রে সন্দেহ করিয়া কেহ কেহ সাধুর গৃহে ভোজন করিতে সম্মত হইল না—ইহা কবির কল্পনা নহে। আমাদের সমাজে এখন 'তেলে ঘোঁট' বলিয়া, কাজ কর্ম্মে এরূপ গোলমাল উঠে। তখনকার কালে ঐরূপ একটা গোলমাল প্রায়ই হইত। সকলে অস্বীকার করিয়া বলিল,—"খুল্লনা সভা মধ্যে পরীক্ষা দিউক; নচেৎ লক্ষ টাকা দিতে হইবে"। সদাগর টাকা দিতে প্রস্তুত দেখিয়া সাধ্বী খুল্লনা স্বামীকে বলিল,—

"পরীক্ষা লইতে প্রভু যদি কর আন।
গরল ভক্ষিয়া আমি ত্যজিব পরাণ॥"

এই কথাতেই বেশ বুঝা যায় যে, খুল্লনা পতিব্রতা, নিষ্কলঙ্ক-চরিত্রা। পরীক্ষার স্থির হইল। নানা পরীক্ষার পর জতুগৃহে দাহনই স্থির হইল। জতুগৃহ নির্ম্মিত হইলে খুল্লনা, পতির চরণ ধ্যান করিয়া চণ্ডীর নাম স্মরণ করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। অগ্নি সংযোগে গৃহ দগ্ধ হইলে পরিশুদ্ধা সাবিত্রী মূর্ত্তি খুল্লনা, বিশুদ্ধ সুবর্ণের ন্যায় জ্বল্ জ্বল্ করিয়া বাহির হইল। সে তেজোদ্ভাসিত সাবিত্রী মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই ভক্তি বিনম্র মস্তকে সাধ্বীর চরণে প্রণাম করিল।

শেষে খুল্লনার পবিত্র মাতৃমূর্ত্তি। সেও অতি উজ্জ্বল—মহিমাময়ী। খুল্লনার চরিত্র বিষয়ে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। এই দুই

পবিত্র সাধ্বী সাবিত্রীর মূর্ত্তি দেখিয়া কবির লেখনী কৌশলের প্রশংসা একমুখে করিয়া উঠা যায় না। ফুল্লরা ও খুল্লনার মধ্যে কে বড় আমরা ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না। আমাদের দেশে আজ কাল যেন এমন প্রেমময়ী, পতিপরায়ণা, লক্ষ্মীরূপিনী সাধ্বীর কিছু হ্রাস হইয়াছে। তাহাতেই আমাদের এমন দুর্দ্দশা হইয়া পড়িতেছে। সাধ্বী সাবিত্রীর চরিত্র হিন্দুর, হিন্দুরই তাহা সযত্নে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

কালকেতু ব্যাধ সন্তান; দেখিতেও সেইরূপ; তাহার 'দুই বাহু লোহার সাবল,' 'কপাট বিশাল বুক,' 'পরিধান বীরধড়ি' তাহার

কালকেতু। অতুল বিক্রম। বাঘ সিংহকে সে ভ্রূক্ষেপ করে না। প্রত্যহ বনমধ্যে সিংহের সহিত যুদ্ধ করে

সহজে কেহ হারে না। শেষে কালকেতুর দৌরাত্ম্যে পশুগণ বিধ্বস্ত ও বিত্রস্ত হইয়া উঠিল। কালকেতু ভক্তিপ্রবণ, নির্ম্মল চরিত্র ও আপনার ক্ষুদ্র কুটীর ও আপনার সাধ্বী বনিতাতেই সন্তুষ্ট ছিল। তাহার নির্ম্মল চরিত্র একস্থানে বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। যখন সুবর্ণগোধিকারূপিনী চণ্ডী কালকেতুর কুটীরের দ্বারে অলোকসামান্যা রমণীমূর্ত্তি বিকাশ করিয়া বসিলেন, তখন কালকেতু পরস্ত্রী বলিয়া তাঁহাকে যে উপদেশ দিল, তাহাতে তাহার নির্ম্মল চরিত্রের উজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে বলিল;—"মা! এ বড় কুস্থান, চারিদিকে হাড় ছড়ান; এখানে কেন এসেছ মা! তুমি কুলবধূ; একাকী এখানে থাকিলে, লোকে আমাকে যে দোষী করিবে, মা!

চল বন্ধুগণ পথে ফুল্লরা চলুক সাথে,
পাছু লয়্যা যাব ধনুঃশর॥"

কালকেতু পুরুষ; একাকী পরস্ত্রীর সহিত যাইতে রাজি নয়। তাই বলিল,—ফুল্লরা সঙ্গে যাক; সে রক্ষীস্বরূপ পশ্চাতে যাইবে। তাহাতেও যখন চণ্ডী যাইতে সম্মত হইলেন না, তখন ব্যাধ বলিল,—

"চরণে ধরিয়া সাধি ছাড় গো নিলয়॥"

যখন তাহাতেও হইল না, তখন "ভানু সাক্ষী করি বীর জুড়িলেক শর।" কিন্তু ব্যাধ হতবল হইল। দরদর ধারায় অশ্রুজল পতিত হইতে লাগিল, আর সে শরত্যাগ করিতে পারিল না, তাহার সর্ব্ব শরীর রোমা-

ঞ্চিত হইয়া উঠিল। চিত্রলিখিত আলেখ্যবৎ সেই অবস্থায়ই রহিল। শেষে দেবী দয়া করিয়া বলিলেন,—"আমি চণ্ডী, তোমাকে বর দিতে আসিয়াছি!" কালকেতু যেন স্বপ্ন দেখিল; ভীম, নিকৃষ্ট ব্যাধের নিকট চণ্ডী আসিলেন, যেন একথা তাহার বিশ্বাস হইল না। তখন দেবী মহিষ-মর্দ্দিনীরূপ ধারণ করিয়া তাহার সন্দেহভঞ্জন করিলেন। কালকেতু জগন্মাতার চরণে লুটাইয়া পড়িল। দেবী তাহাকে অনেক ধনরত্ন প্রদান করিলেন। সে বিপুল ধনরত্ন তাহারা,—স্বামী স্ত্রীতে—লইয়া আসিতে পারিল না; সরল ব্যাধ স্বভাবসুলভ সরলতা সহকারে দেবীকে বলিল, "এক ঘড়া ধন মাগো নিজ কাঁখে কর।" ভক্তির এমনি শক্তি; ব্যাধের সেই সরল ভক্তিতে প্রীত হইয়া দেবী তাহাই করিলেন। এমন সরল চরিত্রের কবিকে ধন্যবাদ দিতে হয়।

কালকেতু মহা পরাক্রান্ত রাজা হইল। তাহার সে পরাক্রমে যমও ভয় পায়। একস্থানে কালকেতুর এই তেজোগর্ব্বোদ্ভাসিত চরিত্র কবি যেন একটু সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিয়াছেন। যখন কলিঙ্গরাজের সহিত যুদ্ধে কালকেতু পরাজিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন ফুল্লরার কথায় কালকেতু ঘরের ভিতর লুকাইয়া রহিলেন। সতী স্ত্রীর এমনই প্রভাব। আবার বলি সতী সাবধান।

ব্যাধ অতি নীচ জাতি; হাজারই কেন দৈববল থাকুন না, হাজারই কেন তাহার বিপুল পরাক্রম থাকুক না, তাহার নীচ জাতি তাহার নীচ জাতিত্ব তাহাকে ছাড়ে না। সতীকেও নীচ জাতীয়গণকে সাবধান করিবার জন্যই, বোধ করি কালকেতুর চরিত্র বিপর্য্যয়।

ধনপতির চরিত্রে বলিবার বিশেষ কিছুই নাই। বড় লোকের পুত্র। সুন্দরী খুল্লনাকে দেখিয়া বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইল। ঈষদুদ্ভিন্নযৌবনা, লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া সে ভুলিয়া গেল। প্রথম পত্নী লহনাকে বুঝাইয়া খুল্লনাকে বিবাহও করিল। কিন্তু রাজকার্য্যে তাহাকে স্থানান্তরে যাইতে হইল।

ধনপতি। দুই পত্নীকে ধনপতি বেশ বুঝাইয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু খুল্লনার দিকের টান্ যেন কিছু বেশী বেশী। ধনপতির চরিত্রে একটী গুণ আমরা বড় পরিস্ফুট দেখিতে পাই; সে একজন

প্রকৃত শৈব। শিব ভিন্ন আর কাহারও নিকট সে মস্তক অবনত করিতে চায় না। খুল্লনার চণ্ডীপূজা দেখিয়া ক্রুদ্ধ ধনপতি বলিল,—

"স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহি করি॥"

কেবল কথায় নহে, কাজেও সে তাহাই করে, তাহা আমরা বেশ দেখিতে পাই। যখন দূর সিংহলে বন্দী হইয়া, সে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল, তখন চণ্ডী তাহাকে বলিলেন;—"তুমি আমার পূজা করিলে, তোমায় উদ্ধার করিব, ও তোমায় সবই দিব।" কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ধনপতি সে কথায় প্রলুব্ধ না হইয়া বলিল;——

"যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী।
মহেশ ঠাকুর বিনা অন্যে নাহি জানি॥"

তাহার সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া ও একান্ত শিবভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। শেষে হরগৌরী মূর্ত্তি একসঙ্গে দেখিয়া, অজ্ঞান ধনপতির মোহ ভাঙ্গিল। তখন সে এক পুষ্পাঞ্জলিই হর-পার্ব্বতীর চরণে উৎসর্গ করিল।

শ্রীমন্ত দেখিতে বেশ সুশ্রী। কবি শ্রীমন্তের রূপ অতি সুন্দররূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। সে আজন্ম বড়ই অভিমানী; কেহ একটু কিছু

শ্রীমন্ত বলিলেই আর স্থির থাকিতে পারে না। বাল্যে সে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় খেলা করিয়া বেড়ায়; আজ বৎসহরণ, কাল রাক্ষস বধ এইরূপ করিয়া বেড়ায়। কৈশোরে লেখা পড়া শিখিতে গেল। পাঠশালে গুরুমহাশয়ের এক নিদারুণ কথায় তাহার প্রাণে বিষম আঘাত লাগিল। মাতৃভক্ত সন্তানের মাতার চরিত্রে দোষারোপ কিছুতেই সহ্য হইল না। দূর প্রবাসে পিতৃ-অনুসন্ধানে যাইবার জন্য দৃঢ়সংকল্প করিল, সিংহলে যাইয়া পিতার সাক্ষাৎ পাইল, সিংহল-দুহিতার পাণিগ্রহণ করিল। পরে একদিন রাত্রে, স্বপ্নে মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া মাতৃভক্ত সন্তান আর স্থির থাকিতে পারিল না। এইস্থানে তাহার মাতৃভক্তি বেশ ফুটিয়াছে; যে যাহা বলিল, সকলই কাটাইয়া সে দেশে ফিরিয়া মাতার চরণ দর্শন করিল। কবি প্রত্যেক চরিত্রে এক একটী বিশেষত্ব দিয়াছেন। আর সকল গুলিই সুন্দররূপে ফুটিয়াছে।

শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

মেখলা।

(৯)

গুণাকরের অর্থ নাই—অথচ পরের দাসত্ব করিবার প্রবৃত্তি থাকিলেও প্রকৃতি নহে সুতরাং তাহাকে কেহ চাহে না। নিজের গৃহ নাই, পৈতৃক ভূ-সম্পত্তি বিস্তর ছিল—পিতার আমলেই সেই সমুদয় গিয়াছে, এখন কে তাহাকে বসাইয়া অন্ন দিবে; গুণের আদরও সর্ব্বত্র হয় না সুতরাং কুটুম্বগণ ও দূর-আত্মীয়গণ সকলেই তাহাকে স্থান দিল না, গুণাকর নিশীথে নীরবে নদীতটে আসিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—কি করি, কোথায় যাই, মেখলা এখন আসিবে কি? সেখানেই বা যাই কি করিয়া? কোন দিন ত যাই নাই, দেখি বসিয়া বসিয়া দেখি, লোকে বলে মনের টান্। আগে-না যায় তথাপি যাইবার পূর্ব্বে একবার দেখা হওয়া চাই?

গুণাকর নদী তটে বসিল।

কয়েকদিন হইল শ্মশানে একটা পাগলা আসিয়াছিল, তাহার গলায় খুব মস্ত পইতের গোছা। সে দূর হইতে একটা লোককে একলা বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ধীরে ধীরে গুণাকরের সম্মুখে আসিয়া বসিয়া বলিল,—আমার সঙ্গে এস।

গুণাকর হাসিয়া বলিলেন—কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর।

সন্ন্যাসী হাসিতে হাসিতে বলিলেনঃ—ভাবিও না, আশা পূর্ণ হ'বে।

গুণাকর সহাস্যে বলিলেন,—তুমি ঐ শ্মশানের পাগলা না? ভেবেছিনু তোমাকে একদিন দেখ্‌তে যা'বো। সন্ন্যাসী গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—তা'ই আমি এসেছি, তুমি খুব বড় লোক হ'বে।

গুণাকর বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন,— তা'র প্রমাণ এই, এখন একটু স্থির হয়ে বস, আমি কি করবো না করবো মনে মনে ভেবে ঠিক করি?

সন্ন্যাসী স্থির হইল, গুণাকর ভাবিতে বসিল।

(১০)

অরবিন্দ গুণাকরের সংবাদ দুইবেলা রাখিতেন, রাখিবার কারণ গুণাকরের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ, অলক্ষ্যে থাকিয়া ও হাসির মুখে কতক শুনিয়া মেখলার মনোভাব অবগত হওয়া।

সন্ধ্যার পর গুণাকর চিরদিনের মত গৃহত্যাগ করিলেন, অরবিন্দ মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই সংবাদ অবগত হইয়াই তাঁহার অনুসরণ করিলেন, ঘাটে আসিয়া দেখিলেন দুইজন লোক বসিয়া আছেন, নিকটে আসিয়া দুইজনকে ডাকিলেন এবং তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আপনার নিভৃত আবাসে লইয়া গেলেন।

অরবিন্দ কক্ষে আসিয়া বলিলেন,—পাগলা ঠাকুর না থাকলে গুণাকর হয় ত বাঁচত না, তুমি কে পাগল? পাগল আপন মনে মৃদুস্বরে গান ধরিলঃ—

সঙ্কটে তার শঙ্করী,
জীবন রহেনা বলনা কি করি!
তোমার লাগিয়া ত্যজিনু সকলি,
নিশিদিন অশ্রু সম্বল কেবলি,
তোমারি বিহনে কেমনে প্রাণ ধরি;
পাষাণী পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া,
ভুলেছ, দেখনা বারেক চাহিয়া,
এসগো হৃদয়ে ছলনা পরিহরি;—
নগনা বিভূষণা ভুবনমোহিনী,
ভাবুক মানস আঁধার নাশিনী,
তার তার রয়েছি তোমারে স্মরি॥

অরবিন্দ বলিলেন,—তুমি কে সত্য পরিচয় দাও।

সন্ন্যাসী। আমি পাগল, শ্মশানে ছিলাম, আর পরিচয় দিব না।

অরবিন্দ। এত বড় দাড়ি কখন এ বয়সে হয়?—দেখি!

অরবিন্দ অগ্রসর হইল, সন্ন্যাসী চীৎকার করিল, অরবিন্দ শুনিল না—দাড়ি ধরিয়া টানিল, টানে দাড়ি খসিল, গুণাকর চীৎকার করিয়া বলিল,—বিমলবিকাশ! হাসির স্বামী!

অরবিন্দ বিমলকে বক্ষে চাপিয়া বলিলেন,—বিবাগী আর হইবে না বল।

বিমল বলিল,—একটী সর্ত্তে—মেখলার সহিত গুণাকরের পরিণয়ে।

অরবিন্দ। সে সমুদয় আমি স্থির করেচি, এখন থাক আমি আসচি। ভয় নাই, কোন কথা এখন ভাঙ্গিব না।

অরবিন্দ চলিয়া গেলেন, বিমল ও গুণাকর নানা কথায় বিব্রত হইল।

(১১)

কিরণমালা নিশীথে অরবিন্দকে দ্রুত গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বলিলেনঃ—কি ঠাকুরপো, এত রাত্রে অমন করে এলে কেন? আমি এই দেখ শ্রী গড়বার সব দ্রব্যাদি ঠিক করে রাখচি, তবে ভয়ে ভয়ে, কুটুম্বালয়ের খবর নাকি বড় ভাল নয়—পাত্রের শুন্‌চি অসুখ! অরবিন্দ সাগ্রহে বলিলেনঃ—সে মরুক, তা'তে আমার কি! হাসি কোথায়! মেখলা কি করচে?

কিরণমালা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বলিলেন,—তারা বুঝি ঘুমিয়েচে?

অরবিন্দ মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—না, দেখ দেখি, পড়বার ঘরেও নাই দেখলুম।

কিরণমালা চলিয়া গেলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেনঃ—কই না, কোথা গেল?

অরবিন্দ সমুদয় বুঝিলেন, তথাপি কিরণমালাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—ভেবোনা, আস্‌চি, হাসির বাড়ী দেখি। অরবিন্দ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন, খিড়কিড় পথ ধরিয়া নদীর ঘাটে চলিলেন—সে পথে যাইবার কারণ আসিবার সময় সেই দিকে রমণী কণ্ঠ শুনিয়াছিলেন।

নদীর ঘাটে আসিয়া অরবিন্দ মেখলা ও হাসিকে পাইলেন, মেখলা ও হাসি তাঁহাকে দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল, অরবিন্দ উভয়ের হাত ধরিয়া বলিলেনঃ—আর এখানে বসিয়া কাজ নাই, আর আমার সঙ্গে ফিরে আয়, আমি সব জানি, গুণাকর আর বিমল দু'জনেই আমার নিভৃত নিবাসে।

অরবিন্দ অগ্রসর হইলেন, মেখলা ও হাসি নিঃশব্দে তাঁহার অনুসরণ করিল, কিরণমালা উভয়কে পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

(১২)

অরবিন্দ। আমি কি করবো বউ দি, ওটা মলে কি বাঁচবে, না বিমল সংসার ত্যাগী হ'লে সুখী হ'বে? সেও ত তোমারই বোনঝি! আমার না হয় পর হল, আমি তা'র কল্যাণ না হয় না খুঁজলুম!

কিরণমালা। একজায়গায় কথা দিইচি যে? কি মুস্কিল!

অরবিন্দ। আরে ছাই বুঝচো না, তারা আবার দুমাস পরে করবে বলচে, ততদিনে সে হয় ত সাবার হ'বে, তাও না হয় তোমাকে আর হাজারে উঠতে হ'বে—বস্ পথে বস, তার পর বাড়ী কখন আসেন মর্য্যাদা দাও, নইলে বাড়ীতে—পা ধোবেন না—এ সব ভাবচো? তুমি এক কথা বলে দাও আমরা আর দিন পেছুতে পারবো না!

কিরণমালা। তা যেন হ'ল, কিন্তু, গুণাকরের কিছুই নেই, তারপর ওর মন যদি ফেরে।

অরবিন্দ। সে সব ভাবনা আমার—আমি কাঁচা কাজে মাথা দিইনে এখন মত কি বল, না হয় তোমার সংসার রইল, আমার ছেলে মেয়ে রইল, মাসে চার পাঁচশ টাকা আয় সব রইল, আমি চল্লুম—তোমার মেয়ে নিয়ে তুমি যা খুসি কর। বলবো কি বউদি, ওদের দু'জনায় এতদূর ভালবাসা যে আর দু'একদিন যদি দেরি হয় তা হ'লে দুটোই মরবে, হাসিও মরবে, বিমলও আবার দেশ ত্যাগী হ'বে। তা'কেও ত জান, আর তা'র টাকা কত; সে গুণাকরের জন্য যত টাকা লাগে খরচ করবে; বস্ আর কি চাও?

কিরণমালা। এত যদি জান্‌তে আর এত যদি মনে ছিল তবে এত দিন কি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলে? এত কথা পেটে করে রেখেছিলে কেমন করে? মেয়েটা যদি মরে যেত? অরবিন্দ কিরণমালাকে প্রণাম করিয়া বলিলেনঃ—আমার নজর কোথায় ছিল। যাও এখন সব আয়োজন করগে।

অরবিন্দ চলিয়া গেলেন। কিরণমালা আপনাপনি বলিলেনঃ—ঠাকুরপো—তুমি কি দেবতা!

কিরণমালা আর অধিক সময় বৃথা চিন্তায় যাপন না করিয়া বিবাহের সমুদয় আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন।

(১৩)

মেখলা বিমলকে নিকটে পাইয়া বলিলঃ—বিমল তুমি বিবাগী হইয়াছিলে কেন ?

বিমল-বিকাশ খুব হাসিয়া বলিলেনঃ—তা আর জান না ; তোমাকে পাবার জন্য।

মেখলা হাসিয়া বলিলঃ—তা নয়, হাসি বড় ছোট ছিল, অত অল্প বয়সে বিবাহ সেই জন্য।

বিমল-বিকাশ। তোমার পড়ে পড়ে মাথা খারাপ হয়েছে না ?

মেখলা। তা নয় আমারই হয়েছে, কাকার ত হয়নি ? তারপর ফিরলে কেন ?

অরবিন্দ। পুরুষোত্তমে স্বপ্নে দেখলুম একটা 'পাতা কেলা' দিগগজ কুলীনের সঙ্গে মেখলার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্চে, তাই মেখলা আর হাসি জলে ডুবে মরতে যাচ্চে, আমি না এলে বাঁচবে না।

মেখলা। স্বপ্ন তবে সত্তি হয়।

অরবিন্দ। আমার ত হয়েছে !

সহসা গুণাকর গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেনঃ—আমার স্বপ্নটা কিন্তু ঠিক হ'ল না ভাই। আমি ভেবেছিলুম মেখলা ও হাসি দুটোই আমার হ'বে।

মেখলা অবগুণ্ঠন টানিয়া ছুটিয়া হাসির নিকটে গমন করিয়া তাহার ফুলের তোড়া, ফুলের মালা ছড়াইয়া, তাহার মাথার কাপড় টানিয়া ফেলিয়া তাহার হাত ধরিয়া হড় হড় করিয়া টানিতে টানিতে বলিলঃ—আয় নিবি আয়, সে তোকেও নেবে।

হাসি স্তম্ভিত হইয়া 'ছাড়' 'ছাড়' বলিয়া বসিয়া পড়িল। মেখলা গম্ভীর ভাবে বলিলঃ—তোর সঙ্গে এত ভাব ? হাসি হাসিয়া বলিলঃ—কার ?

মেখলা মুখ নত করিয়া বলিল,—ফুনাকরের !

হাসি হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলঃ—বুঝিচি তা'র, তা নাম করেই বল না, এখনও ত বিয়ে হয়নি ! মেখলা হাসির মুখ চাপিয়া বলিল,—ও বিয়ে ধর না ? হাসি মুখ হইতে হাত সরাইয়া বলিল,—তা বটে, চল—একটু মজা করবো চল, পাকা গোঁপ দাড়ি গুলো আছে ত

মেখলা হাসিয়া বলিল,—আছে আয়।

উভয়ে হাসিতে হাসিতে হাতে হাতে ধরিয়া চলিল।

(১৪)

মেখলা অন্তরালে রহিল, হাসি গুণাকরকে ডাকিয়া দিয়া পাকা দাড়ি গোঁফ হস্তে লইয়া বলিল,—

যাও হে ফিরে নবীন যোগী
যেথা তুমি ছিলে ভালো ;
মনে মনে হয়নি মিলন
এখন বল বাস ভালো।
আপন বশে আপন ভাবে,
যাওনা যেথা যতন পাবে,
আমার নামটী হাসি ভালবাসি
মন যে আমার করবে আলো ॥

হাসি বিমল-বিকাশকে যোগী সাজাইতে গেল, মেখলা ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—তবে ভাই, তুমি আমার। বিমল মেখলার হাত ধরিয়া বলিল,—এস আমরা যাই।

গুণাকর এই অবসরে আসিয়া একহস্তে হাসির হস্ত ও অপর হস্তে মেখলার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল,—

ভাই, বিবাদে কাজ নাই, তোমারটা তুমি লও, আমারটা ছেড়ে দাও।

বিমল সুর করিয়া বলিল ঃ—

কেমনে তা পারি ;
যে আমার আমি তারি।
ছিল ভাল অদর্শন, দর্শন চাহে মিলন
নহে ফিরে দেহ মন আপন বিচারি ;
কি ছলে এ সংঘটন, নহে মৃত্যু নহে মিলন
এখন যে আছে জীবন পিয়ে আশা বারি ॥

গুণাকর গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—তবে ভাই তুমি দুইটাই লও, আমি যোগী সাজিয়া চলিয়া যাই, যোগীর এত আদর !

বিমল ব্যস্ত হইয়া বলিল,—না না তাহ'লে আমি যার জন্য ফিরলুম তা হ'ল কই? আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

হাসি ও মেখলা উভয়েই বলিল,—তবে আমরাই বা আর গৃহে থাকি কেন?

বিমল। যখন এত ভেজাল তখন একটা মিট মাট আপোষে করে ফেলাই ভাল।

হাসি খুব হাসিয়া বলিল,—মিট মাট আর কি—এখন মেখলার বিবাহটা খুব ঝট পট্।

সকলে হাসিতে হাসিতে উদ্যানে গমন করিল। গুণাকর ও মেখলার বিবাহ হইয়া গেল। ইহা হইল শুভ-বিবাহ। এই বিবাহে পাড়ার সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন।

গুণাকরের পূর্ব্বের কুটুম্বগণ এবং অন্যান্য আত্মীয় বিশেষ হৃদ্যতা দেখাইতে আসিলেন, কিন্তু অসময়ে যাঁহারা অনায়াসে পথে দাঁড় করাইতে পারেন, তাঁহাদিগের সে হৃদ্যতায়, গুণাকর মেখলা অরবিন্দ প্রভৃতি বড় আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না।

অরবিন্দ বুঝাইয়া দিলেন আত্মীয়তা বা কুটুম্বিতা অর্থে নহে—হৃদয়ে হৃদয়ে সরল দুশ্ছেদ্য বন্ধনে।

শ্রীশ্যামলাল মজুমদার।

চুঁচুড়া।

দ্বারকার পথে।

(৯)

স্থূল ভাবে পোরবন্দরের বৃত্তান্ত পাঠক পাঠিকাকে উপহার দিয়া এখন নিজের কথা বলি। একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি; সে কথাটা বলিয়া তারপর নিজের কথা বলিব। আমি যখন পোরবন্দরে যাই তখন রাণা সেখানে ছিলেন না। পোরবন্দর হইতে গোটাতিনেক ষ্টেসন তফাতে রাণার একটা বাড়ী আছে। তখন তিনি সেইখানে মহিষীর ও নিজের চিকিৎসার জন্য ছিলেন। আমরা যেদিন যাই সেই দিনই জুনাগড় হইতে ভাল ডাক্তার তথায় আসে।

আমরা পোরবন্দরে উপস্থিত হইবা মাত্র, দুই তিনজন লোকে আমাকে ঘেরিয়া ফেলিল। একজন বলিল কোথা যাবেন, আমি বলিলাম দ্বারকা। সে বলিল জাহাজ এই মাত্র ছাড়িয়া গেল—আজ লেট (বিলম্ব) হইয়াছিল। আজি মঙ্গলবার, ৪। ৫ দিন বসিয়া থাকিতে হইবে, রবিবারে আবার জাহাজ মিলিবে। আমি এই কথা শুনিয়া একেবারে বাত্যাহত-কদলীর ন্যায় পড়িয়া যাইতেছিলাম বলিলে কি অত্যুক্তি হইবে? আমার সে পড়া—ই। আমি একেবারে মরিয়া গেলাম। ৫ দিন পোরবন্দরে বসিয়া থাকিলে রিটার্ণ টিকিট মাটী হইবে—সময়ে কাছারী যাইতে পারিব না। অথচ কাছারী খোলার প্রথম দিনেই সাহেব মক্কেলের মোকদ্দমা। আমি একবার পূর্ণচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলাম। সে দৃষ্টি রাহু। পূর্ণচন্দ্র তাহাতে রাহুগ্রস্ত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। চন্দ্রের ন্যায় কাঁপিয়াছিলেন কি না মনোযোগ দিয়া দেখি নাই। একজন বৃদ্ধ পাণ্ডাগোছ লোক ছিল—সে বলিল ও ভাবনা ভাবিবার সময় আছে, এখন বেলা অধিক হইয়াছে, চলুন বাসা করিয়া আহারাদি করিবেন। খুব ভাল স্থানই আমি দিব। আর একটি সুবিধা এই যে আমি যে স্থান দিব সে স্থান সুদামা মন্দিরের নিকটেই। আমি সুদামা নাম একবার শুনিয়াছিলাম—যে এই পুরীর নাম এদেশীয় লোকেরা বলে সুদামাপুরী, আর এই দ্বিতীয়বার শুনিলাম। কিন্তু সুদামা মন্দিরের কথা এই প্রথম

সুতরাং ভাল বুঝিতে পারিলাম না। সেই সময় একজন বলিল নিকটেই
ধর্ম্মশালা, আসুন যত্ন করিয়া রাখিব। আর একজন বলিল (ইংরাজীতে)
বৃদ্ধ যাহা বলিয়াছে সত্য, আসুন আমি সেই স্থানেই আপনাকে লইয়া
যাই। সেখানে ধর্ম্মশালাও আছে inn ইন্‌ও আছে। ইন্ ইংরেজী কথা
বিলাতী হোটেলের ন্যায়। সে আরও বলিল, পছন্দ না হয়, চলিয়া
আসিবেন। আহারের পর আমি ষ্টীমার আফিসে লইয়া গিয়া জাহাজের
সমস্ত সংবাদ আপনাকে দিব। সেখানকার ভাষা বুঝি না, ইংরেজী জানা
লোকটার উপর কেমন একটা সহানুভূতি হইল, বলিলাম "চল"। বৃদ্ধ
এই সময় সোৎসাহে বলিল "মিথ্যা বচন—নরক গমন" কেন মিথ্যা
বলিব। তখন মোট-ঘাট একটা এক্কায় তুলিয়া দিল। এক্কাখানি খুব
ভাল, সচরাচর প্রচলিত এক্কার ন্যায় নহে—অনেকটা "টঙ্গার" মত। চাপিবা
মাত্র হু হু করিয়া উড়াইয়া লইয়া চলিল। তিন মিনিটও লাগিল না
গন্তব্য স্থানে আসিয়া পঁহুছিলাম। বাড়ী, দ্বারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বলদ
গোটাকতক শুইয়া আছে, আর ৩। ৪ খানা গো শকট রহিয়াছে। বাড়ী
ঢুকিয়া দেখি এটি একটি কল্পতরু। একপাশে অনেকগুলি বলদ চক্ষু
বুজিয়া ঘাস চর্ব্বণ করিতেছে। প্রকাণ্ড উঠানের অপর পার্শ্বে অশ্বগণ
রহিয়াছে। এখানে গো শকট পাওয়া যায়, ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়,
ইচ্ছা করিলে রাঁধা অন্ন ব্যঞ্জন পাওয়া যায়। বিলাতী (inn) ইনের
সদৃশই ত বটে। বাটীর উত্তর পূর্ব্ব কোণ লইয়া অধিকারীর বাটী—নাম
ভুলিয়া গিয়াছি। পশ্চিমদিগে সারি সারি ঘর—পূর্ব্বমুখো—যেখানে
যাত্রীরা থাকে। আমাকে দক্ষিণদিকের ঘরটি দেখাইয়া ইংরাজী-অভিজ্ঞ
সেই লোকটি বলিল—এই ঘরে তারকেশ্বরের মোহান্ত মহারাজ বাস
করিয়াছিলেন, অল্প দিনই হইল তিনি আসিয়াছিলেন। বাক্য ব্যয় না
করিয়া আমি সেই ঘরই পছন্দ করিলাম। আরও দুই তিনটি বালক
আসিল তাহারা অধিকারীর পুত্রগণ—আরও একটি বালিকা ঘর পরিষ্কার
করিয়া দিল। সেরূপ স্বাস্থ্য আমি কখনও দেখি নাই। বালিকা সুন্দরী
সুগোল গঠন—স্বাস্থ্য যেন দেহ ফুটিয়া বাহির হইতেছে, আর তার উপর
বালিকা সুলভ সরলতা—যেন একটী দেব কন্যা। বয়স ১১ বছর গৌরী

বিবাহ হয় নাই। যেন দেবী মূর্ত্তি ধরিয়া হিমালয় ছাড়িয়া এখানে লীলা করিতেছেন। আনন্দময়ীকে দেখিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। আমাদের পাশের ঘরেই অনেকগুলি যাত্রী ছিলেন। দুইজন পুরুষ আর পাঁচ জন মেয়ে। সকলেই সুন্দরী। মহারাষ্ট্রীয় বণিক—বোম্বাই (তাহারা বলে "মুম্বই") সহরে দোকান আছে, তীর্থ ভ্রমণে আসিয়াছে। দ্বারকা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, এখন প্রভাস ও গীর্ণার যাইবে। সময়ের ভিখারী নহে, ধীরে স্বস্তিতে সব দেখিয়া বেড়াইতেছে। মেয়েরা সকলেই সুন্দরী, দুইজন মাত্র যুবতী ছিলেন, আর সব বর্ষীয়সী। স্ত্রী স্বাধীনতা সুতরাং—অসঙ্কোচে আমার সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিল। আমি টাইম টেবেল ও ম্যাপ বাহির করিয়া জাহাজের রাস্তা সময় আদি বুঝাইয়া দিলাম। একটি সুন্দরী যুবতীর ললাট ফলকে বৃহৎ সিন্দুর টিপ দেখিয়া আমার প্রাতঃ সূর্য্য মনে পড়িয়াছিল। আমি যখন মহারাষ্ট্রীয় মহিলাগণকে প্রভাস যাইবার পথ বুঝাইতেছিলাম, পূর্ণচন্দ্র তখন খিচুড়ী রাঁধিতেছিলেন, এবং সত্ত্বাধিকারীর পুত্র তখন কুমারীর সাহায্যে আমার ময়লা কাপড়গুলি ফর্সা করিতেছিল। ঘণ্টাখানেক পরে লইয়া আনিল—বেশ পরিষ্কার হইয়াছে। আমি হাসিয়া বলিলাম, তোমরা পোরবন্দরকে বিলাত করিয়া ফেলিয়াছ। সব কথা বলিতে গেলে, পুঁথি বাড়িয়া যাইবে, কাজেই সংক্ষেপ করিতে হইল।

স্নান আহারের পর আমরা পূর্ব্বোক্ত এক্কা বা টঙ্গা গাড়ী লইয়া ষ্টীমার ঘাটে যাইলাম। যাইবার সময় বাসার আসিল, দ্বারকাজীর একজন পাণ্ডা নাম প্রাগ্‌জী। প্রাগ্‌জী সাক্ষাৎ এঁটুলীর অবতার, এমনই বসিয়া গেল যে কিছুতেই ছাড়ে না, শেষে আমায় বলিল "বাবুজী বিরক্ত হবেন না——আমি নিজের খরচে যাইব—তবে সঙ্গে যাইব, পাণ্ডা ত আপনার একজন চাই, পছন্দ হয় লইবেন। ছায়া বা কি আর প্রাগ্‌জী বা কি—যেখানে যাই সঙ্গে সঙ্গে। তবে বলা উচিৎ একটি চাকরের ন্যায় কাজ করিতে লাগিল। আমাদের যখন যা চাই, আনিয়া যোগাইতে লাগিল। ক্রমে বাধ্য করিয়া ফেলিল—কি মায়া জানে। ক্রমে একটু টান হইল। মনে হইল অচেনা জায়গায় যাইতেছি ভাল একটা জানা শুনা লোক সঙ্গে থাকুক না—ভালই হইবে। সে দলস্থ একজন হইল ও রহিয়া গেল।

গাড়ী পবন বেগে চলিল। অশ্বের শিক্ষায় নল বিপক্ষে অনল চলিল। চালক যেন মাতলী অটল। অতুলনীয় সারথী বটে—চক্ষুর নিমিষে ষ্টীমার ঘাটে আনিল। এখানে হইলে মাতলী মহাশয়কে র‍্যাষ ড্রাইভিং অপরাধে পড়িতে হইত। ষ্টীমার ঘাটে গিয়া সেই পুরাতন কথাই শুনিলাম —বসিয়া পড়িলাম। আমি কিলিক নিকসনদের আপিসে গিয়াছিনু কর্ম্মচারী একজন গৌরবর্ণ যুবা। জাতিতে ক্ষত্রিয়। তিনি আমাকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন। তিনি বলিলেন, এক উপায় আছে যাহাতে আপনি দ্বারকা পরশ্ব সন্ধ্যার সময় পঁহুছিতে পারেন। আমি সাগ্রহে বলিলাম, দেশীয় নৌকায় নাকি? তিনি বলিলেন "না।" একটা কথা বলিয়া রাখি দেশীয় নৌকাকে এখানে "জাহাজ" বলে, আর ষ্টীমারকে বলে আগুণে বোট। তিনি বলিলেন "কল্য দুপুর বেলা, আন্দাজ ২॥ টার সময় একখানা আমাদের আগুণে বোট আসিবে। তাহার নাম "বাহাদুরী।" সে ষ্টীমার দ্বারকায় না থামিয়া একেবারে কচ্ছ প্রদেশে কচমাণ্ডবী (কচিমুণ্ডাও বলে) পঁহুছিবে বেলা ৮ টার সময়। ঠিক সেই সময় আমাদের কোম্পানির একখানা ষ্টীমার আসিয়া কচমাণ্ডবীতে ধরিবে, সেখানা আসিতেছে কেরাচি হইতে। সে মাণ্ডবী হইতে লোক লইয়া দ্বারকায় থামিবে, বেলা দশটার সময় ছাড়িবে। আপনি অনায়াসে এ বোট হইতে ও বোটে চাপিয়া সন্ধ্যার সময় দ্বারকা আসিয়া পঁহুছিতে পারিবেন। কোন কষ্ট নাই, কেবল ভাড়া বেশী পড়িবে। তবে আপনি সময়ের ভিখারী, সময় পাইবেন, নতুবা রবিবার পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিতে হইবে।" আমি কথা শুনিয়া লাফাইয়া উঠিলাম, বলিলাম নিশ্চয়ই যাইব। ভাড়া আদির ব্যাপার স্থির করিয়া ষ্টীমার আফিস হইতে বাহির হইলাম। আফিসে বসিয়া দূরবীণ সাহায্যে সমুদ্র ও সমুদ্র-গামী ষ্টীমার দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম। সোমনাথের মন্দিরে যাইব বলিয়া যেমন বাহির হইব, অমনই একজন লোক পূর্ণকে সেলাম করিল। পরিচয়ে বলিল, পূর্ণ বাবুকে অনেক কারণে চাণকে (বারাকপুরে) দেখিয়াছে। সে বারাকপুরে পলটনের নাপিত (হাজাম) বাঁকিপুরে বাড়ী। কেরাচীতে তাহার পুত্র পলটনে থাকে, পুত্র দেখিয়া, পুত্রমুখ দর্শন করিয়া সে কেরাচী হইতে

৯০ ক্রোশ উষ্ট্র যানে বা চলিয়া হিংলাজ যাইবে (হিঙ্গুলা তীর্থ করাচীর উত্তর, সমুদ্রের কিনারায় কিনারায় যাইতে হয়, দেবী কোট্টরী ভীম লোচন ভৈরব আছেন, এখানে জ্যোতি দর্শন হয়। বিষ্ণু চক্রে সতী দেহ ছেদিত হইলে এইখানে দেবীর ব্রহ্মরন্ধ্র পতিত হয়, তাই এত মাহাত্ম্য) আমি ত শুনিয়াই অবাক্। যাহাহৌক সোমনাথ মন্দিরে বড় আনন্দ পাইয়াছিলাম। স্থানটি পরম রমণীয়, দুইদিকে সমুদ্র, আর দুইদিকে সমুদ্র সৈকত। ব্রাহ্মণ ঠাকুর, মহাদেবের বেশ বিন্যাস (বা শিঙ্গার) করিতেছিলেন। আমরা গমন করিলে বড়ই সমাদর করিলেন। তিনি বলিলেন, এই সোমনাথ ও প্রভাসের সোমনাথ, একই দেবতা। সন্ধ্যার প্রাক্কাল দেখিয়া আমরা একটু জপ আহ্নিক করিয়াছিলাম। তাহাতে বিশেষ আনন্দ পাইয়াছিলাম, আর গুরুকৃপায় বুঝিতে পারিয়াছিলাম, মহাদেব "জাগ্রত।" মহাদেবের প্রাঙ্গণে একদল বিবিধ প্রকারের সন্ন্যাসী নানা বাদ্য বাজাইয়া আনন্দ করিতেছে। তাহারা গাঁজার জন্য কিছু আদায় করিল। ফিরিয়া আসিবার সময়, সেই সাধুর সঙ্গে দেখা হইল, যিনি আমার সহিত আমেদাবাদ হইতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন ও আমাকে বড়ই ভালবাসিয়াছিলেন। এখন আমাকে দেখিয়া আনন্দে গলিয়া গেলেন। জিজ্ঞাসায় জানিলাম করাচী যাইবেন। আমি বলিলাম, আমার সঙ্গে কাল যাইবেন, আমি মাণ্ডবী পর্য্যন্ত যাইব, আপনি সঙ্গে যাইবেন। পরে আমি জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে দুইজন বাঙ্গালী পোরবন্দরে আছে। লেডী ডাক্তার ও তাঁহার স্বামী। আমি লেডী-ডাক্তারের বাসায় যাইলাম। সেখানে তাঁহার স্বামীর সহিত আলাপ হইল। বড় অমায়িক লোক, তাঁর সঙ্গে যে সকল কথা হইয়াছিল তাহা সাধারণে প্রকাশ করা চলে না। সেখানে বসিয়া কথা বার্ত্তা কহিতেছি অর্থাৎ দ্বারকার ব্যাপারগুলা শুনিয়া লইতেছি, তিনি চারিবার দ্বারকা গিয়াছিলেন, এমন সময় আসিলেন একজন নবীন ব্রহ্মচারী। তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য, বিবেকানন্দ স্বামীর শিষ্য বলিয়া প্রকাশ করিলেন। শুনিলাম দুইদিন পূর্ব্বে তিনি মাণ্ডবী হইতে আসিয়াছেন। আর কয়েক মাস "ভুজ" (কচ্ছ-ভুজ ভূগোলে পড়িয়াছিলাম) সহরে ছিলেন। তিনি আসিয়াই বলিলেন একাদশীর রাত্রিতে (অর্থাৎ পূর্ব্ব

রজনীতে, সুদামা মন্দির "হলে" যমুনা দাস সদাগর তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে দেন নাই। কারণ কি জিজ্ঞাসায় শুনিলাম পাছে স্বদেশীয় কোন কথা বলেন। এই ভয়ে কেবল মাত্র ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা করিতে দেন নাই। মনে মনে বুঝিলাম বৃটীশ সিংহের দংষ্ট্রা কোথা। যাহাহৌক নবীন ব্রহ্মচারী ছাড়িবার পাত্র নহেন—অনেক বলিয়া কহিয়া পুনরায় একদিন বক্তৃতা করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। পূর্ণিমার দিন সম্ভবতঃ বক্তৃতা করিবেন। তাঁর কাছে মাণ্ডবীর সকল সংবাদই পাইলাম। গুরু দেবের কৃপায় দ্বারকার ও মাণ্ডবীর অবশ্য জ্ঞাতব্য সকল কথাই জানিলাম। অনেক রাত্রিতে বিদায় লইলাম। পান দিয়াছিলেন, আমি খাই নাই। পরদিন প্রাতে আমি আহ্নিক করিতেছি এমন সময় লেডী ডাক্তারের স্বামী মহাশয় আসিলেন। পান না খাওয়ায় দুঃখিত। তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত বলায় সে কথা বুঝিলাম। দেখিলাম তিনি একজন বড় লোক হৃদয়টা খুব—মস্তিষ্কটাও খুব। সে সব কথা আর বলিব না। যাহাহৌক প্রাণে প্রাণে মিলিয়া গেল। এমন সময় আসিলেন ব্রহ্মচারী। অনেক কথা হইল। শেষে তিনি অঙ্গার পাঠাইয়া দিলেন—তামাক খাবার অসুবিধা না হয়। বিদায় লইলাম। গাড়ী ভাড়া দিবার সময় চক্ষু স্থির। কলিকাতার যে ভাড়া তাহার ৪ গুণ দাওয়া করিল। কিছুতেই এক পয়সা কম লইল না। আমি ভাবিলাম, বড়মানুষী করিবার আক্কেল সেলামী। যাহাহৌক কড়ায় গণ্ডায় চুকাইয়া দিয়া সেই গাড়ীতেই বেলা ১।।০ টার সময় ষ্টীমার ঘাটে যাইবার জন্য বাহির হইলাম। সুদামাপুরী গিয়া দেখি দ্বার বন্ধ। বুঝিলাম আগে রণছোড়জীকে দেখাই কর্ত্তব্য। টিকিট লইয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে দূরবীণ দিয়া দেখিলাম, আগুণে বোট আসিতেছে। আমরা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। প্রথমেই আমরা একটা ছোট নৌকায় চাপিলাম। এটা জলি বোটের অনুরূপ। আমাদের দেশে গঙ্গায় বর্ষাকালে যে বড় বড় মহাজনী "মেনেনী" প্রভৃতি নৌকা আসে তাহাদের সঙ্গে ছোট নৌকা যে বাঁধা থাকে সেইরূপ, আফিস হইতে মালবাবু সঙ্গে চলিলেন। প্রথম দিনের আলাপী কর্ম্মচারী ইঁহার সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। ইনি আমাকে অত্যন্ত যত্ন করিয়াছিলেন। সেখানে

সমুদ্রের জল কম বলিয়া এই নৌকায় পোয়াটাক পথ গিয়া আমরা একখানি "জাহাজে" উঠিলাম, এইটি বড় বিপদ জনক—বিশেষত স্ত্রীলোকদের পক্ষে। সে যাহাহৌক আমরা জাহাজে উঠিলে জাহাজের পাল তুলিয়া দিল। বায়ুর গতি অনুসারে কখনও পূর্ব্বাভিমুখে, কখনও উত্তরাভিমুখে একবার বা বাম পার্শ্বে, একবার বা দক্ষিণ পার্শ্বে, এরূপ গতিতে দেড় মাইল রাস্তা গমন করিয়া আমরা ষ্টীমারের নিকট পঁহুছিলাম। সেখানে হুল স্থুল। প্রায় ৩০ খানি "জাহাজ" জমিয়াছে, তাহারা ষ্টীমারের উভয় পার্শ্বে থাকিয়া ষ্টীমার হইতে ক্রেণ যন্ত্র সাহায্যে মাল বোঝাই লইতেছে। এই জাহাজগুলি সমুদ্র তরঙ্গে ক্রমাগত নাচিতেছে—নিমেষ মাত্রও স্থির নহে। অনেকগুলি বালকও মাল্লার কাজ করিতেছে। তাহারা এই গুণ বৃক্ষের উপর উঠিয়া পাল গুটাইতেছে, আবার জাহাজে মাল বোঝাই লইয়া ছাড়িবার সময় ঐরূপ উঠিয়া পাল খাটাইতেছে। লাফালাফি, হুটাহুটি, ছুটাছুটি করিতেছে। দেখিলে বোধ হয় ইহাদের অসাধ্য কোন কার্য্য নাই। ইহারা যথার্থই সমুদ্র সারমেয় (Sea dog)। ইহারা এই সমস্ত জাহাজ লইয়া দ্বীপ পুঞ্জময় আফ্রিকা যায়, লঙ্কা যায়, সর্ব্বত্রই যায়। ইহাদেরই সভ্য ভাষায় নাম—যখন বিলাতী ষ্টীমারে কাজ করে—"লস্কর।" ভারতের ভাগ্যে যদি কখনও নেভি (navy) পোত-বল হয়, তবে দাঁড়ি মাঝির কখনও অভাব হইবে না, একথা স্থির নিশ্চয়।

জাহাজে উঠিবার জন্য উপর ডেক হইতে শিকলে বাঁধা কাঠের সিঁড়ি ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। আমরা জাহাজ হইতে সেই সিঁড়ি ধরিয়া উপরে গেলাম। আমাকে মাল বাবুর কথামত তিন চারিজন লোকে সাহায্য করিয়াছিল ও মোট প্রভৃতি তুলিয়া দিয়াছিল। আমার সেকেণ্ড ক্লাস ক্যাবিন টিকিট ছিল। ষ্টীমারের পশ্চাৎ ভাগে গিয়া দেখি দুই ধারে ক্যাবিন অর্থাৎ ছোট ছোট কুঠারী। আমি একটি কুঠারী বা ক্যাবিন বাছিয়া লইলাম। পূর্ব্বে কংগ্রেস উপলক্ষে মান্দ্রাজ যাওয়ায় ক্যাবিনের ব্যাপার তথা ষ্টীমারের ব্যাপার আমার জানা ছিল। পূর্ণ আসিয়া চর্ম্ম গদির উপর আমার বিছানা করিয়া দিল ও বড় বাকস্ টা আমার ক্যাবিনেই রহিল। কুরিয়ার ব্যাগ সর্ব্বদা নিকটে থাকিত। ষ্টীমারের দক্ষিণ

দিগে অর্থাৎ ডান দিকে কিনারা ও ক্যাবিনের মধ্যে যে স্থান ছিল সেই খানে পূর্ণচন্দ্র, পাণ্ডা প্রাগ্‌জী ও সেই পূর্ব্ব পরিচিত সাধু আপনাদের আসন করিলেন। ক্ষণকাল পরেই উঁকি মারিয়া দেখি গঞ্জিকার ধূমে অন্ধকার। পাণ্ডাজী খুব মজবুৎ, আবার আর একজন সন্ন্যাসী জুটিয়াছে। কেবল ঢাল সাজ—তবে আমাকে পাণ্ডাজী লুকাইতেছিল। আমি ষ্টীমারের চারিদিকে বেড়াইয়া দেখিলাম। প্রথম শ্রেণীতে একজন সাহেব ছিলেন—তিনি করাচী যাইতেছিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ হইল। ঠিক ঠাওরাইতে পারিলাম না তিনি কি করেন, ভাবে বোধ হইল, ডাক্তার। বলিলেন বঙ্গদেশ আমি কখনও দেখি নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন হুগলি নদী না সহর। যাহাহৌক নৌকায় শৌচাচার সারিয়া আহ্নিক সারিলাম। সঙ্গে লুচী ভাজিয়া লইয়াছিলাম, তাই আহার হইল। দুধ মিলিল, ষ্টীমারে সব জিনিষ কিনিতে পাওয়া যায়, তবে অগ্নি মূল্য, চারিগুণ দাম। পয়সা যার আছে আর খরচ করিবার মতি আছে, তার খুব সুখ। রাত্রি বেশী হইলে বাতাসের জোর হইল। সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিল, ষ্টীমার দুলিতে লাগিল, আমি পূর্ণকে ওখান হইতে তুলিয়া আনিয়া ষ্টীমারের কোণে নির্বাত স্থানে শোয়াইলাম। ক্যাবিন বড় গরম বলিয়া আমিও বাহিরে বসিয়া স্বভাবের শোভা দেখিতে লাগিলাম। চন্দ্রোদয়ে অপরূপ বাহার হইয়াছিল—শোভা দেখিয়া ভাবে মন গলিয়া গেল। ফস্‌ফরাস্ সমুদ্র তরঙ্গের আলোড়নে আলোক রশ্মিপাতে ডায়মণ্ড কাটা অলঙ্কারের ন্যায় অথবা হীরক খণ্ডের ন্যায় চক চক করিতেছে। সেই চাকচিক্যময় তরঙ্গের উপর আবার চন্দ্রমার রশ্মিপাতে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। মনে রাখিবেন, সমুদ্রের জল স্বভাবত নীলমসীবর্ণ অথবা তরঙ্গ উঠিলে তরঙ্গ শিরে শ্বেত ফেনপুঞ্জ ক্ষণ-কালের জন্য দর্শন হয়। দেখিয়া দেখিয়া কত লুপ্ত স্মৃতির উদয় হইল, কত বিগত বেদনা জাগিয়া উঠিল, সকলি নিস্তব্ধ, কেবল ষ্টীমার হুস্ হুস্ করিতে করিতে অবিরল চলিয়াছে। আমি সেই শব্দকে সুর করিয়া আমার বেহাগ মিশাইলাম—

কাঁদে কি সকলে পেয়ে প্রাণধন।
আমারই মতন॥

সুখের আভাস এলে,
অসুখ আরও উথলে
চাঁদের ও উদয় হলে সাগর যেমন॥

ক্রমে ভারতের ভবিষ্যৎ কি হইবে এই ভাবনা আসিল, সেই ভগবানের পাদপদ্মে সমস্ত অর্পণ করিয়া তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিয়া হৃদয় শান্ত হইল। বুঝিলাম ভগবানকে মা বলিয়া ভাবাই প্রশস্ত। পরিবারের মধ্যে এমন সম্পর্ক আর দ্বিতীয় নাই, আর মায়ের উপর সন্তানের অনেকটা জোর আবদার চলে। ক্রমে রাত্রি অধিক হওয়ায় ক্যাবিনে শয়ন করিতে গেলাম। ভোরে উঠিয়া দেখিলাম ষ্টীমার ক্রমাগত সেইরূপই চলিতেছে, বিরাম নাই বিশ্রাম নাই, চতুর্দ্দিকে এখনও অন্ধকার, কেবল পূর্ব্ব গগণে শুকতারা আর অপেক্ষাকৃত ফরসা। যাহাহৌক বেলা আটটার সময় "বাহাদুরী" ষ্টীমার কচ্ছ দেশের মাণ্ডবী বন্দরের এক বা দেড় মাইল দূরে নঙ্গর ফেলিল আমরা মোট গুছাইতে লাগিলাম। সহসা ক্যাবিনের ভিতর একজন উপস্থিত হইয়া মোট ধরিল। বলিল সে মজুর নহে "শালে"। শালে অর্থে নাবিক। বোধ হয় ইংরেজী Sailor সেলর শব্দ মুড়ি গুড়ি দিয়া ভারতের মালাবার উপকূলে শালে ভাবে বিরাজ করিতেছেন। আমি বলিলাম ভালই হইয়াছে। আমার মাল লইয়া যাইবে ও এখনই অপর আগুণে বোটে আমাকে ও মাল তুলিয়া দিতে হইবে; কেন না আমি করাচী হইতে যে ষ্টীমার আসিতেছে, তাহাতে চাপিয়া দ্বারকা যাইব। জিজ্ঞাসায় সে বলিল যে অনেক দেরি সে ষ্টীমার বেলা দুপুরের সময় ছাড়িবে, আপনি সহর দেখুন, স্নানাহার করুন, বহুৎ দেরি। বাহিরে আসিয়া দেখি জাহাজে জাহাজে ছয়লাভ। আগুণ বোটের চতুর্দ্দিকেই জাহাজ মাল লইতে আসিয়াছে। তাহারা না গেলে আর আমাদের নামিবার উপায় নাই। অনেকক্ষণ পরে "শালের" জাহাজে চাপিয়া সমুদ্র তট নিকটে উপস্থিত হইলাম। সেখানে চটান পুকুরের ভাব, গরুর গাড়ি একেবারে জাহাজের ধারে আসিল, আমি লম্ফ দিয়া জাহাজ হইতে গরুর গাড়ীতে চাপিলাম। গরুর গাড়ী নানা সুরে নিজের দুঃখের কাহিনী মাণ্ডবী-আগত লোকজনের নিকট জ্ঞাপন করিতে করিতে হাঁটু সমান বালী ভাঙ্গিয়া ক্রমে চড়াই

করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে আমরা কষ্টম হাউসে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, সেইখানে আমাদের মাল পত্র নামান হইল। গাড়ী-বারান্দার মত স্থানে আমাদের রাখিয়া দুই ধারে চাবি দিয়া বন্ধ করিল, বসিয়াই আছি—লোক আর আসে না। আবার শুনিলাম ১০টার সময় দ্বারকার ষ্টীমার ছাড়িয়া যাইবে। আমি বড় ব্যস্ত হইলাম। অর্দ্ধঘণ্টা পরে স্থূলকায় একজন কর্ম্মচারী আসিয়া উপস্থিত। বলা বাহুল্য চুঙ্গী শুল্ক আদায় জন্য ও অপরাপর ব্যাপার জন্য আমাদের এই দুর্দ্দশা। ব্যবসার জন্য নূতন কাপড়, নূতন দ্রব্যাদি আনিয়াছি কি না মোট খুলিয়া সমস্ত দ্রব্য দেখাইতে হইবে, বিপদ বড় কম নয়। পাঁচ সাতটা মোট খুলিয়া দেখাইতে হইবে—আবার বাঁধিতে হইবে।

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

আমাদের আপনাদের কথা।

(১)

কর্ম্মের ভোগ ভুগিতেই হয়; দুঃখ করিলে আর কি হইবে? এখন আমি রাজনীতিকে ছাড়িতে চাই, কিন্তু কম্‌লী ছোড়ত নেহী। যেখানে যাই, যার সঙ্গে দেখা হয়, কেবল দুটি মাত্র কথা—মুরলীর ধ্বনি লাগিল কেমন; সংশোধনের ব্যবস্থা কেমন হইয়াছে? সেদিন একজন সরকারি উচ্চ কর্ম্মচারীও ঐ কথা জিজ্ঞাসা করেন।

আমার একটা অতি পুরাতন কথার সঙ্গে, আমার উত্তর জড়িত ছিল; সেই কথাটা বলিতে হইতেছে। আমার কিছু জ্ঞান হওয়া অবধি, এই চল্লিশ বৎসর যাবৎ আমি বলিতেছি, যে মহাত্মা রাম মোহন রায়ের সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত দেখিতেছি, প্রায় সকলেই ভারত-ভবনের কার্ণিশ কারু-কার্য্য লইয়া ব্যস্ত। এমন যে সুদৃঢ় ভিত্তি, তাও ক্বচিৎ কোথাও শিথিল হইতেছে অনেক স্থলে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, ছাদ ফুটা হইয়া জল পড়িতেছে, কাজেই মেজেয় জল বসিতেছে—ঘর সেঁতা হইতেছে—কিন্তু সে দিকে প্রায় কাহারও দৃষ্টি নাই—ঐ যে কার্ণিসের নীচে লতা পাতায় ফুল কাটা তাহারই মেরামত হইতেছে। উচ্চ কর্ম্মচারী মহাশয়কে তাহাতেই বলিয়াছিলাম, কার্ণিসের মেরামতের কথা লইয়া আমরা আর কত দিন কাটাইব? ঐ কথার ভাল মন্দ লইয়া আর কত কাল তর্ক বিতর্ক করিব? এখন দিন কতক আমাদিগকে আমাদের ঘরের কথা ভাবিতে হইবে; কার্ণিস, অলিন্দ, লতাপাতা, কারুকার্য্য ভাল হৌক, মন্দ হৌক, ওসকলকে ভুলিতে হইবে। যাহাতে আমরা সুস্থ শরীরে বসবাস করিতে পারি, তাহার কথা ভাবিতে হইবে, সেই চেষ্টা করিতে হইবে।

ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুত, ব্যোম। এই পাঁচটির পাঁচটিতেই আমরা সাধারণ ভারতবাসী, বিশেষতঃ বঙ্গবাসী, নানারূপে বিড়ম্বিত। আমরা শুষ্ক মাটীতে বাস করিতে পাই না; স্নান পানের জন্য পরিষ্কার জল পাই না; পল্লীগ্রাম সকল জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, প্রচুর সূর্য্যালোক আসে না। মাটী পচায়, গাছ পচায়, বায়ু অনেক স্থানে বিষম দূষিত

হইয়াছে, বিশুদ্ধ বায়ু আমরা সেবন করিতে পাই না। রোগক্লিষ্ট, শোক-দগ্ধ, অন্নাভাবে শীর্ণ, অকালে জীর্ণ, কোটি নর-নারীর আর্ত্তরবে আকাশ পর্য্যন্ত বিদূষিত হইয়াছে, শূন্য প্রাণে শূন্য পানে চাহিয়াও আমরা সান্ত্বনা পাই না। দুর্দ্দশায়, আমাদের শান্তি স্বস্তি অন্তর্হিত হইতে বসিয়াছে। কি করিব—আমরা নির্ব্বাচিত সদস্য পূর্ণ মন্ত্রণা সভা লইয়া? কি করিব, কমিটি, বোর্ড, কৌন্‌সিল লইয়া? কি করিব, উচ্চ নীচ, সুলভ, দুর্লভ শিক্ষা লইয়া? কি করিব বিচারক ও শাসকের পার্থক্য লইয়া? কি করিব, সভাগৃহ মধ্যে, রাজকর্ম্মচারীদিগকে অবাধে প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা লইয়া? আর কি করিব সুদূর বিলাতে নিনাদিত মুরুলি ধ্বনি শুনিয়া? আমরা সে বাস্তর মাটী পাই না, তৃষ্ণার জল পাই না, শীতে রৌদ্র পাই না, গ্রীষ্মে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে পাই না। আমরা যে জ্বরে হয় উজাড় হইয়া যাইতেছি, নয় জড় সড় হইয়া আছি। আমরা যে প্রচুর আহার অভাবে দিন দিন ক্ষীণ হইতেছি; দেহের বল কমিতেছে; হৃদয়ের সাহস কমিতেছে, প্রাণের স্ফূর্ত্তি নাই বলিলেই হয়।

রাস্তা, বাঁধ, জাঙ্গাল, সড়ক—সমগ্র ভারতে নিত্যই বাড়িতেছে; গোলক ধাঁধার মত রাস্তার জটিলতায় পথ হারাইয়া ফেলিতে হয়; রাস্তার জাল দিয়া, সমস্ত ভারতবর্ষ ছাঁকিয়া ফেলা হইয়াছে,—তাহাতে স্থল পথ সুসার হইয়াছে বটে, কিন্তু জল নিকাশীর পথ প্রচুর না থাকায়, বৃষ্টির জল, বন্যার জল নিকাশ পায় না, মাটীতে ক্রমাগত জল বসিতে থাকে—কাজেই ভূমি হইয়াছে ম্যালেরিয়ার বিহারক্ষেত্র। শুষ্ক ভূমিতে বাস করিতে সকলেই উপদেশ দেন, কিন্তু ভূমিতে জল বসিলে, ভূমি শুষ্ক থাকে, কিরূপে? সুতরাং বাস্ত ভূমি সকল বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। রাস্তা জাঙ্গাল, বাঁধের মধ্যে মধ্যে সেতু করিয়া দিয়া জল নিকাশীর ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

আবার নদীগর্ভ সকল ক্রমে ভরিয়া উঠিয়াছে, এই সকল নদী কাটাইয়া না দিলে রীতিমত জল নিকাশী হইবে না; দিলে জল নিকাশীর ব্যবস্থাও হইবে, এবং স্নানের ও পানের জন্য জল সংকুলানও হইবে।

পূর্ব্বে ধনী মধ্যবিত্তের ধর্ম্ম প্রাণতা ছিল; পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ও নব পুষ্করিণীর প্রতিষ্ঠা প্রায়ই হইত; এখন সে ধর্ম্ম প্রাণতা নাই—কিন্তু

প্রাণ-রক্ষা ত চাই; ভাল জলের সংস্থান না করিলে নদী বিহীন পল্লীগ্রাম টেকিতেই পারে না। এ বিষয়ে সকলেরই মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। কেবল কার্ণিসের কথা লইয়া কাল কাটাইও না। তাহার পর, দেশে জঙ্গল বাড়িতেছে। কতক আমাদের উদাসীনতায়, কতক আমাদের আলস্যে, আর কতক আমাদের লোভে। বাগাত জমিতে গাছ পালা চির-কালই আছে ও থাকিবে; নতুবা বাগাত হইবে, কি প্রকারে? কিন্তু বাস্ত, উদ্বাস্ত—আমরা লোভপরবশ হইয়া আমের কলমে, নিচুর কলমে ভরিয়া ফেলিতেছি। যাহার আছে সে বাগাত জমিতে বাগান কর, কিন্তু বাস্ত উদ্বাস্ত জঙ্গল করিও না। মাঠাল জমিও বাগাতে পরিবর্ত্তন করিও না। জঙ্গলে ভূমি শুষ্ক হইতে পারে না, তাহাতে বাস্তর বিলক্ষণ ক্ষতি হয়, এবং ক্ষেত্রে বাগান করিলে, শস্য সম্ভার কমিয়া যায়। আগাছা, একটু বড় হইলেই পূর্ব্বে লোকে কাটিয়া ফেলিত; এখন পাথুরে কয়লা জ্বালানি হওয়ায়, আগাছার তত টান নাই; বড় আগাছায় গ্রাম নগরের উপকণ্ঠ একবারে ভরিয়া উঠিতেছে। আলস্যে এবং উদাসীনতায়, আমরা সে গুলি কাটাইবার বন্দোবস্ত করি না। কিন্তু না করিলে আর চলে না। মর্লি মিণ্টো কি করিলেন, কি না করিলেন, সেই ভাবনা ভাবিয়া দিন যাপন করিলে, আর চলিতেছে না আপনার অবস্থা, আপনার গ্রামের অবস্থা, আপনার জেলার অবস্থা ধীরে সুস্থে বিবেচনা করিয়া দেখ; দেখিলে বেশ বুঝিতে পারিবে, আমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়াতে, আমাদের ইহকাল পরকাল নষ্ট হইতেছে। যাহাতে আপন গ্রামে, আপন ভিটায়, আমরা সুস্থ শরীরে বাস করিতে পারি তাহার চেষ্টা সকলকে করিতে হইবে। জঙ্গল কাটাইতে হইবে, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করাইতে হইবে, নদী সকল যাহাতে বহতা হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

শরীর বহিলে, ধর্ম্ম সাধন হয়, লোকযাত্রা সাধন হয়; শরীর সুস্থ না থাকিলে, কোন কিছু হয় না; কোন কিছু ভাল লাগে না। যাহাতে সুস্থ শরীরে নিজের ভিটায় বাস করিতে পার, তাহার জন্য প্রথমে নিজে চেষ্টা করিতে থাক; জঙ্গল কাটাইবার পয়সা না জুটে, প্রত্যহ স্বহস্তে নিজে কাটিতে থাক; তাহার পর, প্রতিবাসীর জঙ্গল কাটাইবার জন্য জনের

জনের বাড়ীতে গিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া, তাঁহাদিগকে জঙ্গল কাটাইতে লওয়াও। গ্রামের মাথাল মাথাল লোকদের ধর, স্বদেশী সেবক সম্প্রদায়কে ধর, ফাঁড়ির জমাদারকে ধর, থানার দারোগাকে বল; নদী বহতা করাইবার জন্য জমীদার মহাশয়কে ধর, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়কে ধর; যখন লাট সাহেব সদরে আসিবেন, তখন তাঁহার কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়। লাগিয়া পড়িয়া থাকিলে—পাহাড় টলান যায়।

শিক্ষা বল, বিদ্যা বল, গুণাপনা বল, ধন বল, যশ বল—শরীর বহিলেই ত সব। যাহাতে আমরা সেই শরীর সুস্থ রাখিয়া বসবাস করিতে পারি, তাহার জন্য অগ্রে আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে; সেই চেষ্টাকে আমন্তর-নীতি বলিতে হয়, বল, প্রজানীতি বলিতে হয়, স্বাস্থ্য নীতি বলিতে হয়, বল, এইজন্য রাজপুরুষগণের নিকট যে ক্রন্দন আবেদন, নিবেদন—তাহাকে রাজনীতি বলিতে হয়, বল,—যে নামে বলিতে হয়, বল,—কিন্তু এই চেষ্টা এখন কিছুদিন করা চাই। সর্ব্বরূপ আন্দোলনে বিশ্রাম দিয়া, এই কার্য্যে লাগিয়া যাও; উদাসীনতায়, আলস্যে, নির্ব্বুদ্ধিতায় আসল খোয়াইয়ানকলের জন্য লালায়িত হইও না।

বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, যাঁহারা দেশের হিতাহিত চর্চ্চা সতত করাতে দেশের অধিনায়ক বলিয়া অভিহিত হয়েন, তাঁহারা প্রায়ই দেশের মজ্জার কথার আলোচনা করেন না। এই যে জাঁক পসারে মান্দ্রাজে কংগ্রেস্ হইয়া গেল, এবং স্বনামখ্যাত সুযোগ্য ব্যবহারাজীব ডাক্তার রাস বিহারী ঘোষ তাহার অধিনায়কতা করিলেন এবং সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেশের নানা কথার আন্দোলন করিলেন, তিনি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, শুনিবেন? "I should have also liked to make a few remarks on the high mortality from plague and malaria * * But I feel I cannot detain you much longer." হরি! হরি! ইহারাই আমাদের দেশের অধিনায়ক! মজ্জার কথা বলিবার অধিনায়কদের সময় হয় না, শ্রোতাদের শুনিবার অবকাশও হয় না। সময় পাইলে, এবং শ্রোতাদের সুমতি হইলে, কংগ্রেসের সভাপতি মহাশয় মৃত্যু সংখ্যার আধিক্য বিষয়ে কিছু বলিতে পারিতেন। কিন্তু আমাদের ভারতবাসীদের মৃত্যু সংখ্যা বড়

বেশী, এইটিই কি কেবল আমাদের দুঃখ? তা ত নয়—আমরা যে কেবল অনেকে মরিতেছি এমন ত নয়, আমরা প্রায় সকলেই আধ-মরা, পোন-মরা সিকি-মরা হইয়া বাঁচিয়া রহিয়াছি, সেই দুঃখই বিষম দুঃখ। এ দুঃখ ত শ্মশানের আগুণে পুড়িবে না, পুত্র পৌত্রাদিক্রমে চলিতে থাকিবে। এত বড় দুঃখ, আমাদের অধিনায়কগণ হৃদয়ে ধারণা করেন না, কাজেই তাঁহাদের কথায় বা লেখায় প্রকাশ পায় না।

এই জন্য বোধ হয়, তাঁহারা সমাজের অঙ্গ সৌষ্ঠব লইয়াই ব্যস্ত, সমাজের, প্রাণের সহিত তাঁহারা প্রাণ লাগাইতে পারেন না। কাজেই তাঁহাদের কান্নাকাটি শান্ত করিবার জন্য যে মুরলি ধ্বনি, তাহাতেও কেবল শাসন সৌষ্ঠবের উপক্রম করিবার আশ্বাস বাক্য।

তবে উপায়? দেশের বড়লোকেরা যদি, আমাদের মজ্জাগত দুঃখের কথা না ভাবিলেন,—তবে আমাদের উপায়? উপায় শ্রীভগবান্। তিনি, আমাদিগের পরিত্রাণের জন্য 'অসংখ্য' বার অবতীর্ণ হইয়াছেন—আমাদের উপায় চিরদিনই তিনি। আমরা দেখিতেছি—শাসক পুরুষগণের দৃষ্টি ভারতের এই দুর্বিসহ দুর্দ্দশার দিকে একটু একটু করিয়া আকৃষ্ট হইতেছে। সানিটরি কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায় সরকার পক্ষ যেন অধিকতর মনোযোগী হইতেছেন; শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার আগস্তি প্রমুখ দুই একজন দেশীয় উচ্চ-কর্ম্মচারী এবং চৌধুরী সাহেব প্রমুখ গণ্যমান্য সহৃদয় ব্যক্তি—এই বিষয়ে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানে বাঙ্গালার জেলায় জেলায় সামান্য অর্থ ব্যয়ের ব্যবস্থা হইতেছে। যশোর জেলার ভৈরব নদীর এবং আমাদের হুগলি জেলার কৌষিকী নদীর খাল বহতা করিয়া দেওয়া হইতেছে। ভগবান্ আমাদের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, এখন আমরা তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া একবার উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে পারিলেই হয়। আমরা—কিনা, তুমি, আমি, কালু কেওরা, নীলু পোদ, হাসিম্ সেখ, জিতু মোল্লা সকলে লাগিতে পারিলেই হয়।

সুরেন্দ্র বাবু, রাস বিহারী বাবু প্রভৃতির অবশ্য হাতে পায়ে ধরিতে হইবে, বলিতে হইবে, যে তাঁহারা দিন কত আমাদের অধিনায়কতা করিয়া আমাদের মজ্জার কথা প্রকাশ করুন, যদি একান্ত না শুনেন, তখন

আমরাই আপনারাই কোমর বাঁধিয়া লাগিব। ভগবান্ আমাদের সহায়, আমরা প্রাণের ব্যথায় ব্যথিত, সেই প্রাণের সহিত সাধিলে, সিদ্ধি আমাদের অবশ্য হইবে।

আমাদের আয়াস ব্যর্থ হইবার আশঙ্কা নাই। যুগ যুগান্তর ধরিয়া ভগবান্ আমাদের রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, এখন এই কলির প্রারম্ভে কেবল উদাসীনতায় ও আলস্যে নষ্ট হইবার জন্য? তাহা কি কখন হয়? আমরা হিন্দু, মনু যাজ্ঞবল্ক্য ব্যাস বাল্মীকি আমাদের রক্ষা করিতেছেন; আমরা মুসলমান—খোদা হজরৎ মহম্মদকে আমাদের জন্য মর্ত্তে প্রেরণ করেন, কি কেবল অকালে মরিবার জন্য? তা কি কখন হয়? আমরা নিশ্চেষ্ট থাকিয়া, মৃত্যুকে আহ্বান করিব না।

আমাদের মধ্যে স্বদেশী-সেবক সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছে। তাহাদের চক্ষু ফুটিতেছে, তাহারা আর রাজনীতির ছায়া লইয়া কাল কাটাইবে না; তাহারা প্রকৃত সমাজসেবক স্বাস্থ্যসেবক হইবে। ফাকা কুস্তি, মিছা লাঠি ঠকাঠকি আর তাহারা করিবে না; কুঠার কর্ত্তরি লইয়া তাহারা আগাছা কাটিয়া, কোদাল দিয়া আগাছার গোড়া উপাড়িয়া, বাগানের ফল কর গাছের মাঝে মাঝে কাটিয়া দিয়া, তর্স তর্স করিয়া, জঙ্গল নির্ম্মূল করিবে। কিংস্ফোর্ড কোম্পানীর সঙ্গে তাহারা আর শত্রুতা সাধন করিবে না; ভারতের দুর্জ্জয় শত্রু ম্যালেরিয়া; সেই ম্যালেরিয়াকে মারিয়া তাড়াইবার জন্য, এখন হইতে সকলেই কোমর বাঁধিয়াছে।

পোলিস্ পুঙ্গবগণ, বিদ্রোহের অনুসন্ধান ছাড়িয়া দাও—দেশে অসন্তোষ আছে বটে, কিন্তু বিদ্রোহ নাই—যে বিদ্রোহ দেখা গিয়াছে, তাহা নগণ্য পাগলের অতি তুচ্ছ খেয়াল—সে খেয়াল চলিয়া গিয়াছে; সে বিদ্রোহের স্মরণ করিও না। যাহাতে দেশে স্বাস্থ্য সংস্থাপিত হয়, তাহার চেষ্টা কর; সমাজসেবকদিগের সহায় হও—স্বাস্থ্য সংস্থাপিত হইলে, এবং অন্নের ব্যবস্থা হইলেই, দেশে পূর্ব্বমত শান্তি বিরাজিত হইবে এবং তোমাদের শান্তি রক্ষক নাম সার্থক হইবে।

কদমতলা, চুঁচুড়া। পৌষ সংক্রান্তি। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পণ।

কুন্দকুসুম মন্দ মলয়ে
গন্ধ ছুটা'ল ওই,
সান্ধ্য-শীতল সমীর-সেবীর
শ্রান্তি রহিল কই!
মুগ্ধ হইল দগ্ধ পরাণ
স্নিগ্ধ সুবাসে তার;
কণ্ঠে দোলাতে সে ফুল মালিকা
কুণ্ঠা না হ'ল আর।
কিন্তু সহসা কি যেন মন্ত্রে
শান্ত হইল আশ!
সবলে বাসনা নিভায়ে, ভাবিনু
সাজাতে শ্রীনিবাস।

সে ফুল রতন রাতুল চরণে
শরণ লভিল পরে;
ব্যক্ত মাধুরী অগুরুসিক্ত
হেরিনু ভক্তি ভরে!
সুপ্তি ঘুচিল, তৃপ্তি লভিনু,
নেত্র পুরিল নীরে!
মিটাইয়ে সাধ দেবের প্রসাদ
সাদরে ধরিনু শিরে।
আত্মা লভিল আত্মসমাধি,
মুক্ত মোহপাশ;
জীবন সফল, প্রেম সফল,
সফল সকল আশ!

শ্রীইন্দ্রনারায়ণ দেবশর্ম্মা।

কবিকঙ্কণের কাব্য চণ্ডীমঙ্গল।

(২)

এই গেল কবির সুচরিত্র অঙ্কণের কথা। কবি যে কুচরিত্র, খল, দুর্বিনীত, ঠকেরও চরিত্র সুন্দর অঙ্কিত করিতে পারেন, তাহার উদাহরণ,—ভাঁড়ুদত্ত, মুরারী শীল, আর দুর্ব্বলা।

মুরারী শীল।—

কালকেতু একটী বহুমূল্য অঙ্গুরী বিক্রয় করিবার জন্য বণিক মুরারী শীলের নিকট গেল। মুরারী কালকেতুর নিকট কিছু মাংসের মূল্য খাঁ ছিল। কালকেতুর সাড়া পাইবা মাত্র সে মনে করিল,—মাংসের দাম লইতে আসিয়াছে; অমনি কৃপণ বণিক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বারংবার ডাকাডাকির পর বণিকপত্নী বাহিরে আসিয়া বলিলেন; "পোদার বাড়ী নাই।" তাহার কথা শুনিয়া কালকেতু বলিল;—"আমি একটা অঙ্গুরী ভাঙ্গাইতে আসিয়াছিলাম।" এদিকে মুরারী অন্তরালে থাকিয়া সকল কথা শুনিতেছিল; অঙ্গুরীর নাম শুনিয়াই খিড়কীর দ্বার দিয়া বাহিরে আসিয়া সদর দ্বারে উপস্থিত হইল। এমন কপট চরিত্র অঙ্কণে কবির যথেষ্ট কৃতিত্ব। ঠক মুরারীর কপটবাক্য আরও সুন্দর ফুটিয়াছে, সে আংটী দেখিয়া বলিল;——

"সোণা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিত্তল।
ঘসিয়া মাজিয়া বাপু করেছ উজ্জ্বল॥"

অঙ্গুরীর দাম হইল,—"অষ্টপন পাঁচ গণ্ডা।"

তাহা শুনিয়া কালকেতু বলিল;

"——মূল্য নাহি চাই।
যে জন দিয়াছে বস্তু দিব তার ঠাঁই॥"

তাহার কথা শুনিয়া কপট মুরারী বলিল;—

"আমা সঙ্গে সওদা কর, না পাবে কপট।"

কপটেরা এইরূপ বাহাড়ম্বর করিয়াই আপনার দোষ লুকাইবার চেষ্টা করে বটে।

ভাঁড়ুদত্ত।—

ভাঁড়ু দত্ত একজন দুর্দ্দান্ত ও কপট লোক। যে যখন বড় হয়, সে তখনই তাহার পদ লেহন করিতে যায়। যখন কালকেতু রাজ্য পত্তন করিল, তখন কলিঙ্গ হইতে কালকেতুর রাজ্যে আসিয়া বাস করিল। চাটুবাক্যে কালকেতুর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিল। যখনই সে বাজারে যায়, তখনই সকল হাটুরিয়া ভয়ে ভয়ে জিনিষ পত্র দিয়া তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায়। ভাঁড়ু বাজারে গেলে,—

"পসারী পসরা লুকায় ভাড়ুর তরাসে॥
পসরা লুঠিয়া ভাঁড়ু ভয়রে চুপড়ি।
যত দ্রব্য লয় ভাঁড়ু নাহি দেয় কড়ি॥
* * *
টানাটানি করে ভাঁড়ু পসরা না ছাড়ে।
জটে ধরি কীল লাথি মারে তার ঘাড়ে॥
পাঠে চূণ মাখি হাট্যা * চলিলা আদ্দাসে † ॥

হাটুরিয়া আসিয়া কালকেতুকে দুঃখ জানাইয়া বলিল;—

"মহাবীর রাজ্য কর ভাঁড়ু দত্ত লয়্যা।
হের দেখ পীঠে চূণ ভাঁড়ু দত্ত করে খুন,
সবে যাই বিদায় করিয়া॥
ভাঁড়ু জানে কত কলা পরদ্বন্দ্ব পাতে ছলা,
টাকা সিকা নিত্য খায় ধুতি ‡॥
* * *
শাক বেগুণ কলা মূলা, হাটে ভিয় লয় তোলা,
ঘরে আসি লুটে তার ব্যাটা।
নিজে তার বোন্ রাঁড়ি লুট করি লয় হাঁড়ি,
কুসার ধরিয়া করে সেটা॥
পরাক্রম নাহি টুটে, গোপের পসার লুটে,
নিত্য ধরে ঘাস কর দায়।

* হাট্যা = হাটুরিয়া। † আদ্দাসে—দুঃখ জানাইতে। ‡ ধুতি—ঘুষ।

তার বেটা বড় মূঢ় ময়রার লুটে গুড়,
নিবেদন কৈলুঁ রাঙ্গা পায়॥
ছাগ মেষ যথা পায়, মারি খুন করে তায়,
নিত্য ধরে অপরাধ ছলা॥
ভাঁড়ুর ব্যাটার কাজ কহিতে বাসিয়ে লাজ,
জাতি লয়ে পড়ি গেল গেলা।
বহুড়ী জলেতে যায় আহড়ে * থাকিয়া তায়
গাছে হইতে ফেল্যা মারে ঢেলা॥"

ভাঁড়ুর এইরূপ দারুণ অত্যাচার শুনিয়া কালকেতু তাহাকে ডাকাইল। কিছু তিরস্কারও করিল; সে তিরস্কারে ভাঁড়ুর হৃদয়ে অগ্নি জ্বলিল। কিসে সেই বিদ্বেষাগ্নিতে সে কালকেতুকে দগ্ধ করিবে, তাহাই ভাবিয়া পুনরায় কলিঙ্গ রাজের নিকটে গেল। তথায় নানা প্রকারে কালকেতুর বিরুদ্ধে দোষ দেখাইল; সে বলিল, কালকেতু

পূর্ব্বে ভাণ্ডে পীত বারি এবে ভেল হেমঝারী,
বাটী ঘটী সব হেমময়।

সে পূর্ব্বে মাংস বেচিয়া খাইত; তাহার স্ত্রী ফুল্লরা হাটে মৎস্য বেচিত; আর সেই কালকেতু আজ রাজা; আপনার রাজ্য নষ্ট করিবার উদ্যোগ করিতেছে।" রাজা এই কথা শুনিয়া বিষম ক্রোধে জর্জ্জরিত হইয়া কালকেতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। পরে যখন যুদ্ধে কালকেতু পরাজিত হইয়া গৃহে লুকাইয়া রহিল, তখন ভাঁড়ু তাহার অনুসন্ধানে, ফুল্লরার নিকট উপস্থিত হইয়া যে কপট বাক্য বলিল, তাহা কপট ভাঁড়ুর কপট চরিত্রেরই উপযুক্ত। সে ফুল্লরাকে বলিল;—"খুড়া, কলিঙ্গরাজকে না বলিয়া রাজা পত্তন করিয়াছিল বলিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, এখন সব গোল মিটিয়া গিয়াছে; বীরের বীরত্ব দেখিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইয়াছেন। খুড়া কোথায়?" এই বলিয়া কপট ভাঁড়ু নিজের চরিত্র ঢাকিবার জন্য বলিতেছে;—

"প্রাণ দাতা তোর স্বামী তাহার সেবক আমি,
মনে কিছু না করিহ আন॥"

*আহড়ে—অন্তরালে।

তাহার সেই কথা শুনিয়া সরলা ফুল্লরা ধান্যঘরের দিকে তাকাইবা মাত্র কপট ভাঁড়ু সব বুঝিয়া চলিয়া গেল। সকল গোল মিটিয়া যাইবার পর, ভাঁড়ু আবার কালকেতুর নিকট আসিল। কপট ভাঁড়ুকে দেখিয়া কালকেতু অতিশয় রাগান্বিত হইল; কিন্তু শীঘ্রই সে রাগ প্রশমিত হইল। শেষে দয়ালু কালকেতুর দয়ায় ভাঁড়ু সে যাত্রা রক্ষা পাইল। এমন কপট চরিত্র, কবিকঙ্কণ অতি সুন্দর অঙ্কিত করিয়াছেন; যেখানে যেমন সাজাইলে কপট চরিত্র পরিস্ফুট হয়, সেই স্থানেই সেইরূপ কথা দিয়া কবি চরিত্রটীকে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়াছেন।

দুর্ব্বলা।—

দুর্ব্বলা কবির আর একটী আশ্চর্য্য সৃষ্টি। মুরারী, ভাঁড়ু,—উভয়ের অপেক্ষা দুর্ব্বলার চরিত্র অধিক কুটিলতাময়, দ্বেষপূর্ণ। যখন দুর্ব্বলা দেখিল, লহনা খুল্লনা দুই সতিনী সম মনপ্রাণ; তখন তাহার মনে পাপ গরলাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সে মনে মনে ভাবিল;—

"যেই ঘরে দু-সতিনে না হয় কন্দলী।
সেই ঘরে দাসী বৈসে বড়ই পাগলী॥
একের করিতে নিন্দা যাব অন্য স্থান।
সে ধনী বাসিবে মোরে প্রাণের সমান॥"

তৎপরে সে এই বলিয়া লহনার মনে সতিনী-বিদ্বেষ জাগরিত করিল;—

"শিশুমতি ঠাকুরাণী নাহি জান পাপ।
দুগ্ধ দিয়া কি কারণে পোষ কাল সাপ॥
সাপিনী বাঘিনী সতা পোষ নাহি মানে।
অবশেষে ওই তোয় বধিবে পরানে॥
কলাপি-কলাপ জিনি খুল্লনার কেশ।
অর্দ্ধপাকা কেশে তোমার কি করিবে বেশ॥
খুল্লনার মুখ-শশী করে ঢল ঢল।
মাছিতায় মলিন তোমার গণ্ডস্থল॥
আসিবেন সাধু গৌড়ে থাকি কথো দিন।
খুল্লনার রূপে হবে কামের অধীন॥

অধিকারী হবে তুমি রন্ধনের ধামে।
মোর কথা স্মরণ করিবে পরিণামে॥"

এরূপ আপাত-উপদেশপূর্ণ বাক্যে সরলা লহনার হৃদয়ে শীঘ্রই গরল উঠিল। সে গরলে খুল্লনা দগ্ধ হইতে লাগিল। যখন লহনা সাধুকে বশীকরণ ঔষধের জন্য দুর্ব্বলার নিকট অনুনয় বিনয় করিল, তখন

"দুর্ব্বলা বলেন যদি ভ্রমি দিন চারি।
তবে সে ঔষধ আমি করিবারে পারি॥"

লহনা সে কথায় সম্মত হইল। এদিকে খুল্লনা ছাগচারণ যন্ত্রণায় প্রপীড়িতা হইয়া দুর্ব্বলাকে তাহার জননীর নিকট সংবাদ দিতে অনুরোধ করিল। কপটাচারিণী দুর্ব্বলা মধুর বাক্যে দুইজনেরই মন রাখে; লহনা খুল্লনা উভয়েই মনে করে,—দুর্ব্বলা আমার শুভাকাঙ্ক্ষিণী। সে এই সুযোগে খুল্লনার মাতার নিকট সংবাদ দিয়া আসিল; শেষে লহনাকে ঔষধ দিল। সাধু গৃহে ফিরিলে দুর্ব্বলা, লহনা ও খুল্লনা উভয়কেই বেশ ভূষায় ভূষিত করিল; আর দুইজনকেই বলিল;—

"তুমি অলক তিলক পর মোহন কজ্জল।
সাধু ভেটিবারে লহ ভৃঙ্গারের জল॥

তোমাকেই সাধু ভালবাসিবেন।" আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের কথাও বলিল;— "দুর্ব্বলা অন্যের দাসী নহে তোমা বিনে।"

এরূপ করিয়া কপটাচারিণী দুর্ব্বলা পরস্পরের অন্তরে বিদ্বেষাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল। পরে দুর্ব্বলার হাট করিতে গমন।

"দুর্ব্বলা হাটেরে যায় দুআবারি লোক চায়,
হের আইসে সাধু ঘরের ধাই।
বুঝিয়া এমন কাজ যার আছে ভয় লাজ,
ভাল বস্তু রাখিল লুকাই॥"

দুর্ব্বলার চরিত্রের অনুযায়ী সে বাজারের টাকা হইতে কিছু আত্মসাৎও যে না করিল এমন নহে। আমরা গৃহস্থের গৃহে অনেক বুড়া দাসী দেখিয়াছি; মনে হয়, তাহারা সাধারণতঃই গৃহস্থের শুভাকাঙ্ক্ষিণী হয়; কিন্তু দুর্ব্বলার ন্যায় দাসী আমরা, বোধ হয় আর দেখি নাই। কপটাচারিণী বাণীর

যদি দৃষ্ট হয়, তথাপি দুর্ব্বলার মত দাসী কি কেহ অধিক দেখিয়াছেন? কপটের উপযোগী বাক্যবিন্যাসে কবিকঙ্কণ কপটের চরিত্র অতি সুন্দররূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। যেমন ফুল্লরা, খুল্লনার চরিত্র হইতে আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ আপন জীবনের আদর্শ স্থির করিবেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে যেন, তাঁহারা দুর্ব্বলার ন্যায় দাসীর কুপরামর্শে আপন আপন স্নেহময়ী ভগিনীর প্রতি বিরূপা না হন, ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা।

কৌতুকে কৃতিত্ব।—

মুকুন্দরাম কেবল মাত্র যে গম্ভীর কথা লইয়াই ব্যস্ত, এমন নহে; তাঁহার কাব্যে যেরূপ সরস, তীব্র শ্লেষপূর্ণ বাক্য আমরা দেখিতে পাই সেরূপ বাক্যবিন্যাস অন্য কবির কাব্যে লক্ষিত হয় না। সাধু ধনপতি রন্ধনশালে লহনাকে দেখিয়া, আদর করিয়া, বলিলেন;—

"রূপ নাশ কৈলে প্রিয়ে রন্ধনের শালে।
চিন্তামণি নাশ কৈলে কাচের বদলে॥"

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এরূপ পবিত্র উপহাস কি ভাল দেখায় না? তৎপরে লহনার প্রতি তদীয় সখী লীলার সরস উক্তি;—

পূর্ব্বে জানিতাম আমি অধীন তোমার স্বামী,
* * *
না জানি দৈবের মায়া, আজ্ঞে কোন পথ দিয়া,
নারিকেলে সান্ধাইল পানী
* * *
শুন গো শুন গো সহি লোচনে দংশিলে অহি,
কোন্‌খানে বান্ধিব তাগাবন্ধ॥"

যখন ধনপতি সিংহলরাজের নিকট, অগাধ সমুদ্র মাঝে কমলেকামিনী বর্ণনা করিল, তখন তাহার সে কথায় সিংহলরাজের বিদ্রূপ বড়ই লাগিয়াছে;—

"বিদেশে আসিয়ে সাধুর লাগ্যাছে তরাস।
কি ভাগ্যে তোমার ডিঙ্গা না কৈল গরাস।॥"

এইরূপ বহুবিধ সরল কৌতুক-পরিহাস-পূর্ণ বাক্যে কবিকঙ্কণের কাব্য সমলঙ্কৃত।

কবিকঙ্কণের একটী বড় গুণ নিরীক্ষণ করিয়াছি;—যাহার যেমন চরিত্র, তিনি প্রায় তাহার নামটীও সেইরূপ দিয়াছেন। যেমন সিংহলের রাজপুরোহিতের নাম অগ্নিশর্ম্মা [বলিতে হইবে না, তিনি সর্ব্বদাই রাগান্বিত]; আর বিক্রমকেশরীরাজের পাত্রের নাম স্ফুটভাষী [তিনি বড়ই স্পষ্টভাষী।]

স্ত্রীলোকের নিকট পরপুরুষ কিরূপ তৎসম্বন্ধে কবিকঙ্কণ বলিতেছেন;—

" সতীজনের পতি নারায়ণ সমতুল।
পরের পুরুষ যেন শিমুলের ফুল॥ "

এইরূপ উপদেশপূর্ণ উচ্চশিক্ষাময় বাক্য প্রত্যেক গৃহলক্ষ্মীর শিক্ষার্হ। ইহা ভিন্ন চণ্ডীর প্রতি ফুল্লরার উপদেশবাণী অমূল্য।

দুঃখ বর্ণনায় কৃতিত্ব।

সর্ব্বাপেক্ষা কবিকঙ্কণের দুঃখ বর্ণনা আমাদের প্রাণে এক বিপুল বন্যার সৃষ্টি করে। তাঁহার দুঃখ বর্ণনা অনন্ত ধারায় প্রবাহিত; সারা কাব্যখানি জড়াইয়া যেন দুঃখ; হাসিতেও ক্রন্দন, কৌতুকেও ক্রন্দন। যে বসন্তে মৃদুমন্দ মলয় সমীর ফুলবাস গায়ে মাখিয়া ছুটাছুটি করিয়া সকলের প্রাণে অতুল হর্ষের সৃষ্টি করে, কবিকঙ্কণের সেই বসন্ত বর্ণনায় আমরা না কাঁদিয়া থাকিতে পারি না। বসন্তে অতুল সুখের ভিতরেও কবি গভীর নিরানন্দের ক্রন্দন ছুটাইয়াছেন। ফুল্লরার বারমাস্যা হইতে শ্রীমন্ত-পত্নী সুশীলার বারমাস্যা পর্য্যন্ত যেন কবি করুণক্রন্দনে পরিপ্লাবিত করিয়াছেন। ফুল্লরার বারমাস্যায়;—

" ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর তাল পাতার ছাউনী॥
ভেরেণ্ডার থাম ওই আছে মধ্য ঘরে।
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে॥
পায় পোড়ে খরতর রবির কিরণ।
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞার বসন॥
জ্যৈষ্ঠে, বেণ্ডচের ফল খায়্যা করি উপবাস॥
শ্রাবণে, আচ্ছাদন নাহি অঙ্গে পড়ে মাংস জল।
কত মাছি খায় অঙ্গে মোর কর্ম্মের ফল॥

কত শত খায় জোঁক নাহি খায় ফণী॥
ভাদ্রে, দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
বৃষ্টি হইলে কুঁড়ায় ভাস্যা যায় বান॥
আশ্বিনে, উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা।
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা॥
কার্ত্তিকে, নিযুক্ত করিল বিধি সভার কাপড়।
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়॥
অগ্রহায়ণে, দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ॥
মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ।
মালতীয়ে মধুকর পীয়ে মকরন্দ॥
যুবতী পুরুষ অঙ্গ পোড়য়ে মদনে।
ফুল্লরার অঙ্গ পোড়ে উদর দহনে॥
অনল সমান পোড়ে চইতের খরা।
চালু সেরে বান্ধা দিলুঁ মাটিয়া পাথরা॥

কবির এই দুঃখ বর্ণনা এরূপ স্বাভাবিক যে, দেখিয়া মনে হয়, কবি যেন দরিদ্রা ফুল্লরার 'তালপাতার ছাউনী' কুটীরখানিতে 'ভেরেণ্ডার থাম' ধরিয়া উঁকি মারিয়া দেখিয়াছেন; এমনই কবির অদ্ভুত শক্তি! পরে খুল্লনার বারমাস্যায়;—

" শ্রাবণে বরিষে ঘন মূষলের ধার।
কোলেতে করিয়া ছেলি নালা করি পার॥
কাননে ছাগল রাখি শিরে গাছের পাতা।
একাকিনা বনে ফিরি কারে কব কথা॥
* * *
কাঁকালে তুলিয়া বাঁধি খুঞা ধুতিখানি॥
বৃষ্টি বাজে যেন শেল বৃষ্টি বাজে যেন শেল।
তিন দিন ব্যতীতে লহনা দেয় তেল॥
ভাদরে চরাই ছেলি ভিজে সর্ব্ব গা।

অঙ্গুলীর সন্ধিতে পাঁকুই হইল ঘা।

আশ্বিনে, রামা পরে অলঙ্কার রামা পরে অলঙ্কার।
তৈল বিনা কেশে মোর হৈল জটাভার॥

কার্ত্তিকে, নিয়োজিত কৈল বিধি সভার কাপড়।
ঢেঁকিশালে শয়ন আমার, পোয়ালের খড়॥

* * *

হেমন্তে, ক্ষেতে ধান কুড়ায়ে অভাগী পেট ভরে॥
পৌষ মাসেতে প্রভু অতি গুরু শীতে।
কাঁটা খোঁচা ভাঙ্গি অগ্নি জ্বালি চতুর্ভিতে॥
তাহাও দেখিতে নারে দারুণ সতিনী।
দুর্ব্বলা হাথাঞা তায় ঢালি দেয় পানী॥

ফাল্গুনে, খুল্লনার গায়ে বস্ত্র খুঞার বসন॥
নয়মাসে খুঞাখানি হ'য়ে গেল গুঁড়া।
সতিনী প্রসাদ কৈল একখানি মূড়া॥
শয়ন ঢেঁকিশালে মোর শয়ন ঢেঁকিশালে।
নিদ্রা না আইসে খুদি পিপীলিকা জালে॥

প্রকৃতির তরুলতার প্রতি ও কোকিল ভ্রমরের প্রতি বসন্তে খুল্লনার উক্তি একবার উদ্ধৃত হইয়াছে।

এমন দুঃখ দারিদ্র্য,—যে একবার না দেখিয়াছে, সে কি বর্ণনা করিতে পারে? প্রত্যেক কথাটী প্রত্যক্ষ, চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কবিকঙ্কণের কাব্যে যে নিঃশব্দ করুণ ক্রন্দন স্রোত প্রবাহিত, তাহার করুণ উচ্ছ্বাসে অন্তর ভাঙ্গিয়া যায়। কবির বসন্ত বর্ণনায় প্রেমগীতির মৃদুমন্দ মলয় মারুতে শরীর পুলকিত হইবার পরিবর্ত্তে, আঁখি বাষ্পারুণ হইয়া উঠে, এবং তৎসঙ্গে কবির করুণ ক্রন্দনে গাত্র রোমাঞ্চিত হয়। তাঁহার গম্ভীর গীতের মধুর উচ্চ মূর্চ্ছনার সহিত যেন একটু কেমন বাঙ্গ-রুণ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাই। এই জন্যই "কবিকঙ্কণ সুখের কথায় বড় নহেন, দুঃখের কথায় বড়" এবং ইহাই কবিকঙ্কণের কাব্যের বিশেষত্ব।

শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস।

(৩)

আচার্য্য যুগ।

যখন আর্য্যভূমি—আর্য্য গৌরবে গৌরবান্বিত, ক্ষত্রিয়-রাজা দেশের শান্তি রক্ষা করিতেছেন—বৈশ্যগণ কৃষি বাণিজ্যে দেশের ধন ধান্য বৃদ্ধি করিতেছেন—শ্যাম-তট-শালিনী-সরস্বতীর পূর্ব্ব তীর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ণ কুটিরে সুশোভিত হইয়াছে—ঋষিগণ গৃহস্থ সাজিয়াছেন,—ধর্ম্মমতী মুনি-পত্নীগণ, সন্তান পালন ও স্বামী সেবা করিয়া—নারী জীবনের আদর্শ গঠন করিতেছেন; ঋষিবালকের মধুর কণ্ঠ হইতে পবিত্র বেদগাথা উত্থিত হইতেছে; হোমধেনু দোহন কালে কুমারীকুলের কলহাস্যে—কুশক্ষেত্র মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে; ভারতের তখন ঋষিযুগ, ধর্ম্মের তখন উপনিষদ্ যুগ, আয়ুর্ব্বেদের তখন আচার্য্য যুগ।

তখন, তীক্ষ্ণ শায়কের ন্যায় উজ্জ্বল—বজ্রের ন্যায় অটুট ব্রাহ্মণ্য প্রতিভা—পূর্ব্ববর্ষার নদীর মত—আবর্ত্তে—তরঙ্গে—গর্জ্জনে—দিগন্ত কাঁপাইয়া, বিশাল বিশ্বের পানে ছুটিতেছিল! এখনকার এই মলিন—নিষ্প্রভ—প্রাণশূন্য ভারত—তখন কত আনন্দময়—কত উৎসাহময়!! আয়ুর্ব্বেদের তখন দীপ্তিময় যৌবন কাল!

হিমালয়-মধ্যগত কনক শিখরী মেরুর ন্যায়—ঋষি সহস্রের মধ্যবর্ত্তী আত্রেয়—তখন পূর্ণোৎসাহে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করিতেছিলেন। তখন, আশ্রমে আশ্রমে আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়, গৃহে গৃহে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, যৌক্তিক অনুসন্ধানে বৈজ্ঞানিক গবেষণায়—আয়ুর্ব্বেদের তখন সকল বিভাগ সম্পূর্ণ।

পুনর্ব্বসু, ভরদ্বাজ, অঙ্গীরা, গৌতম, যমদগ্নি, অগস্ত্য, বামদেব, কপিঞ্জল, কুসিক, কাশ্য, কাশ্যপ, সৌনক, পুলস্ত্য, চ্যবন প্রভৃতি ঋষিগণ—স্ব স্ব নামে এক একখানি সংহিতা প্রণয়ন করিলেন। এইরূপে ৩৫ খানি সংহিতা লিখিত হইল।

এই সকল সংহিতার মধ্যে অধিকাংশই এখন আর পাওয়া যায় না। কোনও কোনও খানির দুই চারিটী শ্লোক এবং কোনও গ্রন্থ বা অসম্পূর্ণ ও

অসংলগ্ন অবস্থায় ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়িয়া আছে। কিন্তু তবুও এই অসম্পূর্ণ আয়ুর্ব্বেদে যাহা আছে, তাহা বুঝি জগতের আর কোথাও নাই! একদিন অগ্নিবেশ যে বলিয়াছিলেন—"যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ"—একথার প্রত্যেক অক্ষরেই বুঝি সত্যের নিশ্বাস জাগিয়া আছে!

ভ্রূণ তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে সুশ্রুত এই সকল সংহিতার অনেকগুলিরই নাম করিয়াছেন। পাণিনি ও পতঞ্জলির গ্রন্থেও অনেকগুলির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাভারতের মোক্ষ পর্ব্বাদি স্থানে আত্রেয় প্রভৃতির উল্লেখ আছে, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ-প্রবর্ত্তক ভরদ্বাজের নাম নাই। তৎপরিবর্ত্তে, মহাভারতকার শুক্রাচার্য্যকে আয়ুর্ব্বেদের প্রথম প্রবর্ত্তক বলিয়াছেন। এই জন্যই কেহ কেহ অনুমান করেন—ভরদ্বাজ ও শুক্রাচার্য্য একই ব্যক্তি। এ সকল গবেষণার আমোদ আছে বটে, কিন্তু ফল নাই। সুতরাং আমরাও এ প্রসঙ্গ এইখানেই পরিত্যাগ করিলাম।

মহর্ষি পুনর্ব্বসুর ছয়জন শিষ্য। অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপানি। ইঁহারাও এক একখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে অগ্নিবেশ-সংহিতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভেলমুনি কেবল স্ত্রীরোগের নিদান লিখিয়াছিলেন। গ্রন্থখানি কীটদষ্ট অবস্থায় এখনও কোনও কোনও কবিরাজের গৃহে অযত্নে পড়িয়া আছে। জতুকর্ণ প্রণীত গ্রন্থের নাম—"মূত্র-বিজ্ঞান"; সাধারণের বিশ্বাস—কবিরাজেরা মূত্র পরীক্ষা করিতে পারেন না। কিন্তু জতুকর্ণের "মূত্র বিজ্ঞান" যদি মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে প্রচারিত হইত, তাহা হইলে কবিরাজদের এ কলঙ্ক থাকিত না। ডাক্তারিমতে প্রস্রাবকে জ্বাল দিয়া পরীক্ষা করা হয়, জতুকর্ণও এরূপ প্রণালী জানিতেন। মূত্রে—দ্রব্য বিশেষের চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া, শরীরের কোন্ ধাতু বিকৃত হইয়াছে, বলিতে পারিতেন। একমাত্র মূত্র পরীক্ষা করিয়াই তিনি রোগের অবস্থা বুঝিতেন। এমন কি—মূত্র পরীক্ষা করিয়া, ঐ মূত্র স্ত্রীলোকের কি পুরুষের, বালকের কি বৃদ্ধের, স্ত্রীলোকের মূত্র হইলে সে গর্ভবতী কি না—অনায়াসেই তাহা বলিয়া দিতেন। এ সম্বন্ধে পৃথক প্রবন্ধ লিখিবার কল্পনা রহিল।

হারীত প্রণীত সংহিতা সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। এইরূপ প্রবাদ আছে যে—[illegible] অথর্ব্ব বেদ হইতে সঙ্কলন করিয়া যে সংহিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা [illegible] অধ্যায়ে বিভক্ত এবং লক্ষ শ্লোকে পূর্ণ ছিল। হারীত তাহাকে [illegible]ক্ষিপ্ত করিয়া পাঁচখানি সংহিতা লেখেন। উহা যথাক্রমে—২৪ হাজার, [illegible] হাজার, ৬ হাজার, ৩ হাজার এবং পরিশেষে যেখানি সর্ব্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত, [illegible]খানি কেবল ১৫ শত শ্লোকে সমাপ্ত করেন। এই শেষের খানিই এখনও বর্ত্তমান আছে। ক্ষারপানি ও পরাশরের কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায় না। [illegible]ল হরিশ্চন্দ্র নামক কোনও চিকিৎসক, নিজকৃত চিকিৎসা গ্রন্থে, উক্ত [illegible]দ্বয়ের অনেকগুলি মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই হরিশ্চন্দ্র, ভাবমিশ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী। ভাব প্রকাশে তাঁহার নামের উল্লেখ আছে।

আমরা অগ্নিবেশ কৃত সংহিতাকেই সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়াছি। কোনও সময়ে চরকঋষি ঐ গ্রন্থের প্রতিসংস্কার করেন, সেই অবধি "অগ্নিবেশ সংহিতা" "চরক-সংহিতা" নামেই বিখ্যাত। "চরক-সংহিতার" মত, এমন সুললিত, প্রাঞ্জল, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর চিকিৎসা গ্রন্থ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ডাক্তার ওয়াইজও স্বীকার করিয়াছেন—চরকের সূত্রগুলি—Wonderful Generalization!" সুদূর পাতালপুরী আমেরিকা হইতেও একজন বহুদর্শী ডাক্তার বলিয়াছেন—"চরকের চিকিৎসা প্রণালী প্রচলিত থাকিলে, পৃথিবীতে এত অকাল মৃত্যু থাকিত না।"

চরক সংহিতার প্রত্যেক অধ্যায়, উৎকৃষ্ট বুদ্ধি—মধ্যম বুদ্ধি ও অধম বুদ্ধি, এই তিন শ্রেণীর চিকিৎসকের জন্য লিখিত হইয়াছে। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। "পিত্তজ রোগের স্বভাব উষ্ণ, অতএব তাহার ঔষধ শৈত্যগুণ বিশিষ্ট হওয়া চাই।" উৎকৃষ্ট বুদ্ধিদের জন্য চরক এইরূপ বলিয়াছেন। মধ্যম বুদ্ধিদের জন্য বলিয়াছেন—"পিত্ত রোগীর জন্য—তিক্তক গণ ব্যবহার করিবে, কেননা—তিক্তক গণ শীতল।" "পিত্ত রোগে—নিমছাল, পলতা ও বাসক প্রভৃতির ক্বাথ ব্যবস্থা করিও।" [illegible]ন বুদ্ধিদের জন্য—এইরূপ স্পষ্ট ভাষায় উপদেশ দিয়াছেন। চরক যেখানে দৃঢ়স্বরে বলিতেছেন—'ক্ষয়রোগ অষ্টাদশ প্রকার' সে স্থলে কোনও ডাক্তার সাহস করিয়া বলিতে পারিবেন না যে—ক্ষয়রোগ সপ্তদশ

প্রকার। অমুক রোগে এ লক্ষণ হইতে পারে, না হইতেও পারে, এমন অনিশ্চিত সন্দিগ্ধ কথা, তোমরা চরকের কোথাও খুঁজিয়া পাইবে না। 'যদি কাহারো যক্ষ্মা হইয়া থাকে তবে তাহার এই কয়টী লক্ষণ অবশ্যই থাকিবে,—স্কন্ধ ও পার্শ্ব দেশে বেদনা, হস্ত পদে দাহ, এবং অষ্ট প্রহর জ্বর; যদি এই তিনটী লক্ষণের একটী লক্ষণ না থাকে, তবে তাহার মুখ দিয়া অনর্গল রক্ত উঠিলেও সে রোগ কখন যক্ষ্মা নহে। যদি কাহারও মূত্রে ফোড়া হইয়া থাকে, অবশ্যই তাহার শ্বাস হইতে থাকিবে। যদি তুমি মেদস্বী পুরুষ না হও, তবে তোমার প্রস্রাবে—রাশীকৃত চিনি মিশ্রিত থাকিলেও—তোমার রোগ কখনও মধুমেহ নহে।' চরকের সর্ব্বত্রই একরূপ দৃঢ়তা। এমন কথা সাহস করিয়া আর কেহ বলিতে পারে কি?

চরকের আরও একটু চমৎকারিত্ব আছে। তিনিই প্রথমে সকল রোগকে, বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। তিনি অস্ত্র চিকিৎসা জানিতেন না, কিন্তু শস্ত্র সাধ্য রোগকেও উক্ত তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া, তাহার চিকিৎসা প্রণালীও সুন্দররূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

চরকে গদ্য ও পদ্য এই দুই রকম রচনাই দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার সিদ্ধিস্থানের উপসংহারে এমন একটী সঙ্কেত আছে যে, যদি গদ্যাংশকে আর্য্যাচ্ছন্দে বিভাগ করা যায়, তাহা হইলে সমগ্র গ্রন্থে দ্বাদশ সহস্র শ্লোক হইতে পারে।

এই চরক সংহিতা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহাতে সত্য ও ত্রেতা যুগের উল্লেখ আছে, দ্বাপর বা কলির নাই। সুতরাং তাঁহাকে আমরা দ্বাপরের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া ধরিয়া লইব। তিনি কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা বড় কঠিন। পাণিনি সূত্রে 'কঠ-চরকাল্লুক' এই সূত্রের বৃত্তিতে 'চরকেন-প্রোক্তঃ' এইরূপ ব্যাস বাক্য দৃষ্ট হয়। ইহাতে আমরা অনুমান করতে পারি, চরক পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে—খৃষ্ট জন্মিবার চারিশত বৎসর পূর্ব্বে—পাণিনি বর্ত্তমান ছিলেন। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ গোল্ড ষ্টুকার বলেন—খৃষ্ট জন্মিবার ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে পাণিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। যখন পাণিনির সময়

নির্দ্দেশেই এত মতভেদ, তখন চরকের প্রকৃত কাল নির্ণয় করাও অত্যন্ত দুরূহ।

পাণিনির ভাষ্যকার—'সভারাজ-মনুষ্য পূর্ব্বা' এই সূত্রের উদাহরণ-স্বরূপ, 'চন্দ্রগুপ্ত-সভা' এই পদ ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং তিনি চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালে বা কিছুকাল পরে বর্ত্তমান ছিলেন। পাণিনির ভাষ্যকার—ভর্ত্তৃহরির পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। বাক্য পদীয় গ্রন্থে—তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্ট জন্মিবার ৩১৫ বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহার রাজ্য-কাল ২৪ বৎসরের অনধিক, সুতরাং খৃষ্ট জন্মিবার ২৯১ বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব শেষ হয়। পাণিনির ভাষ্যকারের যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে এই মাত্র জানা যায় যে পাণিনি—ভাষ্যকারের পূর্ব্বে যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, চরক তাহারও পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পাতঞ্জল দর্শনের ভোজ বৃত্তি এবং চক্রপানি প্রণীত টীকায় দেখা যায়, পতঞ্জলি—চরকের একখানি ভাষ্য লিখিয়াছিলেন। সেই ভাষ্য—এখন দুষ্প্রাপ্য।

চরকের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আরও কতকগুলি যুক্তি দেখান যাইতে পারে। (১) আজকাল মানুষ—সচরাচর ৫০।৬০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে, কিন্তু চরকের সময়ে লোকের শত বৎসর পরমায়ু ছিল। চরক বলেন—প্রতি ১০০ শত বৎসরের পর, মানুষের জীবন ১ বৎসর করিয়া কমিয়া যায়। পাঠক—এখন ত্রৈরাশিকের নিয়মে স্থির করিয়া দেখিতে পারেন—শতবৎসর পরমায়ু—৫০।৬০ বৎসরে কমিয়া আসিতে কত বৎসর লাগে। (২) চরকের সময়ে লোক বিরেচনের জন্য আধসের পরিমাণে এরণ্ড তৈল পান করিত, আমরা বড় জোর ১ ছটাক 'ক্যাষ্টর অয়েল' খাইতে পারি। এই এক তৈলের মাত্রাতেই বুঝা যাইতেছে—চরক অতি প্রাচীন গ্রন্থ।

এমন যে উপাদেয় চিকিৎসা গ্রন্থ—চরক সংহিতা, শুনিতে পাই আধুনিক কবিরাজেরা তাহা পড়েন না। এই প্রয়োজনীয় গ্রন্থের প্রতি তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্যই—এত বিস্তৃত করিয়া চরকের পরিচয় দিলাম। দৃঢ়বল বলিয়াছেন——

একস্মিন্নপি যস্যেহ শাস্ত্রে লব্ধাস্পদা মতিঃ
স শাস্ত্রমন্যদপ্যাশু যুক্তিজ্ঞত্বাৎ প্রবুধ্যতে॥

আমাদের অনুরোধ—চরক সম্বন্ধে এ কথাটী যেন কবিরাজ মহাশয়েরা ভুলিয়া না যান।

আচার্য্য যুগেও দুই শ্রেণীর বৈদ্য ছিলেন। অগ্নিবেশ, চরক প্রভৃতি কায় চিকিৎসক, তাঁহারা জ্বরাদি সকল প্রকার কায় রোগের চিকিৎসা করিতেন। সুশ্রুত প্রভৃতি অস্ত্র চিকিৎসক ছিলেন। কাশীরাজ ধন্বন্তরি এই যুগের অদ্বিতীয় অস্ত্র চিকিৎসক। তাঁহার নাম দিগ্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইত। এখনও কোন ডাক্তার কবিরাজ নিজের চিকিৎসা নৈপুণ্য দেখাইলে লোকে বলিয়া থাকে—'ইনি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি!' সুশ্রুত এই ধন্বন্তরির কাছে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। সুশ্রুত বিশ্বামিত্রের পুত্র। সুশ্রুতের সঙ্গে আরও শতাধিক ঋষিকুমার—ধন্বন্তরির শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই এক একখানি সংহিতা সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সুশ্রুত প্রণীত 'সুশ্রুত সংহিতা'ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুশ্রুত যখন ধন্বন্তরিকে ইহা পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন, তখন ধন্বন্তরি বলিয়াছিলেন—'বৎস! তোমার নাম সুশ্রুত, তোমার গ্রন্থখানিও সুশ্রুত অর্থাৎ শুনিতে সুন্দর।'

সুশ্রুতের সহাধ্যায়ীগণের মধ্যে খরনাদ ও জেজ্জড়ের নাম বিখ্যাত। ভাব মিশ্র—ইঁহাদের অনেক উপদেশ নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। খরনাদের একখানি গ্রন্থও আছে, তাহার নাম 'দোষ বিবৃতি'। বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষ কুপিত হইয়া কি কি উপসর্গ উৎপাদন করিতে পারে, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

এখনও যে সকল আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে —চরক সংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতাকে—আমরা আয়ুর্ব্বেদের প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করিব। চরকের চেয়েও সুশ্রুত আরও প্রাচীন গ্রন্থ। চরকের বিষয় পূর্ব্বেই আলোচনা করা গিয়াছে, এইবার সুশ্রুত সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিব।

"চরক সংহিতায়"—ইঙ্গিতে সুশ্রুতের উল্লেখ আছে; কিন্তু সুশ্রুত সংহিতায় চরকের নাম গন্ধও নাই। সুশ্রুত রীতিমত একজন "সার্জ্জন" ছিলেন। শারীর-বিদ্যা, শারীরতত্ত্ব, নিদান, শল্যতন্ত্র [Surgical Treatment]

ধাত্রীবিদ্যা, স্ত্রীরোগ, অস্ত্রবিধি, যন্ত্রবিধি, অগদ (Antedotes to Poisons) কৌমারভৃত্য (The treatment of Infants and of the Puerperal state) শস্ত্র-সাধ্য চিকিৎসা, ইন্দ্রিয় বিজ্ঞান, গর্ভব্যাক্রান্তি, ভৈষজ্যবিধান, ভূতবিদ্যা (Diseases caused by the evil spirits), রসায়ণ,—প্রভৃতি সকল বিভাগেই সুশ্রুত সমান পারদর্শী। ব্রাহ্মণের সূক্ষ্ম হেতুবাদ, উপনিষদের তত্ত্বস্পর্শী গভীরতা, প্রকৃতির বুকে জন্ম মৃত্যুর রহস্য——সুশ্রুতের অক্ষরে অক্ষরে অঙ্কিত। যাহা খুঁজিবে তাহাই পাইবে। সে অপার্থিব সত্যনির্ণয়, সে অপরাঙ্মুখ অনুসন্ধান—সে অবিশ্রান্ত অকপট অধ্যবসায়,—যদি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিয়া দেখ, তোমার নব্যতা-সুলভ অহঙ্কার চিরদিনের জন্য চূর্ণ হইয়া যাইবে। সে স্বভাব বিপুলা প্রতিভার চরণে, তোমার ঐ সভ্যতাভিমানী উন্নত মস্তক, আপনা আপনি নত হইয়া পড়িবে। তুমি যতই আত্মবিস্মৃত হইয়া থাক না কেন, ইংরাজী শিক্ষার গৌরবে তোমার স্নায়ু মণ্ডলের যতই উত্তেজনা থাকুক না কেন, তোমায় মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে— "সুশ্রুত" গভীর-জ্ঞান গবেষণার অনন্ত ভাণ্ডার, সুশ্রুতের মধ্যে যে সকল তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা অদ্যাপি অনেক জাতির জ্ঞান গোচর হয় নাই। আয়ুর্ব্বেদের কাছে—পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্র—এখনও অনেক বিষয় শিখিতে পারে। ডাক্তারগণ এখনও এমন কোনও নূতন কথা বলিতে পারেন নাই, যাহার স্বপ্নছায়া বা আভাষ সুশ্রুতে পাওয়া যায় না।

সুশ্রুত শবচ্ছেদ করিতেন। যে সকল ছাত্র শব স্পর্শে ঘৃণা করিত, তাহাদিগকে—'বস্ত্রময় পুত্তলিকা' ও 'কর্দ্দমপূর্ণ ভস্ত্রিকা'র সাহায্যে—অস্ত্র প্রয়োগের কৌশল শিখাইতেন। নষ্টশল্যের উদ্ধার, ব্রণের শোধন ও রোপন ভগ্নাস্থির সন্ধান, আর কত নাম করিব? সুশ্রুত সকলই জানিতেন। সুশ্রুতের সময়ে "একস্‌রে" ছিল না বটে, কিন্তু তিনি এমন প্রলেপ জানিতেন, যাহাতে জীবদেহের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত শল্যও সহজে ধরা পড়িত। যকৃত ও প্লীহায় ফোঁড়া হইলে, সুশ্রুত তাহা কাটিয়া দিতেন। অশ্মরী [পাথুরী] বাহির করিবার জন্য—মূত্রাশয়ের মধ্যে নিঃসঙ্কোচে অস্ত্র চালাইতেন। যন্ত্রের সাহায্যে মৃঢ় গর্ভ আহরণ করিতেন। উদরে আঘাত লাগিয়া, ছিন্ন অন্ত্র বাহির হইয়া পড়িলে, তাহা যথাস্থানে পুনঃস্থাপিত

করিতে পারিতেন। কর্ত্তিত স্থান সেলাই করিয়া দিতেন। অস্ত্র প্রয়োগের দ্বারা "জলোদরের" জলস্রাব করাইতেন। চক্ষুরোগে তাঁহার মত লঘু হস্তে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে কয়জন জানে? বর্ত্তমান সময়ে যে যে রোগে অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, সেই সেই রোগে সুশ্রুতও অস্ত্র প্রয়োগ করিতেন। অস্ত্র চিকিৎসক হইতে গেলে, যতটুকু জ্ঞানের—যতটুকু দূরদর্শিতার প্রয়োজন, সুশ্রুতের তাহা যথেষ্ট পরিমানেই ছিল।

'সুপ্রসব'—ধাত্রী পরীক্ষা ও সন্তান পরীক্ষা অধ্যায়ে তিনি যে সকল যুক্তিপূর্ণ উপদেশ দিয়াছেন, তাহা একবার তোমরা প্লেফেয়ারের 'মিড্‌ওয়াইফারী'র সঙ্গে মিলাইয়া দেখ, মনে হইবে—উহা বুঝি সুশ্রুতেরই ইংরাজী অনুবাদ। আজকাল তোমরা যে 'বেসিলি থিওরি'র গুমর কর, সুশ্রুতের তাহাও অজ্ঞাত ছিল না। কুষ্ঠের কৃমি আছে, যক্ষ্মা, বসন্তাদি সংক্রামক রোগ, পাণ্ডুরোগে ও গর্ভাবস্থায় রক্তের লাল কণিকা কমিয়া যায়, বিসর্প রোগের পরিণামে সর্ব্ব শরীরস্থ রক্ত বিষাক্ত হইয়া উঠে, "রক্তার্ব্বুদ" পাকিলে—রোগী কিছুতেই বাঁচে না; কৃষ্ণ সর্পে দংশন করিলে হৃদয়ে 'রক্তশল্য' জন্মায়, এই জন্য শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্টে দংশিত ব্যক্তি শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করে। যক্ষ্মা রোগে হৃদ্‌পিণ্ডে কোটর উৎপন্ন হয়, উরোক্ষত ও রক্তাতিসারে আভ্যন্তরিক ক্ষতের চিকিৎসা করিতে হয়; কি অমানুষিক দক্ষতার সহিতই সুশ্রুত এ সব বুঝাইয়া দিয়াছেন।

অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দে হার্ভি সাহেব রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার আবিষ্কার করেন। কিন্তু আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে—সুশ্রুতও ইহার বৈজ্ঞানিক মীমাংসা করিয়াছেন। "* * * তস্য চ হৃদয়ং স্থানং। স হৃদয়াচ্চতুর্ব্বিংশতিং ধমনীরনু প্রবিশ্য * * কৃৎস্নং শরীর মহরহ স্তর্পয়তি, বর্দ্ধয়তি, ধারয়তি, যাপয়তি, জীবয়তি, চাদৃষ্ট হেতুকেন কর্ম্মনা।" সুশ্রুতের সূত্রস্থান [১৪শ। ২] দেখিলেই আপনারা তাহা বুঝিতে পারিবেন। ধমনীর কার্য্য, স্নায়ু বিধানের কার্য্য, শিরা মণ্ডলীর কার্য্য, রস হইতে ক্রমে ক্রমে রক্তমাংসাদির উৎপত্তি—সুশ্রুত কিছুই বলিতে বাকী রাখিয়া যান নাই। সুশ্রুত যেখানে—ক্ষিপ্ত কুক্কুর ও সর্প বিষের প্রকৃতি বা চিকিৎসার উপদেশ দিতেছেন, তাহা পড়িলে মনে হয়—তাঁহার গবেষণা

তাঁহার প্রতিভা আজিও জগতে অদ্বিতীয়! এমন সম্পূর্ণ চিকিৎসা গ্রন্থ আর কোনও ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার উপযুক্ত সমালোচনা করা এ ক্ষুদ্রতম লেখকের সাধ্যাতীত।

শুনিতে পাই কেহ কেহ ধুয়া ধরিয়াছেন 'আয়ুর্ব্বেদ অবৈজ্ঞানিক।' যাহাদের মতে—'সেল্' ও 'প্রটোপ্লজমের' বিপাকই জীবন, তাহাদের শাস্ত্রকে তোমরা সহস্রবার বিজ্ঞান বলিতে পার, আমাদের তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদকে কখনও অবৈজ্ঞানিক বলিও না। তোমরা সেল প্রটোপ্লজমের কথা বিশ্বাস করিও, আমরা তাহা মানিব না। আমরা যাহা মানি, তাহা সেল প্রটোপ্লজমের চেয়েও সূক্ষ্ম, তাহার নাম ওজঃ বিন্দু। 'সেলে'র তো জীবন আছে, জীবন তাহাতে উৎপন্ন হয় না। তবে জীবনী শক্তি কি? তুমি কাহার চিকিৎসা কর? এ মীমাংসা আয়ুর্ব্বেদই শুধু বলিতে পারে। এ প্রশ্নের পাকা উত্তর, ঋষিদের মুখেই তুমি শুনিতে পাইবে।

সুশ্রুত বলেন—"* * তদ্দুঃখ সংযোগাশ্চ ব্যাধয়ঃ,—স এব অধিষ্ঠানম্।' অর্থাৎ আত্মজ্ঞ জীবনী শক্তির নাম পুরুষ, পুরুষ যাহাতে দুঃখ পান—তাহার নামই ব্যাধি। তোমাদের—Morbid Anatomy ব্যাধির বাসস্থান বলিয়া দিতে পারে, স্বরূপ বুঝাইতে পারে না। জগতে, সকল শক্তির ন্যায় জীবনী শক্তিরও বিকাশ ব্যোমিক বিস্ফুরণের মধ্য দিয়া। প্রণব—এই বিস্ফুরণেরই সঙ্কেত মাত্র। তুমি, আমি, জগৎ, ওঁকার বা আদিম—বিস্ফুরণের প্রসব, তাই আমাদের শারীরিক পরমাণু নিয়তই বিস্ফুরণশীল। ইহাকেই কি তোমরা 'অ্যামিবিক মুভমেণ্ট' বল না? শোক দুঃখাদিতে যখন এই আনবিক স্ফুরণের সাম্যাবস্থা থাকে না, তাহারই নাম বিকার। পুরুষ, শরীরের সর্ব্বত্রব্যাপী, দৈহিক সূক্ষ্ম উপাদানের উপর তিনি কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন। বহু শতাব্দি পরে মহাত্মা হানিমান আর্য্যঋষিদের এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া গিয়াছেন *।

* When a person falls ill, it is only this spiritual self-acting vital-force, everywhere present in the organism, that is primarily deranged by the dynamic influence of a morbific agent inimical to life —Orgenon.

আচার্য্য যুগের দার্শনিক বৈদ্যগণ স্থির করিয়াছিলেন—'জগতে এক ভিন্ন দ্বিতীয় শক্তি নাই।' আনবিক বিস্ফুরণের সাম্যাবস্থা নষ্ট হইলে পরমাণু পুঞ্জের তাপের তারতম্য হয়। জীবদেহে এরূপ তাপ বৃদ্ধি হইলে পিত্ত বৃদ্ধি হয়, বায়ু (তাড়িত শক্তি) বিপর্য্যস্ত হয়, শ্লেষ্মা শৈত্য কমিয়া যায়। "ব্যাপন্ন ঋতুর" ফলে কোনও দেশের সূক্ষ্ম শক্তি বিকৃত হইয়া গেলে সেখানে "জনপদ বিধ্বংসী-মহামারী" দেখা দেয়। পাঠকের বিরক্তির ভয়ে এ সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব— আমরা সংক্ষেপেই আলোচনা করিব।

জগতে এক ভিন্ন দ্বিতীয়-শক্তি নাই। এক মৌলিক অণুর বিস্ফুরণের তারতম্যকেই—দার্শনিক কনাদ ঋষি—দ্ব্যণুক ত্র্যণুক প্রভৃতি নাম দিয়াছেন। জগতে এক আকর্ষণই—ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত। জড় জগতে যাহা ঐষিকী কৈষিকী, উপসর্পনী-অপসর্পিনী শক্তি, আধ্যাত্মিক জগতে তাহাই অনুরাগ, বিরাগ, সহৃদয়তা। তাহাই আবার জীবদেহে—বাত, পিত্ত, কফ। এইখানেই দেখ—আয়ুর্ব্বেদ শুধু চিকিৎসা শাস্ত্র নয়, আয়ুর্ব্বেদ জড় ও জীব শক্তির সামঞ্জস্য!! এমন আয়ুর্ব্বেদকেও তোমরা অবৈজ্ঞানিক বলিতে চাও?

আচার্য্য যুগের বৈদ্যগণ—প্রথমে ব্যাধির স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছিলেন। তাহার পর ঔষধের কল্পনা। রোগ সারে কিসে? ধন্বন্তরি সুশ্রুতকে উপদেশ দিলেন—'দ্রব্যের বীর্য্যে ব্যাধি নষ্ট হয়'। দ্রব্যে—রস, গুণ ও বীর্য্য আছে। রসের পরিবর্ত্তন হইতে পারে, গুণের গুণ থাকিতে পারে না, দ্রব্যের বিপাকও সকল ক্ষেত্রে সমান হয় না। সুতরাং দ্রব্যের বীর্য্যই কেবল ব্যাধি নাশ করিতে পারে। এ রহস্য ঋষিগণ বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই দ্রব্য লইয়া তাঁহাদের কত অনুসন্ধান। ধন্বন্তরি বলেন 'দ্রব্যের বীর্য্য অচিন্তনীয় অবিনশ্বর, অতএব দ্রব্যের বিশুদ্ধ বীর্য্যই সেবন করা উচিত'। কতকগুলা জড় আবর্জ্জনা খাইলে কি উপকার হইবে? বিশুদ্ধ বীর্য্য চাই। মর্দ্দন, পীড়ন ও সন্তাপ এই তিন প্রকার ক্রিয়ার সাহায্যে দ্রব্যের জড় ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায় ঘৃতকে শতবার ধৌত কর, প্রয়োজন মত তৈলকে শতবার পাক কর, লৌহকে সহস্র পুটিতকর, তাহা হইলেই তাহাদের জড় ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। জীবনও শক্তি, বীর্য্যও শক্তি; শক্তি ভিন্ন শক্তিকে কেহ আহত করিতে পারে কি?

ভারতে যত ফল, ফুল, শস্য, তরু, লতা, ক্ষুপ, ধাতু, পাওয়া যায়, এত আর কোথাও পাওয়া যায় না। তাই—আর্য্য ঋষির দ্রব্য গুণ জ্ঞান অতি গভীর ও বহুল বিস্তৃত ছিল। তাঁহারা ছয়শত রকম বিরেচক ঔষধ (জোলাপ) প্রস্তুত করিয়াছিলেন। 'জ্বরহরবর্গ' 'মূত্র বিরেচনীয়বর্গ' 'স্তন্যনীয়বর্গ' 'কৃমিঘ্ন' 'বিষঘ্ন' 'হিক্কা নিগ্রহনীয়'—আর কত নাম করিব? এত "কষায়" "মহাকষায়" "কল্প" "চূর্ণ," ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পশু পক্ষীর মাংসের গুণ, নানা জাতীয় সুরার গুণ, অষ্টবিধ মূত্রের গুণ, কত রকম দুগ্ধ, কত রকম ঘৃত, কত রকম নবনীত, তক্র, দধি, লৌহাদি ধাতু, হরিতালাদি বিষ, এ সকলের দোষ গুণ শোধন, মারণ, প্রয়োগ—সভ্যজগতের কোনও ভাষায় আছে কি? দ্রব্যের এত শ্রেণী বিভাগও আর কোথাও দেখিতে পাইবে না। কে বলে আর্য্য ঋষিরা রসায়ন তত্ত্বে অনভিজ্ঞ ছিলেন?

"ওষধী র্নাম রূপাভ্যাং জানতেহ্যজপা বনে।
অবিপাশ্চৈব গোপেশ্চ যে চান্যে বনবাসিনঃ॥
ন নাম জ্ঞান মাত্রেন রূপ জ্ঞানেন বা পুনঃ।
ওষধীনাং পরাং প্রাপ্তিং কশ্চিদ্বেদিতু মর্হতি॥
যোগ-বিন্নাম রূপজ্ঞস্তাসাং তত্ত্ববিদুচ্যতে।
কিং পুনর্যো বিজানীয়া দোষধীঃ সর্ব্বথা ভিষক্॥"

"বনে যে সকল ছাগরক্ষক, মেষপালক এবং বনবাসিরা বাস করে, তাহারাও ওষধির নাম ও আকৃতি জানে। কিন্তু নাম ও রূপ জানিলেই কি সে সম্বন্ধে তাহাদের কোনও জ্ঞান লাভ হয়? যিনি—সেই সকল ওষধির যোগ, নাম ও রূপ অবগত আছেন, কোন্ দ্রব্যের সহিত কোন্ দ্রব্য মিশ্রিত করিলে কিরূপ গুণ উৎপন্ন হইবে যিনি ইহা জানেন—তাঁহাকেই তত্ত্ববিৎ বলা যায়।" যে রসায়ন তত্ত্ব জানে না, সে কি এমন কথা বলিতে পারে? ঋষি বলিতেছেন—দ্রব্যের গুণ, রূপ, নাম জানিলে চলিবে না, প্রয়োগ প্রণালীও শিখিতে হইবে। দ্রব্যের অযথা প্রয়োগে মহা অনিষ্ট হয়। তীক্ষ্ণ বিষ প্রয়োগ কৌশলে অমৃত হইয়া দাঁড়ায়, আবার অমৃতও অযথা প্রযুক্ত হইলে, বিষের কার্য্য করে। অতএব জীব জীবনের উপর যুক্তি বহির্ভূত ঔষধ কখনও ব্যবহার করিও না।"

চূণের জলে, হরিতাল, শেঁখো, দারুমুজ—এই তিন প্রকার বিষ শোধন করিতে হয়। সুতরাং এই তিন দ্রব্য—এক শ্রেণীর। এইরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা দ্বারা অনায়াসেই বুঝা যায় ঋষিরা দ্রব্য বিশ্লেষণ প্রথা অবগত ছিলেন। "রক্তে—লৌহ আছে, অতএব দেহের রক্ত কমিয়া যাইলে—লৌহ ঘটিত ঔষধ ব্যবহার করিবে। লৌহ দুষ্প্রাপ্য হইলে—হীরাকস্, বা গৈরিক (গেরিমাটী) লৌহের চতুর্গুণ মাত্রায় গ্রহণ করিবে।" যে মহাত্মা এমন সুন্দর উপদেশ দিতে পারেন, তিনি যে দ্রব্য বিশ্লেষণ করিতে পারিতেন না,—এ কথা বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। আর্য্য জাতির রসায়ন তত্ত্ব তান্ত্রিক যুগে বিশেষ করিয়া বলিব।

চুঁচুড়া। শ্রীব্রজবল্লভ রায়।

কবি নবীনচন্দ্র।

বয়সে আমি নবীনচন্দ্রের দুই মাস মাত্র 'অগ্রজ'; কিন্তু, যে সময় আমাদের সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ হইত, সে সময়ে নবীন আমাকে কেবল মুখে দাদা বলিতেন এমন নহে, কার্য্যেতেও আমাকে নিজ অগ্রজের মত 'সমীহ' করিতেন। আমিও তাঁহাকে ছোট ভায়ের মত ভাল বাসিতাম। ইদানী অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই—তাঁহার মৃত্যুতে সে ভ্রাতৃভাব হৃদয়ে জীবন্ত হইয়াছে, তাঁহার বিষয়ে লেখা আমার পোষায় না। কিন্তু অনেকে আমাকে 'কিছু' লিখিতে বলিতেছেন, অগত্যা দুই দশ ছত্র লিখিতেছি:—

১৭৬৮ শকে ২৯এ মাঘ নবীনের জন্ম হয়, এই ১৮৩০ শকের ১০ই মাঘ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। বয়স বাষটি বৎসরও হয় নাই; আমি ত তাঁহাকে বৃদ্ধ হইতে দেখি নাই—নবীন, ত নবীন, —ঢল ঢল মুখে হাসি লাগিয়াই

আছে—ছল ছল চক্ষুতে শীতল তেজ বাহির হইতেছে—আর পথে ঘাটে একা চলিতেছেন—কি—শীস্ দিয়া ভৈরবী আলাপ করিতেছেন,—সেই মুখ, সেই মৃদু হাসি সেই চক্ষু আর সেই শীস্‌গান কেবলই মনে পড়িতেছে—আমি আবার কি লিখিব?

সৌভাগ্য ক্রমে বাঙ্গালির কাছে নবীনের কবিত্বের পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নাই। লেখাপড়া জানেন, অথচ নবীনের কবিত্বের কথা কিছুই জানেন না, এমন বাঙ্গালি আছেন কি? তা নাই।

হৃদয়ের রস গলিয়া, জমিয়া কবিতা হয়। সেই হৃদয়ের রস দর্পণে নবীনচন্দ্র আপনার অসংখ্য ছায়ামূর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার উৎকৃষ্ট জীবনী।

'অবকাশ রঞ্জিনীর' প্রথম ভাগের প্রথমেই দেখিবেন, 'পিতৃহীন যুবক' নবীনের ফটো। সেই পদ্যের একটি মাত্র স্থান উদ্ধৃত করিব:—

"জনক উদ্দেশে আমি করি নমস্কার,
জানি না মিলিব কি না আবার দু'জন;
সাধ ছিল চিহ্ন কিছু রাখিব তোমার
স্মরণার্থ, কিন্তু আশা হলোনা পূরণ
তরল না হতো যদি নয়নের নীর,
ছুঁইত আকাশ তব সমাধি মন্দির।"

কবি পরজীবনে পিতার স্মরণার্থ চিহ্ন রাখিবার খেদ মিটাইয়াছিলেন; নবজীবনে তিনি 'নবজীবন' নামক যে পদ্য লেখেন, তাহাতে খেদ মিটাইবার বিবরণ আছে, স্থানের ও সময়ের পরিচয় কবিতার শীর্ষ স্থানে আছে। (অশোকাষ্টমী—নিশি—নদীতীরে—পিতৃ মাতৃ শ্মশানস্থ শিবালয় সম্মুখে) কবি বলিতেছেন—

"আর কাঁদিব না। যেই অনন্তের সনে
মিশিয়াছ, সেই মহা অনন্ত স্বরূপ,—
অশোক অষ্টমী আজি,
ভক্তির তরঙ্গ রাজি
করিয়াছে মুহূর্ত্তেক অশোক অন্তর—

স্থাপিলাম সেই মূর্ত্তি শ্মশান উপর।
স্থাপিলাম "গোপীশ্বর"—প্রকৃতি ঈশ্বর।
কাংস্য ঘণ্টা শঙ্খ ধ্বনি,
কি পবিত্র স্রোতস্বিনী
বহে হুলুধ্বনি সহ রহিয়া রহিয়া!
কিবা ধ্যান সুধাময়,
সমীরণ পৃষ্ঠে বয়,
অগুরু চন্দন গন্ধে মাখিয়া শরীর,
—অনন্তের কিবা মূর্ত্তি, কি চিন্তা গভীর!"

নবীনচন্দ্রের পিতার নাম গোপীমোহন রায়। সেই জন্য গোপীশ্বরের স্থাপনা। ভাল, যদি গোপীশ্বরের স্থাপনা হইল—তবে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি স্থাপিত করিলেইত হইত? তা কেমন করিয়া হইবে, এ শ্মশান সমাধি-মন্দির যে—আর নবীনচন্দ্র যে বিখ্যাত শঙ্করপুরীর শিষ্য। এই সকল কথা বলিয়া, এমন কথার ইঙ্গিত করিতেছি না, যে নবীনচন্দ্র 'হরিহরে' ভেদ করিতেন; মহাদেবের নাম গোপীশ্বর হওয়াতেই সে কল্পনা দূর হইয়াছে।

নবীনচন্দ্রের কবিতাবলীর অসংখ্য স্থলে তাঁহার জীবনের ও হৃদয়ের অসংখ্য ফটো আছে; আর অধিক দেখান আমা কর্ত্তৃক অসম্ভব। সৌভাগ্যবান্ নব্য লেখকেরা অবশ্য নবীনচন্দ্রের বিস্তৃত জীবনীতে সেই সকল ভাল করিয়া দেখাইবেন।

নবীনচন্দ্র হেমচন্দ্রের অনুকরণে স্বদেশ প্রীতিতে তাঁহার কবিতা ভরিয়া রাখিয়াছেন;—কিন্তু সে সকল কথার অনুশীলন করা এখন ত চলে না।—এখন কতকগুলি রাজপুরুষ রাগ ভরে গর্ গর্ করিতেছেন, সাধ্যমত তাঁহাদিগকে শান্ত করাই—এখন আমাদের কর্ত্তব্য।

তবে একটা কথা নবীন সম্বন্ধে বলিতেই হইতেছে। রাজাজ্ঞায় বাঙ্গালা দ্বিখণ্ডিত হওয়াতে দেশে আকুণ্ড কুণ্ড জ্বলিয়া উঠিয়াছে,—জানি না, কবে নিভিবে! দ্বিখণ্ডিত হইয়াও বাঙ্গালা যে অন্তরে অন্তরে এক রহিয়াছে—সে একরূপ বিচিত্র-বন্ধনে—পূর্ব্ববঙ্গের দুইটি কৃতিসন্তানের কৃতিত্ব গুণে,—দাদা কালীপ্রসন্নের ও ভাই নবীনচন্দ্রের গুণে।

সাহিত্যের বন্ধন—বড় বন্ধন। এই যে বুকে পীঠে সেক্সপিয়রের বন্ধন জড়াইয়া বসিয়া আছি—কৈ কর্জনের চড়চড়ানিতে তাহাত ছিঁড়িল না? সাহিত্যের বন্ধন বড় শক্ত বন্ধন। এদিক্ থেকে জয়দেব হইতে রবীন্দ্রনাথ—সকলেই সমগ্র বাঙ্গালা ঘোর বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, ওদিক হইতে প্রধানতঃ দুইটি মহা রজ্জু ছিল, তাহার একটি মহাকালের মহাটানে ছিঁড়িয়া গেল! তোমরা কেহ ওদিক হইতে নবীনের ন্যায় বন্ধন দিতে পারিবে না!

নবীন সেন গিয়াছেন—কিন্তু কবি নবীন ত যান নাই—তিনি ত অমর! তবে আর যে নিত্য নিত্য সেই নবীনসুধা আমরা উপভোগ করিতে পাইব না—এই আমাদের দুঃখ। নবীন! তুমি চট্টগ্রামের জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি-পন্থার ভবনে নীরবে আপনার জীবলীলা বিবৃত করিতেছিলে—এখন তাহাই ছিল আমাদের দৃঢ়তর বন্ধন। তোমার জীবনী লেখা শেষ না হইতেই তোমার জীবলীলা ফুরাইল—তাহাই আমাদের দুঃখ।—আমার দুঃখ তোমার সেই হাসিমুখ আর একবার দেখিতে পাইলাম না—অনেক দিন দেখি নাই—আশা ছিল একবার দেখিব ও ছেলেদের দেখাইব,—সে আশা পূর্ণ হইল না!!

কদমতলা, চুঁচুড়া। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

হৈমবতী।

প্রথম অধ্যায়।

"পিশাচ সহোদর"।

ভাদ্র মাস। শনিবার। কৃষ্ণপক্ষের একাদশী তিথি উত্তীর্ণ হইয়া দ্বাদশী পড়িয়াছে। রাত্রি দেড় প্রহর অতীত হইয়াছে। ইংরাজী হিসাবে দশটা বাজিয়াছে। সন্ধ্যার পর একপসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশে এখনও মেঘ রহিয়াছে। চারিদিক ঘোর অন্ধকার। পল্লীগ্রামের পথ ঘাট প্রায়ই জলাকীর্ণ বা কর্দ্দমে পরিপূর্ণ। খানা ডোবা পুকুর প্রভৃতি যেখানে যেখানে জল আছে সেইখানেই ভেক ডাকিতেছে। গৃহস্থের বাড়ী গুলি নিস্তব্ধ। কলিকাতার কুড়ি বাইশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী এবং নিকটস্থ রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে ক্রোশাধিক মাত্র ব্যবধানে এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে ভূতনাথ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে একটা বিষম গোল উঠিয়াছে।

ভূতনাথ পরলোকগত, তাঁহার ব্রাহ্মণীও সধবা অবস্থায় গঙ্গালাভ করেন। ভূতনাথের দুইটী পুত্র ও একটি কন্যা। কন্যা শরৎ সুন্দরী সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা, তাঁহার বয়স ৩৬। ৩৭ বৎসর হইবে। প্রথম পুত্র সুরেশচন্দ্র ৩২। ৩৩ বৎসর বয়স্ক। তিনি কলিকাতার এক আফিসে মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে কর্ম্ম করেন। দ্বিতীয় সতীশ চন্দ্র ২৫। ২৬ বৎসরের যুবক, অল্পদিন হইল তিনি ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতাতেই চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। সুরেশচন্দ্র প্রতি শনিবারেই বাড়ী আসেন, সতীশের তাহা ঘটে না। তাঁহার শ্বশুর বাড়ী কলিকাতায়। স্ত্রী পিত্রালয়েই থাকেন। বিশেষ কাজ কর্ম্ম উপলক্ষে সতীশ সস্ত্রীক সময়ে সময়ে বাড়ীতে আসেন।

সুরেশচন্দ্রের প্রথম স্ত্রীর কাল হইয়াছে। তিনি পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়াছেন। দ্বিতীয়া স্ত্রী নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের রূপসী কন্যা। তাঁহার বয়স ষোল সতের বৎসর হইয়াছে। সুরেশের প্রথম পক্ষের একটি পুত্র আছে। পুত্রের নাম পাঁচু বা পঞ্চানন। তাহার বয়স ৭।৮ বৎসরের অধিক নহে।

এই গ্রামের দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী রাজীবপুরের গুরুচরণ গাঙ্গুলীর সহিত শরৎ সুন্দরীর বিবাহ হয়। গুরুচরণ একজন বিখ্যাত কথক ছিলেন। কয়েক মাস হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়া বিধবা শরৎসুন্দরী একটী পুত্র ও কন্যা লইয়া পিত্রালয়ে আসিয়া বাস করিতেছেন। পুত্র হরিশচন্দ্রের বয়স তের চৌদ্দ বৎসর। কন্যা হৈমবতী দশ এগার বৎসরের বালিকা। শরৎ পুত্র কন্যা লইয়া পিত্রালয়ে বাস করেন ইহা ভ্রাতৃজায়া সুরেশচন্দ্রের স্ত্রীর অভিপ্রেত নহে। শরতের আগমনের পূর্ব্বে সুরেশের স্ত্রী বাটীর গৃহিনী ও কর্ত্রী ছিলেন। শরৎ আসিলে তাঁহার এই কর্ত্তৃত্বের ও গৃহিনীপনার কিঞ্চিৎ লাঘব হয়। তিনি সর্ব্বদাই শরতের সহিত কলহ করিবার চেষ্টায় থাকিতেন। কিন্তু শরৎ তাঁহার দুর্ব্বাক্য ও কুব্যবহার সকলই সহিয়া যাইতেন বলিয়া ঝগড়া বাধিত না। সুরেশের স্ত্রীর মন অতিশয় নীচ এবং কুটিলতায় পুর্ণ ছিল। মধ্যে মধ্যে প্রায়ই তিনি শরৎকে তাড়াইবার জন্য স্বামীর কর্ণে মন্ত্র দিতেছিলেন। আজ তাহার ফল ফলিয়াছে।

সুরেশচন্দ্র মদ্যপায়ী। সন্ধ্যার পূর্ব্বে কলিকাতা হইতেই তিনি কিঞ্চিৎ গরল পান করিয়া আসিয়াছিলেন। রাত্রিতে বাড়ী পৌছিয়াও আবার কিছু খাইয়াছেন। রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা এমন সময়ে সহসা তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া তাঁহার ভগিনী যে ঘরে পুত্র কন্যা লইয়া শয়ান ছিলেন তাহার সম্মুখীন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন "দিদি, দিদি, বেরোও ত একবার,—"

উপবাসক্লিষ্টা বিধবার চক্ষে তখনও নিদ্রা আসে নাই। সুরেশ, তাহার পুত্র, আপনার পুত্র কন্যা এবং ভ্রাতৃজায়াকে আহার করাইয়া তিনি অল্পক্ষণ মাত্র শয়ন গৃহে আসিয়াছেন, এমন সময়ে ভ্রাতার রুক্ষ স্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি প্রথমতঃ মনে করিলেন সুরেশ মাঝে মাঝে মাতাল হইয়া যেমন বকে আজও বোধ হয় তেমনই বকিতেছে; কিন্তু ক্রমশঃ যখন সুরেশের স্বর পঞ্চম হইতে সপ্তমে চড়িল এবং তিনি আততায়ীর ন্যায় ভগিনীর শয়ন গৃহের দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন শরৎ দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন এবং সহোদরের সম্মুখীন হইয়া

কহিলেন "কি সুরেশ, কি বলিতেছ ?" সুরেশ উত্তর করিলেন "বলছি, তুমি তোমার ছেলে মেয়ে নিয়ে রাজীবপুরে যাও"।

শরৎ। কেন, কি হয়েছে ?

সুরেশ। সে কথায় কাজ কি, তুমি বেরোও।

শ। এখনই ?

সু। হাঁ এখনই।

শ। আজ যে ভাদ্র মাস।

সু। হোক ভাদ্র মাস। রজনী তোর গাড়ীটে নিয়ে আয়।

রজনী বাগ্দী ইহাদের বাড়ীর কৃষাণ। সে ভূতনাথের আমলেও ইহাদের বাড়ীতে কর্ম্ম করিয়াছে। বয়সে সে সুরেশ অপেক্ষা বড় কিন্তু শরতের ছোট। সে শরতকে দিদি বলিয়া ডাকিত। রজনী বাহিরের ঘরে শুইয়াছিল, সুরেশের চীৎকার শুনিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কেবল তাহার কেন, নিকটস্থ দুই চারি বাড়ীর লোকেরও ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। রজনী আসিয়া নিকটে দাঁড়াইলে সুরেশ বিকৃত মুখভঙ্গীর সহিত কহিলেন "যা তোর গাড়ীটে নিয়ে আয়, আর তোর দিদি ঠাকরুনকে রাজীবপুরে পৌঁছে দিয়ে আয়।"

রজনী। এই রাত্রে—

সুরেশ। রাত্রে নয় ত কি, এখনই।

র। দিদি ঠাকরুন যে উপোস ক'রে আছেন।

সু। শালা তোর এত ন্যাকামোয় কাজ কি ? তুই নিয়ে আয় না গাড়ী।

র। আপনার কর্ত্তাও কখনও আমাকে শালা ব'লে গাল দেন নি।

সুরেশ রজনীকে মারিতে উদ্যত হইলেন। শরতের চক্ষু দিয়া জল ঝরিতেছিল। তিনি ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, এবং রজনীর নিকটবর্ত্তীনী হইয়া তাহাকে কহিলেন "রজনী, যাও গাড়ী নিয়ে এসো।"

রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

বিধবা শরৎ তাঁহার মাতাপিতাকে উদ্দেশ করিয়া চেঁচাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

পিশাচ সুরেশ ক্রুদ্ধভাবে কহিলেন "এখানে কাঁদ্‌তে হবে না, সেই রাজীবপুরে যেয়ে কেঁদো"। পুনরায় একটু সুর নরম এবং বিকৃত করিয়া কহিলেন "বাপ্ এই ক' মাসের গিন্নিপনায় হাড় জ্বালিয়ে দিয়েছ। তুমি, বোন হ'য়ে ভাইকে দাও কুকুরে খাওয়া গুড় খেতে ?"

শরৎ এতক্ষণে সুরেশের আকস্মিক ক্রোধের কারণ অনেকটা বুঝিলেন। কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া তিনি প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, "বউ বুঝি লাগিয়েছেন। সুরেশ তুইতো আমার মার পেটের ভাই। আমি তোকে দেবো কুকুরে খাওয়া গুড় খেতে ? কুকুরে গুড় এক ভাঁড় চেটেছিল বটে সেও বউয়ের দোষে। আমি সে গুড় তখনই ফেলে দিয়েছি।"

সু। তোমার আর নাকে কাঁদ্‌তে হবে না।

শরতের ক্রন্দনের বেগ আরও বর্দ্ধিত হইল।

পিশাচ সুরেশ পুনরায় কহিলেন "তোমাকে বার বার বলছি তুমি এখানে কেঁদ না।"

ভূতনাথের বৈমাত্রেয় সহোদর দেবনাথ ভট্টাচার্য্য নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার বিধবা ব্রাহ্মণী ভূতনাথের বাড়ীর অতি নিকটে বাস করেন। সুরেশের চীৎকারে তিনি জাগরিত হইয়াছেন এবং এই অমানুষিক ব্যাপার দেখিয়া শরতের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

অস্ত্রবৎ তীক্ষ্ণ সুরেশের শেষ কয়েকটী কথা শরতের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিল। তিনি দেবনাথের স্ত্রীর চরণ সমীপে বসিয়া পড়িয়া কহিলেন "হ্যাঁ কাকী মা, আমি কি এখানে কাঁদ্‌তেও পারবো না ? এটা কি আমার বাবার ভিটে নয় ?"

কাকীমা শরতের মস্তকে হস্তস্পর্শ করিয়া কহিলেন "মা তুমি আমার বাড়ী চল। ভাদ্র মাসের এক'টা দিন থেকে তার পর রাজীবপুর যেয়ো।

শরৎ একথায় সম্মত হইলেন না, তিনি কহিলেন "তুমিই আছ যে কষ্টে।"

অপত্যহীনা রমণী পুনরায় অকৃত্রিম স্নেহমাখা স্বরে কহিলেন "মা তুই কি আমার মেয়ে নস্ ? যদি এক'দিনও না থাকিস্ অন্ততঃ কাল সকালে কিছু একটু মুখে দিয়ে তার পর যাস্।"

শরৎ কাকীমার এ অনুরোধও রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাহার অভিমানে বিষম আঘাত লাগিয়াছে। অভিমান কাহার না আছে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি শরতের স্বামী গুরুচরণ গাঙ্গুলী নগণ্য লোক ছিলেন না। রাজীবপুরে এখনও তাঁহার দু দশ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী আছে। সুরেশ এবং সতীশ একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করাতেই শরত পুত্র কন্যা লইয়া পিত্রালয়ে আসিয়াছিলেন। পাষণ্ড ভ্রাতার নৃশংস ব্যবহারে আজ তাঁহাকে উন্মত্তার ন্যায় করিয়া তুলিয়াছে। তিনি স্থির করিলেন রজনী গাড়ী না আনিলেও আমি হাঁটিয়াই রাজীবপুরে যাইব। পিতৃভবনে আর জল স্পর্শ করিব না।

শরতের পুত্র কন্যা দুইজনেই আসিয়া মায়ের কাছে দাঁড়াইয়াছিল, এবং মাতুলের ব্যবহার দেখিয়া পুনঃ পুনঃ কহিতেছিল "চল মা আমরা বাড়ী যাই। মামা বাবু তোকে মারবে।"

দেবনাথের স্ত্রী ইহা বুঝিতে পারিলেন, এবং তাহার শেষ অনুরোধের অব্যবহিত পরেই রজনী গাড়ী আনিয়া হাজির করিলে, শরৎ যখন তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া "কাকীমা বিদায় হই" বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তখন কাকী মার চক্ষু হইতে বিগলিত দুই চারি ফোঁটা তপ্ত অশ্রু শরতের মস্তকে পড়িল, কিন্তু তিনি তাঁহার গমনে বাধা দিবার নিমিত্ত আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

উপবাসিনী বিধবা পুত্রকন্যাদুটীর হাত ধরিয়া গো শকটে আরোহন করিলেন। তাহার যে সামান্য বিছানা ও বস্ত্রাদি ছিল রজনী তাহা পূর্ব্বেই গাড়ীতে তুলিয়া লইয়াছিল।

সুরেশের শিশু সন্তান পাঁচু পিতার চীৎকারে জাগ্রত হইয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দু একবার বলিয়াছিল "পিশি মা কাঁদ কেন? তুমি যেয়ো না তুমি গেলে আমি তোমার সঙ্গে যাব।" সুরেশ তাহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া এক চপেটাঘাত করেন, এবং গৃহমধ্যে রাখিয়া আসেন। বালক অগত্যা বিমাতার বিষময় ক্রোড়ে আশ্রয় লয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পুরাতন ভৃত্য ও প্রতিবেশী।

রজনীর গাড়ী ছাড়িতে রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়া গেল। বাড়ীতে সে কিছু বিলম্ব করিয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাজীবপুর শরতের পিত্রালয় হইতে দুই ক্রোশ মাত্র পথ, কিন্তু একে বিষম অন্ধকার, আর তাহাতে রাস্তার অবস্থা বড়ই খারাপ ছিল। রজনীকে অনেক স্থানেই সরল পথ ছাড়িয়া বক্র পথে যাইতে হইল। পথে একটী বড় বাজার আছে। রজনী সেখানেও কিছু বিলম্ব করিল। শরতের বাড়ী পৌঁছিতে প্রায় চারিটা বাজিয়া গেল।

শরৎ পুত্র কন্যা দুইটী লইয়া বহিরাঙ্গনে নামিলেন। দেখিলেন পাঁচ মাস পূর্ব্বে বাড়ীটি যে ভাবে তালাবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন উহা সেই ভাবেই আছে, কিন্তু মানুষের গতি বিধি না থাকায় গৃহ প্রাঙ্গণ আদি যেন শ্রীহীন হইয়া কাঁদিতেছে। শরৎ চাবিটি লইয়া গৃহদ্বার উন্মোচন করিলেন। বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়াই তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার পতি শোক আবার যেন নূতন হইয়া জাগিয়া উঠিল। তিনি শয়ন গৃহে কথঞ্চিৎ একটী শয্যা বিন্যাস করিয়া হরিশ ও হৈমবতীকে শুইতে বলিলেন, কিন্তু নিজে বালিকার ন্যায় হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হরিশ ও হৈমবতী মাতুল গৃহে নিদ্রাভঙ্গের পর হইতেই মাতার ক্রন্দনে যোগ দিয়াছে, এইবার তাহারা উভয়েই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, এবং দুইজনে দুইদিক হইতে মায়ের অঞ্চল আকর্ষণ করিতে করিতে কহিতে লাগিল "মা তুমি একটু ঘুমোও, সারাদিন রাত্রি তোমার এক ভাবে গিয়াছে। আমরা খানিকটা ঘুমাইয়াছি, দুই তিনবার খেয়েছি তুমি না খেয়ে রাত্রি অবধি মামা বাবুর জন্য খাবার করেছ।"

পুত্র কন্যার ক্রন্দন ও সান্ত্বনা দুঃখিনী জননীকে অনেকটা প্রকৃতিস্থ করিল। আমি কাঁদিলে, ইহারা ঘুমাইবে না ভাবিয়া শরৎ নিস্তব্ধ হইলেন, এবং হরিশ ও হৈমবতীকে কহিলেন, "আমি আর কাঁদবোনা

তোমরা ঘুমোও।" বালক বালিকা জননীর দুই পার্শ্বে শয়ন করিল, এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই নিদ্রিত হইল।

শরৎ চুপ করিয়া রহিলেন বটে, কিন্তু নিদ্রা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না।

প্রভাত হইলে তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন, এবং দেখিলেন, রজনী বাহিরের ঘরে ঘুমাইতেছে। তাহার মস্তকের নিকট একটী বস্ত্রাবৃত বড় পোঁটলা রহিয়াছে। শরতের পদশব্দ পাইবা মাত্রই রজনী জাগিয়া উঠিল, এবং শয্যাত্যাগ করিয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়া শরৎকে প্রণাম করিল। শরৎতাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রজনী এ পোঁট্‌লা কার?" রজনী চক্ষে জল ফেলিতে ফেলিতে কহিল "পোঁট্‌লা তোমার।"

শরৎ। আমি ত কোন পোঁট্‌লা আনি নি।

রজনী। আমি এনেছি—বলিয়া অতি যত্নে পোঁট্‌লাটী খুলিল। শরৎ দেখিলেন বস্ত্রমধ্যে দশ বার সের আতপ তণ্ডুল এবং সেই তণ্ডুলের মধ্যে একটি মুখ বাঁধা ভাঁড়ে দেড়সের দু'সের গব্য ঘৃত রহিয়াছে। তিনি কহিলেন, এ কোথা থেকে আন্‌লে?

রজনী। আমার বাড়ী থেকে।

শরৎ। কখন আনলে?

রজনী। যখন গাড়ী যুড়তে যাই। তোমার জন্য আতপ চাল ত আমরাই দিই। আমার ঘরে এখনও দশ মণ আমন ধান বাঁধা। চার ভাই সমানে খাটি। ঘি আমাদের গরুর দুধের। আমার জিনিষ ব'লে ঘেন্না ক'র না দিদি ঠাকরুণ।

শ। এ ত তুমি সবই বেচ্‌তে।

র। অমন কথা বলো না দিদি, আমি তোমার খাবার জন্য এনেছি। গাছে এক কাঁদি কাঁচা কলা ছিল, রাত্রে আমি তাও কেটে এনেছি। গাড়ীর ভেতর আছে। পথে বাজারের দোকানদারকে তুলে একটু সন্ধব নুন আনতে চেয়েছিলাম কিন্তু দোকানদার উঠ্‌লো না। আমি এখুনি যেয়ে নুন এনে দিচ্ছি।

শরতের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল। তিনি কিছুক্ষণ কোনও কথাই কহিতে পারিলেন না। মনে মনে বুঝিতে পারিলেন, রজনী যে বাড়ীতে গাড়ী আনিতে যাইয়া বিলম্ব করিয়াছিল, সে কেবল তাঁহারই আহারের যোগাড় করিবার জন্য। বাজারে যে তামাক খাইব বলিয়া নামিয়াছিল সেও তামাক খাইবার জন্য নহে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শরৎ কহিলেন "রজনী তুমি আর নুন আন্‌তে যেয়ো না। বেলা হ'লে সুরেশ তোমায় ব'কবে।"

রজনী। তা বকুন, কাল ত রাত্রে শালা বলেছেন, আমি আর ও বাড়ীতে চাকরি কর্‌ছি না। চিরকাল তোমার বাপের নুন খেয়েছি, আর তোমাদের উপর কেমন একটা মায়া তা কাল রাত্রে সব ঘুচে গেছে। বড় বাবু যে কাণ্ডটা ক'রেছেন তা বামুন কেন বাগ্দীতেও করে না।

রজনী আর কথা না কহিয়া বা শরতকে কথা কহিবার অবকাশ না দিয়া বাজারে চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই নুন আনিয়া হাজির করিল। শরৎ হৃষ্টচিত্তে পিতার পুরাতন ভৃত্যের এই সমস্ত দানই গ্রহণ করিলেন। রজনী গাড়ীতে উঠিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিল, "যে ক'দিন বাঁচি, দিদি, মাঝে মাঝে তোমাকে আর তোমার ছেলে মেয়েকে এসে দেখে যাব।

রজনীর চোক দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িল। অসভ্য ও অশিক্ষিত রজনী বাগ্দী বিধবা ব্রাহ্মণী শরৎ সুন্দরীর প্রাণের আশীর্ব্বাদরূপ অমূল্য পুরস্কার সঙ্গে লইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল।

অল্পক্ষণ মধ্যেই শরৎ দেখিলেন, তিনি আপনাকে যেরূপ সহায়হীনা মনে করিতেছিলেন, রাজীবপুরে তিনি সেরূপ অসহায়া নহেন। নিতাইদাস নামে এক বৈরাগী তাঁহার স্বামীর সহিত কথকতার সময়ে বিদেশে যাইত; সে এখন বৃদ্ধ। রজনী না যাইতে যাইতেই বৃদ্ধ নিতাই আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শরতের সহিত দুই একটি কথা কহিয়াই রন্ধনের নিমিত্ত কাষ্ঠাদি আহরণ করিতে চলিল। প্রতিবেশিনী বৃদ্ধা এবং প্রৌঢ়া অনেক রমণীই শরতের বাড়ীতে আসিল এবং তিনি কিছু না বলিলেও তাহারা অল্পক্ষণ মধ্যেই আপন আপন বাড়ী হইতে কেহ দুটী শশা, কেহ একটী তাল, কেহ কতকগুলি ঝিঙ্গে এবং কেহ বা কিছু পটল আনিয়া হাজির

করিল। শরতের স্বামী গাঙ্গুলী মহাশয় একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এবং অতিশয় উন্নত চরিত্রের লোক ছিলেন, শরৎ সুন্দরী সর্ব্বাংশেই তাঁহার উপযুক্ত সহধর্ম্মিনী। সুতরাং এই ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রতি পল্লীবাসী সকলেরই সমধিক শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। নীচ জাতীয় প্রতিবাসীরা গাঙ্গুলী মহাশয়কে দেবতার ন্যায় সম্মান করিত। তাঁহার মৃত্যুর পর শরৎ তাঁহার পিত্রালয়ে চলিয়া যান, ইহাও তাহাদের অভিপ্রেত ছিল না। তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসাতে তাহারা সকলেই আনন্দিত হইল। শরৎ দেখিলেন তিনি ভাদ্র মাসে ভ্রাতার বাড়ী হইতে কেন আসিয়াছেন, এ কথা তাঁহাকে কেহই জিজ্ঞাসা করিল না, পরন্তু সকলে তাঁহাকে প্রাণের সহানুভূতি দেখাইল এবং যথাসাধ্য সাহায্য করিল। বিধবার দগ্ধ হৃদয় অনেকটা শান্ত হইল। তাঁহার স্বামীর জমীর ভাগযোতদার সেই দিনই আসিয়া তাঁহাকে ফসলের অবস্থা বলিয়া গেল। শরৎ বুঝিলেন কোন বিঘ্ন না হইলে জমীতে যে ধান্য হইবে তাহাতেই কোনরূপে তিনটী প্রাণীর এক বৎসরের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান হইতে পারিবে।

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

সমালোচনা।

প্রধান মাসিক পত্রগুলির সম্যক্ সমালোচনা মাসিক প্রবন্ধে পোষায় না—দুই চারি কথা বলা মাত্র।

✓ প্রবাসীতে ও বঙ্গদর্শনে "লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন কলঙ্ক" তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা হইতেছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় আজি কয়বৎসর ধরিয়া, আমাদের দেশের লুপ্ত বা বিকৃত ইতিহাসের পুনরুদ্ধারের বা সংস্করণের ধারাবাহিক চেষ্টা করিয়া, আমাদের সকলেরই ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে ঐ কলঙ্ক মোচনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবার বিশেষ করিয়া ঐ কথার আলোচনা করিয়াছেন। ভালই হইয়াছে। কিন্তু মৈত্রেয় মহাশয়ের লেখনভঙ্গিতে কেমন একটু যেন সমীচীনতার অভাব বলিয়া মনে হইতেছে; তাহা জানাইতেছি:— মৈত্রেয় বলিতেছেন— "মিন্‌হাজ.....লিখিয়া গিয়াছেন—যাহারা বক্তিয়ারের সহিত বিজয় যাত্রায় বহির্গত হইয়াছিল, তাহাদের মুখে মিন্‌হাজ এই কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন।" ইহার চারি পংক্তি পরে,—"ইহার মূল প্রমাণ মিন্‌হাজের গ্রন্থ—এক মাত্র প্রমাণ মিন্‌হাজের গ্রন্থ—তাহাও একমাত্র বৃদ্ধ সৈনিকের পুরাতন আখ্যায়িকা।" "তাহাদের" বহুবচন হইতে "এক মাত্র"—কিরূপে আসিল তাহা বুঝা যায় না। ইহার চারি পংক্তি পরে, "তিনি (সেই সৈনিক) তখন অশীতিপর বৃদ্ধ—তাঁহার সত্য নিষ্ঠা বা আত্ম-গৌরব ঘোষণার প্রলোভন কতদূর প্রবল ছিল, এতকাল পরে তাহার মীমাংসা করিবার সম্ভাবনা নাই।" অর্থাৎ সৈনিক মিথ্যাবাদী হইতে পারে। ভাল, ইহার একপৃষ্ঠা পরে:—"মিন্‌হাজের কাহিনী আদৌ কোনও বৃদ্ধ সৈনিকের নিকট হইতে সংকলিত, অথবা তাঁহার কপোল কল্পিত মাত্র তদ্বিষয়েও সন্দেহ-শূন্য হইবার উপায় নাই।" অর্থাৎ মিন্‌হাজও মিথ্যা-বাদী হইতে পারেন। লেখার এরূপ ভঙ্গি নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের পক্ষে ভাল কি?

একটু একটু করিয়া বাঙ্গালার মাসিক সাহিত্যে বিজ্ঞান চর্চ্চা প্রসর বৃদ্ধি করিতেছে। পৌষের বঙ্গদর্শনে ঈথরের পরিচয় আছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকের ঈথর এবং প্রাচীন দার্শনিকগণের 'ব্যোম' একই পদার্থ বটে। তবে শব্দকে আকাশের গুণ যে দার্শনিকগণ বলেন, সেটা কিছু ঈথরে আরোপ করা যায় না। যেখানে বায়ু নাই, সেখান হইতে শব্দ আসে কি না, এ কথা বিজ্ঞান বলিতে পারে না। আর 'শব্দ ব্রহ্ম' এ কথাই বা বিজ্ঞান বুঝিবে কিরূপে? আদি শব্দ বুঝিলে, তখন শব্দ আকাশের গুণ কি না বুঝা যাইতে পারে। পৌষ, মাঘের প্রবাসীতে বিজ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণী আছে—বিজ্ঞানে ও কবিত্বে মাখামাখি, খাঁটি বিজ্ঞান নহে। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘের ভারতীতে আচার্য্য বসুর অদ্ভুত আবিষ্কারের পরিচয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে বুঝা যায়, জীব, উদ্ভিদ্ এবং ধাতু প্রস্তরাদি কতকগুলি জড় পদার্থ—তড়িৎ সঞ্চালনে, সমানে সাড়া দেয়, মাদক সেবনে মাতিয়া উঠে, বিষ প্রয়োগে মরিয়া যায়। ইহাতেই বুঝা যায় যে সাড়া দিবার শক্তি সর্ব্ববিধ জড়ে নাই। যেটা মরে, সেটা ত আর সাড়া দেয় না। ব্রহ্মবাদের সহিত এই আবিষ্কারের কোন সম্বন্ধ নাই। কেহ কেহ এইরূপ একটা কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া, এ কথাটা বলিতেছি। সমস্ত পদার্থ বিজ্ঞানের মূলে তাড়িত শক্তির লীলা খেলা—ছোট ছোট তাড়িত যন্ত্র যত দিন না পল্লীগ্রামের স্কুল পাঠশালে অধিষ্ঠিত এবং চালিত হয়, ততদিন দেশে বিজ্ঞানের ভিত্তি বসিবে না। কলিকাতার বিজ্ঞান সভা প্রভৃতি কেবল উপর তলার কাণ্ড—নীচেতলা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে।

অগ্রহায়ণের পূর্ণিমায় রবি বাবুর 'গোরা' গল্পের বিশ্লেষণ পদ্ধতি বিষয়ে বলিয়াছিলাম, "এইরূপ বিশ্লেষণে রবি বাবু অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইতেছেন। এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মানব-চিন্তার ব্যবচ্ছেদ করা অতি সূক্ষ্ম অন্তর্দর্শীর কার্য্য," এই বিষয়ে পৌষের প্রবাসীতে "উপন্যাসিক সাহিত্যে নবনীতি" নামে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তাহাতে রবি বাবুকে জর্জ ইলিয়টের পথে যাত্রী বলা হইয়াছে। বাস্তবিক তাই কি?

আজি কালি বোমা বারুদ বিভ্রাটে প্রায় ভদ্র লোক মাত্রেই উন্মনা

হইয়াছেন; মাসিক পত্রগুলিতে দেখা যাইতেছে, 'ধর্ম্ম' নাম দিয়া, বা আত্মশাসন নাম দিয়া—দেশদ্রোহীদলকে শান্ত হইতে উপদেশ দেওয়া হইতেছে। ভাল কথা। কিন্তু আসল স্থানে কেহই আঘাত করিতেছেন না। ঘোরতর শিক্ষা বিভ্রাটে হিন্দু যুবক বালকেরা বিড়ম্বিত হইতেছে—তাহার প্রতীকারের কোন চেষ্টাই নাই। খ্রীষ্টান বালকে কতকটা খ্রীষ্টানী উপদেশ পায়; মুসলমান বালকেও স্বধর্ম্মের কিছু কিছু উপদেশ পায়—অভাগা হিন্দু সন্তানেরাই একেবারে বিড়ম্বিত হয়। একটা 'জাতীয়' কথার মোহে সকলকেই আচ্ছন্ন করিয়াছে। শিক্ষা স্বতন্ত্রধর্ম্মী (বা Denominational) হইলে, সর্ব্বনাশ হইবে, বলিয়া অনেকের ধারণা—তাঁহারা চান শিক্ষা সাধারণ-ধর্ম্মী (বা National)। এই একটা ন্যাশান্যাল কথার কুহকে সকলেই জ্ঞানহারা হইয়াছেন। হিন্দুর ছেলেকে হিন্দুয়ানি—মুসলমানের সন্তানকে মুসলমানী—খ্রীষ্টানের ছেলেকে খ্রীষ্টানী—এইরূপ স্বতন্ত্র শিক্ষা না দিয়া, যে ধর্ম্ম-শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা আমরা বুঝিতেই পারি না। আর ধর্ম্ম বাদ দিয়া যে শিক্ষা হইতে পারে, তাহাও বুঝি না। আর চক্ষে দেখিতেছি, শিক্ষা বিভ্রাটে হিন্দু সন্তান—মহা বিকৃত-মনা হইতেছে। ইহার সদ্য প্রতীকার একান্ত আবশ্যক। আশুতোষের অকাল মৃত্যুতে আমরা সকলেই দুঃখিত হইয়াছি; ভাবিত হইয়াছি; কিন্তু এরূপ আর না হইতে পারে, তাহার জন্য কি করা হইতেছে?—কিছুই না। আমরা পোলিসের উপর সমস্ত রক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত। সে ত ভাল নয়। যাহাতে আসল স্থানে আঘাত পড়ে, তাহার উদ্যোগ করিতে হইবে; বিষম শিক্ষা বিভ্রাট হইতে বালক যুবকে যাহাতে নিষ্কৃতি পায়, তাহা করিতে হইবে। হিন্দুর ছেলেকে হিন্দুয়ানিতে বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। নতুবা এই পাপের কি পরিণাম হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

মাসিক পত্রের সমালোচনায়—অনেক বড় কথা তুলিলাম, এখন একটা হাসির কথা বলি। ভাদ্র মাসের প্রবাসীর একটি প্রবন্ধের পাদটীকায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেন, সুপারি শব্দ—বাঙ্গালা। অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, ঠাকুর মহাশয়কেই জিজ্ঞাসা

করিয়াছেন 'সুপরি' যাবনিক সফর শব্দ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না কি? অবশ্য—শুধু জিজ্ঞাসা করেন নাই—কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহার যথেষ্ট কারণ দর্শাইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু এই জন্য মাঘের প্রবাসীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন—কিন্তু প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিতেছেন—"সুপারি বাঙ্গালা ভাষার একটা আটপহুরিয়া শব্দ, এই যা আমি জানি; তবেই তাহা যে আসিয়াছে কোথা হইতে, তাহা তিনিই বা কিরূপে জানিবেন, আর, আমিই বা কিরূপে জানিব?" উত্তর পড়িয়া হাসি আসিল, সেকালের কবির লড়ায়ের একটা গল্প মনে পড়িল। নিতাই দাস ও নীলু পাটনীতে বাদ হইতেছে—নিতাই আসর লইয়া যশোদা ভাবে গাহিল—

ওরে নীলমণি! কি কথা শুনি!
তোর নাকি নূতন বাপ নূতন মা হয়েছে এদানী? ইত্যাদি

তাহাতে নীলমণি পাটনী পুরাণের কথা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, উত্তর দিল—

আমি জাৎ পাটনী, বাই তরণী,
গোঁদল পাড়ার টেঁকে রই।
ব্রজের সে নীলমণি নই।

যোগেশ বাবু কত পাণ্ডিত্য করিলেন, আমাদের পাটুনী ঠাকুর মহাশয়, সে সকল পাণ্ডিত্যের কাছ দিয়া না গিয়া, বলিলেন—

দেশী কথা সুপারি, এই মাত্র বল্‌তে পারি,
আমি পণ্ডিত টণ্ডিত নই।
বোল্‌পুরের বনে রই॥

কার্ত্তিক অগ্রহায়ণের উপাসনা। অনেক গম্ভীর প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে এবার (অগ্রহায়ণে) 'ভবানী ভাণ্ডার' নামে একটি গল্প আছে। গল্পটি সুপাঠ্য। 'গবালম্ভ ও গবাশন' প্রবন্ধ উপাসনায় স্থান না পাইলেই ভাল ছিল। হিন্দুরা যে সকল জিনিষের নাম করে না, সেই সকল বিষয় লইয়া নাড়া চাড়া, না করাই ভাল।

স্বদেশী। কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ—পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, স্বদেশী নামে শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক হইয়াও—প্রধানত সাহিত্য পত্র বটে। এই তিন মাসে ৩। ৪ টি মাত্র শিল্প, বাণিজ্য ও গোশালার

প্রবন্ধ আছে। ইহা ঠিক নয়। কিন্তু স্বদেশীর এইরূপ এবং অন্যরূপ ত্রুটি দেখিয়া মহাজনবন্ধু (কার্ত্তিকের) "স্বদেশী সাবধান" বলিয়া যে ঝাল ঝাড়িয়াছেন, তাহাও ঠিক নহে। মহাজনবন্ধুর একটা বিষম দোষ দেখিতেছি, মহাজন বন্ধু আপনাকে বাদ দিয়া সকলকেই রাজ-দ্রোহী—বলিতে চাহেন। পূর্ণিমার উপর (বিশেষ আমার উপর) ঐরূপ দোষ আরোপ করেন। অগ্রহায়ণের পূর্ণিমায় চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছি, যে তাঁহার ওরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এখন দেখিতেছি মহাজনবন্ধু স্বদেশীর উপর লাগিয়াছেন। কোথায় কোন লেখিকা একটা পদ্য লিখিতে গিয়া অনর্থক অতিরঞ্জন করিলেন, তাই ধরিয়া সম্পাদককে কি গালি দিতে আছে? মহাজনবন্ধু, এই সংখ্যায় আর একটা বড় গোল করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, একটা কলঙ্কের কথা ইংরাজের নামে বাহির হয় যে "ইংরাজ স্বদেশী বস্ত্র শিল্পের উন্নতি জন্য এদেশী তাঁতিদের আঙুল কাটিয়া দিয়াছিল।" আমরা যতদূর জানি এমন মিথ্যা আরোপ কেহ করে নাই। তাঁতিরা বেগারে তাঁত বোনা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য আপনাদের আঙুল আপনারা কাটিত। এইরূপ একটা কথা ইংরাজীতে অনেক স্থলে থাকিতে পারে; 'দেশের কথায়' প্রথমে বাঙ্গালায় ছাপা হয়। ইংরেজ কোম্পানী ঢাকায়, কাশীমবাজারে, শান্তিপুরে, ধনেখালিতে, শ্রীরামপুরে, বালেশ্বরে, পিপলাইতে কাপড়ের বুনানি, চালানি বিক্রয়ের কারবার করেন। পিপলাই অঞ্চলের তাঁতিরা নাকি সেই সকল কারখানার কার্য্য হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য ঐরূপ উপায় অবলম্বন করে। এ কথার চর্চ্চায় এখন কোন ফল নাই।

মহাজন বন্ধু অগ্রহায়ণ পৌষের, যুক্ত সংখ্যাও আমরা পাইয়াছি।

বামাবোধিনী কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ। রবি বাবুর 'রাজপথ,' ও 'নদীর ঘাট' রচনার অনুকরণে কার্ত্তিক সংখ্যায় "বটবৃক্ষের কাহিনী" প্রকাশিত হইয়াছে। লেখা বেশ। একদিকে যেমন ভক্ত কবি তুলসী দাসের কথা অন্যদিকে তেমনিই জাপানের অভ্যুদয়ের কথা দুই সংখ্যাতেই আছে।

উদ্বোধন। কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ। উদ্বোধন আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গুণে গণনীয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মহৎ নাম উদ্বোধন

কিঞ্চিৎ মাত্র কলঙ্কিত করে নাই; ইহাই উদ্বোধনের প্রধান গৌরব। কার্ত্তিক ও পৌষ সংখ্যার "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত" কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণের "স্বামি-শিষ্য সংবাদ" অগ্রহায়ণ পৌষের 'হামিরপুর যাত্রা' এবং কার্ত্তিকের 'পদব্রজে কাশী যাত্রা' ও "ধর্ম্মের জয়" অগ্রহায়ণের 'ভারতের ঐতিহাসিকতত্ত্ব' ও 'সেবা ধর্ম্ম' প্রভৃতি প্রবন্ধ সকলেরই পক্ষে সুখপাঠ্য, আনন্দদায়ক এবং উপদেশ পূর্ণ। এমন সরল কথায় বর্ণনা—ও সহজ কথায় উপদেশ আজিকার দিনে দুর্লভ পদার্থ।

আশ্বিন ও কার্ত্তিকের যুক্তসংখ্যার পন্থা। পন্থায় উপাসনার মত অনেক গভীর ও গম্ভীর কথা গভীর ও গম্ভীর ভাবে লেখা থাকে, সমস্ত পড়িতে পারি না; পড়িলেও বুঝিতে পারি না। যাঁহারা পারেন—তাঁহারা বুঝাইয়া দিলে ভাল হয়।

ভাল কথা—মাসিক পত্রে অন্য মাসিক পত্রের সমালোচনা প্রায়ই থাকে না কেন? থাকা ভাল। থাকিলে একমাসে কোন উন্নতির সঙ্গত সঙ্কেত পাইলে, পরমাসে উন্নতি করিতে পারেন, অথবা প্রবন্ধ সকল যখন পরে পুস্তকাকারে বাহির হয়, তখনও সঙ্গত সঙ্কেতের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন। আমি বৃদ্ধ, কাজের বাহির হইয়াছি, এই বিষয়ে একলা খাটিব আর তোমরা উৎসাহপূর্ণ, নবীন যুবক, তাহাতে কৃতি, তোমরা —এই বিষয়ে হাত গুটাইয়া অলস ভাবে বসিয়া থাকিবে—সেটা ভাল হইতেছে কি?

সাহিত্যসংহিতা। অগ্রহায়ণ, এই সংখ্যায় শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী একটি অদ্ভুত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। "গৌরাঙ্গের যতিভাব না গোপীভাব।" লেখক বাবাজী দেখিতেছি মধুর রসের উপর খড়্গহস্ত—কিন্তু তিনি যে ভাবে বিচার করিয়াছেন, তাহাতে দাস্য সখ্য কোন রসই তিষ্ঠিতে পারে না। তিনি লিখিয়াছেন, "ভগবানের সহিতও যাহারা পার্থিব সুখ ভোগ করিতে চাহে, তাহারাও যদি ভক্ত হয়, তবে ঐ প্রকার ভক্তির অস্তিত্ব এই মুহূর্ত্তেই জগৎ হইতে উঠিয়া যাউক," যদি কেহ বলে ভগবান্ হইতে আমাদের ভরণ পোষণ হইতেছে তিনি আমাদের পিতা বা মাতা—ইহাতে কি পার্থিব সুখভোগের কথা রহিল না? অবশ্য রহিল—সুতরাং

এমন ভক্ত জাহান্নমে যাউক। যাহারা তাঁহাকে রাজার রাজা বলে, প্রভুর প্রভু বলে—সকলেই—হিন্দু-মুসলমান খ্রীষ্টান—সকল ভক্তই জাহান্নমে যাউক, থাকুক কেবল সরস্বতী সম্প্রদায় অর্থাৎ সকলরূপ ভক্তিই জগৎ হইতে যাউক—থাকুক কেবল Unknown এবং Unknowable ভক্তদিগের সম্প্রদায়——বেশ কথা!!

ধর্ম্মপ্রচারক। কার্ত্তিক মাত্র। বড় পিছাইয়া আছেন। শ্রীঅবনিধর ভট্টাচার্য্যের "সত্যানুসন্ধান," খণ্ডশ বাহির করা যুক্তি সঙ্গত হয় নাই। সত্যানুসন্ধানের সমস্ত ফল একবারে বাহির করা শ্রেয়ঃ ছিল।

পল্লীচিত্রের কার্ত্তিক সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে—এই সবে দ্বিতীয় বর্ষ—এখনই এত আমার মত বুড়ুটে চাল ধরিলে চলিবে কেন? দেখিবেন, আমরা অগ্রহায়ণের পূর্ণিমায় পল্লীচিত্রের বড় প্রশংসা করিয়াছি—আমাদের যেন মুখ রক্ষা হয়।

মুকুল পৌষ। বালক বালিকাদের জন্য অনেক বিষয় লিখিবার আছে। সহজ সহজ বিজ্ঞানের কথা, ছোট ছোট নীতিপূর্ণ গল্প, সরল ছড়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গান, এ সকল থাকা ভাল। ছোট ছোট ম্যাপ দেওয়াও ভাল। মুকুলের জন্য বালক বালিকা উদ্গ্রীব হইয়া থাকিবে, খাবার ফেলিয়া মুকুল পড়িতে দৌড়িবে—তখন মুকুল জন্ম সার্থক হইবে।

বহুদিন পরে, আবার জাহ্নবীর দেখা পাইলাম—কার্ত্তিক সংখ্যা। ইহাতে বিষয়গুলির সূচি নাই কেন—এবং এত পিছাইয়া থাকিলেই বা চলিবে কেন?

কৃষক অগ্রহায়ণ সংখ্যা। কিন্তু ইহাতে পৌষ বা ডিসেম্বর মাসের বাগানের কার্য্য বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেগুলি ফাল্গুনে করিলে চলিবে কি? এরূপ পত্র সময়ে বাহির করিতে না পারিলে চলিবে কেন?

আমরা পূর্ব্বে কমলা সম্বন্ধেও এইরূপ দুঃখের অনুযোগ করিয়াছিলাম—উপস্থিত অক্টোবর সংখ্যার কমলায় আমাদের কথাগুলি "প্রতিকূল" কথা বলিয়া কমলা উদ্ধৃত করিয়াছেন। বাস্তবিক, কিন্তু প্রতিকূল কথা কিছু বলি নাই। সম্পাদক 'নিবেদনে' বলিয়াছেন, আমি যাহা বলিয়াছি—সকলেই তাহা বলেন। কমলার এ সংখ্যাও বেশ ভাল হইয়াছে

অনেক জানিবার ও শিখিবার কথা আছে। আমরা মফস্বলের সঙ্গে চির-সম্পর্কিত। সময়ে সাময়িক পত্র বাহির করার যে কত অন্তরায়, তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি। এই পূর্ণিমার অধ্যক্ষগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও পৌষ সংখ্যা সময়ে বাহির করিতে পারেন নাই। আবার এই মাঘ সংখ্যার অদৃষ্টে বা কি আছে তাহাই বা কেমন করিয়া জানিব। তবে মাঘ মাসের মধ্যে কাপি শেষ করিয়া দিয়া খালাস্।

কদমতলা, চুঁচুড়া। মাঘ সংক্রান্তি। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

ভারতে সাধারণের শিক্ষা।

যে সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশীয় লোক সকল ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন, সেই অতি দূরবর্ত্তী প্রাচীন কালে ভারতবাসীরা সভ্যতা ও সুশিক্ষার উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে এখন আর মতদ্বৈধ নাই। ইহাদিগের শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র, ন্যায় সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্র ও গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসা এবং সঙ্গীতাদি, বিবিধ লৌকিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানপূর্ণ গ্রন্থ সকল, সভ্যতা ও সুশিক্ষার দেদীপ্যমান প্রমাণ স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে।

মন্বাদি সংহিতা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে দ্বিজগণ উপনীত হইয়া ৩৬ বৎসর; ১৮ বৎসর, ৯ বৎসর অথবা যতকালে শিক্ষা সমাপ্ত না হয় ততকাল গুরু গৃহে বাস ও কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া বিবিধ বিদ্যা লাভ করিতেন। ভারতে ধর্ম্ম শিক্ষাই সর্ব্বপ্রধান এবং সকল শিক্ষার শীর্ষস্থানীয় ছিল। গুরু শিষ্যদিগকে মৌখিক উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হইতেন না, যাহাতে সর্ব্বতোভাবে শিষ্যগণ উপদেশ অনুসারে কার্য্য করে তাহা দেখিতেন। গুরু গৃহে শিক্ষালাভ করিবার সময়ে ছাত্রগণ এরূপ আচরণ করিতেন যাহাতে তাঁহাদের শরীর দৃঢ় ও কষ্টসহিষ্ণু হয়, বুদ্ধি মার্জ্জিত ও সূক্ষ্ম হয় এবং জিতেন্দ্রিয়তা, বশ্যতা ও সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত হয়। পূর্ব্বকালে দ্বিজগণ কিরূপ সত্যপরায়ণ ছিলেন তাহার নিদর্শন স্বরূপ অনেক সময়ে এখনও দেখা যায় প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কথোপকথন উপলক্ষে অনবধানক্রমে এক কথা বলিতে গিয়া আর এক কথা বলিয়া ফেলিলে তাহা সংশোধন করিবার পূর্ব্বে বিষ্ণু স্মরণ করেন; যেন ঐ মিথ্যার আভাস মাত্রে যে প্রত্যবায় হইয়াছে তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। এক্ষণে উক্তবিধ আচরণ কেবল অভ্যাস মাত্র বলিয়া বোধ হয় সত্য কিন্তু উহা মূলতঃ সত্যানুরাগ হইতে হইয়াছে সন্দেহ নাই। এখনও ঐ শ্রেণীর লোকের মধ্যে সদাচার ও ধর্ম্মাচরণে আগ্রহ

অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় তাঁহাদিগের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতেছে।

প্রাচীন ভারতে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা কি প্রকার শিক্ষা লাভ করিতেন তাহার বর্ণনে বিরত হইয়া সাধারণের শিক্ষা বিষয়ে কোন উপায় ছিল কি না তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

অধুনাতন অনেক শিক্ষিত লোকের এই বিশ্বাস যে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা আপনাদিগের আধিপত্য স্থায়ী করিবার মানসে নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে একেবারেই শিক্ষা দিতেন না। এ বিষয়ে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দোষারোপই অধিক শুনা যায়। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যোগ্য আচার্য্যের অভাব হইলে ক্ষত্রিয়াদির নিকট অধ্যয়নেরও ব্যবস্থা ছিল। অধ্যাত্মবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য কোন কোন ঋষিও রাজর্ষি জনকের শরণাপন্ন হইয়াছেন এরূপ কথা শুনা যায়। সে দুই একস্থল মাত্র; প্রধানতঃ ব্রাহ্মণগণই উপদেষ্টা ছিলেন কিন্তু তাঁহারা স্বার্থপর বা প্রভুত্বপ্রিয় ছিলেন বলিয়া কিছুতেই বোধ হয় না। আমার মত ব্রাহ্মণাধমের প্রতি যে কোন দোষারোপ করিতে ইচ্ছা হয় করুন, কিন্তু ভ্রম প্রমাদ বর্জ্জিত, সর্ব্বজ্ঞকল্প ধর্ম্মমাত্রসর্ব্বস্ব ঋষিগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাধান্য লাভের জন্য স্ত্রীশূদ্রাদিকে শিক্ষালাভে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা কিছুতেই মনে হয় না। যে শ্রেণীর লোক যে প্রকার উপদেশ গ্রহণে সমর্থ তাহা বুঝিয়া তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীকে ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ দিতেন। অনধিকারীকে উপদেশ দিলে কোনই ফল হয় না। যাহারা যোগ বিয়োগ শিখিবার যোগ্য তাহাদিগকে জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপদেশ দেওয়া কি পণ্ডশ্রম নহে?

প্রাচীন ভারতে গ্রামাধ্যক্ষ, দশগ্রামাধ্যক্ষ, শতগ্রামাধ্যক্ষ প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে যেমন শান্তি রক্ষা ও বাদ বিবাদের মীমাংসা হইত, তেমনই সাধারণের শিক্ষাও হইত; এই জন্য রাজা দিলীপের গুণ বর্ণন প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন;—

"প্রজানাংবিনয়াধানাৎ রক্ষণাৎ ভরণাদপি।
সপিতা পিতর স্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ॥"

অর্থাৎ প্রজাদিগের শিক্ষাদান, দস্যু তস্করাদি হইতে রক্ষা এবং অন্ন পানাদি দ্বারা পোষণ করিয়া রাজা দিলীপই তাহাদিগের প্রকৃত পিতা ছিলেন, তাহাদের আপন আপন পিতা কেবল জন্মের হেতু মাত্র। পূর্ব্বকালে সাধারণের মধ্যে সামান্য এক প্রকার শিক্ষা প্রচলিত ছিল, তাহার শেষ নিদর্শন স্বরূপ গ্রামে গ্রামে পাঠশালা ও প্রতি গণ্ডগ্রামে চতুষ্পাঠী ছিল এবং এখনও অনেক আছে। সে সকল গ্রাম্য লোক ও দেশীয় ধনী লোকের সাহায্যে নির্ব্বাহিত হইত। পরন্তু এখনকার মত লেখা পড়া ও অঙ্ক কষা হইলেই সাধারণের শিক্ষা সাঙ্গ হইল এমন মনে করিতেন না। প্রজাগণ শান্ত শিষ্ট ও ধার্ম্মিক হইলেই প্রকৃত শিক্ষা হইল এই প্রকার মনে করিতেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নও করিতেন। সর্ব্বসাধারণকে বিনীত ও ঈশ্বরনিষ্ঠ করিবার জন্য ঋষিগণ পুরাণ সকল প্রণয়ন করিয়াছেন। উহা শ্রবণে সকলেরই অধিকার ছিল। ঐ সকল পুরাণে অবতার কথা, মহানুভব ভক্তদিগের চরিত্র, সর্ব্বগুণান্বিত রাজাদিগের ইতিবৃত্ত ইত্যাদি নানা উপলক্ষে নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, সমাজ পদ্ধতি, সদাচার প্রণালী প্রভৃতি বিষয় অতি সরল ও সুখবোধ্য রূপে বর্ণিত আছে। ঋষিগণের রচিত ইতিহাস ও পুরাণে উচ্চ ও নীচ, অজ্ঞ ও বিজ্ঞ সকলের জ্ঞাতব্য অতি উপাদেয় বহুবিধ বিষয় সন্নিবেশিত আছে। এইজন্য ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলিয়া উপনিষদে উল্লেখ করা হইয়াছে।

পূর্ব্বকালে পুরাণ বক্তা বেদিতে বসিয়া পুরাণ বা ইতিহাসের ব্যাখ্যা করিতেন। শত শত লোক তাহা শ্রবণ করিতেন। ইতিহাস ও পুরাণোক্ত মহানুভবদিগের আখ্যান শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ যে উপদেশ পাইতেন তাহা প্রস্তরাঙ্কিত রেখার ন্যায় তাঁহাদের হৃদয়ে চিরকাল অঙ্কিত থাকিত। উক্ত আখ্যান গুলিতে যে কত নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে তাহার দুই একটীর আলোচনা করিবার চেষ্টা সময়ান্তরে করিব ইচ্ছা আছে।

কালক্রমে পুরাণ ব্যাখ্যা প্রণালী রূপান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান সময়ে কথকতায় পরিণত হইয়াছে। ৫০। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে ধনবান লোকের বাটীতে পুরাণ কথা হইত, পূর্ব্বাহ্নে পাঠক মহাশয় মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত কি অন্য পুরাণের পারায়ণ করিতেন, দুই একজন পণ্ডিত

ধারক ও দুই একজন ব্রাহ্মণ শ্রোতারূপে বৃত হইতেন। গৃহস্বামী ও গ্রামবাসীরা ভক্তিপূর্ব্বক ঐ পারায়ণ শ্রবণ করিতেন। অপরাহ্নে কথক মহাশয় উচ্চ বেদিতে বসিয়া ইতিহাস বা পুরাণোক্ত উপাখ্যান সকল সরস ও সুললিতরূপে বর্ণন করিতেন, মধ্যে মধ্যে তাল লয় বিশুদ্ধ দুই একটী হরিগুণ গানও গাইতেন। শত শত স্ত্রী পুরুষ আপামর সাধারণ চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া ঐ কথা শুনিত এবং সন্ধ্যাকালে স্ব স্ব গৃহে গিয়া কথক মহাশয়ের কথা ও সঙ্গীতের সমালোচনা করিত। এখনও ঐরূপ পারায়ণ ও কথা হয় কিন্তু ক্রমে কিছু বিরল হইয়া আসিতেছে। কারণ দেশ মধ্যে ধনীলোকের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে এবং ধর্ম্মার্থ অর্থ ব্যয় করার প্রবৃত্তিও কিছু কমিতেছে। কথক মহাশয়দের মধ্যে কাহার কাহার আচরণ দোষেও অনেক ধনবান্ লোক ঐরূপ কার্য্যে বিরত হইয়াছেন।

এখন তাদৃশ পুরাণ কথা শ্রবণের সুযোগ কিছু বিরল হইলেও উক্ত প্রকার সরল ও সরস উপায়ে সাধারণের ধর্ম্মশিক্ষা ও নীতি শিক্ষা দেশ মধ্যে চলিতেছে। সময়ে সময়ে কৃত্তিবাসের রামায়ণ বা কাশীরামদাসের মহাভারত গ্রামের মধ্যে একজন উচ্চস্বরে পাঠ করেন, অনেকে তাহা শ্রবণ করেন, তদ্দ্বারা সাধারণের শিক্ষা লাভের যথেষ্ট সাহায্য হয়। পশ্চিমাঞ্চলে কাশীদাসের মহাভারতের ন্যায় কোন পুস্তক হিন্দি ভাষায় নাই, তুলসীদাস রচিত অমৃতোপম রামায়ণ শ্রবণ করায় সেই প্রদেশের লোকের প্রচুর শিক্ষা লাভ হয়। উৎকল প্রদেশে অনেক পুরাণোক্ত উপাখ্যান সকল দেশীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। কলিকাতায় উড়ে বেহারাও অবসর ক্রমে তাহা উচ্চস্বরে পাঠ করে, ও অনেকে বসিয়া শ্রবণ করে।

পূর্ব্বোক্ত উপায়ে সাধারণের শিক্ষা কিরূপ ফলবতী হইয়াছে তাহা "ফলেন পরিচীয়তে"। ভারতের এই অধঃপতিত অবস্থাতেও অত্রত্য নিম্ন শ্রেণীর লোকের সহিত অন্যান্য দেশীয় তাদৃশ অবস্থাপন্ন লোকের তুলনা করিলে স্পষ্ট দেখা যায় ভারতীয় নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা অপেক্ষাকৃত অধিক শিষ্ট, শান্ত, বিনীত, মিতাচারী এবং ধর্ম্মানুরাগী। অনেক বৈদেশিক ভ্রমণকারীরা ইহাদের বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছেন।

এদেশের সামান্য কৃষক বা শ্রমজীবীর সহিত কিছুকাল আলাপ করিলে বোধ হয় যেন তাহারা এক প্রকার নিরক্ষর দার্শনিক। জীবনের সকল ঘটনাই কার্য্যকারণভাবে নিজের কর্ম্মের ফল তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, পরমেশ্বর বিনা কারণে সমস্ত শুভাশুভ বা সুখ দুঃখ ঘটাইতেছেন এমন কদাচ মনে করে না। পূর্ব্বজন্মে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল স্বরূপ জীবের মঙ্গল বা অমঙ্গল ঘটিতেছে এপ্রকার দৃঢ় বিশ্বাস থাকায় মনে অসন্তোষ কিংবা আত্মাবমাননার জন্য কষ্ট হয় না। এই সকল কারণে এ দেশের ইতর লোক সকল দারুণ দুঃখ, দরিদ্রতা ও দুর্ভিক্ষাদি ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করে, কোন প্রকার উপদ্রব ঘটায় না।

ক্রমে দেশের অবস্থা একটু একটু পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। আর গ্রামের কোন বৃদ্ধ বা গ্রাম্য পাঠশালার সরকার মহাশয় অপরাহ্নে বাঙ্গালা রামায়ণ কিংবা মহাভারত পড়িতেছেন এবং অনেকে বসিয়া তাহা শুনিতেছে এরূপ প্রায় দেখা যায় না। পূর্ব্বের মত এখন মুদিখানার দোকানদার পিতৃ পিতামহের কীট দষ্ট পুরাতন কাশীদাসের বা কৃত্তিবাসের পুঁথী অবসর কালে পড়ে না, তৎপরিবর্ত্তে হয়ত দুই এক পয়সা দিয়া একখানি সংবাদ পত্র কিনিয়া তাহা পড়ে এবং স্বকীয় বুদ্ধি অনুসারেই তাহারই সমালোচনা করে। জানি না এ অবস্থা কত দূর শুভকর হইতেছে। দেশের ঘটনা সকল জানা মন্দ নহে, কিন্তু সময়ে সময়ে সংবাদ পত্রপাঠে যেরূপ চিত্ত চাঞ্চল্য হয়, তাহাতে কখন কখন মনে হয় ঐ সকল বিষয়ে অজ্ঞ থাকাই সুখের বিষয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে সংবাদ পত্রের প্রচার দেশ মধ্যে বাড়িবেই এবং লোকে তাহা অবশ্যই পড়িবে। তাহাতে কোন আপত্তি নাই। তবে সাধারণের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত পুরাতন পুঁথাগুলির আলোচনা যেন লোপ না পায়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক।

প্রসঙ্গ ক্রমে অধুনাতন শিক্ষা পদ্ধতির বিষয় কিছু আলোচনা করিয়া প্রস্তাবটী শেষ করিব। এক্ষণে রাজকীয় অর্থ সাহায্যে অনেক পাঠশালায় লেখা পড়া ও অঙ্ককষা শিখান হইতেছে। ঐরূপ পাঠশালায় প্রজাগণ বিনা ব্যয়ে শিক্ষা পাইবে এরূপ আশাও পাওয়া যাইতেছে, তাহা ভালই। রাজপ্রতিষ্ঠিত ও রাজকীয় অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় লোকের কর্ত্তাধীনত্ব

অনেক বিদ্যালয়ে ইংরাজী সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও দর্শনাদির অধ্যাপনা হইতেছে, তাহা দেশ কাল পাত্রানুসারে আবশ্যক। ঐ শিক্ষা আরও কার্য্যোপযোগী হইলে উত্তম হয়। অধুনাতন বিদ্যালয় সমূহে প্রাচীন ভারতের সার সর্ব্বস্ব ধর্ম্মের শিক্ষা দেওয়ার কোন উপায় নাই। সে শিক্ষার সুবিধাও নাই। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নানা ধর্ম্মাবলম্বী। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান, বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্ম প্রভৃতি নানা ধর্ম্মাবলম্বী লোক অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীর ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য পৃথক্ বন্দোবস্ত হইতে পারে না। তাহা করিতে হইলে অর্থ ব্যয় অধিক আবশ্যক।

থিয়োসফিষ্টদিগের প্রতিষ্ঠিত কাশীধামস্থ সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজে যে প্রকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহা মন্দ নহে। একজন থিয়োসফিষ্টের মুখে যেরূপ শুনিয়াছি তাহা প্রশংসার যোগ্য। শিক্ষার্থীদিগের মধ্যে যাহারা ছাত্রাবাসে থাকেন, তাঁহাদিগের সন্ধ্যাবন্দনাদির জন্য একটি পৃথক গৃহ আছে। তাঁহারা নিয়মিত সময়ে যথোচিতরূপে সন্ধ্যা পূজা করেন। মৌখিক ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি হইতে সংগ্রহ করিয়া উত্তম পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে। তাহার একখানি পুস্তক আমি পড়িয়াছি। সে পুস্তকখানি উত্তম হইয়াছে। মৌখিক উপদেশ এবং তদনুরূপ অনুষ্ঠান উভয়ই হইয়া থাকে। দৈনিক অধ্যয়ন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ছাত্রগণ দণ্ডায়মান হইয়া সমস্বরে শ্রীভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ের অর্জ্জুন কৃত স্তবটী পাঠ করেন, এবং যত দূর সাধ্য অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ ধর্ম্ম শিক্ষা বিষয়ে যত্ন করিয়া থাকেন।

যেখানে নানা ধর্ম্মাবলম্বী ছাত্র অধ্যয়ন করেন সেখানে ঐ প্রকার ব্যবস্থা করা সহজ নহে। এজন্য আপাততঃ বিদ্যালয় সমূহে যে প্রকার ঐহিক বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহাতেই আমাদের সন্তুষ্ট হইতে হইবে। ধর্ম্ম শিক্ষার ভার পিতা মাতা ও অভিভাবকদিগেরই লইতে হইবে। তাঁহারা নিজে সদাচার ও সন্ধ্যাবন্দনাদির অনুষ্ঠান করিবেন এবং শিশুকাল হইতে সন্তানদিগকে সেই বিষয়ে উপদেশ দিয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিতে শিখাইবেন। প্রথমতঃ পিতা মাতা বা অভিভাবকদিগের আদেশক্রমে

ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছাপূর্ব্বক নিত্য নিয়মিতরূপে কিছুকাল ধর্ম্মাচরণ ও ঈশ্বর চিন্তা করিলে তাহা অভ্যস্ত হইয়া যাইবে। শেষে ঐ প্রকার আচরণ দীর্ঘকাল অভ্যাস বশতঃ অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যরূপে পরিণত হইবে। ধর্ম্মাচরণ ও ঈশ্বর চিন্তা নিয়মিতরূপে করিতে করিতে চিত্তপ্রসাদজনিত যে * সাত্ত্বিক সুখ অনুভূত হয়, তাহার জন্য দিন দিন আকাঙ্খা বৃদ্ধি পায়। বয়ঃ পরিণামে যখন শরীর দুর্ব্বল এবং ইন্দ্রিয়গণ অপটু হয় তখন মনুষ্য ভোগ্য বস্তুর উপভোগ জনিত † রাজসিক সুখ ভোগে অসমর্থ হইয়া নির্ম্মল সাত্ত্বিক সুখের জন্য ব্যাকুল হয়। যাঁহারা শুভাদৃষ্টক্রমে যৌবনে জ্ঞান চর্চ্চা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা নির্ম্মল সাত্ত্বিক সুখাস্বাদে অভ্যস্ত তাঁহারাই পরমানন্দে বৃদ্ধকাল কাটাইতে পারেন। যাঁহারা যৌবনকালে কেবল রাজসিক সুখাস্বাদেই অভ্যস্ত, তাঁহারা বৃদ্ধ বয়সে বিকলেন্দ্রিয় হইয়া তাদৃশ সুখভোগে অসমর্থ হন, অথচ সাত্ত্বিক সুখের উপায় স্বরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানে অনভ্যাস বশতঃ শোচনীয় অবস্থায় কালাতিপাত করিতে বাধ্য হন।

---

* শ্রীভগবদ্গীতায় ত্রিবিধ সুখের এইরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন ;—

"সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তং চ, নিগচ্ছতি॥
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্ম বুদ্ধি প্রসাদজম্॥"

হে ভরত শ্রেষ্ঠ ত্রিবিধ সুখ শ্রবণ কর। যে সুখে অভ্যাস বশতঃ পরমানন্দ লাভ হয় এবং দুঃখের অন্ত পাওয়া যায় সেই অনির্ব্বচনীয় প্রথমে বিষবৎ কিন্তু শেষে অমৃত তুল্য আত্মা ও বুদ্ধির প্রসাদ জনিত সুখ সাত্ত্বিক বলিয়া অভিহিত হয়।

† "বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥"

বিষয় অর্থাৎ ভোগ্য বস্তু ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে প্রথমে অমৃত তুল্য, পরিণামে বিষতুল্য যে সুখ তাহা রাজস নামে অভিহিত হয়। এখানে তামস সুখের লক্ষণ অনাবশ্যক।

কখন কোন হিন্দু গৃহস্থ আপন শান্ত ও সুবোধ সন্তানকে ধর্ম্মানুষ্ঠান-রত করিতে গিয়া বিফল প্রয়াস হইতে পারেন, তাহাতে হতাশ হওয়া উচিত নহে, নিয়ত চেষ্টা করিতে করিতে কৃতকার্য্য হইবেন। Spirit of the age কালধর্ম্ম নিতান্ত প্রতিকূল হওয়ায় প্রথমতঃ চেষ্টা ফলবতী না হইতে পারে। যে সকল বালক বা যুবক পিতা মাতা কিংবা অভিভাবক-দিগের উপদেশ ও আদেশে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে, তাহাদিগেরও বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। চতুর্দিকে বিকৃত আচার ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেখিতেছে, সহচর, অনুচর ও প্রতিবাসীরা সকলেই সদাচার ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত, এজন্য কেবল অভিভাবকের উপদেশ ও সদ্দৃষ্টান্ত কার্য্যকর হয় না। কালধর্ম্ম ক্রমে অনুকূল হইবার উপক্রম হইয়াছে। ৪০। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে স্কুল কালেজের ছাত্রকে সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে দেখিলে সহচরগণ উপহাস করিত, এখন কেহ কেহ প্রশংসা করে। অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে পিতা মাতা সন্তানদিগকে ধর্ম্মশীল করিবার জন্য দৃঢ়তর যত্ন করুন। ফল শ্রীভগবানের হস্তে "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মাফলেষু কদাচন।"

শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দরিদ্রের দান।

নবীন বসন্ত, দীনা প্রকৃতির দ্বারে,
যাচিল 'অতিথি' বলি' সাদর সৎকার;
অতিথি নিরখি' সতী, কোন উপহারে,
কেমনে বা তোষে তারে,—ভেবে হ'ল সার!
মিনতি-মধুর-কণ্ঠে কহিল দুখিনী,—
"দীনা আমি, কিবা আছে করিব সৎকার?
আছে শুধু জীর্ণপত্র, করিব অর্পণ,
দয়া করি' শ্রীচরণে ধর উপহার!"—
সযতনে নিল মধু; অতিথি-আশীষে
মুঞ্জরে নীরস-অঙ্গে পেলব-পল্লব;—
আতপ নাশিতে যেন প্রকৃতির শিরে
ধরিল কে শ্যাম ছত্র কান্ত-অভিনব!
নিরখি' নিসর্গ-শোভা ভাবে বিশ্বজন,—
দরিদ্রের দান নহে বিফল কখন!

কবিকঙ্কণের কাব্য চণ্ডীমঙ্গল।

[৩]

মুকুন্দরামের আরও একটী অপূর্ব্ব গুণ আছে; তিনি প্রকৃতির শ্যামল ও ফলপুষ্পময় অঙ্গে, এবং ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গেরও অঙ্গে মনুষ্য সমাজের ছায়া দেখিতে পান। প্রকৃতির অঙ্গ-প্রভা তিনি তাঁহার উজ্জ্বল-মহিমাময়ী লেখনীর সাহায্যে সজীব ও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; সরল ভাষায় এরূপ সুন্দর ভাব প্রকাশ করিতে অন্য কোন কবিই, বোধ হয়, পারেন না। তিনি বলিতেছেন;—

"এক ফুলে মকরন্দ পান করি সানন্দ,
ধায় অলি অপর কুসুমে।
যেন, এক ঘরে পেয়ে মান, গ্রামযাজী দ্বিজ যান
অন্য ঘরে চলেন সম্ভ্রমে॥"

মনুষ্য সমাজের ছায়া কবির হৃদয়পটে এরূপ উজ্জ্বল ও স্পষ্টরূপে অঙ্কিত ছিল, যে জলে, স্থলে, প্রকৃতি-অঙ্গে ও এমন কি কীট পতঙ্গ প্রভৃতির অঙ্গেও তিনি সেই সমাজের ছায়া প্রতিফলিত দেখিতে পান।

আর এক কথা; তখনকার সমাজে যে সকল ব্রাহ্মণ নিত্য গৃহে গৃহে পূজা করিয়া বেড়াইতেন, তাঁহাদের সমাজে একটু হীন হইয়া থাকিতে হইত; এবং তাঁহাদের, সকলেই একটু অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত। তাহার দৃষ্টান্ত আমরা কবির কাব্যে দেখিতে পাই। যখনই একটু সুবিধা পাইয়াছেন, তখনই মুকুন্দরাম ঐরূপ ব্রাহ্মণকে বিদ্রূপ করিয়াছেন; যেমন;—

"মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে, নগরে যাজন করে,
শিখয়ে পূজার অধিষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে, দেব পূজে ঘরে ঘরে,
চাউলের বোচকা বান্ধে টান॥
ময়রা ঘরে পায় খণ্ড,* গোপ ঘরে দধি ভাণ্ড,
তেলি ঘরে তৈল কুপী ভরি।

* খণ্ড গুড়।

কোথাও মাসরা কড়ি, কেহ দেয় ডালি বড়ি,
গ্রামযাজী আনন্দে সাঁতরি॥"

ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে তখন গ্রামযাজীকে একটু হীন হইয়া থাকিতে হইত। থাকিবারই কথা—মনু ইহাদিগকে অপাংক্তেয় করিয়াছেন।

যখন কবি কোন বিষয় বর্ণনা করিতে থাকেন, তৎকালে বর্ণনা করিতে করিতে যখন ভাবের প্রগাঢ়তা কবির মন আকৃষ্ট করে, এবং যখন কবি সেই ভাবুকতায় আপনহারা হইয়া পড়েন, তখনই সরসতা বাহির হয়। তখন আর ছন্দ দেখিতে হয় না; ভাব দেখিতে হয় না। তখন তাঁহার লেখা দেখিয়া মনে হয়, যেন তিনি দেখিতেছেন, আর লিপিবদ্ধ করিতেছেন। ধনপতি পিতৃশ্রাদ্ধে চাঁদ বণিককে প্রথমে মাল্যচন্দন দেওয়াতে নিমন্ত্রিত সকল বণিকই ক্রুদ্ধ হইলেন; তখন, কঙ্কণের যে লেখা, তাহা দেখিয়া মনে হয়, তিনি সে স্থানে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সব দেখিতে দেখিতে লিখিয়াছেন;—

"এমন সময়ে শঙ্খদত্ত কিছু বলে॥
বণিক সভায় আমি আগে পাই মান।
ধূসদত্ত জানে হরিশ্চন্দ্র বিদ্যমান॥
যে কালে বাপের কর্ম্ম কৈল ধূসদত্ত।
তাহার সভায় বেণে আইল ষোল শত॥
ষোল শত মধ্যে শঙ্খদত্ত পাইল মান।
সম্পদে মাতিয়া নাহি কর অবধান॥
ইহা শুনি ধনপতি দিলেন উত্তর।
সে কালে না ছিল কিবা চান্দ সদাগর॥
ধনে জনে রূপে শীলে চান্দ নহে বাঁকা।
বাহির মহলে যার সাত মড়াই টাকা॥
ইহা শুনি কিছু বলে নীলাম্বর দাস।
ধন হইতে হয় কিবা কুলের প্রকাশ॥
ছয় বধূ যার ঘরে নিবসয়ে রাঁড়।

ধন হৈতে সভামাঝে চান্দ হৈল ষাঁড়॥
চান্দ বলে জানি তোরে নীলাম্বর দাস।
তোমার বাপের কিছু জানি ইতিহাস॥
হাটে বাটে তোর বাপ বেচিত আঙলা। *
যতন করিয়া তাহা কিনিত অবলা॥
অনুক্ষণ হাথে হাথে বারবধূ সনে।
নাহি স্নান করি বেটা বসিত ভোজনে॥
কড়ির পুটলী সে বান্ধিত তিন ঠাঁই।
সভামাঝে কহ কথা কিছু মনে নাই॥
নীলাম্বর দাস বলে শুন রাম রায়।
পসরা করিত বাপা নাহি প্রত্যবায়॥
এঁটো চোপা খাইলে নাহি কুলের খাঁখার॥
নীলাম্বর দাস রাম রায়ের শ্বশুর।
ধনপতি গঞ্জি কিছু বলয়ে প্রচুর॥
জাতি বাদ নাহি ভাই যদি হয় রঙ্ক †
বনে জায়া ছেলি রাখে তবে সে কলঙ্ক॥"

এরূপ সামাজিক কলহ প্রায়ই তখনকার কালে হইত। এরূপ স্বাধীন বাক্‌বিতণ্ডা ও কলহ অন্য কোন কবির কাব্যে পড়িয়াছি বলিয়া বোধ হয় না।

ঘুমপাড়ানিয়া গান।

খুল্লনা শিশুপুত্র শ্রীমন্তকে ঘুম পাড়াইতেছেন;—

"আয় আয়রে বাছা আয়।
কি লাগিয়া কান্দ বাছা, কি ধন চায়॥
তুলিয়া আনিব গগন ফুল।
একেক ফুলের লক্ষেক মূল॥
সে ফুলে গাঁথিয়া দিব যে হার।
প্রাণের বাছা মোর না কান্দ আর॥

* আঙলা—আমলা। † রঙ্ক—দরিদ্র।

রথ গজ ঘোড়া যৌতুক দিয়া।
দুই রাজকন্যার করাব বিয়া॥
শ্রীমন্ত চাপে মোর সোণার নায়।
কুঙ্কুম কস্তূরী মাখাব গায়॥
খাটে নিদ্রা যাবে চামরের বায়।
অম্বিকা মঙ্গল মুকুন্দে গায়॥"

কবি এক ঘুমপাড়ানিয়া গানে শ্রীমন্তের ভবিষ্যতের সকল কথা বলিলেন। ইহাতে কাব্যের অতিশয় সৌন্দর্য্য বাড়িয়াছে। শ্রীমন্তের দুই রাজকন্যার সহিত বিবাহ, সমুদ্র যাত্রা প্রভৃতি সকল কথাই বলা হইল।

মুকুন্দরামের পরবর্ত্তী প্রত্যেক কবিরই কাব্যে আমরা তাঁহার ভাবের, ছন্দের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। ভারতচন্দ্র যে কবিকঙ্কণের নিকট কতদূর ঋণী তাহা বলা যায় না। কবিকঙ্কণের ছন্দকে আরও একটু মাজিয়া ঘসিয়া ভারতচন্দ্র স্বীয় কাব্যখানি পূর্ণ করিয়াছেন; সকল গুলিই যে ভারত কবিকঙ্কণ হইতে লইয়াছেন, তাহা আমরা বলিতে চাহিনা; তাঁহার নিজেরও অনেক আছে। কিন্তু মুকুন্দরামের গভীর ভাবের ভিতর হইতে সারটুকু লইয়া, তিনি তাহার উজ্জ্বল চিত্র দেখাইতে পারেন নাই। মদন ভস্মে কবিকঙ্কণের রতি কাঁদিতেছেন;—

"মোর পরমায়ু লয়্যা, চিরকাল থাক জীয়্যা,
আমি মরি তোমার বদলে।
যে গতি পাইবে তুমি, সে গতি ইচ্ছিলুঁ আমি,
রহিব তোমার পদতলে॥"

আর ভারতের রতির খেদ;—

"পতিশোকে রতি কাঁদে, বিনাইয়া নানা ছাঁদে,
ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।
ওরে নিদারুণ প্রাণ, কোন্ পথে পতি যান,
আগে যারে পথ দেখাইয়া।
চরণ রাজীব রাজে মনঃশীলা পাছে বাজে,
হৃদে ধরি লহরে বাহিয়া॥"

কঙ্কণের সরল সাধ্বীর করুণ ক্রন্দনে আমরা গভীর শোকের তীব্রতা বেশী অনুভব করি, না ভারতের উচ্ছ্বলিত কলাপূর্ণ পদ বিন্যাসে অধিক অনুভব করি? কবিকঙ্কণ সরল কথায় প্রাণের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, আর ভারত, শব্দ বিন্যাসে মন দিয়া যেন ততটা কাঁদাইতে পারেন নাই।

"ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে দেখিতে পাই, অনেক স্থলে ভারত রচিত গানের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা। পুরবর্ণনা করিতে ভারতচন্দ্র লিখিতেছেন;—

"ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে॥"

বিদ্যার সুন্দর দর্শন;—

"দেখিব সে শ্যামরায় বিকাইব রাঙ্গা পায়,
ভারত ভাবিয়া তায় ভাবে ঢল ঢল॥"

বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকারম্ভ;—

"রাধাকৃষ্ণে রাস হাস পরিহাস,
ভারত উল্লাস অন্তরে॥"

সমস্ত বিদ্যাসুন্দরেই এইরূপ। আমরা বুঝিতে পারি যে নায়কের রূপ বর্ণনা পরিপোষণ জন্য ভারতচন্দ্র নায়কের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের অবতারণ ও আরোপণ করিয়াছেন। আমরা জানি কবিকঙ্কণ ভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী; তাঁহার শ্রীমন্তের ভাগবত খেলায় ভারতের অনুসারিত এই প্রথার মূল দেখিতে পাই।" *

আবার কবিকঙ্কণের ছন্দ হইতেই ভারতের ছন্দ; কেবল একটু মার্জ্জিত ও সংস্কৃত।

কঙ্কণের, "দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান,"
কিছু পরিবর্ত্তিত ও মার্জ্জিত হইয়া হইয়াছে, ভারতের,—
"শুন শ্বশুর ঠাকুর শুন শ্বশুর ঠাকুর"।

মুকুন্দ কবির ছন্দ নির্ব্বাচন ও মন্দ নহে; যুদ্ধ বর্ণনায় কবি লিখিতেছেন;

* শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় কয়েকজন ছাত্রকে 'কবিকঙ্কণ' পড়াইবার সময় যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা হইতে গৃহীত।

"বীরবর লম্ফে বসুধা কম্পে,
অষ্ট কুলাচল ফিরে।
ছিণ্ডিল শুণ্ড ভাঙ্গিল মুণ্ড,
কাঙ্করি যেন খান খান॥"

প্রভৃতি ছন্দ নাচাইয়া পড়িতে পারিলে গাম্ভীর্য্যের চূড়ান্ত হয়।

কবিকঙ্কণ অতি অন্তজ্জাতি ব্যাধকে স্বীয় কাব্যের নায়ক করিয়াছেন বলিয়া দীনেশ বাবু তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর চিত্রকরের আসন দিতে যেন একটু কুণ্ঠিত। তিনি লিখিতেছেন;—"কবিকঙ্কণ প্রথম শ্রেণীর কবি, কিন্তু তিনি যে সমাজের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর।"* অর্থাৎ তিনি সর্ব্বাংশে প্রথম শ্রেণীর চিত্রকর নহেন। তাঁহার এই সিদ্ধান্তের মীমাংসায়, বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সমালোচক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বলেন;—"তখনকার কবিরা সমাজের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত দৃষ্টি প্রসারণ করিতে পারিতেন; তাঁহারা সমাজের 'চূড়া গম্বুজ' লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন না। সমাজের পত্তনের আশে পাশে কিরূপ উচ্চ, নীচ, বন্ধুর ভূমি ছিল, তাহা তাঁহারা নিজে দেখিতেন এবং অপরকেও দেখান কর্ত্তব্য মনে করিতেন। এই গেল ব্যাধ সম্বন্ধে সাধারণ কথা। ব্যাধ সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে, সাধারণ সামাজিক মনুষ্যকে গৃহস্থালী ধর্ম্ম শিখাইবার জন্য—[গৃহস্থালী ধর্ম্মের মধ্যে কেনা বেচার যে ধর্ম্ম, কেবল তাহাই নহে, গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া যে ধর্ম্ম পালন করিতে হয়, সেই ধর্ম্ম]—মহাভারতের বনপর্ব্বে যে বৃহৎ উপাখ্যানের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার নাম "ধর্ম্ম ব্যাধের কথা।" ধর্ম্মব্যাধ একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যাধ। সে আপনার জাতিধর্ম্মের দ্বারা অর্থাৎ পশু পক্ষী মারিয়া, মাংস বিক্রয় করিয়া, জীবিকা নির্ব্বাহ করে। অথচ বড় বড় ঋষিমুণিগণ ধর্ম্মশিক্ষার জন্য তাহার কাছে ব্রাহ্মণসন্তানগণকে প্রেরণ করেন। বেদব্যাসের এই কাণ্ড দেখিলে, কবিকঙ্কণ ব্যাধ কালকেতুকে কেন নায়ক করিলেন তাহা কতক কতক বুঝিতে পারা যায়। হিন্দুশাস্ত্রের আসল কথা, জাতির উপর ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ভর করে না। অতি অন্ত্যজ্জাতিও ধর্ম্মশীল হইতে পারে।"

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য; পৃঃ ৪০৩।

আরও এক কথা। 'মনসার ভাসান' 'কবিকঙ্কণের চণ্ডী,' প্রভৃতি প্রাচীন কাব্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি, যে তৎকালে গন্ধবণিকজাতি সমাজের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী, মানী এবং বাণিজ্য প্রবীণ ছিল। মেদিনীপুর হইতে বর্দ্ধমান জেলা পর্য্যন্ত সমগ্র পশ্চিম বাঙ্গালা ইহাদের বাসভূমি ছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে সমাজের সর্ব্বপ্রধান জাতিকে কবিকঙ্কণ আপনার কাব্যের নায়ক করিয়াছেন; যেমন ধনপতি। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি সমাজের নিম্নতম স্তরের লোকদিগকেও ভুলেন নাই। অতি হীন, অপদার্থ, ব্যাধকেও তিনি নায়ক করিলেন।

"দীনেশবাবু বলেন;—'কবিকঙ্কণের বর্ণিত ঘটনার একটা মূল কেন্দ্র নাই।'* তিনি যে কেন এরূপ বলিলেন ঠিক বুঝা যায় না। চণ্ডীমঙ্গল, চণ্ডীর বা ভগবতীর মর্ত্ত্যধামে পূজা প্রচারের গল্প লইয়াই লিখিত। সে কথা যে দীনেশ বাবু জানেন না এমন নহে; এবং নিজেও দেখাইয়াছেন। সে পূজা প্রচার কেন মূলকেন্দ্র বলিয়া গ্রহণ করেন নাই তাহা বুঝিতে পারা গেল না। পুস্তকের আরম্ভে পদ্মার উপদেশে এবং শেষভাগে অষ্টমঙ্গলায় এই মূলকেন্দ্র বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার কথা বিশদ করিয়া বুঝাইবার জন্য তিনি পরে বলিতেছেন,—'চণ্ডীকাব্য বিশৃঙ্খল একটী প্রাকৃতিক অরণ্যানীর ন্যায় তরু, গুল্ম, পুষ্প, গুহা—সমস্তই একত্র এক দৃশ্যপটে দেখাইতেছে; এই সৌন্দর্য্যের সাধারণতন্ত্রে প্রত্যেক শোভাই নিরীক্ষণযোগ্য; কিন্তু বিশেষ কোন একটী অংশ অপূর্ব্ব সুদৃশ্য হয় নাই'†। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে কাব্য কেন্দ্রহীন হইল কিরূপে? একটী কাঞ্চনজঙ্ঘা না হইয়া যদি পাঁচটী কাঞ্চনজঙ্ঘা হিমালয়ে থাকিত, তাহা হইলে হিমালয়ের শোভা কি অপেক্ষাকৃত কম হইত, অথবা হিমালয় কেন্দ্রহীন হইত? গ্রন্থকারের উদ্দেশ্যকে কখনও কখনও কাব্যের কেন্দ্র বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। যেমন "আনন্দমঠে"র কেন্দ্র দেশোদ্ধার। এই উদ্দেশ্য বা কেন্দ্র স্পষ্টীভূত থাকিলে সেটী কাব্যের দোষ হয়, গুণ হয় না। আনন্দমঠের স্পষ্ট উদ্দেশ্য আনন্দমঠের দোষ। কবিকঙ্কণের কাব্যের কেন্দ্র স্থির আছে, কিন্তু গ্রন্থকারের কোন উদ্দেশ্য নাই। সেই উদ্দেশ্য নাই

* বঙ্গভাষা সাহিত্য; পৃঃ ৪০৯। † বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পৃঃ ৪০৯।

বলিয়া কি দীনেশ বাবু বলিয়াছেন, "ইহার মূলকেন্দ্র নাই?" তাহা যদি বলিয়া থাকেন, তবে তাঁহার ভ্রম হইয়াছে। তাঁহার যে কথা,—চণ্ডীকাব্য একটী বিশৃঙ্খল প্রাকৃতিক অরণ্যানীর ন্যায়,—এ কথাও বুঝা যায় না; কেন না কোন প্রাকৃতিক পদার্থই বিশৃঙ্খল নহে; আকাশ বিশৃঙ্খল নহে, সমুদ্র বিশৃঙ্খল নহে, হিমালয় বিশৃঙ্খল নহে, অরণ্য বিশৃঙ্খল নহে; পরন্তু ঐ গুলিই সুন্দর শৃঙ্খলাপূর্ণ। বৈচিত্র্য হইতেই সৌন্দর্য্য। ইংরাজীতে বলে "Beauty is unity in diversity"। সুতরাং diversity বা বৈচিত্র্য [যেমন তাঁহার কথিত তরু, গুল্ম, পুষ্প, গুহা এগুলি] সৌন্দর্য্যের অন্তরায় নহে। কবিকঙ্কণের বৈচিত্র্যের মধ্যে একটী করুণ রসের সূত্র সর্ব্বত্রই গ্রথিত আছে। তাঁহার বসন্ত বর্ণনা করুণ রস পূর্ণ। যেখানে তিনি বাঙ্গাল মাঝিদের অনুকরণে তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিতেছেন, সেখানেও, করুণ রস ছাড়েন নাই; "অল্‌দে গুরি বাসিয়ে গেল জীবনে কি কাজ," ইত্যাদি কথায় হাসি পায় বটে, কিন্তু বাঙ্গালদের জন্য দুঃখও হয়।" *

"কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। ভারতচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকলকে জড়াইয়া এই কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কৃত্তিবাস রামচরিত লেখেন বাল্মিকীর অনুসরণ করিয়া; কাশীরাম বেদব্যাসের অনুসরণ করেন। মাইকেল বাল্মিকীর অনুসরণ করেন। হেমচন্দ্র মাইকেলের অনুসরণ এবং অনুকরণ করেন। রবীন্দ্রনাথ বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ লেখেনই নাই। ভারতচন্দ্র কবিকঙ্কণের একেবারে অনুকরণকারী।"

উপসংহারে আমরা আর দুই একটী কথা বলিব। তাঁহার কাব্যে করুণার ক্রন্দন, উল্লাসের উৎসাহ, প্রেমের পূর্ণতা, ভক্তির দ্রাবকতা সমানভাবে স্ফূরিত হইয়াছে; তন্মধ্যে, করুণার ক্রন্দনই কবির বিশেষত্ব। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখন আবার বলিতেছি, কবিকঙ্কণের প্রত্যেক চরিত্র সজীব, স্বভাব-সুন্দর ও প্রত্যক্ষ। কবির ফুল্লরা লাজবিনম্রা সুন্দরী গৃহলক্ষ্মী; আদর্শ হিন্দুপত্নী। লহনা ও খুল্লনা বাঙ্গালীর ঘরের চিত্র। বাঙ্গালীর গৃহে প্রায়ই এমন সপত্নী বিদ্বেষ ঘটিতেছে। মুকুন্দ কবি তাহাই

* শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। মুরারী শীল ও ভাঁড়ু দত্ত বাঙ্গালীর চরিত্র; বাঙ্গালীর কাব্যেই ফুটিয়াছে। কবির কাব্য পড়িতে পড়িতে আমাদের মনে হয়, যেন কবি যেমন দেখিয়াছেন, তেমনি আঁকিয়াছেন; কিছুই অতিরঞ্জিত করেন নাই। 'মুকুন্দ কবি স্বভাবের নিজ ঘরের কবি'। এমন স্বাভাবিক ভাবের প্রগাঢ়তা আর কোন কাব্যে লক্ষিত হয় না। যাঁহারা ভাব-রাজ্যে বিচরণ করিয়া তাহার স্নিগ্ধশীকর-শীতল-সমীর সেবনে মন প্রাণ জুড়াইতে চাহেন, তাঁহারা কঙ্কণের চণ্ডীকাব্য পাঠ করুন। আর আমরা কায়মনে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যে আমাদের নভেলগতপ্রাণা, নারীগণ যে মহান্ আদর্শ ভুলিয়া গিয়াছিলেন,—[আমরা সীতা সাবিত্রীর কথা বলিতে চাহি না]—আজ কবির এই অমূল্য রত্নখানিকে তাঁহারা সাদরে গ্রহণ করিয়া আপন আপন জীবনের আদর্শ স্থির করিয়া লউন; আর কপটাচার, বিদ্বেষ ভুলিয়া মানুষ হইয়া জগতের দ্বারে দীপ্তগর্ব্বে দণ্ডায়মানা হউন! আমাদের হিন্দুর লক্ষ্মী, আবার হিন্দুর লক্ষ্মী হইয়া গৃহে গৃহে বিরাজ করুন।

আমরা আবার বলি "যাঁহারা—শুধু ভাষার মিষ্টত্বের খোঁজ করেন, তাঁহারা ভারতচন্দ্র পাঠ করুন, কবিকঙ্কণের কবিতাস্বাদ করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই।"

কবির জীবনী।

এইবার কাব্যের কথা ছাড়িয়া, একটু কবির কথা বলিতে হইল। নিম্নলিখিত পদ দুইটী হইতে কবিকঙ্কণের সময় জানিতে পারা যায়;—

"শকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥"

১৪৯৯ শক বা ১৫৭৭ খৃঃ অব্দে কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন। তাঁহার নিবাস দামিনা। দামিনা দামোদর তীরস্থ ভাঙ্গামোড়ার দুই ক্রোশ দূরে হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলার সন্ধিস্থলে। তাঁহার প্রকৃত নাম মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। তিনি স্বীয় কাব্য মধ্যেই বংশ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতামহের নাম জগন্নাথ, পিতার নাম হৃদয়নাথ, মাতার নাম দেবকী,

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম কবিচন্দ্র, পুত্রের নাম শিবরাম, পুত্রবধূ চিত্রলেখা, কন্যা যশোদা এবং জামাতার নাম মহেশ।

দামিনাগ্রামে মুকুন্দরামের পূর্ব্বপুরুষগণ নিরাপদে বাস করিয়া আসিতেছিলেন। মুকুন্দরামের সময়ে মামুদ সরিপ নামক একজন ডিহিদার আইসে। তাহার অত্যাচারে তত্রস্থ অধিবাসিগণ বিষমরূপে প্রপীড়িত হইয়া উঠিল। সে অত্যাচার মুসলমান রাজত্বে মধ্যে মধ্যে ঘটিত। মামুদ সরিপের

" উজির হল রায়জাদা, বেপারিরে দেয় খেদা,
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল্য অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া, *
নাহি শুনে প্রজার গোহারি॥ †
সরকার হৈল কাল, খিলভূমি ‡ লেখে লাল ¶
বিনা উপকারে খায় ধুতি। §
পোদ্দার হইল যম, টাকা আড়াই আনা কম,
পাই লভ্য ॥ লয় দিন প্রতি॥

* * *

পেয়াদা সবার কাছে, প্রজারা পলায় পাছে,
দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা।
প্রজা হইল ব্যাকুলি বেচে ঘরের কুড়ালি,
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা॥ "

প্রজারা এইরূপে উত্যক্ত হইতে লাগিল। মুকুন্দরাম সে উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া, স্বীয় পুরুষানুক্রমিক বাসভূমি ত্যাগ করেন। তিনি পুত্র কলত্রের সহিত দামিনা ত্যাগ করিয়া আড়রা ব্রাহ্মণভূমির রাজা

* কুড়—বিঘা।
† গোহারি=কাতরোক্তি।
‡ খিলভূমি=অনুর্ব্বর, অকর্ষিতভূমি।
¶ লাল=উর্ব্বর।
§ ধুতি—ঘুষ।
॥ লভ্য—সুদ।

বাঁকুড়া রায়ের শরণাপন্ন হন। পথিমধ্যে তাঁহাকে অতিশয় কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি দুঃখে লিখিতেছেন;——

পথিমধ্যে,

" তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান করিলুঁ উদক পান,
শিশু কাঁদে ওদনের তরে॥
আশ্রম পুখরি আড়া, নৈবেদ্য শালুক পোড়া,
পূজা কৈলুঁ কুমুদ প্রসূনে।
ক্ষুধা, ভয়, পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে,
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥ "

এইরূপ হৃদয় বিদারক যন্ত্রণা তৎকালে লোককে নিত্যই সহ্য করিতে হইত। বাঁকুড়া রায় বিদ্বান ও গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি মুকুন্দরামের ন্যায় একজন সুপণ্ডিত এবং সুকবি ব্রাহ্মণকে সযত্নে আপনার রাজ্য মধ্যে বাস করাইলেন। অধিকন্তু স্বীয় পুত্র রঘুনাথের শিক্ষক-পদে তাঁহাকে অভিষিক্ত করেন। রঘুনাথের অনুরোধে মুকুন্দরাম চণ্ডী-মঙ্গল রচনা করেন।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল বাঙ্গালার প্রথম শাক্ত গ্রন্থ। যদিও তিনি শাক্ত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তথাপি তিনি নিজে বৈষ্ণব। তাঁহার কাব্য মধ্যে

" ঘোর কলিকালে যেবা হরিনাম লয়।
জরা রোগ মৃত্যু শোক যমে নাহি ভয়॥

* * *

শ্রীচৈতন্য বন্দনায়;—

" গাইয়ে তোমার আগে, গোবিন্দ-ভকতি মাগে,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥ "

প্রভৃতি পদ এবং 'শ্রীরামচন্দ্র বর্ণনা' 'শ্রীচৈতন্য বন্দনা' 'হরিনামের-মাহাত্ম্য কথন' প্রভৃতি কবিতায় ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

হিন্দু-সমিতি, চুঁচুড়া। শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

হৈমবতী।

তৃতীয় অধ্যায়।

রাজীবপুরের যে গাঙ্গুলী বংশে শরতের স্বামী গুরুচরণের জন্ম সেই বংশের পঁচিশ ত্রিশঘর ব্রাহ্মণ এখনও এই গ্রামে বাস করিতেছেন। সাধারণতঃ বাঙ্গালার ব্রাহ্মণের যে দুর্দ্দশা ও অধঃপতন হইয়াছে ইঁহারাও তাহার হাত এড়াইতে পারেন নাই। গাঙ্গুলী মহাশয়দিগের অধিকাংশই এখন মসিজীবী এবং শ্ববৃত্তি অবলম্বন করিয়া পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতেছেন। গ্রামের মধ্যে এক গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অবস্থা বিশেষ উন্নত। তাঁহার জমীদারী আছে, বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি হইয়া থাকে। গাঙ্গুলী মহাশয়ের পুত্র নাই, একটী মাত্র কন্যা, তাহার নাম শৈলবালা। সে হৈমবতীর সমবয়স্কা। শৈশব হইতেই উভয়ে বড় সদ্ভাব।

আজ দুর্গোৎসবের ষষ্ঠী। প্রভাতেই গোবিন্দ গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাড়ীতে পূজার বাজনা বাজিয়া উঠিয়াছে। ক্ষুদ্র গ্রাম রাজীবপুর আনন্দে উৎফুল্ল। বালক বালিকারা নূতন বস্ত্র পরিয়া সকলেই পূজাবাড়ীর দিকে ছুটিতেছে। যে সকল শিশু চলিতে অক্ষম তাহারা পিতা মাতা ভ্রাতা কিম্বা ভগ্নীর কোলে চড়িয়া গাঙ্গুলী বাড়ী যাইতেছে। গাঙ্গুলী বাড়ী যাইবার একটী পথ গুরুচরণের বাড়ীর ঠিক সম্মুখ দিয়া। পথটী অল্প পরিসর; তাহার দুই পার্শ্বে শিশিরসিক্ত দুর্ব্বাগুচ্ছগুলি দেখিলে মনে হইতেছে যেন এই তৃণরাজী মহামায়ার আগমনে প্রাতঃস্নান সমাপন করিয়া এখনও আর্দ্র গাত্রে রহিয়াছে। বালক বালিকা যুবা বৃদ্ধ যে কেহ ক্ষুদ্র পথ ছাড়িয়া তাহাদের মস্তকে চরণ নিক্ষেপ করিতেছে দুর্ব্বাদল ক্রোধ ভরে তাহাদের পাদুকায় বা অনাবৃত পদে জল ঢালিয়া দিতেছে।

পল্লীস্থ প্রায় সকল বাড়ীর লোকই কেহ না কেহ গাঙ্গুলী বাড়ীতে আসিয়াছে। হরিশ এবং হৈমবতীর মনে যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও তাহারা যাইতে পারে নাই। কেন না জননী শরৎ সুন্দরী আজ প্রভাত হইতেই রোদন করিতেছেন। পূর্ব্ব বৎসরের এই ষষ্ঠী দিনের কথা তাঁহার মনে

উঠিয়াছে। গুরুচরণ পুত্র কন্যা ও তাঁহার জন্য নূতন বস্ত্র আনিলে তিনি কত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। আজ তাঁহার পুত্রকন্যার বস্ত্র হয়ই নাই। মাতাকে কাঁদিতে দেখিয়া হরিশ ও হৈমবতী তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। দুই একটী বৃদ্ধা প্রতিবেশিনী আসিয়া শরতকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। কিন্তু শরৎ কিছুতেই আজ শান্ত হইতে পারিতেছে না। অবশেষে বৃদ্ধ নিতাই দাস আসিয়া পুনঃ পুনঃ "মা উঠ, মা উঠ" বলিয়া নিজে কাঁদিতে লাগিল এবং তাঁহার হস্তে কয়েকখানি অল্প মূল্যের নূতন বস্ত্র দিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

এই সময়ে সহসা সতীশ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং একেবারে অগ্রজার চরণোপরি পতিত হইলেন। শরৎ তাহার মস্তকে হস্তস্পর্শ করিলে সতীশ মস্তক উত্তোলন করিলেন এবং দিদির মুখের দিকে চাহিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। শরৎ নিজের কান্না ভুলিয়া ভাইকে সান্ত্বনা করিলে সতীশ কহিলেন, দিদি! দাদার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা কর। দাদা যাহা করিয়াছেন মানুষে তাহা পারে না।

শরৎ কোন উত্তর না দিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।

সতীশ কহিলেন "আমি সকলই শুনিয়াছি। কাল বাজারে হরিশ ও হৈমবতীর কাপড় কিনিতে গিয়াছিলাম, সেখানে গ্রামের মহেন্দ্রের সঙ্গে দেখা। তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিতেই তোমার কথা সব বলিয়াছে। দিদি! বাবার ভিটায় বোধ হয় আর প্রদীপ জ্বলিবে না।

শ। অমন কথা ব'লো না ভাই।

স। একাদশীর রাত্রিতে নিরম্বু উপবাসিনী তুমি যে ভাবে সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছ আর কি কখনও ওবাড়ীর কল্যান হইবে?

তুমি ত বাবার প্রথম সন্তান। দাদা তোমাকে বাবার ভিটায় দাঁড়িয়ে কাঁদিতেও দেন নাই। উঃ—

সতীশের কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল।

শরৎ পুনরায় সান্ত্বনা করিলে তিনি কহিলেন "কাল রাত্রেই আমি গাড়ীতে আসিয়া অন্ধকারে ষ্টেশনে পড়িয়াছিলাম। আমি হরিশ হৈমবতীর আর তোমার জন্য কাপড় এনেছি, দিদি তুমি নেবে কি ?

সতীশ আবার কাঁদিলেন।

শরৎ বলিলেন, তোমার কাপড় নেবো না কেন ভাই ? তুমি ত এক দিনের জন্যও আমার প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার কর নাই।

সতীশ মহা সন্তুষ্ট এবং আশ্বস্ত হইলেন এবং ধীরে ধীরে কহিলেন, দিদি তুমি কি কলিকাতায় যাবে, আমি তোমাকে আর তোমার ছেলে মেয়েকে ভিক্ষে করে খাওয়াব। বাবার বাড়ীতে আর যেতে বলতে পারিনে।

শরৎ কহিলেন, তোমার অবস্থা ভাল হ'ক, আমি তোমার কাছে যাব, নূতন বউ থাকতে আর বাপের বাড়ী যাব না। বাবা গো—শরৎ ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সতীশ আর ও অনুরোধ না করিয়া পঁচিশটী টাকা দিদির পায়ের নিকট রাখিয়া কহিলেন "দিদি এ আমার নিজের উপার্জ্জন, আশীর্ব্বাদ কর যেন আমি নিজে উপার্জ্জন করিয়া তোমাকে মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারি।

শরৎ কহিলেন, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তুমি রাজেশ্বর রাজা হও। আশীর্ব্বাদ কি সুরেশকে করি না ? ভগবান তাহার সুমতি দিন। আমার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছে আমি সব ভুলিয়া যাইব। তার যেন কোন অমঙ্গল না হয়।

সতীশ কহিলেন "দিদি তুমি যাও আর না যাও পূজার পরে আমি হরিশকে আমার বাসায় নিয়ে যাব।"

শ। তা যেয়ো। আর হৈমবতীর বেও তোমাকে দিতে হবে।

স। সে কথা তোমাকে বল্‌তে হবে কেন ? আমি এর মধ্যেই একটী পাত্রের সন্ধান কচ্ছি।

শ। তোমার ভগিপতি বল্‌তেন "ওর খুব ভাল বে হবে আর ও

অকপালে হবে না। ওর যেমন চেহারা কপালও তেমনি হবে। তিনি যাকে যা বলতেন তাত ঠিকই হ'ত।

স। ওর বের জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।

সতীশ ভাগিনেয় হরিশকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ইংরাজী পড়বে ?

হরিশ উত্তর করিল "না, আমি সংস্কৃত পড়বো, আর যদি পারি বাবার মত কথা কহিতে শিখিব।

স। তুমি কথা কহিতে পার ?

হ। পারি একটু একটু—

"তা আমি সংস্কৃত পড়াইবার বন্দোবস্ত করবো" বলিয়া সতীশ ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন, তাঁহার গাড়ীর সময় হইয়াছে। তিনি অগ্রজার চরণে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

মামার দেওয়া কাপড়খানি পড়িয়া হৈমবতী বৈকালে শৈলবালাদের বাড়ীতে আসিয়াছে। শৈলবালা সকালেই তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল কিন্তু মাকে কাঁদিতে দেখিয়া বালিকা আসিতে পারে নাই।

এক বড় জমীদারের পুত্রের সহিত শৈলবালার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে। পূজার পর তাহারা দেখিতে আসিবে। শৈলবালার পিতা কন্যার জন্য কলিকাতা হইতে অনেকগুলি নূতন অলঙ্কার আনিয়াছেন। শৈল তাহার মাতার ঘরে বসিয়া হৈমবতীকে একে একে গহনাগুলি দেখাইতেছে। দুটী দাসী ব্যতীত আর কেহই সে ঘরে আসিতেছে না। শৈল তাহার নূতন গহনাগুলি হৈমবতীকে দেখাইয়া যখন তুলিতে যাইতেছে তখন দেখিল একটী হীরার ফুল নাই। দুইটী ছিল, একটী আছে। সে হৈমবতীকে বলিল, ভাই ফুলটী কোথা গেল।

হৈম এবং শৈল দুজনে তন্নতন্ন করিয়া ঘরটী খুঁজিল; ফুল পাওয়া গেল

না। একটী দাসী আসিয়া জানিতে পারিয়া কথাটী শৈলবালার মায়ের কানে তুলিয়া দিল। গৃহিনী তড়িত বেগে গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং কন্যাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, আজ এই ষষ্ঠীর দিনে একটা গয়না হারালি, ঘরে কে কে এসেছে বল্‌ত ?

শৈল। ঘরে আর কেউ আসেনি ; কেবল দুই ঝি দু একবার এসেছে।

শৈলবালার মাতা। তারা কি তোদের কাছে গিয়েছে।

শৈল। না।

গৃহিনী একেবারে সিদ্ধান্ত করিলেন, হৈমবতীই ফুলটী চুরি করিয়াছে এবং তাহাকে কহিলেন " হৈম, ফুল দেখেচিস্।"

বালিকা কাঁদ কাঁদ মুখে উত্তর করিল ' না কাকী মা। আমি দেখলে কি আর বলি না।'

গৃহিনী। ফুল কি উড়ে গেল, তুই ওঠ্‌ত। হৈমবতী উঠিল, গৃহিনী তাহার রীতিমত অঙ্গ সন্ধান করিলেন এবং শেষে তাহাকে উলঙ্গ হইতে বলিলেন।

একাদশ বৎসরের বালিকা নতমুখী হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বস্ত্র ত্যাগ করিল এবং পরীক্ষা শেষ হইল ভাবিয়া কহিল " কাকী মা আমি শৈলের একটী ফুল চুরি করিব, এই তোমার বিশ্বাস হয় ? " গৃহিনী একটী দাসীকে কহিলেন, উহার মুখে হাত দিয়ে দেখত।

আদেশ প্রতিপালিত হইল। নিরপরাধিনী বালিকা আরও জোরে কাঁদিল।

ফুল পাওয়া গেল না। গৃহিনী গর্জ্জিতে লাগিলেন। রোরুদ্যমানা হৈমবতী বাড়ী যাইতে চাহিল এবং কাকীমার অনুমতি লইয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে বাড়ীমুখে ছুটিল।

হৈমবতী ফুল চুরি করিতে পারে এমন সন্দেহ শৈলবালার মনে কখনও আসে নাই। বালিকার প্রতি মাতা যে ব্যবহার করিলেন তাহাও শৈলের অনুমোদিত নহে, তথাপি তাহার জননীর কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার সাহস ছিল না। হৈমবতী চলিয়া গেলে গৃহিনী কন্যাকেই তাড়না করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যে দ্বিতীয়া দাসী সেখানে আসিল। সে প্রথমা অপেক্ষা

চতুরা। গৃহিনী অপেক্ষাও বুদ্ধিমতী। সমস্ত অবস্থা শুনিয়াই সে গৃহের একটী নর্দ্দামার দিকে দৃষ্টি করিল এবং কহিল, ফুলটী ত নর্দ্দামা দিয়া গড়াইয়া যায় নাই ?

গৃহিণী কহিলেন, দেখ্‌ত।

দাসী নর্দ্দামা দেখিয়া বাহিরে গেল এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই ফুলটী লইয়া ফিরিয়া আসিল। ফুল গড়াইয়া বাহিরে গিয়া পড়িয়াছিল।

এইবার শৈলবালার মুখ ফুটিল। সে কহিল, মা তুমি হৈমকে মিছেমিছি দোষী কর্‌লে।

মা কহিলেন, চুপ কর্।

শৈলবালা চুপ না করিয়া কহিল, আমি হৈমকে গিয়ে ডেকে আনি।

গৃ। ডেকে আনতে আর হবে না, কালই আসবে চা'ল ডাল্ চাইতে।

বস্তুতঃ বালিকার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করা হইয়াছে ইহা মনে বুঝিতে পারিলেও গৃহিণী তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, আর তাহার নিকট প্রকারান্তরে ক্ষমা প্রার্থনা করা যাইতে পারে, এ কথা তাঁহার মনেই আসিল না। তিনি দ্বিতীয়া দাসীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিতে লাগিলেন, তুমি জান না ছুঁড়ীটে এমন—সে দিন ঐ ওর বাপ যেখানে কথা কইতে যেত সেখানকার দুটী লোক এসেছিল ওদের বাড়ীতে, বোধ হয় বুড়ো বেঁচে আছে কি না সেই খবর নিতে। ছুঁড়ীটে এসে আমায় বল্লে, কাকীমা আমাদের এক সের সরু চাল দেবে ? আমি চাল দিতে ভাঁড়ারে এলাম। ও সঙ্গে সঙ্গে এল, এসে বলে কি কাকী মা দুটো আলু দেবে ? ভাদ্র মাসের আলু বুঝতেই পাচ্ছ, শেষে তাও চারিটী দিলাম, কিন্তু বড় রাগ হ'ল—বল্লাম চাল নিলে আলু নিলে—লোক দুটীকে হয় ত আলু ভাতে ভাত দেবে, তাদের আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেই হ'ত। ছুঁড়ী কিছু বল্‌লে না, দিব্যি সুড় সুড় করে চাল আর আলু নিয়ে বাড়ী চলে গেল।

দাসী গৃহিণীর কথায় সায় দিল।

গৃহিণী ফুল হারাবার কথা কর্ত্তার কানে না যায় বলিয়া কন্যাকে সমজাইয়া দিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হৈমবতী পথে আসিতে আসিতে একবার মনে করিতেছিল মাকে কিছু বলিবে না, কিন্তু বাড়ী আসিয়া সে মায়ের কাছে কিছুই লুকাইতে পারিল না। তাহার মুখে তাহার অবমাননার কথা শুনিয়া শরৎ এবং হরিশের মনের অবস্থা কিরূপ হইল ইহা সহজেই অনুমেয়। শরৎ অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল সতীশের সহিত কলিকাতায় না যাইয়া তিনি ভুল করিয়াছেন। হরিশ কাঁদিল না বটে, কিন্তু ভগ্নির কাতর মুখের ছায়া যেন তাহার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিল।

শৈলবালার পিতার প্রকৃতি তাহার মাতার ন্যায় নহে। গৃহিণী গ্রামের লোককে মাড়াইয়া চলেন; কর্ত্তার অহঙ্কার নাই বলিলেই চলে। সপ্তমীর দিন হরিশ হৈমবতী বা তাহাদের মাতা কেহই পূজা বাড়ীতে আসিল না ইহা তিনি লক্ষ্য করিলেন এবং বাড়ীর ভিতরে আসিয়া গৃহিণীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গৃহিণী রুক্ষ স্বরে উত্তর দিলেন, সকলকেইত নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে যার ইচ্ছা হয় আসবে, ইচ্ছা না হয় না আসবে।

কর্ত্তা এ উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না এবং তিনি পূর্ব্ব দিন হৈমবতীকে দেখিয়াছেন, আজ কেন সে কিম্বা তাহার ভাই কেহই আসিল না বলিয়া গৃহিণীকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন।

গৃহিণী কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া কহিলেন, তা আমি কেমন ক'রে জানবো?

কর্ত্তা একটু সুর নরম করিয়া কহিলেন, শৈলকে একবার পাঠিয়ে দিলে হয় না?

গৃ। হাঁ শৈলকে পাঠাবে বৈকি? তুমি নিজেই যাও না?

ক। এই চল্লাম, একি বড় বেশী কথা। গ্রামের সকলে এসেছে, আর তারা কেউ এল না।

বস্তুতঃ গোবিন্দচন্দ্র নিজেই হরিশ এবং হৈমবতীকে ডাকিতে গেলেন। পথিমধ্যে তিনি এক বৃদ্ধা প্রতিবেশিনীর মুখে পূর্ব্বদিনের ঘটনা সমস্ত

শুনিলেন। তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগিল। তিনি কথক মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া হরিশ হৈমবতীকে দেখিতে পাইলেন। ইহাদের উভয়েরই বিষন্ন বদন। কর্ত্তা নিজে আসিয়াছেন দেখিয়া, বালক বালিকা তাহাদের জননীকে সংবাদ দিল। তিনি বাহির বাটীর দিকে আসিলেন। গাঙ্গুলী মহাশয় কহিতে লাগিলেন, বউ দিদি কিছু মনে করো না। ওত চিরকেলে পাগল। হরিশ হৈমকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও। শরৎ ইহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন এবং পুত্র কন্যাকে যাইতে অনুমতি করিলেন। কহিলেন, "উনি যখন নিজে এসেছেন তোমরা যাও"। বালক বালিকা অনিচ্ছা সত্ত্বেও গাঙ্গুলী মহাশয়ের অনুগমন করিল। তিনি হরিশ হৈমবতীকে অতিশয় যত্নের সহিত আহার সামগ্রী দিলেন এবং তাহাদিগকে এমন স্থানে বসাইলেন যাহাতে গৃহিণীর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ না হয়। আহারান্তে ইহারা বাড়ী চলিয়া গেলে, কর্ত্তা বাড়ীর ভিতরে যাইয়া গৃহিণীকে কিঞ্চিৎ তিরস্কার করিলেন। তিনি কহিলেন, ফুল না পাওয়া গেলেও তোমার হৈমকে চোর সন্দেহ করা উচিত ছিল না।

গৃ। করেছি তাহাতে হয়েছে কি?

ক। হবে আর কি? অহঙ্কার জিনিষটা বড়ই খারাপ। আর লোকের মনে ব্যথা দেওয়া মহাপাপ। হৈমবতীর প্রতি তুমি যে ব্যবহার করেছ তাহাতে গ্রামশুদ্ধ লোকে দুঃখিত। যখন ফুলটী পাওয়া গেল, তখন তুমি একবার ওদের বাড়ী গেলে না কেন? শৈলকে পাঠিয়ে দিলেও ত হ'ত। শৈল পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। সে অবসর পাইয়া কহিল, আমি যেতে চেয়েছিলাম বাবা।

গৃহিণী তেলে বেগুণে জ্বলিয়া গেলেন। কর্ত্তার কোপাগ্নিতে কন্যা আহুতি দিল বলিয়া তিনি কন্যাকে বকিতে আরম্ভ করিলেন। তুই পোড়ারমুখী ফুল না দেখাতে গেলে ত এত কাণ্ড হয় না, আর আমাকে এত কথা শুনতে হয় না। গৃহিণী এইরূপ সুর ধরিলেন এবং মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন, "ভাদ্র মাসে ভাইয়ে তাড়িয়ে দেয় তার আবার এত অহঙ্কার"। গোবিন্দ কেবল বলিলেন, অহঙ্কার তাদের না তোমার?

এই সময়ে কর্ত্তাকে বাহির হইতে ডাক পড়িল। পূজার ক'দিন কর্ত্তা

গৃহিণীতে বড় ভাল ভাবে কথাবার্ত্তা হইল না। হরিশ হৈমবতী এবং তাহাদের মাতা গৃহিণীর বিষ দৃষ্টিতে পড়িলেন। তাহারা কর্ত্তার অনুরোধে অষ্টমী এবং নবমীর দিনও আসিয়া খাইয়া গেল, কিন্তু কাকীমার সহিত সাক্ষাৎও করিল না। হরিশ কাহারও সহিত কথাও কহে নাই। বিজয়ার পর দিন গ্রামের সকলেই শুনিল, হরিশ গৃহে নাই, কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

ফুল।

ত্যজিয়া স্বরগবাস, দেখাতে মধুর হাস,
আসিয়াছ এ মর জগতে,
সাজাইতে বনস্থল, নীল সরোবর জল,
মানবের মন বিমোহিতে।
রোগ তাপ অবিরত মানবে বেদনা কত
দেয়, দহে সুতীব্র জ্বালায়,
মরম দহিয়া যায় তাপিত নিঃশ্বাস তায়,
অনুক্ষণ গুমরে হিয়ায়;
নয়নে অশ্রুর ধারা করে তারে দিশেহারা,
শান্তি তরে উন্মাদিত মন,
কোথায় সে শান্তি হায়! শুধু মৃগতৃষ্ণিকায়
ব্যর্থ মন করিছে ভ্রমণ।
তুমিই তো ফুলরাণী, ওগো স্বরগের মণি,
দেখাইয়া বিমোহন হাসি,
অমৃত সেচন করি' তাপিত হৃদয় ভরি'
সকল মরম জ্বালা নাশি',
স্নেহের পরশ দিয়া আঁখি নীর মুছাইয়া
শান্তি ছবি দেখাইয়া দাও,
শোক তাপ দুখ-হরা, মধুর সৌরভ ভরা,
স্বরগের সুষমা ছড়াও।

হে দেবি! শুধু কি হেথা ঘুচায়ে মনের ব্যথা
শান্তি পাও মনেতে তোমার?
অমরতা ফেলি দূরে মানব-সান্ত্বনা-তরে
লও ধরি মরণ তাহার,—
মানবেরই সহ মিশে যাইয়া কালের বশে
নাশ পথে অগ্রসর হও,
হারায়ে মোহিনী শোভা হাসি তব মনোলোভা,
অভাগীর মত পড়ি' রও।
এত তব উপকার স্মরণ কি রাখে আর
অকৃতজ্ঞ মানব হেথায়?
যতক্ষণ হাসি দেখে সাদরে তোমারে রাখে
শুধু নিজ শান্তি কামনায়!
ও হাসি শুকায়ে গেলে ফেলে গো চরণে দলে,
ভুলে যায় পূর্ব্ব উপকার!—
এত অকৃতজ্ঞ যারা গর্ব্বে এত মাতোয়ারা
তাদের কি ঘুচে হাহাকার?

শ্রীভবভূতি ভট্টাচার্য্য।

ফুলের উত্তর।

এযে বিশ্ব শান্তিময়, নিত্য নব অভিনয়;
হাহাকার কোথা রয়
মানব হিয়ায়?
যবে মোর হাসি টুটে, প্রবীন জীবন ফুটে,—
ক্ষাম দেহ লয় লুটে
মানব সভায়;

যেহেতু অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়াই তুমি মনে করিতেছ—" আমি যুদ্ধ করিব না "—তোমার এই ব্যবসায় ব্যর্থ হইবে। কারণ স্বয়ং প্রকৃতি তোমার ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের আরম্ভক রজস্তমোগুণ স্বভাবের সাহায্যে তোমাকে নিশ্চয়ই যুদ্ধে নিযুক্ত করিবে। ৫৯

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশেঽপিতৎ॥ ৬০

হে কৌন্তেয় মোহবশতঃ তুমি যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, স্বাভাবিক কর্ম্মসূত্রে নিবদ্ধ হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও তোমাকে তাহা করিতে হইবে। ৬০

ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ৬১

হে অর্জ্জুন, যন্ত্রারূঢ় সর্ব্বভূতকে নিজ মায়াসূত্রে ভ্রামিত করিয়া ঈশ্বর সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণে নিত্য অবস্থিতি করিতেছেন। ৬১

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ ৬২

হে ভারত, সর্ব্বতোভাবে (তোমার ভালই হউক আর মন্দই হউক) তাঁহাকেই শরণ লও, তাঁহার প্রসাদে পরম শান্তি এবং নিত্যস্থান প্রাপ্ত হইবে॥ ৬২

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৬৩

এই গোপনীয় হইতেও গোপনীয় জ্ঞান আমি তোমাকে বলিলাম; ইহা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া যেমন ইচ্ছা কর সেইরূপ করিও। ৬৩

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততোবক্ষ্যামি তে হিতম্॥ ৬৪

সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম এবং আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাক্য আবার শ্রবণ কর। তুমি নিতান্ত প্রিয়তম বলিয়াই তোমার হিতের জন্য পুনর্ব্বার বলিতেছি। ৬৪

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ৬৫

তুমি মন্মনা (আমাতে সমাহিত চিত্ত) হও, আমার ভক্ত হও, আমার পূজক হও, আমাকে নমস্কার কর, নিশ্চয় আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। তুমি আমার প্রিয় বলিয়াই সত্যপূর্ব্বক আমি তোমার নিকটে ইহা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি। ৬৫

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৬৬

সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও অর্থাৎ গুণানুযায়ী অধিকার বিধায়ক শাস্ত্রের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া গুণফল আমাতে অর্পণ করিয়া আমার দাস হও। এইরূপে কর্ম্মত্যাগ জন্য যদি কোন পাপের আশঙ্কা কর, তাহা হইলে পাপ পুণ্যের একমাত্র ফল বিধাতা আমি তোমাকে বলিতেছি—তোমার যত কেন পাপ হৌক না, সমস্ত পাপপুণ্য বন্ধন হইতে আমি তোমাকে মুক্ত করিব; তজ্জন্য দুঃখিত হইও না॥ ৬৬

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি।

শিরোমণি মহাশয় আর নাই; কৈলাসচন্দ্র শিরোমণির ৺ কাশীধাম প্রাপ্তি হইয়াছে। যে অপূর্ব্ব বঙ্গীয় ধীশক্তি আজি চত্বারিংশৎ বর্ষ কাল ভারতের ভারতীর পীঠস্থানে বারাণসী ধামে সরস্বতী সিংহাসন পার্শ্বে অচল অটল ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বাগ্দেবীর একান্ত সেবায় সমগ্র বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল, সে শক্তি শিবলোকে চলিয়া গিয়াছে। কৈলাসচন্দ্র এখন কৈলাসনাথের সেবায় ব্যাপৃত; ভারতে ভারতীর সেবা তাঁহার উদ্‌যাপন হইয়াছে। বাঙ্গালীর গৌরব রবি অস্তাচলে।

যেহেতু অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়াই তুমি মনে করিতেছ—" আমি যুদ্ধ করিব না "—তোমার এই ব্যবসায় ব্যর্থ হইবে। কারণ স্বয়ং প্রকৃতি তোমার ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের আরম্ভক রজস্তমোগুণ স্বভাবের সাহায্যে তোমাকে নিশ্চয়ই যুদ্ধে নিযুক্ত করিবে। ৫৯

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশেঽপিতৎ॥ ৬০

হে কৌন্তেয় মোহবশতঃ তুমি যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, স্বাভাবিক কর্ম্মসূত্রে নিবদ্ধ হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও তোমাকে তাহা করিতে হইবে। ৬০

ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ৬১

হে অর্জ্জুন, যন্ত্রারূঢ় সর্ব্বভূতকে নিজ মায়াসূত্রে ভ্রামিত করিয়া ঈশ্বর সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণে নিত্য অবস্থিতি করিতেছেন। ৬১

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ ৬২

হে ভারত, সর্ব্বতোভাবে (তোমার ভালই হউক আর মন্দই হউক) তাঁহাকেই শরণ লও, তাঁহার প্রসাদে পরম শান্তি এবং নিত্যস্থান প্রাপ্ত হইবে॥ ৬২

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৬৩

এই গোপনীয় হইতেও গোপনীয় জ্ঞান আমি তোমাকে বলিলাম; ইহা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া যেমন ইচ্ছা কর সেইরূপ করিও। ৬৩

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততোবক্ষ্যামি তে হিতম্॥ ৬৪

সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম এবং আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাক্য আবার শ্রবণ কর। তুমি নিতান্ত প্রিয়তম বলিয়াই তোমার হিতের জন্য পুনর্ব্বার বলিতেছি। ৬৪

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ৬৫

তুমি মন্মনা (আমাতে সমাহিত চিত্ত) হও, আমার ভক্ত হও, আমার পূজক হও, আমাকে নমস্কার কর, নিশ্চয় আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। তুমি আমার প্রিয় বলিয়াই সত্যপূর্ব্বক আমি তোমার নিকটে ইহা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি। ৬৫

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৬৬

সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও অর্থাৎ গুণানুযায়ী অধিকার বিধায়ক শাস্ত্রের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া গুণফল আমাতে অর্পণ করিয়া আমার দাস হও। এইরূপে কর্ম্মত্যাগ জন্য যদি কোন পাপের আশঙ্কা কর, তাহা হইলে পাপ পুণ্যের একমাত্র ফল বিধাতা আমি তোমাকে বলিতেছি—তোমার যত কেন পাপ হৌক না, সমস্ত পাপপুণ্য বন্ধন হইতে আমি তোমাকে মুক্ত করিব; তজ্জন্য দুঃখিত হইও না॥ ৬৬

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি।

শিরোমণি মহাশয় আর নাই; কৈলাসচন্দ্র শিরোমণির ৺ কাশীধাম প্রাপ্তি হইয়াছে। যে অপূর্ব্ব বঙ্গীয় ধীশক্তি আজি চত্বারিংশৎ বর্ষ কাল ভারতের ভারতীর পীঠস্থানে বারাণসী ধামে সরস্বতী সিংহাসন পার্শ্বে অচল অটল ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বাগ্দেবীর একান্ত সেবায় সমগ্র বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল, সে শক্তি শিবলোকে চলিয়া গিয়াছে। কৈলাসচন্দ্র এখন কৈলাসনাথের সেবায় ব্যাপৃত; ভারতে ভারতীর সেবা তাঁহার উদ্‌যাপন হইয়াছে। বাঙ্গালীর গৌরব রবি অস্তাচলে।

আমরা স্বদেশীর ধূয়া গাহিতে গাহিতে ক্রমেই বিদেশী ভাবে আত্ম-বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছি। বিদেশীর নাটে আমরা নাচিতে আরম্ভ করিয়াছি; বিদেশী ঠাটের গৌরব করিতে শিখিতেছি। কেবল যে জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্ল-চন্দ্রের গৌরব করি, এমন নহে, কন্দুক-ক্রীড়ন-কারী রণজিৎকে দেখাইয়া আমরা কত না বড়াই করিয়া থাকি; কিন্তু দেশী ঠাটের দেশী রত্ন কৈলাস, কোহিনূর আমরা চিনিয়াও চিনি নাই; তাই বুঝিতে পারিতেছ না, আজি আমাদের কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে!

যাঁহারা শিরোমণি মহাশয়কে কেবল মাত্র মহাপণ্ডিত বলিয়া জানিতেন, তাঁহারা আমাদের কথা না বুঝিতেও পারেন; কিন্তু যাঁহারা সেই অগাধ-পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সঙ্গে, সেই একান্ত নিরভিমান, শিশু-সুলভ সরলতা, প্রগাঢ় অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রম, সম্পূর্ণ বিলাস-বিতৃষ্ণা, কিশোরীর কোমল হৃদয়, যুবকের উদ্যম ও উৎসাহ—একদিনও দেখিয়াছেন, তাঁহারাই কথঞ্চিৎ বুঝিয়া ছিলেন, দেশীয় ঠাটে বাঙ্গালী কিরূপ অপূর্ব্ব পদার্থ হইতে পারে; তাঁহারাই আজি বুঝিবেন, আমাদের আজি কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

কৈলাস শিরোমণি মহাশয়কে, দেখিবার ও বুঝিবার আমি বহুতর সুযোগ, সৌভাগ্যক্রমে পাইয়াছিলাম। তাঁহার পরিচয় আমি নানারূপে পাইয়াছিলাম; সেই পরিচয়ের পরিচয় না দিলে, আমি প্রত্যবায়-গ্রস্ত হইব, মনে করিতেছি—তাই হৃদয়ের শোকানল তূষ স্তূপে চাপা দিয়া—সর্ব্ব সমক্ষে সেই পরিচয় প্রদান করিতেছি।

শিরোমণি মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য আমার পিতৃদেবের সহাধ্যায়ী বন্ধু ও তদানীন্তন ইংরেজিওয়ালা ছিলেন। যুবা বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। শিরোমণি মহাশয়ের পিতা আমার পিতাকে পাইলে, পুত্র শোকের কথঞ্চিৎ লাঘব হইল, মনে করিতেন। পিতা তখন উলার মুনসেফ্। উলার বামনদাস বাবু তখন বাঙ্গালির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ক্রিয়াবান্ পুরুষ। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, ত্রৈলঙ্গ, কাশী, প্রয়াগ, মহারাষ্ট্র হইতে পণ্ডিত সকল তখন উলায় ৺ জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা উপলক্ষে আহূত হইয়া আগমন করিতেন। মহাসমারোহ হইত। পণ্ডিতদিগের, পাঁচ সাত দিন ব্যাপী, বিচার চলিত। শিরোমণি মহাশয়ের পিতা সেই সমারোহে নিমন্ত্রিত

হইয়া উলায় যাইতেন, আমাদের বাসায় থাকিতেন। তাঁহার সঙ্গে থাকি-তেন,—তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক গোলোক ন্যায়রত্নের ছাত্র—কৈলাসচন্দ্র। সুতরাং শিরোমণি মহাশয়ের ছাত্র অবস্থা হইতে এই অধমের তাঁহার সঙ্গে পরিচয়। তখন তিনি তেজস্বী, মেধাবী, তীক্ষ্ণ ধীশক্তি সম্পন্ন, বিচার-পটু নৈয়ায়িক ছাত্র মাত্র। তখনই শুনিতাম গোলোক ন্যায়রত্নের সেই প্রতিভা-মণ্ডিত ছাত্র নাকি এক একদিন সভা-ভেদ করিতেন। সকলে ধন্য ধন্য করিত, পিতা মহাহৃষ্ট হইতেন। তখন আমার বয়স—অষ্টাদশ বৎসর মাত্র; তাঁহার—বয়স বিশ বাইশ। তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয়, তখন কেন, আমি এখনই বা কি বলিতে পারি, তবে তাঁহাকে ছাত্রাবস্থা হইতে আমার দেখা—এই কথা মাত্র আমার বলা।

তিনি পিতাকে ‘দাদা’ বলিতেন, আমি তাঁহাকে ‘খুড়া মহাশয়’ বলিতাম; ব্রাহ্মণ কায়স্থ, পণ্ডিত মূর্খ,—বিষম ভেদ থাকিলেও, আমাদের মধ্যে পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা ছিল; এমন কি মেয়েছেলের যাতায়াত ছিল।

শিরোমণি মহাশয়দের নিবাস বর্দ্ধমান জেলার কালনার নিকট—ধাত্রী গ্রাম। ধাইগাঁ-কালনা বলে। আমি সেখানে তাঁহাদের বাড়ী গিয়াছি। পল্লীর প্রতিবেশী মণ্ডলে শিরোমণি মহাশয়কে দেখিয়াছি। দেশে তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বের কিরূপ প্রতাপ,—বলি, তোমরা হয়ত শুনিয়া স্তম্ভিত হইবে। তিনি রাঢ়ীয় শ্রেণী, চট্টোপাধ্যায়; দেশে বহুতর ব্রাহ্মণ তাঁহাদের শিষ্য এবং যজমান ছিলেন। অনেকে আবার একাধারে শিষ্য ও যজমান। ইঁহাদের অনেকের বাড়ীতেই দুর্গোৎসব হয়। দুর্গোৎসবের ৪ দিন, চণ্ডীমণ্ডপে নৈবেদ্য উপকরণ বা যাহা কিছু উৎসর্গীকৃত হইবে, সমস্তই শিরোমণি মহাশয়দের। সমস্তই তাঁহাদের বাটীতে পৌঁছিয়া দিতে হইবে। অন্য কোন ব্রাহ্মণ যে তাহা হইতে কিছু প্রত্যাশা করিবেন, তাহার উপায় নাই। কৃতি যে অন্য কাহাকেও, তাহা হইতে কিছু দিবেন তাঁহার সে সাধ্য নাই। এই প্রতিষ্ঠা প্রতাপবান্ ব্রাহ্মণকে সেই—[illegible] যজমান মণ্ডলীর মধ্যে দেখিলাম, সেই শিশুর মত সরল, অমায়িক, নিরহঙ্কার, দম্ভশূন্য—দশজনের মধ্যে একজন, সহজ-বিনয়ে, সাদাসিধা বিচরণ করিতেছেন। নিজ গৌরবে সকলকে কোলে টানিয়া লইতেছেন,

কাহাকেও দূরে নিঃক্ষেপ করিতেছেন না। এটা উৎসব উপলক্ষ। তাঁহার ভ্রাতুষ্পৌত্রের অন্নপ্রাশন। ক্রিয়াবাড়ী।

শিরোমণি মহাশয় যখন অধ্যয়ন করেন, তৎকালে নবদ্বীপের টোলে যেরূপ সংযম-শিক্ষা হইত—তাহা এখনকার উপন্যাসেও থাকে না। গোলোক ন্যায়রত্নের ন্যায়ের টোলে নানা দিগ্‌দেশ হইতে আগত দ্বিশতাধিক ছাত্র। অধ্যাপক কাষ্ঠ তণ্ডুল যোগাইতেই শশব্যস্ত। ব্যঞ্জন মসলা তৈল ছাত্রগণকে আপনা আপনি মধ্যে জোগাড় করিতে হইত। গল্প আছে, টোলের ছাত্রেরা পাতা জ্বালিয়া পুঁথির পাঠ অভ্যাস করিতেন। শিরোমণি মহাশয় আমাকে বলিয়াছেন, "আমিই কত দিন তাহাই করিয়াছি। হয় ত কোন দিন দুপুর বেলা দুইটি চুণা মাছ পাওয়া গেল, কেবল কাঁচকলা সিদ্ধ খাইয়া হয়রান হইয়াছি—পড়িবার তৈল দিয়া মাছ কটা ভাজিয়া খাইলাম, তাহার পর রাত্রিতে তাল পাতা জ্বালিয়া পাঠ অভ্যাস করিলাম।" বাল্যে এই ঘোরতর সংযম শিক্ষা পাইয়া যৌবনে ও প্রৌঢ়ে তাহার পক্ষে সংযম একটা সিদ্ধির বস্তু হইয়াছিল,—সংযম করিলেই হইল, উহাতে কোন আয়াস করিতে হইত না।

নব্য ন্যায়ে মহা প্রতিপত্তি লাভ করিয়া শিরোমণি মহাশয় বারাণসী ধামে বেদান্ত অধ্যয়ন করিতে যান; সে আজি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের কথা। কিছু দিন পরে, কাশীর নূতন কলেজে তিনি নব্য ন্যায়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তখন, বোধ করি, ব্যালাণ্টাইন কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু নব্য ন্যায় কিরূপ বিদ্যা—তাহার কিছুই জানিতেন না—শিরোমণি মহাশয়ের নিকট—একটু আধটু পরিচয় পাইয়া, তিনি বাঙ্গালি পণ্ডিতজির একেবারে গোঁড়া হইলেন। সকল বিষয়েই পণ্ডিতজিকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন—বাধ্য হইয়া শিরোমণি মহাশয়কে সকল দর্শনই বিশেষ উদ্যম, অধ্যবসায়, উৎসাহ ও পরিশ্রম পূর্ব্বক শিক্ষা করিতে হইল। কাশীধামে তখন সন্ন্যাসী শ্রেণী মধ্যে মহা মহা পণ্ডিত ছিলেন, শিরোমণি মহাশয় তাঁহাদের সাহায্যে সকল বিষয়েই প্রগাঢ় পণ্ডিত হইলেন।

বারাণসী ধামে আমি শিরোমণি মহাশয়কে তিনবার দেখিয়াছি। শেষবারে দুই পুত্র লইয়া, তাঁহার পাকা বাড়ীতে কয়দিন অবস্থান করিয়াছিলাম। তাঁহার অধ্যাপনাও বিচিত্র। তিনি নীচেকার একটি ঘরে

পড়াইতেন, আমরা অতিথি, সেই ঘরেই থাকিতাম। চৌকীর উপর পুরাণ শপ পাতা—তাহার মধ্যস্থলে একটা মলিন উয়াড় দেওয়া তাকিয়া বালিশ। সেই বালিশ বুকে দিয়া শিরোমণি মহাশয় সকলিকা একটি থেলো হুঁকা হস্তে পড়াইতেছেন। হুঁকা সকলিকা বটে, কিন্তু কলিকা অনেক সময়ে সাগ্নিকা নহে। কিন্তু তিনি হুঁকা টানিতে বিরাম দিতেছেন না। দুইজন ছাত্র পড়িতেছেন—দীধিতির টীকা; দুইজন পড়িতেছেন—পঞ্চদশী; একজন পড়িতেছেন "শব্দার্থ প্রকাশিকা"; দুইজন হিন্দুস্থানী পড়িতেছেন 'পাণিনীর অষ্টাধ্যায়'; আর একজন হিন্দুস্থানী ন্যায় পড়েন, কিন্তু বঙ্গাক্ষরে তাঁহার পরিচয় না থাকাতে তাঁহার নব ন্যায় পড়িবার সুবিধা হইতেছে না বলিয়া, তিনি পড়িতেছেন প্রথম ভাগ বর্ণপরিচয়—তাঁহাকে শিরোমণি মহাশয় বলিতেছেন ক আর র,—'কর' ব আর ল—'বল'। এমন সময় শব্দার্থ প্রকাশিকার ছাত্র—একস্থলে একটা পূর্ব্বপক্ষ বলিল। শিরোমণি মহাশয় বালিশ হইতে বুক তুলিয়া খাড়া হইয়া বসিলেন, থেলো হুঁকাটায় কসে একটান দিলেন, বলিলেন, 'দেখত, আগুনটা নিভে গেছে বুঝি'। ছাত্রেরা পুঁথি হইতে মাথা তুলিল, মুচকি হাসিল, একজন আর একটা টাট্‌কা কলিকা আনিয়া দিল—শিরোমণি মহাশয় বলিলেন 'ঠিক'—তাহার পর থেলোয় জোরে টান দিয়াই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর ধীরে ধীরে দিতে লাগিলেন; চুল চিরিতে লাগিলেন—ঘটত্বের চারিপুরু খোলস ছাড়াইলেন। তখন ডান হাতে হুঁকা বাম হাতে কাপড়টা আটকান, বিচার চলিতে লাগিল—সেই এক অদ্ভুত অধ্যাপনা।

মহা শোকের সময় শিরোমণি মহাশয়কে দেখিয়াছি—অচল অটল জলভরা মেঘের মত। শেষবারে, মেলট্রেনের বিড়ম্বনায় আমরা গভীর রাত্রিকালে তাঁহার বাড়ীতে অতিথি হই। আহারাদির কোন ত্রুটি হইল না; কিন্তু সেই রাত্রিতেই শিরোমণি মহাশয়ের একটি শিশু পৌত্র মারা পড়ে। আমার ছেলে দুটি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; আমি জাগিয়া—আপনাকে নিতান্ত অভাগ্যবান্ মনে করিয়া ধিক্কার দিতে লাগিলাম। খুড়া মহাশয়ের এমন বিপদ, কি করে, কাল প্রভাতে খুড়া মহাশয়কে মুখ দেখাইব, কিরূপেই বা তাঁহার আশ্রয়ে থাকিব। ঘুমাইয়ে পড়িয়াছি, উঠিতে একটু বেলা

হইয়াছে,—দেখি খুড়া মহাশয় সচ্ছন্দে সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতেছেন; একটু দুঃখিতের মত ভাবে বলিলেন "কাল তোমাদের ঘুমের বড়ই ব্যাঘাত হইয়াছে।" তাহার পর, আর দুঃখ নাই, ক্লেশ নাই, খানিকটা জীবন্ত খবরের কাগজের মত বলিলেন "কাল রাত্রিতে আমার একটি শিশু পৌত্র মারা গিয়াছে।" বলিহারি—সেই গাম্ভীর্য্য—বলিহারি—সেই ধৈর্য্য। তখন শিরোমণি মহাশয় পেন্‌সন্ লইয়াছেন। তাঁহার পূরা বেতন ছিল মাসিক ১০০৲ টাকা, সেই ১০০৲ টাকাই তাঁহাকে পেন্‌সন্ দেওয়া হইয়াছে, আর তাঁহাকে কলেজের পরিদর্শক করা হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে, তিনি মধ্যে মধ্যে কলেজ দেখিতে যান। মধ্যে মধ্যে? শিরোমণি মহাশয়—নিত্যই যাইতেন, কোন অধ্যাপক অনুপস্থিত থাকিলে, তাহার পড়া পড়াইয়া আসিতেন। শিরোমণি মহাশয়ের একজন রাঙ্গালি ছাত্র তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিয়মিত সময়ে আসিলেন, বিপদের কথা শুনিলেন, বলিলেন, "আপনিত আজি আর যাইবেন না—আমি বলিব এখন"। শিরোমণি মহাশয় বলিলেন, "মুখে কেবল বলিবে কেন, এই আমি পত্র লিখিয়া দিতেছি" বলিয়া পত্র লিখিয়া তাঁহার হস্তে দিলেন। আর একটি কথা বলিলেই, আমি শিরোমণি মহাশয়ের যতটুক জানিতাম, তাহার একরূপ পরিচয় দেওয়া হয়।

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর পর, শিরোমণি মহাশয় আমাদের এখানে একবার আসেন। আমি পায়ের ধূলা লইয়া, তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে—সেই যে অগাধ গাম্ভীর্য্য তাহা যেন হঠাৎ উথুলিয়া উঠিল, বাঙ্‌-নিষ্পত্তি হইল না, শ্বাস পড়িল না, কোনরূপ স্পন্দন হইল না, সেই বিশাল চক্ষুর্দ্বয়ের দুই কোন দিয়া ধীরে ধীরে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। সেই ধারা দুইটিই চলিতেছে,—আর সমস্ত অঙ্গ অচল অটল। আমার চোখে জল দেখিয়া, তিনি সে ধারাও সম্বরণ করিলেন। বলিলেন "আমিও আমার সেই শেষ পৌত্রটিকে হারাইয়াছি। তাহার বিবাহের সম্বন্ধ একরূপ স্থির করিয়াছিলাম।" বুঝিলাম প্রকারান্তরে আমাকে বলিতেছেন—সংসারে তোমা অপেক্ষাও দুঃখী বিস্তর আছে। আছেই ত! হা ভগবন্! তাই কি অভাগাদের এক মাত্র সান্ত্বনা!!!

তেমন সরল হৃদয়ের সেই সহজ সান্ত্বনা, তেমন পবিত্রা সহানুভূতি, আর বুঝি দেখিতে পাইব না। তেমন পূরা দেশী ধাতুর গড়া জিনিষ আর বুঝি হইবে না! তেমন, বিদেশে দিশি বাঙ্গালীর গৌরব, বোধ করি, চির অস্তমিত হইল! হও ভাই, মিলে মিশে বড় নেশন হও; বাজাও ভাই বিজ্ঞানের ডঙ্কা দেশে বিদেশে; কিন্তু খাটি হিন্দু খাটি স্বদেশীর বিপুল গৌরবের ঠাট,—বুঝি এইবার যে ভাঙ্গিল, আর গড়িবে না। জানি না—বিধির মনে কি আছে?

কদমতলা, চুঁচুড়া। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

সমালোচনা।

পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য রক্ষা। শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা যে কি আনন্দ পাইয়াছি—তাহা লিখিয়া বুঝাইতে পারিব না। বইখানি যেন আমাদিগকে আশ্বাস দিবার জন্যই লেখা হইয়াছে। পৌষ মাসের পূর্ণিমায় 'আমাদের আপনাদের কথার' মধ্যে বলি—"শিক্ষা বল, বিদ্যা বল, গুণপণা বল, ধন বল, যশ বল, শরীর বহিলেই ত সব। যাহাতে আমরা সেই শরীর সুস্থ রাখিয়া বসবাস করিতে পারি, তাহার জন্য অগ্রে আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে। * * * সর্ব্বরূপ আন্দোলনে বিশ্রাম দিয়া এই কার্য্যে লাগিয়া যাও; উদাসীনতায় আলস্যে, নির্ব্বুদ্ধিতায় আসল খোয়াইয়া নকলের জন্য লালায়িত হইও না"। যদিও এই পুস্তকের,—দ্বিতীয় সংস্করণ, তথাপি মনে হইতেছে, যেন আমাদের ঐকান্তিক আহ্বানে এই পুস্তকের প্রচার হইয়াছে। পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য রক্ষা এই কথা কয়টিতেই আমাদিগকে মোহিত করিয়াছে। এইরূপ পুস্তকেরই ভূয়ো প্রচার হওয়া এখনকার দিনে বিশেষ প্রয়োজন। কিরূপে

পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হয়, এখনকার দিনে কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, ইহাতে তাহা অতি সহজ সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। জল নিকাশের অভাব, বিশুদ্ধ জলের অভাব, দূষিত বায়ু সেবন, বাস গৃহের ব্যবস্থা এবং স্নানাহার নিদ্রা ব্যায়াম প্রভৃতি সকল বিষয়ই ইহাতে পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এমন ক্ষুদ্র পুস্তকে এতগুলি অতি প্রয়োজনীয় গুরুতর কথা, এমন ভাবে আলোচনা—আমরা দেখি নাই। ৪৮ পৃষ্ঠা-ব্যাপী পুস্তক, বেশ ভাল কাগজ, সুন্দর ছাপা, অতি সহজ ভাষা, বেশ চক্ চকে চিত্রিত মলাট—মূল্য একআনা। এমন প্রয়োজনীয় অথচ নিতান্ত সুলভ পুস্তকের দ্বারায় ভূয়োপ্রচার যদি না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, আমাদের মধ্যে আর প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আদর নাই—আমরা নিতান্তই অধঃপাতে গিয়াছি। আমাদের একান্ত অনুরোধ, তোমরা হরিষে বিষাদ ঘটাইও না। পুস্তক পড়িয়া যে আনন্দ পাইয়াছি,—প্রচার দেখিয়া তাহা যেন বৃদ্ধি পায়।

কদমতলা, চুঁচুড়া। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

[বিজ্ঞাপন।]

কাব্যকথা or Studies in Literature. (মূল্য ১।০ মাত্র।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায় :—

(১) মেসার্স এস্, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং
৫৪নং কলেজষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

(২) শ্রীযুক্ত হিমাংশুশেখর রায়—
৫৫নং কলুটোলাষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

(৩) শ্রীহরিনাথ রায়—কুঠীবাড়ী, কলিকাতা।

হৈমবতী।

সপ্তম অধ্যায়।

হরিশের গৃহত্যাগে গ্রামের সকলেই শরতের প্রতি সহানুভূতি দেখাইল। সেই হীরার ফুল হারাইবার পর দিন হইতে কেহই হরিশকে ভাল ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে দেখে নাই। সে পূজাবাড়ীতে যাইয়াও ঠিক চোরের মত দু'টী আহার করিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। ইহা শরৎ এবং হৈমবতী উভয়েই দেখিয়াছেন। হরিশ একদিন অন্যমনস্কের ন্যায় মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "মা হীরার ফুলের দাম কত?" মা তাহার উত্তর দিতে পারেন নাই। শরতের মনে হইল, হরিশ অর্থোপার্জ্জনের আশায় কোথাও চলিয়া গিয়াছে। নিতাই অনুমান করিল, কথক মহাশয় কার্ত্তিক মাসে যেখানে কথা কহিতে যাইতেন, বালক সেইখানেই গিয়াছে।

শরৎ একবার কলিকাতায় সতীশকে তার করিতে কহিলেন। তারের উত্তর আসিল, হরিশ কলিকাতায় সতীশের বাসায় যায় নাই। সতীশকে একখানি চিঠি লেখা হইল। নিতাই কহিল, আমি যেয়ে তাকে নিয়ে আস্‌ছি। সে শরৎকে সান্ত্বনা দিয়া জাগীর যাত্রা করিল। একজন প্রতিবেশী পুত্র তাহার সঙ্গে গেল। শরৎ কহিয়া দিলেন তাকে দেখ্‌তে পেলেই আমাকে একটা তার করো, আর যত শীঘ্র পার তাকে নিয়ে ফিরে এসো।

অষ্টম অধ্যায়।

ঢাকা জেলায় জাগীর বন্দর এক অতি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান। জাগীর ধলেশ্বরী নদী তীরে অবস্থিত। এখানে ধান, চাউল, শরিষা, তিশি, তামাক, সুপারি, নারিকেল, চিনি, লবণ, প্রভৃতির প্রভূত পরিমাণে ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। বৎসরের যে কোন দিনে যে কোন সময়ে জাগীর গেলে দর্শক নদীর ঘাটে শতাধিক বড় বড় নৌকা দেখিতে পাইবেন। নৌকাগুলির অধিকাংশই পশ্চিম দেশীয়। পাটনা প্রভৃতি স্থান হইতে আসে। বলা বাহুল্য, জাগীরে অনেক মহাজনের দোকান এবং গুদাম আছে। মহাজনদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। ইহারা প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে

বন্দরে কথা দিয়া থাকেন। হরিশের পিতা পনের বৎসরের অধিক হইবে ইহাদের কথক ছিলেন। তাঁহাকে চিঠি লিখিয়া জবাব না পাইয়া জাগীরের দুইজন লোকই ভাদ্র মাসে ইহাদের বাড়ীতে গিয়াছিল।

হরিশ দুইবার পিতার সঙ্গে জাগীর আসিয়াছিল। নিতাই ইহাতেই অনুমান করিয়াছে যে, সে জাগীরই যাইয়া থাকিবে।

হরিশের গৃহত্যাগের পাঁচ দিন পরে সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, বৃদ্ধ নিতাই আসিয়া জাগীর পৌঁছিল এবং দেখিল তখন বন্দরে কথা আরম্ভ হইয়াছে। বালক হরিশচন্দ্র কথকের আসনে উপবিষ্ট। নিতাই তাহাকে কিছু না বলিয়া নিকটস্থ তারের আপিসে যাইয়া শরৎকে তার করিল যে হরিশ ভাল আছে, সে তাহার দেখা পাইয়াছে।

তার করিয়া নিতাই অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল এবং তৎক্ষণাৎ জাগীরে ফিরিয়া না আসিয়া পথে মুখ হাত ধুইয়া লইল। সে যখন জাগীরে ফিরিল, তখন বেশ একটু রাত্রি হইয়াছে এবং দু একজন লোক হরিশের কথা শুনিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছে। তাহাদের মুখে এই বালকের সুখ্যাতি শুনিয়া বৃদ্ধ নিতাইয়ের মন আনন্দে ভরিয়া গেল। লোকগুলি একবাক্যে কহিতেছে "সরস্বতীর দয়া না হইলে এমন হইতে পারে না। পোনর বছরের পোলা, সেই কি এমন কথা কইবার পারে? এ পোলা বাপেরে ছাড়ায়ে উঠ্‌বে"।

নিতাই জাগীর আসিয়া দেখিল, হরিশের কথকতা শেষ হইয়াছে। আর একজন নূতন কথক কথা কহিতেছেন। নিতাই তাহার পরিচিত গুরু-চরণের বাসায় গেল এবং সেখানে হরিশের সাক্ষাৎ পাইল। বন্দরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাজনের গদীয়ান বৃদ্ধ নরোত্তম সাহা তখন হরিশের কাছে বসিয়া আছেন এবং তাহার ভাষা, ভাব, গীত এবং কণ্ঠস্বরের প্রশংসা করিতেছেন।

বৃদ্ধ নিতাইকে দেখিয়া নরোত্তম যথোচিত সমাদর প্রদর্শন করিলেন। নিতাই কহিল, উনি ত এসে এখানে কথা কইছেন, আর মা ঠাকরুন ওঁর জন্যে ভেবে অস্থির। আমি ওঁকে নেবার জন্য এসেছি।

ন। উনি যে মাকে বলে আসেন নি, তা বুঝ্‌তে পেরেছি। এবার আমরা কথার জন্য অন্য লোকও ঠিক করেছি, কিন্তু আসছে বছর থেকে ওঁকেই আস্‌তে হবে। উনি কথা কহিতে পারবেন জান্‌লে কি আমরা

অন্য ব্রাহ্মণ আনি? তুমি কাল পরশু দুটোদিন অপেক্ষা কর, বন্দরের সকলেই বলেছে, ওঁকে কিছু সাহায্য করবে। কথক মহাশয়ের শ্রাদ্ধে আমরা কিছুই দি নাই, আর ওঁর ভগ্নীও বিবাহের উপযুক্ত শুনেছি।

নিতাই মহাসন্তুষ্ট হইল। তৃতীয় দিনে নরোত্তম, বালক হরিশের হস্তে একশত টাকা আনিয়া দিল এবং পাথেয় ও প্রণামী বলিয়া আরও পনেরটী টাকা দিল।

হরিশ নিতাইকে বলিল, নিতাই দাদা, কলকেত্তা হয়ে যেতে হবে। নিতাই বিশেষ আপত্তি করিল না। তাহারা সতীশের বাসায় গেল। হরিশ, মামাকে কহিল, মামা বাবু, আপনি হৈমর জন্য দুটো হীরের ফুল কিনে দিন, আমি টাকা এনেছি।

বালকের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া সতীশ তাহার কথা রাখিলেন এবং হৈমবতীর জন্য দুইটী হীরার ফুল কিনিয়া দিলেন।

হরিশ ফুল দুটী লইয়া নিতাইয়ের সহিত বাড়ী ফিরিল।

যে দিন বাড়ীর গৃহিণী কর্ত্তৃক হৈমবতীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার হয়, বালক হরিশ সেই দিন হইতেই মনে মনে ভাবিতেছিল, আমি যদি ভিক্ষা করিয়াও ভগ্নীকে দুটী ফুল দিতে পারি। জাগীর বন্দরের মহাজনেরা তাহার পিতাকে বড়ই ভক্তি করিতেন, ইহা হরিশের জানা ছিল, তাই সে কাহাকেও না বলিয়া একাকী জাগীর যাত্রা করিয়াছিল। বন্দরের লোক-গুলির সদাশয়তায় বালকের ইচ্ছা ফলবতী হইল।

নবম অধ্যায়।

দেবরাজপুরের দীনদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় একজন অতিশয় ধনবান ভূস্বামী ছিলেন। এক পুত্র এক কন্যা রাখিয়া তিনি অল্পদিন হইল দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। পুত্র দুর্গাদাস বাইস বৎসরের যুবক। তাঁহার বিবাহ অল্প বয়সে হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হইয়াছে। এত দিন কালাশৌচ ছিল বলিয়া পুনরায় বিবাহ হয় নাই। এই দুর্গাদাসের সহিত শৈলবালার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে। কথা আছে পাত্রী দেখিয়া পছন্দ হইলে অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ হইতে পারে।

দীনদয়াল তাঁহার কন্যা এবং জামাতাকে বাড়ীর নিকটে এক পৃথক

বাড়ী এবং কিছু ভূসম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন। দীনদয়ালের মৃত্যুর পর হইতে এই জামাতাই দুর্গাদাসের অভিভাবক স্বরূপ হইয়াছেন। দুর্গাদাসের মাতা জীবিত আছেন কিন্তু তিনিও জামাতার অনভিপ্রায়ে কোন কার্য্য করিতে চাহেন না। জামাতা রাজীবপুরের গাঙ্গুলী বংশের লোক। তিনি এখন শ্বশুরালয়ে বাস করিতেছেন।

হরিশের গৃহত্যাগের আট দশ দিন পরে, একদিন দুর্গাদাস এবং তাঁহার ভগ্নীপতি পাল্‌কী করিয়া রাজীবপুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা কলিকাতা যাইবেন। রেলওয়ে ষ্টেসনে যাইতে হইলে রাজীবপুর হইয়া যাইতে হয়। ঘটক মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে, রাজীবপুরে এক বেলা অবস্থিতি করিয়া তাঁহারা কন্যা দেখিয়া যাইবেন।

বলা বাহুল্য, দুর্গাদাস এবং তাঁহার ভগ্নীপতির এই একবেলার আহারের নিমিত্তই গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাড়ীতে দু তিন দিন ধরিয়া মহাধূম পড়িয়া গিয়াছে। প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোকেরা অনেকেই আসিয়াছেন। গাঙ্গুলী মহাশয়ের একমাত্র কন্যা দেখিতে এক ধনবান ভূস্বামী আসিতেছেন, ইহা রাজীবপুর গ্রামের এক মহা ব্যাপার সন্দেহ নাই। কলিকাতা হইতে নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য আসিয়াছে। গ্রামের গোয়ালারা দধি, ক্ষীর, ছানা প্রভৃতির বায়না লইয়াছে। ধীবরেরা মৎস্য আনিবার এবং পুকুরে ধরিবার আদেশ পাইয়াছে। আজ সকাল হইতে পাড়ার প্রৌঢ়া প্রতিবেশিনীরা একে একে বা দল বাঁধিয়া আসিয়াছেন, এবং কেহ বা রন্ধন সম্বন্ধে, কেহ বা কন্যা সাজানো বিষয়ে অযাচিত ভাবে পরামর্শ এবং উপদেশ দিতেছেন। যাঁহাকে যাহা বলা হইতেছে, তিনি তাহাই করিতেছেন।

এ ত গেল অন্দরের কথা, বাহিরেও বিস্তর লোক আসিয়া জমিয়াছে। আত্মীয় বন্ধু বান্ধব, নাপিত, পুরোহিত প্রভৃতি অনেকেই আসিয়াছেন। দুর্গাদাস এবং তাঁহার ভগ্নীপতির পাল্‌কী গ্রামে প্রবেশ করিলে গ্রামের অর্দ্ধেক লোক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। ফলতঃ অন্য কোন বাড়ীতে বিবাহের বর আসিলে যত লোক দেখিতে যাইত, গোবিন্দ গাঙ্গুলী মহাশয়ের কন্যার ভাবী বর দেখিবার জন্য তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক লোক আসিল। বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবতী, বধূ, শিশু, এবং শ্রমজীবি কৃষক প্রভৃতি যাহারা যাইতে

অক্ষম তাহারাই গেল না। আর গেল না কেবল হৈমবতী। তাহার জননী শরৎ সুন্দরীও গৃহত্যাগ করিলেন না।

মাতা পুত্রী উভয়েরই মন বিষন্ন ইহা পাঠক জানেন। হরিশ গৃহত্যাগী না হইলে হৈমবতী বোধ হয় হীরার ফুল হারানোর ব্যাপারে আপনার লাঞ্ছনাও ভুলিয়া যাইত এবং শৈলদের বাড়ী যাইবার জন্য মার অনুমতি চাহিত। কেন না শৈলবালা তাহার বাল্য সহচরী—আর সে কখনও তাহার প্রতি কোন রূঢ় ব্যবহার করে নাই। কিন্তু হরিশের জন্য মাতা প্রায় শয্যাশায়িনী। হৈমবতীর তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে প্রাণ সরিল না। হৈমবতী বালিকা। বালক বালিকার কৌতুহল স্বাভাবিক। দুর্গাদাসের পাল্‌কী কথক মহাশয়ের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইবে ইহা সে জানিত। বেহারাদের শব্দ শুনিয়াই সে মনে করিল, বাহিরের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া একবার শৈলবালার বরকে দেখিলে ক্ষতি কি? বালিকা বাহিরে আসিয়া সেই কাঁচা ঘরের বারাণ্ডায় একটী বাঁশের খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইল এবং পাল্‌কীদ্বয় নিকটবর্ত্তী হইলে, সে যথাক্রমে দুর্গাদাস এবং তাঁহার ভগ্নীপতির প্রতি একটীবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিল। তাঁহারাও বালিকাকে দেখিলেন, পরন্তু দুর্গাদাস যতদূর অবধি দৃষ্টি চলিল, পাল্‌কীর ভিতর হইতে ঘাড় বাঁকাইয়াও হৈমবতীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বালিকা ইহা দেখিতে পাইল না, কেন না তাহার প্রতি দুর্গাদাসের প্রথম দৃষ্টি পতিত হইবা মাত্রই সে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং পাল্‌কীর পশ্চাদ্বর্ত্তী বেহারা ও গ্রামের লোকদিগকে দেখিতে লাগিল।

হৈমবতীর অঙ্গে অলঙ্কার নাই বলিলেই চলে। নাকে একটী অল্প মূল্যের নোলক, আর হাতে দুগাছি সরু বালা বই তাহার গায়ে আর কিছুই ছিল না। কান, গলা, কোমর, উপর হাত, পা প্রভৃতি সকলই খালি। বালিকার বস্ত্রখানিও সামান্য এবং অর্দ্ধ মলিন, আর তাহার মুখে বিষাদের কালিমার রেখা ছিল। ইহাতেই কিন্তু তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। কালিদাস কহিয়াছেন:—

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপিহিমাংশোর্লক্ষ্মলক্ষ্মীং তনোতি

ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডণং না কৃতীনাং।

বস্তুতঃ এই পরমাসুন্দরী বালিকা নিরাভরনা হইলেও, দুর্গাদাসের চক্ষে সৌন্দর্য্যের চিত্রবৎ প্রতীত হইয়াছিল এবং তজ্জন্যই তিনি এক দৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়াছিলেন।

দশম অধ্যায়।

গাঙ্গুলী মহাশয়ের আদর যত্নে এবং তাঁহার বাড়ীর আহারের পারিপাট্যে দুর্গাদাস পরম আপ্যায়িত এবং সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু অপরাহ্নে কন্যা দেখিয়া তিনি বিশেষ প্রসন্ন হইলেন না, হৈমবতীর সৌন্দর্য্য তাঁহার—চক্ষে লাগিয়া ছিল। শৈলবালাকে কুৎসিৎ বলিয়া মনে হইল। শৈলবালার অঙ্গে অলঙ্কার অনেক ছিল। তাহাতে দরিদ্রের মন উঠিতে পারে। ধনী সন্তান দুর্গাদাস অলঙ্কারে মুগ্ধ হইবার নহেন। রূপের হিসাবে বস্তুতঃই হৈমবতীর পার্শ্বে দাঁড়াইলে শৈলবালা কুৎসিৎ।

কন্যা দেখা হইয়া গেলে ঘটকজী দুর্গাদাসের মত জানিতে চেষ্টা করিলে, তিনি তাঁহার ভগ্নীপতিকে কহিলেন "বলুন, কলিকাতায় যাইয়া চিঠি লিখিব"।

রেলওয়ে ষ্টেসনে পৌঁছিয়াই দুর্গাদাস তাঁহার ভগ্নীপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা, গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাড়ী যাইতে রাস্তার ধারে একটী মেয়ে দেখ্‌লাম, ওটি কার বলতে পারেন? একখানা কালা পেড়ে আদ ময়লা কাপড় প'রে একটা বাঁশের খুঁটি ধরে দাঁড়াইয়াছিল।"

জামাই বাবুর বুঝিতে বাকী রহিল না যে দুর্গাদাস কথক মহাশয়ের কন্যার কথা কহিতেছেন। তিনি উত্তর করিলেন "ও গুরুচরণ গাঙ্গুলীর মেয়ে। ওমন সুন্দরী মেয়ে আমাদের গ্রামে আর নাই। গোবিন্দ গাঙ্গুলীর কন্যা ওর কাছে কাল পেঁচা বলিলেও চলে"।

দুর্গাদাস বালকের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ও মেয়েটীর ত বিবাহ হয় নাই? আমাদের করণীয় ঘর ত বটে? তাঁহার ভগ্নীপতি কহিলেন, করণীয় ঘর তাহাতে সন্দেহ কি? গোবিন্দ গাঙ্গুলী মহাশয়ও যেমন, গুরুচরণ গাঙ্গুলীও তেমনই। আমার দশ রাত্রের জ্ঞাতি। আর বিবাহের হিসাবে গোবিন্দ

গাঙ্গুলীর মেয়ের চাহিতেই এ মেয়ে ভাল, কেন না, গুরুচরণ গাঙ্গুলী মহাশয়ের পুত্র আছে, গোবিন্দের তা নাই। কন্যাটী তুমি ভাল ক'রে দেখেছ?

দু। না, ভাল করে দেখ্‌বো কেমন করে? পাল্‌কীর ভিতর থেকে যা দেখতে পেয়েছি। ভগ্নীপতি কহিলেন, যদি দেখ্‌তে চাও দেখাতে পারি। ওর এক মামা আছে কলিকাতায়। তার বাসায় এলে তোমাকে দেখিয়ে দেবো।

দু। আপনি সেই বন্দোবস্ত করুন। গয়না নিয়ে আমি কি করবো?

দুর্গাদাসের মন বুঝিয়া তাঁহার ভগ্নীপতি কহিলেন, যদি কেবল বংশ এবং কন্যা দেখিয়া বিবাহ করিতে হয়, তাহা হইলে কথক মহাশয়ের মেয়ে, শৈলবালা অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। তিনি গাড়ীতে উঠিয়া শ্যালককে কথক মহাশয়ের চরিত্র সম্বন্ধে দু চারিটী কথা বলিয়া দুর্গাদাসের নিকট তাঁহার অনেক সুখ্যাতি করিলেন এবং কহিলেন, তিনি একজন খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন।

সেইদিন রাত্রিতেই কলিকাতায় পৌঁছিয়া, দুর্গাদাসকে বাসায় রাখিয়া, জামাই বাবু সতীশের বাসায় গেলেন এবং তাহাকে সমস্ত কথা কহিলেন। সতীশ এই সম্বন্ধের প্রস্তাবে হাতে স্বর্গ পাইলেন এবং তাহার পরদিনই রাজীবপুর যাইয়া দিদিকে বলিয়া হৈমবতীকে লইয়া আসিলেন। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দুর্গাদাস আসিলেন এবং হৈমবতীকে দেখিলেন। সতীশের স্ত্রী তাহাকে যথাসাধ্য সাজাইয়া দিয়াছিল, বালিকা দুর্গাদাসের প্রতি দৃষ্টি করিতে পারিল না। কেন বলিতে পারি না। দুর্গাদাসের সম্মুখে দাঁড়াইয়াই বালিকা কাঁপিতে লাগিল এবং মুখ তুলিতে পারিল না। সতীশ দু তিনবার জিদ করায়, তাহার ব্রীড়া এবং বিষাদ মাখা সে মুখ তুলিল বটে, কিন্তু দুর্গাদাসের দৃষ্টি তাহার চক্ষে পতিত হইবা মাত্রই সে মুখ পুনরায় নত করিল।

দুর্গাদাস সতীশকে ইঙ্গিত করিলেন "কহিতে বলুন"। তিনি বালিকার চক্ষুর্দ্বয়ের প্রতি একবার দৃষ্টি করিয়াই মুগ্ধ হইলেন। তাহার অঙ্গের লাবণ্য পূর্ব্বেই দেখিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইল এ সৌন্দর্য্যে বস্ত্রালঙ্কারের প্রয়োজন নাই।

সতীশের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া দুর্গাদাস তাঁহার ভগ্নীপতিকে কহিলেন 'আপনি মার মত করান, আমি এই বালিকাকেই বিবাহকরিব,

জামাই বাবু ইহাতে সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হইলেন না। কথক মহাশয়ের প্রতি তাঁহার ভক্তি ছিল। তিনি স্মিত মুখে শ্যালককে কহিলেন, আমার বিবাহের পূর্ব্বে যদি করণীয় ঘরে এমন কন্যা পাইতাম, তাহা হইলে আমি তোমার ভগ্নীকে ফেলিয়া তাহাকেই বিবাহ করিতাম।

দুর্গাদাস কহিলেন, কথক মহাশয়ের কন্যা ত আপনার সম্পর্কে ভগিনী, দেখিবেন, বিবাহের পরে শালাজের প্রতি যেন নজর না পড়ে। ভগিনীপতি অপ্রতিভ হইলেন।

পরিশিষ্ট।

হৈমবতীর সহিত দুর্গাদাসের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। শৈলবালারও বিবাহ হইয়াছে। বিবাহের পর আট দশ বৎসর কাটিয়াছে। প্রত্যেকের দু তিনটী সন্তান জন্মিয়াছে। শৈলবালার স্বামীও জমীদারের পুত্র। এখন তাঁহার সংসারে অবনতির অবস্থা। তিনি মদ্যপায়ী, তাঁহার স্বভাবে অন্য-বিধ দোষও আছে। দুর্গাদাসের চরিত্র নির্ম্মল এবং পবিত্র। হৈমবতীও স্বামীর উপযুক্ত সহধর্ম্মিনী হইয়াছেন। দরিদ্রের প্রতি স্বামী স্ত্রী উভয়েরই সমান দয়া, দেবতা ব্রাহ্মণে দুইএরই অচলা ভক্তি। ভগবানের প্রতি দম্পতির অটল বিশ্বাস।

শৈলবালার মাতার কাল হইয়াছে। তাঁহার স্বামী শ্বশুর গৃহেই অবস্থিতি করিতেছেন। গোবিন্দ গাঙ্গুলী মহাশয় কাশী গিয়াছেন।

হরিশ পিতার বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। কথকতায় তাহার যশ হইয়াছে।

হৈমবতীর বড় মামা সুরেশের স্বভাব অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে। তিনি এখন কলিকাতাতেই থাকেন। বাড়ীতে প্রায়ই আসেন না। মামী-ঠাকুরাণী বাড়ীতে একাকিনী থাকেন। নূতন বউএর স্বামীর প্রতি প্রভুত্বের শেষ হইয়াছে। সতীশ তাহাকে মাসে মাসে কিঞ্চিৎ সাহায্য করেন। সুরেশের পুত্র পঞ্চানন পিতৃব্যের বাসায় থাকে। পিতা তাহাকে দু একবার কুস্থানে লইয়া গিয়াছেন বলিয়া সতীশ আর তাহাকে বাপের সঙ্গে যাইতে দেন না। সে কলেজে পড়িতেছে।

বৃদ্ধ নিতাই দাসের গঙ্গালাভ হইয়াছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

সন্ধ্যা।

সারাদিন ভোর করি বহু শ্রম,
সাঁঝেতে শিথিল কায়,
ধীরি ধীরি রবি ফিরিল আলয়ে,
স্বেদ সোণা ঝরি যায়!
পতিরে হেরিয়া—— পূত সন্ধ্যা রাণী,
যতনে গুছায় সব ;—
শ্বেতকাশফুল—— বসন আনিল ;
আনিল পানীয় নব ;
বনকুঞ্জ হ'তে আনে মুঞ্জফল,
পতি-পরিতোষ তরে ;
অমল শীতল সলিল আনিল,
পদ দুটী ক্ষালিবারে ;
পতিরে পাইয়া করিয়া যতন,
সম্ভ্রমে সন্ধ্যা রাণী,
স্বর্ণময় ঝাড়ি আনিয়ে পতির
ধুয়াইল পা'দুখানি !
স্বেদসিক্ত বাস ধৌত করিল,
পূত ভাগীরথি নীরে ,
ছড়াইয়ে পড়িল গলিত স্বর্ণ,
তরঙ্গের শিরে শিরে !
ফুলবাস ভরা আপনার বাস,
বিথারিয়ে দিল ভূমে ;
সতীর আঁচলে অবশ তপন,
ঢলিয়া পড়িল ঘুমে !

দ্বারকার পথে।

[১০]

অনেকক্ষণ বসিয়া থাকার পর একজন বা দুইজন কর্ম্মচারী আসিলেন, তাঁহারা গুজরাটী। আমি বলিলাম, আমি কংগ্রেস দেখিতে আসিয়াছিলাম, আমায় কষ্টম হাউসে আটকান কেন—আমি কি নূতন কাপড়ের ব্যবসা করিতে আসিয়াছি? কর্ম্মচারী মহাশয় দয়া করিয়া সর্ব্ব প্রথমেই আমাকে পরীক্ষা না করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। তখন একজন পাচক ব্রাহ্মণের বাসার উপস্থিত হইয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। Queen Bee বা Queen Ant দেখিয়াছেন? রূপীর দলে সন্ন্যাসী গোদা দেখিয়াছেন—কবি থাকিলে বলিতেন "পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ"—যেন দ্বাপর যুগের লোক, যেমন লম্বা তেমনি চওড়া, তেমনি বলিষ্ঠ। তিনি বলিলেন, বেশী পয়সা না পাইলে আমি ভদ্রলোককে রাঁধিয়া দিই না। আমি ঠিক কোন্ সময়ে ষ্টীমার ছাড়িবে জানিতে আফিসে গেলাম। পোরবন্দরের টিকিট বাবুর চিঠি প্রদান করিয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি চিঠি পড়িয়া এমন তাড়া দিলেন যে আমি অস্থির, তিনি দেখাইয়া দিলেন যে ঐ জাহাজ আসিয়া লাগিয়াছে, আপনি এখনই যান নহিলে জাহাজ পাইবেন না। ফিরিয়া আসিয়া মোট ঘাট লইয়া আবার নৌকায় উঠিলাম। পাচক মহাশয় বলিলেন, যথেষ্ট সময় আছে, আপনি স্নানাহার করিয়া যাইতে পারিবেন, দুপুরের পর জাহাজ ছাড়িবে। কিন্তু আমি আপীসের বাবু কেন মিথ্যা বলিবেন বুঝিতে না পারিয়া মিঠা জল কিনিয়া স্নান করিয়া লইয়াই জাহাজে উঠিবার জন্য নৌকায় উঠিলাম। নৌকা ছাড়িয়া চলিল। যথা সময়ে "মহানদী" আগুণে বোটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মাণ্ডবী দেখার সাধ হৃদয়েই রহিয়া গেল। বেলা দুপুরের পর "মহানদী" ছাড়িল। আমি তখন বুঝিলাম, আপীসের বাবুটি একটি জন্তু, হাবা বটে কিন্তু হারামজাদা নহে। এই আমার ধারণা, তবে মা জানেন—মনের কথা।

সে দিন উপবাসী রহিলাম—ভালই হইল—তবে নিরম্বু নহে। সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট রাখি বটে কিন্তু বসিবার স্থান নাই। বার বার কর্ম্মচারীরা

বলিল, আপনি প্রথম শ্রেণীর টিকিট লউন। আমি শুনিলাম না। ষ্টীমারে এত কষ্ট আর কখনও পাই নাই। তবে অপর রকমের সুখ ছিল। জাহাজ যাঁহারা চালাইতেছিলেন, কাপ্তেন সারেঙ্গ প্রভৃতি সকলেই ভারতবাসী। তাঁহাদের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। জানিলাম তাঁহারা এ বিদ্যা বোম্বাই সহরে লাভ করিয়াছেন। বোম্বাই সহরে নৌ বিদ্যা শিখিবার বিদ্যালয় আছে। তাঁহারা পাশ হইয়া কৃতিত্বের নিদর্শন পত্র পাইয়াছেন ও তাহারই বলে আবার চাকরী পাইয়াছেন। জানিলাম যে তাঁহারা চীন, জাপান, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি সকল স্থানেই যাইতে সক্ষম ও সকল স্থানেই জাহাজ চালাইতে সক্ষম অথচ ইংরেজী জানেন না। তাঁহাদের ষ্টীমার চালান বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ দেখিলাম। অত্যন্ত আনন্দ হইল, ইঁহারা কিন্তু সকলেই মুসলমান। পার্সীরাও এ কাজ করেন ও বুঝেন। তাই বলিতেছিলাম, ভারতের ভাগ্যে যদি কখনও পোত-বল হয়, তবে বিদেশ হইতে লোক আনাইতে হইবে না, সক্ষম ভারতবাসীর অভাব হইবে না।

বেলা ৪ টার সময় কাপ্তেন আমার হস্তে দূরবীন দিলেন ও অঙ্গুলি নির্দ্দেশে একটি দিক দেখাইয়া দিলেন। দূরবীন চক্ষে লাগাইয়া সেই দিক দেখিবা মাত্র আমি একটি মন্দিরের চূড়া দেখিতে পাইলাম। দূরবীন রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "দ্বারকাজীর মন্দিরের চূড়া না কি?"—কাপ্তেন শিরশ্চালনে উত্তর দিলেন "হাঁ"। আমি ভক্তিভাবে প্রণাম করিলাম। কত কালের, কত যুগের আশা, আজি গুরু কৃপায় চরিতার্থতা লাভ করিবে। আজ কি আনন্দের দিন। বসিয়া চারিদিকে চাহিলাম—অগাধ নীল জল রাশি আর তত গাঢ় নীল নহে যেন বর্ণের তারতম্য ঘটিয়াছে।

ক্রমেই "নীল" কাটিয়া যাইতেছে, ক্রমেই বর্ষার কর্দ্দম আবিলতার বর্ণে "নীল" পর্য্যবসিত হইতেছে। কেন এমন হইতেছে? কে যেন কর্ণে বলিয়া দিল, এ যে দ্বারকাপুরী। দ্বারকাপুরী যে মহাসমুদ্র গ্রাস করিয়াছিল। এখনও দুই স্থলে দ্বারকাপুরী, উপকূলে দ্বারকাপুরী ও বেট দ্বারকাপুরী। বেট অর্থে দ্বীপ। যাহা ডুবে নাই, যাহা ভাসিয়া আছে—তাহাই বেট দ্বারকা, তবে জলের মধ্যে এক বিশাল পুরী আছে, সেই জন্য জলের বর্ণ তফাৎ হইতেছে।

আর একটি অপরূপ দৃশ্য দেখিলাম, যখন বেলা দুপুরের পর মাণ্ডব হইতে ষ্টীমার ছাড়িল, তখন কতকগুলি পক্ষী জাহাজের সঙ্গে উড়িয়া উড়িয়া আসিতে লাগিল। জাহাজ হইতে খাদ্য দ্রব্য ফেলিয়া দিলে ইহারা আহার করে—আর সমুদ্র মৎস্যও আহার করে। ইহাদের নাম সী-গল্ (See gull) ইহাদের বিরাম বিশ্রাম নাই, ক্রমাগতই উড়িতেছে। কখনও কখনও বা সমুদ্র জলে বসিয়া একটু বিশ্রাম করে—কেহ বা আদৌ বিশ্রাম করে না, আবার উড়িয়া আসিয়া জাহাজ ধরে, এইরূপে ক্রমাগত চলিতেছে। জগদম্বার রাজত্বে অনেক ব্যাপার আছে—অনায়াসে ৫০ ক্রোশ একেবারে উড়িয়া যাওয়া—তাহারই মধ্যে একটি। পাখী দেখিতে বেশ।

আমরা দিবাবসানে দ্বারকাপুরী পঁহুছিলাম। একটি বাসা ঠিক করিয়া —সমুদ্রের নিকটেই একটি বাসা লইলাম—তালা বন্ধ করিয়া ধূলা পায়ে দেব দর্শন করিতে গেলাম। স্থানটি গুইকুমারের রাজ্য। পাহাড়ের উপর পুরী। সমুদ্র হইতে পাহাড় উঠিয়াছে, পাহাড় কাটিয়া পুরী। এখন সভ্যতা কোনও স্থানই ত্যাগ করেন নাই। তাই মার্ব্বেল বাঁধান মন্দিরতল ও লাট মন্দিরতল, তাই ইলেকট্রিক আলো। ইত্যাদি ইত্যাদি। মন্দিরের চূড়াটি দাক্ষিণাত্যের মন্দিরের মত, অর্থাৎ তাহার পর হাতিয়ার খানার সমতুল্য। অনেক স্থলে গোলা গুলির দাগ। দুর্দ্দান্ত কাবা সম্প্রদায় যখন জোর করিয়া এই মন্দির অধিকার করিতে আসে, তখন যুদ্ধ হইয়াছিল। কাবারা পাহাড়িয়া ভীলজাতী, আমাদের দেশের বর্গীর মত অত্যাচারী ছিল। এখন ঠাণ্ডা হইয়াছে। আরতি দেখিলাম, মার্ব্বেল তলে বসিয়া একটি গীত শুনিলাম, গাহিতেছেন একজন স্ত্রীলোক। আর শুনিতেছেন, ভারতের সর্ব্ব দেশের লোক।

স্ত্রীলোকটির কণ্ঠস্বর মধুর। তাহার উপর তিনি ভাবে ভোর হইয়া গাহিতেছিলেন। গান শুনিতে শুনিতে যেন দেহ মন প্রাণ সমস্ত সুরে ডুবিয়া গেল। কখনও সুর স্তরে স্তরে উঠিতেছে, কখনও স্তরে স্তরে নামিতেছে—আবার উঠিতেছে, আবার নামিতেছে। গানের মর্ম্ম এই—"হে রণছোড়্জি! তোমার সে দিন কি মনে পড়ে যখন জরাসন্ধের সঙ্গে তোমার রণ হইয়াছিল, যে দিন সেই রণ ছাড়িয়া তুমি এই দ্বারকায় চলিয়া আসিয়াছিলে। আবার সে দিন কি মনে পড়ে, যে দিন তুমি বাসন্তী শুক্লা রজনীতে যমুনা পুলিনে গোপ বধূ লইয়া নানারূপ ক্রীড়া (লীলা) করিয়াছিলে? ব্রজের সেই ময়ূর ময়ূরী, সেই তাল তমাল, সেই পিক ভ্রমর, সেই যমুনার কাল জল, আর শেষ সেই চন্দ্রাবলী ও শ্রীমতী রাধাকে মনে পড়ে কি হে? বোধ হয় পড়ে না। নহিলে কি করিয়া তুমি এখানে আছ?

এমন ভাবে গীত, এরূপ গান, আমি বহুদিন শুনি নাই। হৃদয় শীতল হইল, পরম শান্তি লাভ করিলাম। কংগ্রেসের রাজসিক ও তামসিক কলহ বিতণ্ডায় শিরায় শিরায় আগুণ জ্বলিতেছিল, এখন অমিয় সিঞ্চনে কে যেন নিভাইয়া দিল। চক্ষের জল ছুটিয়া পড়িল—বার বার গুরুদেবকে রণছোড়জীকে প্রণাম করিলাম। অনেকগুলি দেব দেবীর একত্রে সমাগম আছে। তীর্থ স্থানে এইরূপই হয়। এক একটি প্রকোষ্ঠে এক একটি দেব বা দেবী মূর্ত্তি—তা কাশীর বিশ্বেশ্বরও একটি প্রকোষ্ঠ অধিকার করিয়াছেন, আর কাশীর অন্নপূর্ণাও একটি প্রকোষ্ঠ অধিকার করিবার অধিকার ও স্থান পাইয়াছেন। এই সকল দেব দেবী আছেন একটি পাশের বাড়ীতে, একই বাড়ীতে ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরে আছেন তিনটি দেবতা—রণছোড়জী, বলভদ্র, টিকস্ ভগবান অর্থাৎ টিকা সাহেব অর্থাৎ পুত্র কামদেব। রাধারাণীর খোঁজ খবর নাই। এখানে বীরত্ব বিকাশ, এখানে বৃন্দাবনের প্রেমের কিছু নাই।

প্রধান পূজক একজন সেই দেশীয় ব্রাহ্মণ—লিঙ্কস্ অপেক্ষাও চক্ষুর জোর অধিক। রাত্রিতে বাসায় আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে চাহেন, আমি কতদূর যাইব। তিনি এক যবোদর স্থূল ভারে কত মণ ভার ঝুলাইলে ছিঁড়িয়া পড়িবে না, কেবল তাহারই মীমাংসা করিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন, ১৪০০ ক্রোশ আসিয়াছ, দেখিও যেন কৃপণতা করিয়া সব নষ্ট করিও না। টাকা না থাকে কিছু ভয় নাই। মুখে বলুন, আমি টাকা দিতেছি। আমি জানি তীর্থ ঋণ আপনি কিছুতেই রাখিবেন না—পরিশোধ করিবেনই। রাজা রাজড়া যায় কি না—লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত পূজা দেওয়া সম্ভব। ব্রাহ্মণ আমাকে কিরূপ ধরিয়াছেন বুঝিয়া লইবেন। ওদিকে ব্রাহ্মণ এদিকে প্রাগ্ জী আনিয়া দিয়াছেন

যাঁর বিবরে সেই পাণ্ডা ঠাকুর। তিনিও আমাকে কতদূর সহিবে তাহাই দেখিতেছিলেন। তবে তাঁর যুদ্ধ নীতি অন্যরূপ। প্রথমেই কংগ্রেস হইতে কথা আরম্ভ, তার পর আমাকে দ্বারকা পুস্তকাগারে বা অমুক—হলে লেক্‌-চার দিবার জন্য অনুরোধ। বলিলেন অমুক স্থানে সমুদ্র তটে বাংলা আছে। সব পাওয়া যায় ইত্যাদি। আমি বলিলাম, আমি হিন্দু ও আমি বড় মানুষ নহি। তখন বিলি ব্যবস্থা করিলেন, পর দিন গোমতী স্নান ও প্রায়শ্চিত্ত—ও গোদান, ইত্যাদি। বলিলেন সপ্ত জন্মের পাপ ঐ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তিরো-হিত হইবে। আমি বুঝিলাম, উভয়ের মধ্যে কেহই বড় একটা সন্তুষ্ট হইলেন না। আর যাঁহারা বড় বই পড়িয়াছে বলিয়া দেখিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারাও সেই সকল (পাণ্ডারাও) একটু বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন অর্থাৎ কিরূপ বর্ষণ হইবে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কেবল মেঘ দেখিয়া গেলেন। সমুদ্র তটে পঁহুছিয়া পরদিন প্রাতে স্নান করিবার অধিকার পাইবার জন্য রাজ দরবারে ২৲ জমা দিলাম, তাহারা রসিদ দিল। গুইকুমার অর্থাৎ বরদা-রাজ এই কর গ্রহণ করেন। পরামানিক আসিয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিল। আমি গোমতী স্নান করিলাম, তর্পণ করিলাম, পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধ করিলাম। যেমন এই সকল কার্য্য শেষ হইয়াছে, অমনি দেখি পূজারী মহাশয় দণ্ডায়মান—ইঙ্গিত করিতেছেন। শীঘ্র আসুন, পূজা হইতেছে না। আপনি না আসিলে আজ পূজা হইবে না। তাড়াতাড়ি বাসাতে ভিজা কাপড় রাখিয়া, প্রাগ্‌জী সাহায্যে পয়সা সংগ্রহ করিয়া আমি ও পূর্ণচন্দ্র রণছোড়জী মন্দিরে উপনীত। আমাদিগকে ঘরের ভিতর লওয়া হইল। তথা তখনও আলো জ্বলিতেছে। কেবল একটি মহারাষ্ট্র মহিলা ও তাঁহার বালিকা কন্যা সেই ঘরে ছিলেন। বুঝিলাম তাঁহার দশাও আমাদের দশা। এক—পূজারী মহাশয় এক ঢিলে দুইটি পাখী মারিতেছেন। যাহাহৌক আমি উহা হইতে ভাব টানিলাম। রণছোড়জীর অনাবৃত গাত্রে নানাবিধ উৎকৃষ্ট গন্ধ তৈল মাখাইয়া দিলাম। তার পর নানা জলে অনেকবার স্নান হইল, তারপর পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া পাদপদ্মে তুলসী পত্র অর্পণ করিয়া সচন্দন তুলসী পত্র মঞ্জরী দিয়া পূজা সারিয়া লইয়া তফাৎ হইলাম। আমি জপে বসিলাম, পূজারী শিঙ্গারের পর অর্থাৎ বেশভূষার পর পূজা

করিলেন ও পরে দ্বার খুলিয়া দিলেন। তারপর আরত্রিক হইল। ভক্তগণ কেহ তুলসী চড়াইতেছেন, কেহ মঞ্জরী চড়াইতেছেন, কেহ ফুল চড়াইতেছেন। কেহ ক্ষীর চড়াইতেছেন। পূজা করিয়া বিষ্ণুপদোদক ধারণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছি এমন সময় প্রাগ্‌জী বলিলেন, ভোগ চড়াইবার ব্যবস্থা করুন। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, লম্বাদৌড় ৫০০৲ টাকার ১০০৲ টাকার ইত্যাদি। আমি বলিলাম, তবে দুঃখীর কি উপায় হইবে? তখন সে কথায় কেহ উত্তর দিল না—শঙ্কমঠের বাবাজী ত কথাই কহিলেন না। পরে অনেক কষ্টে ছোট ছোট ভোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বুঝিয়াছিলাম, এ সব পাণ্ডাদের খেলা তাহাদের "বখ্‌রা" আছে।

বাসায় আসিয়া আহারাদির পর কতকগুলি ব্রাহ্মণ আসিলেন কিছু ভিক্ষার জন্য। কথাবার্ত্তায় জানিলাম, তাঁহারা যজুর্ব্বেদী। আমি পরীক্ষা জুড়িয়া দিলাম। কেহ "অগ্নিমীলে" আবৃত্তি করিল, কেহ বা ঋগ্‌বেদের পুরুষ সূক্ত আবৃত্তি করিল। শুনিলাম, একটি বেদ বিদ্যালয় আছে—বরদা রাজের স্থাপিত। অনেকগুলি ব্রাহ্মণ সন্তান তথা বেদ অধ্যয়ন করেন।

আমাদের জিনিষ পত্র রাখিয়া ঘরে তালা বন্ধ করিয়া রাত্রি কালে আমরা বেট—দ্বারকা দেখিবার জন্য গো-যানে যাত্রা করিলাম। ৭ ক্রোশ পথ—কিন্তু পার্ব্বতীয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি "বেট" অর্থে দ্বীপ। অনেক রাত্রিতে "গোপীতালাও" গ্রামের একটি ধর্ম্মশালায় পঁহুছিলাম। তৈল নাই, প্রদীপ নাই। ইত্যাদি ইত্যাদি। নিদ্রাই হইল না। প্রাতে উঠিয়া বাটীর বাহিরে দেখি, এক অদ্ভুত দৃশ্য, প্রায় পাঁচশত ময়ুর ময়ূরী চরিতেছে, ছুটিতেছে, নাচিতেছে। ধর্ম্মশালায় আহার করিতে আসিয়াছে। তাহাদের কেকা রবে দিক মুখরিত, কেহ বা ভাবে ভোর হইয়া পেখম বিস্তার করিয়াছে। নিকটে একটি পুকুর বা তালাও আছে। গোপীরা এই পুকুরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের বরে পুকুরের মৃত্তিকা শ্বেত। এই মৃত্তিকাই "গোপী চন্দন," বৈষ্ণবেরা যাহার তিলক ধারণ করিয়া থাকেন। ময়ূর দলে প্রবেশ করিয়া বালকের ন্যায় খানিকক্ষণ ক্রীড়া করিলাম। তারপর গোপীতালাওতে স্নান করিয়া লইলাম। ব্রাহ্মণ বলিল যে এইখানে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। আমি বলিলাম, কাল ৭ জন্মের

পাপ মোচন হইয়াছে, এক রাত্রিতে আর কত পাপ হইবে। ব্রাহ্মণ গোমতী প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিতেছি বুঝিতে পারিয়া বলিল, কিছু পুজা দিন—মিটিয়া যাউক।

ধর্ম্মশালা ত্যাগ করিয়া আবার গো-যানে উঠিলাম। চালক জ্বরে কাঁপিতেছে। চালকের দ্বারকাধামে জ্বর দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। রাস্তা অতি মন্দ, এই উঠিতেছি আবার হড় হড় করিয়া এই নামিতেছি, হাড় কখানা বুঝি যায়। খড়ের বদলে গাড়ীতে পাতা বুটা গাছ আহা কেমন কোমল। যাহাহৌক সকল দুঃখের অবসান হইল, দূরে নীল মসীবর্ণ জল রাশি দেখিয়া। সমুদ্র বায়ু হু হু করিয়া কর্ণে কত কি বলিতে লাগিল। আমি পূর্ব্ব স্মৃতির কথা তুলিতে আদৌ রাজি না হওয়ায়—হাওয়া চলিয়া গেল অর্থাৎ গাড়ী আবার নীচুতে পড়ায় বায়ু লাগা বন্ধ হইয়া গেল। ক্রমে তীরে আসিলাম। তখন ভাঁটা, অনেক দূরে জল চলিয়া গিয়াছে। ঘণ্টা খানেক বিশ্রামের পর "জাহাজ" অর্থাৎ দেশীয় নৌকা আসিল ৫।৭ খানি। তাহারা "বেট" হইতে যাত্রী আনিল। আবার আমাদিগকে লইয়া চলিল। অনেক ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেলা ১১ টার সময় বেট দ্বারকায় পঁহুছিলাম—এই প্রকৃত দ্বারকার ধূলি লইয়া ললাটে লেপন করিলাম। বাসা ঠিক করিয়াই ধূলা পায়ে একবার দেখিয়া আসিলাম। তারপর, স্নানের পর গিয়া পুজাদি কার্য্য শেষ করিলাম। এখানে কিন্তু সে সুখ পাইলাম না, তৈল মর্দ্দন করাইতেও পাইলাম না। গাত্র স্পর্শ করিতেও পাইলাম না। এখানে ঠাকুরের বৈঠকখানা আছে—শয়নের জন্য শয্যার ব্যবস্থা আছে—দিন রাত্রিতে পর পর (৯ বার) ভোগ হয়। বিছানার ব্যাপার দেখিলে সোমরাজ বাড়ীর কথা মনে পড়ে। ঠাকুরের সংসার একটা রাজার সংসার। এইটুকু সামন্ত রাজার রাজ্যের মধ্যে হইলেও—গুইকুমার বেট দ্বারকায় তাঁহার খাসে রাখিয়াছেন। অনেক স্থলে দেখিলাম, সঙ্গীত হইতেছে। নানা প্রকার নব নব ভাব উদ্দীপক ছবি দেখিলাম, প্রাচীরের গাত্রে অঙ্কিত। তন্মধ্যে গো-দোহন ছবিগুলি একেবারে স্বভাবকে হারাইয়া দিয়াছে। তবে দুঃখের বিষয় সমস্ত বুঝা যায় না। এখানেও পুজার ট্যাক্স্ আছে। ২৲ পরিমাণ। মোহান্তের সঙ্গে আলাপ হইল। এখানে

তত খাঁই নাই, ৫৲ টাকার ভোগ দিলাম, তাহাই যথেষ্ট হইল। প্রসাদ দিলেন। ৺জগন্নাথ ক্ষেত্রের ন্যায় এখানে প্রসাদ বিক্রয় হয়। প্রথম দিন তাই ধারণ করিয়াছিলাম। দ্বিতীয় দিনে পূর্ণচন্দ্র রন্ধন করিয়াছিলেন। বৈকালে সহর পরিভ্রমণ করিলাম। যেখানে সেখানে ময়ূর—যেন বানান্ করিয়া বুঝাইয়া দিতেছে এটা ভগবানের রাজ্য। কিন্তু এখানেও শোক দুঃখের অভাব নাই। একটি শব আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে—সেই শোক দুঃখ ক্রন্দন, সেই মামুলী হায় হুতাশন দেখিয়াছিলাম। আমরা শঙ্খ-নারায়ণের বাড়ীতে আরতি দেখিয়া বাসায় ফিরিলাম। এখানে কতকগুলি বালকের সহিত আলাপ হইয়াছিল, তাহাদের বাড়ী দ্বারকা—পড়েন কালেজে। বেট দ্বারকায় সরাপ প্রভৃতি নেশার দ্রব্য বা মাছ মাংস বিক্রয় হয় না। একদিন মদ্য পান করিলে তিন দিন বেটে উঠিবার অধিকার নাই মাঝীরা মদ খাইলে এই সাজাই পায়। এখানেও সভ্যতার ঢেউ লাগিয়াছে—বালিকা বিদ্যালয়, স্কুল ইত্যাদি হইয়াছে। একজন পণ্ডিত মহাশয় দিনের বেলা মাঝিগিরি করেন, আর রাত্রিতে নৈশ বিদ্যালয়ে পণ্ডিতি করেন। তিনি আমাদেরই নৌকায় ছিলেন ও আমার সঙ্গে এদেশে আসিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। এখানে ও দ্বারকায় বেট দ্বারকার রণ্‌ছোড়জীর টিকম ভগবানের ছবি বিক্রয় হয়। আমরা কয়েকখানা খরিদ করিয়া আনিয়াছিলাম। তবে একটি দৃশ্য দেখিয়া মনে বড় ব্যথা পাইয়াছিলাম। অর্থাৎ ভাঁটার সময় জল সরিয়া গেলে লোকে সমুদ্র সৈকতে শৌচ কার্য্য করে। তখনই গরু আসিয়া সেই মল ভক্ষণ করে, আবশ্যক হইলে যাত্রীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়। আমি হঠাৎ এই ব্যাপারে বড় ভয় পাইয়াছিলাম, পরে ব্যাপার বুঝিয়া—আর পবিত্র দ্বারকা ধামে এই ব্যাপার দেখিয়া, একেবারে মরমে মরিয়া গেলাম।

আমি দ্বারকায় একজন বাঙ্গালী পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক দেখিয়াছিলাম। পুরুষটির বাটী মানকর—বর্দ্ধমান জেলা। তিনি দ্বারকাবাসী হইয়াছেন। শঙ্কর মঠ হইতে ৪ খানি রুটি প্রতি রজনীতে পান, আর এক স্থানে খাইতে পান। অনেক রাজা রাজড়ার ধর্ম্মশালা সত্র আছে যেখানে

খাইতে পাওয়া যায়। রমণীর বাটী কুমারটুলি। ইনি ভারতের সকল তীর্থ দেখিয়াছেন। এখন মাধুকারী করেন—অন্ন ত্যাগ করিয়াছেন, কেবল আলু ও ঘৃত সেবনে প্রাণ ধারণ করেন। বেট দ্বারকায় তিনটি বাঙ্গালীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। একজন মঠধারী। একজন বাঙ্গালী বৈষ্ণব দ্বারকায় মঠ স্থাপনা করিয়াছেন, ইহা একটা খুব কথা—এ পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই, বা আমরা জানি না। তবে দ্বারকার সেতোরা তাঁর পরম শত্রু। যাহাহৌক কোন রকমে চলিয়া যাইতেছে। আর একটি বৈষ্ণব ও একজন স্ত্রীলোক তাহারা এই মঠেই আছেন। স্ত্রীলোকটি আমার সঙ্গে আসিবার জন্য কাতর হইলেন। আমি কিন্তু "পথে বিবর্জ্জিতা" জানিয়া ত্যাগ করিলাম। স্পষ্ট বলিলাম, ঝঞ্ঝাট আমি পোহাইতে পারিব না।

পরদিন আহারাদি করিয়া জোয়ার হইলে বেট দ্বারকা ত্যাগ করিয়া "জাহাজে" উঠিলাম। যথাকালে খাঁড়ি পার হইলাম। যাঁহারা ছাপ লয়েন তাঁহারা "আখড়াড়ি" গমন করেন। আমি ছাপ লই নাই তাই ঐ স্থানে যাই নাই। দ্বারকার ছাপ এক প্রকার উল্কী, ইহার অর্থ কিন্তু গুরুতর। ঐ ছাপ অঙ্গে থাকিলে মৃত্যুর পর তাহার দাহ নাই। ক্রমে পুরাতন গো শকট আসিল। এখনও জ্বর ভোগ হইতেছে। এবার আমরা নূতন পথ দিয়া আসিলাম অর্থাৎ "কাবা" দের দেশ দিয়া আসিলাম। মনে ভয় হইয়াছিল, পাছে মাঝিরা ধরিয়া কাড়িয়া লয়। প্রাগ্‌জী সঙ্গে থাকায় কতকটা ভরসাও ছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে পুনরায় দ্বারকায় ফিরিয়া আসিলাম। যেটুকু বেলা ছিল সেইটুকুর সাহায্যে দ্বারকা সহর দেখিয়া লইলাম ও পর দিন বোম্বাই যাইবার জন্য মেল ট্রেণে দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিলাম। সহরটি অতি ছোট ও অতি অপরিষ্কার। চারিদিকে প্রাচীর দেওয়া ও চারিদিকে বড় বড় দরজা আছে। তবে সমস্ত জিনিষ পাওয়া যায় বটে তবে বড়ই দুর্মূল্য। সহরের বাহিরে অনেক বাড়ী হইয়াছে —অনেক ধর্ম্মশালা। দ্বারকার পাণ্ডাদের মোকর্দ্দমা হইতেছে। সেখানে ব্রাহ্মণের পাণ্ডা ব্রাহ্মণ, তবে শূদ্রের আলাহিদা ব্রাহ্মণ আছেন। জাতি বিশেষের পাণ্ডা বিশেষ আছে। এখন কথাটা এই যে যাঁহারা কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের যজন করেন, তাঁহারা রাঢ়ী ব্রাহ্মণের যজন করিতে পারিবেন কি

না—কি অন্য ব্রাহ্মণের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইবে? এখনও গোল মিটে নাই। বরদার আদালতে মোকর্দ্দমা হইতেছে।

পরদিন বরদার রেসিডেন্ট সাহেব আসিবেন বলিয়া সহর তোলপাড়। তিনিই প্রকৃত রাজা, কত ষ্টীম লঞ্চ, কত বজরা, কত পিনেস, কত ষ্টীমার হুস্ হাস করিতে করিতে ছুটাছুটি করিতেছে। অনেক কষ্টে পাণ্ডা ও প্রাগ্‌জীর হাত হইতে রক্ষা পাইলাম। তবে প্রাগ্‌জী সন্তুষ্ট হইল বলিতে পারি না—গ্রহ বৈগুণ্য কি করিব? পাণ্ডা মহাশয় সন্তুষ্ট হইলেন। অনেক কষ্টে নৌকায় একটু স্থান লইয়া প্রথমত জাহাজে পরে মেল ষ্টীমারে আসিলাম। দ্বারকার ছাত্রগণ ফিরিতেছিলেন। তাঁহারা আমাকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। মেল ষ্টীমারে উঠিতে নিদারুণ কষ্ট পাইলাম। তার পর বাক্স পেট্‌রা একেবারে মাল চাপা পড়িয়া গেল। অনেক চেঁচা চেঁচি করার পর আমাকে উপরে লইয়া গেল। তৃতীয় শ্রেণীতে অনেকগুলি সিন্ধু-দেশ-বাসী বালক ছিলেন—তাঁহারা বোম্বাই সহরে উইলসন্ কালেজে পড়েন, আমার সঙ্গে আলাপ হইল মাত্র। যুবকের দল নীচু হইতে আমার লগেজ আনিয়া দিলেন। আমাকে নানা জাতীয় ফল প্রদান করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। শেষে আমাকে সুরাট কংগ্রেসের উপর বক্তৃতা করিতে বলিলেন। আমি কি করি করিলাম—সময় কাটাইতে ত হইবে। বক্তৃতার পর সকলে আমার বন্ধু হইয়া গেলেন। সে ভালবাসা অকৃত্রিম। যেন আমি গুরু আর তাঁহারা ছাত্র। অনেক গল্প করিলাম—তাঁহারাও করিলেন। আমি বিলাতী খাদ্য খাই না দেখিয়া প্রথমে বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন, পরে কিন্তু নহে। ষ্টীমার লোকে লোকারণ্য। চারিদিকে অন্ধকার। আমি উপর ডেকে বসিয়া সমুদ্রের শোভা দেখিতেছি। আর কত কথা মনে আসিতেছে। ক্যাবিনে গরম, নিদ্রা হইল না। প্রাতে ১০ টার সময় বোম্বাই ভিক্‌টোরিয়া ডকে Royal Karachi Mail অর্থাৎ আমাদের ষ্টীমার যাহার নাম "নামা" আসিয়া নঙ্গর করিল। পথে একজনের দূরবীণ পাইয়াছিলাম, এবং আগাগোড়া উপকূল অন্তত বাসিন হইতে দেখিতে দেখিতে আসিতেছিলাম। ষ্টীমার হইতে নামিতে ১ ঘণ্টা বিলম্ব হইল। আবার কষ্টম হাউসের হাতে পড়িলাম। দুই সাহেবে বিবাদ

বাধাইয়া দিয়া কোন ক্রমে নিষ্কৃতি লাভ করিলাম। তারপর কুঁজা করিয়া জল ও ক্রফোর্ড মার্কেট হইতে ফল আদি ক্রয় করিয়া লইয়া বেঙ্গল নাগপুর মেল ধরিলাম "ভিক্‌টোরিয়া টার্মিনস্ ষ্টেসনে।" গুরুর কৃপায় এক-খানি পুরা সেকেণ্ড ক্লাস বোম্বাই হইতে হাওড়া পর্য্যন্ত ভোগ করিয়াছিলাম, কেবল খড়্গপুরে আসিয়া একজন সাহেব ঢুকিয়াছিল। যাহাহৌক দ্বারকার পথে" একটু তাড়াতাড়ি করিয়া শেষ করিলাম, কেন না চৈত্র মাস। নহিলে দ্বারকায় যে কৃষ্ণ সাজিয়া ভিক্ষা করে, তাহার বর্ণনাতেই একদিন কাটিয়া যাইত। পাঠক পাঠিকা আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। যদি কিছু নূতন সংবাদ ও একটু সুখ পাইয়া থাকেন, তাহা হইলেই আমার শ্রম সফল।

বড় দিনে সেতুবন্ধ রামেশ্বর গিয়াছিলাম। বৈশাখ হইতে না হয় সেই কথা লিখিব।

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

কাল্‌কা-সিমলা রেল দর্শনে।

এ কি হেরি, হিমগিরি, দুর্গতি তোমার? —
ছিলে তুমি প্রকৃতির রম্য নিকেতন,
শিবময় শান্তিময় যোগীন্দ্র-ভুবন,
মরতে মহান্ ছবি পুণ্য অমরার ;—
জাহ্নবী-যমুনা-ধৌত তব পদতলে
ভারতের কত রঙ্গ হেরিল ভুবন,
সাধিল কতেক ঋষি কঠোর সাধন,—
তুমি ত'ার সাক্ষ্যস্থল এ মহীমণ্ডলে।
কাল চক্র এবে হায় কঠিন নিগড়
বসিয়াছে সুবিশাল তব বক্ষঃস্থলে!
বাষ্পরথচক্র তব ভীম দেহ দলে!
তথাপি নীরব তুমি—অসাড়, অনড়!
তুষার-আশয়-ছলে কাঁদা মাত্র সার।—
বিধির বিধান ইহা—নহে খণ্ডা'বার।

উদ্ভট কবিতা।

[সেকাল একাল]

হইয়াছে অভিলাষ এ দীনের মনে।
রচিতে কবিতা কিছু প্রাচীন ধরনে॥
বীনাপাণি বাণীপদে করি নমস্কার।
আন মা লেখনী মুখে সে কেলে পয়ার।
"পয়ারে" "বয়ার" যত কাব্য ক্ষেত্রে ছিল।
দীনবন্ধু তাড়া দিতে বনে মাথা দিল॥
অধুনা নূতন ছন্দ নব নব ভাব।
মোর কবিতায় কিন্তু সকলি অভাব॥
ছন্দে নাই নূতনত্ব বিষয়েও নাই।
তথাপি দুদশ পংক্তি লিখিবারে চাই॥
সাবেক দু'এক কথা করিব খণ্ডন।
সেকালে একালে কিছু করিব তুলন॥
পূর্ণিমা পাঠকবর্গে দিব উপহার।
তুষ্ট হলে খুসী হব নতুবা নাচার॥
ভাঁড়ে মোর নাহি কিছু ট'কো ঘোল বই।
তোষিতে সুধীরে কোথা পাব দুগ্ধ দই॥
বৃন্দাবনে নন্দালয়ে শুনি নীলমণি।
খাইতেন ঘোল কভু ছেড়ে ক্ষীর ননী *।
নিত্য খান কত মিষ্ট পূর্ণিমা পাঠক।
খেলেন বা অদ্য এই মোর পদ্য টক॥
কট মট কবিতার ধার নাহি ধারি।
লিখে যাব সোজা সুজি যতটুকু পারি॥

---

* জনয়তি সময় বিশেষে চিঞ্চাপঞ্চাম্লতমোদম্।
হরিরপি গোকুলবাসী পীযূষাশী সমিহতে তক্রম্॥

নিরাশ্রয় নাহি বাঁচে বনিতা পণ্ডিত।
লতা যথা হলে অবলম্বন রহিত * ॥
সেকালের কথা বটে একালে না খাটে।
কত পণ্ডিতের কাল খাটে বসে কাটে ॥
বনিতার কথা কয়ে কাজ কিবা ভাই।
সাক্ষী দেখ পরীক্ষায় পাশ করা ধাই ॥
পুরুষেরে অন্ন দিয়া চালায় সংসার।
গাড়ী চ'ড়ি ঘোরে নিজে সহর বাজার ॥
উদ্ভিদ বলিয়া সুধু লতা আছে নত।
অদ্যাপি আশ্রয় চাহে সেকালের মত ॥
ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু শাস্ত্রের বচন †।
অধুনা শূদ্রের ভৃত্য অসংখ্য ব্রাহ্মণ ॥
কেহ বা পাচক বেশে করিছে রন্ধন।
কেহ করে কাচারিতে দপ্তর বন্ধন ॥
প্রবাদে ব্রাহ্মণ শূদ্র আছিল তফাৎ।
একালে শূদ্রের হাতে বিপ্র মুণ্ডপাত ॥
এই মত কত শত সেকালের কথা
একালে না খাটে আর হেরি যথা তথা।
এই বার দুই চার বিষয়ে তুলনা।
সেকালে একালে করি শুন সর্ব্ব জনা
বেশী নয় আশীবর্ষ পূর্ব্বে এই দেশ।
কি ছিল, কি হ'ল এবে বলি সবিশেষ ॥
ছিল না তখন রেল, ট্রাম, কিম্বা তার।
বিঘোষিতে বিশ্ববার্ত্তা দূত রয়টার ॥
ডাকঘর বহুতর ছিল না এমন।
চিঠি পত্র টাকা কড়ি করিতে প্রেরণ ॥

* নিরাশ্রয়া ন জীবন্তি পণ্ডিতাঃ বনিতা লতা। † বর্ণানাং ব্রাহ্মণোগুরুঃ।

কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, হেটে লোক যেত।
দূরের সংবাদ এত শীঘ্র নাহি পেত ॥
ছিল না জলের কল নগরে নগরে।
খবরের কাগজ না ছিল ঘরে ঘরে ॥
চোর ডাকাইতে ভরা ছিল কত স্থান।
হারাইত পথিকেরা পথে ধন প্রাণ ॥
সকলেরি নাহি ছিল স্বর্ণ অলঙ্কার।
ছাতা, জামা, জুতো, মোজা ছিল না সবার ॥
দেখেনি সেকেলে লোক সোডা কি বরফ।
পড়ে নাই এত তারা ছাপান হরফ ॥
বৈদ্যুতিক আলো কিম্বা পাখা নাহি ছিল।
টেলিফোন্ গ্রামোফোন্ কালি দেখা দিল ॥
নাহি ছিল হাওয়া গাড়ী কি বাইসিকল্।
চেনেনি অনেকে আজো একানি নিকল ॥
ছিল নাকো বায়স্কোপ বাঘের সার্কাস।
ছিল যাত্রা, ঢপ, কবি, পুতুলের নাচ ॥
সুগন্ধি সাবান কিম্বা তেল পমেটম।
কেশে অঙ্গে মাখিবার ছিল বড় কম ॥
না ছিল নেত্রের বৈরি কেরোসিন তেল।
বার জেতে অন্নদিতে ছিল না হোটেল ॥
বিজ্ঞাপনে প্রতারণা নাহি ছিল জানা।
অর্থ দিয়া মিলিত না ষোল কড়া কানা ॥
হাতে ছড়ি মুখে বিরি বুকে চেন ঘড়ি।
পথে ঘাটে না ছিল বাবুর ছড়া ছড়ি ॥
এখনো এমন স্থান আছে বাঙ্গালায়।
বাবু নামে অতি বড় ভূস্বামী বুঝায়। *

* ফরিদপুর জেলায় বাবুর জমী, বাবুর প্রজা বলিলে নড়াইলের সুপ্রসিদ্ধ ভূস্বামীদিগকে বুঝায়।

নিরাশ্রয় নাহি বাঁচে বনিতা পণ্ডিত।
লতা যথা হলে অবলম্বন রহিত * ॥
সেকালের কথা বটে একালে না খাটে।
কত পণ্ডিতের কাল খাটে বসে কাটে ॥
বনিতার কথা কয়ে কাজ কিবা ভাই।
সাক্ষী দেখ পরীক্ষায় পাশ করা ধাই ॥
পুরুষেরে অন্ন দিয়া চালায় সংসার।
গাড়ী চ'ড়ি ঘোরে নিজে সহর বাজার ॥
উদ্ভিদ বলিয়া সুধু লতা আছে নত।
অদ্যাপি আশ্রয় চাহে সেকালের মত ॥
ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু শাস্ত্রের বচন †।
অধুনা শূদ্রের ভৃত্য অসংখ্য ব্রাহ্মণ ॥
কেহ বা পাচক বেশে করিছে রন্ধন।
কেহ করে কাচারিতে দপ্তর বন্ধন ॥
প্রবাদে ব্রাহ্মণ শূদ্র আছিল তফাৎ।
একালে শূদ্রের হাতে বিপ্র মুণ্ডপাত ॥
এই মত কত শত সেকালের কথা
একালে না খাটে আর হেরি যথা তথা।
এই বার দুই চার বিষয়ে তুলনা।
সেকালে একালে করি শুন সর্ব্ব জনা
বেশী নয় আশীবর্ষ পূর্ব্বে এই দেশ।
কি ছিল, কি হ'ল এবে বলি সবিশেষ ॥
ছিল না তখন রেল, ট্রাম, কিম্বা তার।
বিঘোষিতে বিশ্ববার্ত্তা দূত রয়টার ॥
ডাকঘর বহুতর ছিল না এমন।
চিঠি পত্র টাকা কড়ি করিতে প্রেরণ ॥

* নিরাশ্রয়া ন জীবন্তি পণ্ডিতাঃ বনিতা লতা। † বর্ণানাং ব্রাহ্মণোগুরুঃ।

কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, হেটে লোক যেত।
দূরের সংবাদ এত শীঘ্র নাহি পেত ॥
ছিল না জলের কল নগরে নগরে।
খবরের কাগজ না ছিল ঘরে ঘরে ॥
চোর ডাকাইতে ভরা ছিল কত স্থান।
হারাইত পথিকেরা পথে ধন প্রাণ ॥
সকলেরি নাহি ছিল স্বর্ণ অলঙ্কার।
ছাতা, জামা, জুতো, মোজা ছিল না সবার ॥
দেখেনি সেকেলে লোক সোডা কি বরফ।
পড়ে নাই এত তারা ছাপান হরফ ॥
বৈদ্যুতিক আলো কিম্বা পাখা নাহি ছিল।
টেলিফোন্ গ্রামোফোন্ কালি দেখা দিল ॥
নাহি ছিল হাওয়া গাড়ী কি বাইসিকল্।
চেনেনি অনেকে আজো একানি নিকল ॥
ছিল নাকো বায়স্কোপ বাঘের সার্কাস।
ছিল যাত্রা, ঢপ, কবি, পুতুলের নাচ ॥
সুগন্ধি সাবান কিম্বা তেল পমেটম।
কেশে অঙ্গে মাখিবার ছিল বড় কম ॥
না ছিল নেত্রের বৈরি কেরোসিন তেল।
বার জেতে অন্নদিতে ছিল না হোটেল ॥
বিজ্ঞাপনে প্রতারণা নাহি ছিল জানা।
অর্থ দিয়া মিলিত না ষোল কড়া কানা ॥
হাতে ছড়ি মুখে বিরি বুকে চেন ঘড়ি।
পথে ঘাটে না ছিল বাবুর ছড়া ছড়ি ॥
এখনো এমন স্থান আছে বাঙ্গালায়।
বাবু নামে অতি বড় ভুস্বামী বুঝায়। *

* ফরিদপুর জেলায় বাবুর জমী, বাবুর প্রজা বলিলে নড়াইলের সুপ্রসিদ্ধ ভুস্বামীদিগকে বুঝায়।

না ছিল জঙ্গলাকীর্ণ পল্লীগ্রাম সব ।
নাহি ছিল জলাভাবে হাহাকার রব ॥
গ্রামে গ্রামে মামলার না ছিল দালাল ।
নিরক্ষর কৃষকেরে করিতে কাঙ্গাল ॥
নাহি ছিল ম্যালেরিয়া রোগ বার মেসে ।
পেটেন্ট ঔষধ এত না মিলিত দেশে ॥
ছিল না অবশ্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় ।
ছিলেন পণ্ডিত মুন্সী গুরু মহাশয় ॥
দুর্বিনীত বালকের সংখ্যা ছিল কম ।
গুরুজনে সকলেই করিত সম্ভ্রম ॥
এই মত আরো কত হয়েছে নূতন ।
সঙ্গে সঙ্গে বলি যাহা ছিল পুরাতন ॥
সেকালের পল্লীবাসী খেত দুধ ভাত ।
অনেকে দুবেলা এবে পাতে নাকো পাত ॥
খালে, বিলে ছিল মাছ ক্ষেতে ছিল ধান ।
গাভীগুলি করিত প্রচুর দুগ্ধ দান ॥
গব্য ঘৃত পাঁচ সের বিকাতো টাকায় ।
খাঁটি তেল বার সের মিলিত মুদ্রায় ॥
তণ্ডুলের মূল্য ছিল টাকায় দুমণ ।
পয়সায় পেত লোকে পান দুইপণ ॥
অধুন[illegible]ানের পণ হয় ছয় আনা ।
চাউলের দাম যত সকলেরি জানা ॥
গাওয়া ঘি টাকায় তিন পোয়া পাওয়া ভার ।
দুসেরের বেশী নহে তেল সরিষার ।
মধ্যবিদ্ ভদ্র এবে খাদ্যাভাবে মরে ।
রোগে বৈদ্য ডাকিবার অর্থ নাহি ঘরে ॥
জলো দুধ খেয়ে মলো শিশু ছেলে যত ।
সাজ পোষাকের ব্যয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত ॥

ছিল না সেকালে এত অভাব লোকের ।
আছিল সবল সুস্থ খেতে পেত ঢের ॥
হেঁটে দুই তিন ক্রোশ নিমন্ত্রনে যেত ।
বেতো রুগী পেট রোগা ছিল নাকো এত ॥
পর্ব্বাদিতে পণ্ডিতেরা যোজনান্তে গিয়া ।
গঙ্গা স্নান করি গৃহে ফিরিত হাঁটিয়া ॥
সেকালে প্রবীণা নারী গৃহ কর্ত্রী ছিল ।
একালে কর্ত্তৃত্ব ভার যুবতী পাইল ॥
অধুনা বধূমা বসি বুনিছে কার্পেট ।
দাসী সম খাটিছে শ্বাশুরী মাথা হেট ॥
ঝুলিছে চাবির থোলো অঞ্চলে বধূর ।
দুলিছে গহনা গাত্রে সিঞ্জন মধুর ॥
শ্বাশুরির অঙ্গে এক বস্ত্র পুরাতন ।
পাচিকা না এলে তিনি করেন রন্ধন ॥
সেকালের ভাই ছিল শ্রীরাম লক্ষ্মণ ।
নরকুলে একালে রাবণ বিভীষণ ॥
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই দেখি প্রায় তাই ।
সদ্ভাব সৌভ্রাত্র্য যেন কিছু মাত্র নাই ॥
কেহ খায় লুচি পাঁটা কেহ গুড় রুটী ।
কারো অট্টালিকা কারো ঘরে ভাঙ্গা খুঁটী ॥
সেকালে যাহারা দেশে ছিল অর্থবান ।
পরার্থে করিত ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠান ॥
তৃষ্ণাতুরে দিতে জল কাটাতো পুকুর ।
পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধে ব্যয় করিত প্রচুর ॥
অকাতরে গৃহস্থ করিত অন্ন দান ।
অতিথি আদর পেত সর্ব্বত্র সমান ॥
যেথা সেথা পথিক পাইত অন্ন জল ।
ঘুরিতে পারিত দেশ লোক নিঃসম্বল ॥

এবে সুধু কন্যা বিয়ে কোম্পানি কাগজ।
সব কাজে বুঝে লোক নিজের গরজ॥
সেকালে আঁধারে লোকে টাকা দিত ধার।
ভয় কিছু ছিল না শঠতা বঞ্চনার॥
"ধর্ম্মসাক্ষী" রাখি তারা লিখিত দলীল।
যেত না খুঁজিতে কেহ এটর্ণি উকিল॥
শত সাক্ষী লিখি এবে কত আঁটা আঁটি।
তবু শেষে আদালতে কথা কাটা কাটি॥
চাকরে মনিবে ছিল মমতার টান।
ভৃত্য ভাবিত লোকে আত্মীয় সমান॥
পরম আদর পেত পুরানো চাকর।
বর্ষীয়সী দাসী বসি শাসিত অন্দর॥
অধুনা ভৃত্যের প্রতি মিত্র ভাব নাই।
লোক বদলাই নিত্য হইতেছে তাই॥
চাকরেও চাহে শুধু মাহিনার টাকা।
দুঃসময়ে মনিবের দেয় গাত্র ঢাকা॥
হাতাতে পারিলে কিছু অমনি প্রস্থান।
ধন লোভে হরে কভু প্রভুর পরাণ॥ *
ময়রা, মেছুনী, গোপ, রজক, নাপিত।
গণিত এরাও সবে গৃহস্থের হিত॥
একালে সম্বন্ধ শুধু দেনা পাওনার।
অর্থ ভিন্ন অন্য চিন্তা নাহি দেখি কার॥
সেকালের লোকের ছিল বেশী মেশা মেশি।
বামুনের বাগ্দী জ্যেঠা বেনে মাসি পিশি॥
হায়রে স্বপন সম সে সুখের দিন।
হারায়েছে শান্তি লোক হ'য়ে ধর্ম্মহীন॥

* বাঙ্গালা ১৩১১ সালে দিনাজপুর সহরে একটী পশ্চিম দেশীয় ভৃত্য বাঙ্গালী মনিবের প্রাণ নাশ করিয়া তাঁহার অর্থ লইয়া পলাইয়া যায়।

কে কারে ঠকাবে কিসে চিন্তা অহর্নিশ।
মুখে মিষ্ট কথা কিন্তু অন্তরেতে বিষ॥
এখনো সেকেলে লোক সুখ্যাতির কথা।
যদিও না ছিল তার পাশ্চাত্য সভ্যতা॥
জিজ্ঞাসিত অজ্ঞাত জনের পরিচয়।
চাকুরেকে "উপরি পাওনা কত হয়?"
সরলতা ভরা ছিল উদার পরাণ।
চিন্তা ছিল পরমার্থ পরের কল্যান॥
কুলাঙ্গনা চুল বাঁধি কাটাতো না কাল।
নিজে রাঁধি পতি পুত্রে দিত অন্ন থাল॥
যত লিখি তত মনে কত কথা আসে।
সেকালের শান্তিময় চিত্র চোখে ভাসে॥
নদী যদি মরে তার রেখা থাকি যায়।
আজো কিছু পূর্ব্ব ভাব আছে পাড়াগাঁয়॥
সহরে বয়েছে স্রোত নব্য সভ্যতার।
অঘটন ঘটিতেছে কতই প্রকার॥
শুনি সেথা সুশিক্ষিতা সীমন্তিনীগণ।
নাম ধরি স্বামীকে করেন সম্বোধন॥
কচি ছেলে ঘরে ফেলে কুলবধূ কত।
থিয়েটার দেখিবারে যান ইচ্ছামত॥
আরো শুনিয়া লেখনী শিহরে লিখিতে।
গণিকা ডাকান গৃহে অঙ্গ সাজাইতে॥
লিখিবারে গেলে সব পুঁথি বেড়ে যায়।
পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হ'তে পারে তায়॥
এতেই যে হয় নাই কেমনে বলিব।
এখানেই তক্র ভাণ্ড শিকায় তুলিব॥
ঘোল খেয়ে যদি কেহ বলেন "বাঃ বেশ"।
পুনঃ দেখা দিতে পারি আজ এই শেষ॥

শ্রীঃ—

বর্ষ শেষে।

[বিশ্বাস-ভঙ্গ, আসল কথার আন্দোলন নাই।]

ব্যায়রাম সঙ্কট ; রোগীর অবস্থা অতি মন্দ ; তবু রাতি পোহাইলেই আত্মীয় স্বজন একটু হাঁপ ছাড়ে—মনে করে কাল রাত্রি পোহাইল, দুর্ভাবনা দূর হইল। সেইরূপ, এখনকার দিনে, একটা বৎসর কাটিয়া গেলেই মনে হয়—আমাদের দুঃসময় বুঝি কাটিয়া গেল। ১৩১৫ সাল কাটাইয়া উঠিয়া আমাদের সেইরূপই মনে হইতেছে। জানি এটা ভ্রম ; কিন্তু এই ভ্রম লইয়াইত আমরা সময় কাটাইতেছি। একটি মানুষ গেলে, ভাবি—এমনটি আর হইবে না ; একটি বর্ষ গেলে ভাবি—এমন দুর্বৎসর আর হইবে না। সাধারণ ভাবে ঐ কথাটা ভ্রমই বল, আর যাই বল, কিন্তু বিশেষভাবে দেখিতে গেলে, ১৩১৫ সাল অতি দুর্বৎসর বটে। বাঙ্গালার তিন জন অতি প্রধান পণ্ডিত * একজন প্রধান ভিষক † এবং একজন প্রধান কবি ‡ আর শত শত ভদ্র অভদ্রকে বৎসর উদরে পুরিয়া লইয়া গিয়াছে বলিয়াই, বৎসরকে দুর্বৎসর বলিতেছি এমন নহে—কতকগুলি বালকে বা যুবকে বাতুলতা করিয়া বোমার উৎপাত করিয়াছে বলিয়াই বলিতেছি, এমনও নহে—এই বৎসর শাসক সম্প্রদায় এবং শাসিত সম্প্রদায় মধ্যে বড়ই বিশ্বাস ভঙ্গ হইয়াছে,—সেই জন্য বলিতেছি। শাসক সম্প্রদায়ের অগ্রণী—পোলিস ; শাসিত সম্প্রদায়ের অগ্রণী—তথা কথিত কৃতবিদ্য—এই দুই দলের মধ্যে বিশ্বাস একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে—সেই জন্য বলিতেছি। এই বিশ্বাস পুনঃ সংস্থাপনের জন্য একদিকে শাসক সম্প্রদায়ের উচ্চতম প্রকোষ্ঠ হইতে আশ্বাস বাণী ঘোষিত হইতেছে, একজন সুযোগ্য বাঙ্গালিকে অতি সম্মানের পদবীতে অভিষিক্ত করা হইতেছে,—অন্য দিকে, শাসিত সম্প্রদায়ের উচ্চতম প্রকোষ্ঠ হইতে রাজভক্তির মত জাহির করা হইতেছে। কিন্তু বিশ্বাস এখনও পুনঃ স্থাপিত হয় নাই—উভয় সম্প্রদায়ই সমানে ভাবিতেছেন

* দিনাজপুরের পণ্ডিত মহেশচন্দ্র চূড়ামণি। মহামহোপাধ্যায় কৈলাস চন্দ্র শিরোমণি পণ্ডিত জয় নারায়ণ তর্করত্ন। † মহামহোপাধ্যায় দ্বারকা নাথ সেন। ‡ নবীনচন্দ্র সেন।

—'কখন কি হয় ; কখন কি হয়' ; এ ভাবও ভাল নয়। ১৩১৫ সাল শান্তি স্থাপন করিতে পারিল না—১৩১৬ সাল পারিবে কি ?

১৩১৫ সালের শেষের ছয় মাস বাঙ্গালায় প্রায় বিন্দুমাত্র বারিপাত হয় নাই। আশ্বিনে ছাট বৃষ্টি হইলে, অনেক স্থলে ষোল আনা ফসল হইত ; তাহা হয় নাই—গোছা গোছা ধানের শীষ—আগ্‌ড়া হইয়া নষ্ট হইল—নহিলে আজি ২৷৷০ টাকা মণ চাউল হইত। এই অনাবৃষ্টিতে অনেক স্থলে জল কষ্টের সীমা নাই। অমৃতবাজার বড় দুঃখ করিয়াই বলিয়াছেন, "হাঁগা তোমরা ছোট বড়, দুটা কৌনসিলে কত কথারই আলোচনা করিলে, কৈ জলকষ্টের কথাও বলিলে না, পোলিসের অত্যাচারের কথাও ত বলিলে না!" ঐ দুঃখও ত আমাদের—সকল কথা বলা হয়, বাঙ্গালার মজ্জার কথা বলা হয় না! দেশের জল মাটী দূষিত হওয়াতে, বাঙ্গালি আপনার পিতৃ পুরুষের পীঠ ভূমিতে বাস করিতে পায় না—তাহার উপর এই দারুণ জল কষ্ট—পোলিসের এই ভীষণ ভ্রূভঙ্গি—এ সকল মজ্জার কথা লেখা হয় না—সে সকলের আন্দোলন হয় না।

রাজদ্রোহিতার মিথ্যা আরোপ।

একেত দশ বিশ জন মাথা পাগলা লোকের পাগলামির জন্য আমরা সমগ্র বঙ্গবাসী শাসক সম্প্রদায়ের কাছে অবিশ্বাসী হইয়াছি, তাহার উপর আমাদের একজন বাণিজ্য পাগলা প্রবীন "মহাজন বন্ধু" আছেন, তাঁহার জ্বালায় আমাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিল। তাঁহার ভঙ্গি দেখিয়া আমরা অগ্রহায়ণের পূর্ণিমায় বলিয়াছিলাম—মানুষ স্বদেশী হইলে রাজদ্রোহী হইবে কেন ? মাঘ মাসে বলিয়াছিলাম "মহাজন বন্ধুর একটা বিষম দোষ দেখিতেছি, মহাজন বন্ধু আপনাকে বাদ দিয়া সকলকেই রাজদ্রোহী বলিতে চাহেন। পূর্ণিমার উপর (বিশেষ আমার উপর) ঐরূপ দোষ আরোপ করেন"। বলিয়াছিলাম "কোথায় কোন লেখিকা একটা পদ্য লিখিতে গিয়া, অনর্থক অতিরঞ্জন করিলেন, তাই ধরিয়া সম্পাদককে কি গালি দিতে

আছে?" আদুরে ছেলে একটু কাঁদিতেছে—যদি কেহ বলিল "না ভাই কেঁদ না" অমনি চীৎকার করিয়া আরও কাঁদিয়া উঠে। আমাদের প্রবীণ আদুরে গোপালেরও তাই হইয়াছে—কোন একজন লেখিকার পদ্য লইয়া সম্পাদককে গালি দেওয়া ভাল হয় নাই বলিয়াছিলাম—অমনই পূর্ণিমার পৃথক লেখকের নাম দেওয়া একটি পদ্য লইয়া, আমি পূর্ণিমার সম্পাদক নহি,—আমাকে বিদ্রোহী প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কেন দাদা! এত জিদ্ কেন বল দেখি! আমি বিদ্রোহী স্থির হইলে—তোমার বাণিজ্যের কিছু বৃদ্ধি হইবে? আমি যে পূর্ণিমার সম্পাদক নহি—তাকি তুমি বুঝ না? আমি যদি সম্পাদক হইতাম—তাহা হইলে 'মৃত্যুর পর' ক্রমাগত পর পর চলিত কি?

তাহার পর 'মহাজন বন্ধু' বলিতেছেন "আহারে অপবিত্র সংস্পর্শ হওয়ার আশঙ্কায় ইহারা এখন (বিদেশী লবণ চিনি) চাহেন না, এতদিন নাসিকায় সর্ষপ তৈল প্রদান পূর্ব্বক নিদ্রা যাইতেছিলেন।" না ভাই! ও কথা গায়ে লাগিল না—আমরা আধুনিক স্বদেশী নহি—আমরা বনেদী স্বদেশী। প্রমাণ বড়বাজারেই সৈন্ধবের দোকানে বা চিনির আড়তে অবশ্য পাইবে। ফলকথা মহাজন বন্ধু—পিকেটিং করার দোষ গুণ, অন্য লেখকদের লেখার দোষ গুণ, আধুনিক স্বদেশীর দোষ গুণ, মজুরদের চারি পয়সা দিয়া পদ দলিত করিবার দোষ গুণ, রুষিয়ান নিহিলিষ্টদিগের দোষ গুণ, জাতীয় বিদ্যালয়ের দোষ গুণ,—আধুনিক বাতাসের সমস্ত দোষ গুণ আমার উপর চাপাইয়া, আমাকে মনস্বী বিশেষণে বিশেষিত করিয়া—তাহার পর যা মনে আসিয়াছে, তাহাই লিখিয়াছেন——ছি! এমন করিয়া কি বাদ প্রতিবাদ চলে? আর চলিবেও না।

বাঙ্গালার স্বাস্থ্যোন্নতি করা অগ্রে চাই।

কতবার বলিয়াছি, আবার বলি, সমস্ত বাজে কথা, আর কাজের কথা ফেলিয়া রাখিয়া, আমাদের বাঙ্গালিকে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের কথা ভাবিতে

হইবে, যাহার যতটুকু সাধ্য স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তাহাকে তত টুকু চেষ্টা করিতে হইবে। যে মহাপুরুষ, তিনি সন্ন্যাসী হৌন, গৃহী হৌন, হিন্দু হৌন, মুসলমান হৌন, বাঙ্গালি সাধারণের মন এ বিষয়ে লাগাইয়া দিতে পারিবেন, তিনিই বাঙ্গালির পরম বন্ধু। যিনি অন্য বিষয়ে বাঙ্গালিকে মন লাগাইতে উপদেশ দিবেন, তিনি বাঙ্গালির পরম শত্রু। আমরা অস্বাস্থ্য তরঙ্গে নিমজ্জমান হইতেছি, হাবু ডুবু খাইতেছি—অগ্রে আমাদের উদ্ধার সাধন কর, তাহার পর আমাদিগকে অন্য উপদেশ দিও। এই সম্বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালার মাসিক পত্র পর্য্যালোচনা করিলাম, কৈ এ কথার গুরুত্বের উপলব্ধি ত কোথাও দেখি না! সংবাদ পত্রও দেখিতেছি—কেবল অমৃত বাজারে কিছু থাকে, আর বাঙ্গালা কাগজে একটু আধটু থাকে—কিন্তু প্রাণের কথা, প্রাণ দিয়া লেখা ত দেখিতে পাই না। অমৃতবাজার বলেন, কলিকাতার লোকে জল কষ্ট বা জ্বর কষ্ট কিছুই বুঝে না সেই জন্য কিছুই লেখেন না। তবেই ত কলিকাতা আমাদের মাথা—মাথায় না লাগিলে মাথা ব্যথা হইবে কেন? কলিকাতার বড় লোকদের সাহায্য যদি না পাওয়া যায়, কংগ্রেস্ যদি এ বিষয়ে উদাসীনই থাকেন, শাসক সম্প্রদায়ও যদি পূর্ব্বের মত গয়ংগচ্ছ করেন,—আমরা, এই সামান্য মধ্য শ্রেণীর সম্প্রদায়,—আমরা আপনারা চেষ্টা করিয়া কিছু করিতে পারি না কি? নাই বা হইলাম রামমূর্ত্তির মত জোয়ান, সুরেন্দ্র বাবুর মত বক্তা, ডাক্তার ঘোষের মত আইনজ্ঞ, ঠাকুর কুমারের মত ধনশালী—আমরা এই সামান্য বিদ্যাবুদ্ধি বল বিত্ত লইয়া প্রতি জনে জনে চেষ্টা করিয়া, এক এক বিঘা ভূমির ভাল করিয়া জল নিকাশ করিয়া, এবং তাহার উপরিস্থ বন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, ভূমি রৌদ্রে খট্ খটে ও বিশুদ্ধ বায়ু পরিচালিত করিয়া রাখিতে পারিব না? কেন পারি না? আমরা বড় অলস। সেই আলস্য ঢাকিবার জন্য বলি, আমাদের দ্বারা কিছুই হইতে পারে না। বাস্তবিক একজনের মত, যদি দশ জন, শত জন, সহস্র জন মনে করে, তাহা হইলে, আপনার ও পরিবারদের স্বাস্থ্য রাখিতে গিয়া গ্রামের স্বাস্থ্য ভাল হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কয়খানি পুস্তক পুস্তিকা।

বৎসর ত জ্বালাইয়া পোড়াইয়া, হাসাইয়া কাঁদাইয়া চলিয়া গেল, বর্ষ শেষ করিয়া আমাদের কিন্তু বর্ষের হিসাব মিটাইতে হইতেছে। পূর্ব্বে সমালোচনা করা আমার একটা রোগ ছিল, এখনও দু একখানি গ্রন্থের সমালোচনা করি, সেই জন্যই হৌক, অথবা আমাকে কেহ কেহ ভালবাসার চক্ষে দেখেন, বলিয়াই হৌক, কোন কোন গ্রন্থকার আমাকে তাঁহাদের কৃত গ্রন্থ এখনও পাঠাইয়া দেন—আমি এমনি অলস পাষণ্ড, অনেক সময় সকলগুলি পড়িতেই পারি না, হয় ত একখানা পোষ্টকার্ডে প্রাপ্তি স্বীকার করাও হয় না। এখন কিন্তু বর্ষ শেষে মনে হইতেছে,—যে যেমন তেমন করিয়া একটা হিসাব মিটাইতে পারিলে ভাল হয়। ধ্রুবতারার সুদীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছি; কিন্তু গ্রন্থকারের ঋণ হইতে সমালোচনায় কি মুক্তি পাওয়া যায়? তা কিছুতেই যায় না—সেই জন্য বর্ষ শেষে আবার কিছু সুদ দিতেছি। ধ্রুবতারা '১৪ সালের গ্রন্থ' ১৫ সালে আমরা পাইয়া সমালোচনা করিয়াছি—এই ১৬ সালে সংস্কৃত সংস্করণ পাইয়া আমরা আনন্দ প্রকাশ করিবার অবসর পাইব, এমন আবদার রাখি।

১৩ সালের একখানি উপন্যাস, ১৫ সালে পাওয়া গিয়াছিল—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—বিদ্যাভূষণ প্রণীত নববোধন। গ্রন্থকার আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি গ্রন্থের উদ্দেশ্য বেশ বুঝিতে পারি নাই—সমালোচনা করিতেও পারিলাম না। ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার প্রণীত ও '১১ সালে প্রকাশিত 'মোগল বংশ' এবং '১২ সালে প্রকাশিত "রিয়াজউস্-সালাতিন" (অনুবাদ) এই দুইখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ আমাকে উপহার দিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন। আমি পারসী জানি না—আমা কর্ত্তৃক এই দুই গ্রন্থের সমালোচনা হওয়া অসম্ভব। তবে "মার গল্প করিতে কত আনন্দ!" এ কথা বুঝি—বলি, সার কথা লইয়া যত আন্দোলন হয়, ততই ভাল। এইরূপ আন্দোলনের সুযোগ দিয়াছেন বলিয়া আমরা গুপ্ত মহাশয়কে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি। আর ধন্যবাদ দিতেছি তাঁহার ১১ সালে লিখিত এই বৎসর প্রাপ্ত "হজরত মোহাম্মদ" নামক পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া ও পাঠ করিয়া।

অনেক সময় কেহ কোন বিষয়ে কথা কহেন না, সকলেই হয় ত প্রশংসা করেন, কাজেই কোনরূপ খট্‌কার কথা বলা আমি ঘোর বিপদ মনে করি। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের "ঠাকুর দাদার" ও "ঠাকুরমার ঝুলি" লইয়া আমি এইরূপ বিপদগ্রস্ত। এই দুই গ্রন্থে বাঙ্গালা শব্দ বানানের যে কোন নিয়ম আছে, আমি বুঝিতে পারি নাই। গ্রন্থকারের কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছিলাম, তাঁহার কথাও ভাল বুঝিতে পারি নাই। বানানে কত গোল তাহা কটকের শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় দেখাইয়া দিয়াছেন। ছেলেদের হাতে এই সকল পুস্তক দিতে হইবে, তাহারা দেখিবে, যে 'চক্ষে', 'চোক্ষে' 'চোখে'—ইত্যাদি সকল রকমই বানান চলে; তাহারা বানান শেখা একটা পণ্ডশ্রমের কার্য্য মনে করিবে। তাহার পর ভাষার কথা বলি:—"রাজা ঘিরিবন্ধী সারিবন্ধী করিয়া সোনার ঝালর চাঁদোয়া উঠাইলেন, চাঁদোয়ার নীচে ঘিয়ের অষ্টছত্রিশ বাতি দিলেন, ঢয় ঢুলী বাজা বাদ্যি, পাইক সিপাই দিয়া পাঁচ পাঁচ আগুণের কুণ্ড, একশ' এক গায়েনে গা'না—সারা রাত খাড়া-পাহরা, হুকুম দিলেন।"

'ঘিরিবন্ধী' কাহাকে বলে? 'অষ্টছত্রিশ' কি? 'ঢয় ঢুলি' কিরূপ ঢুলী? 'বাজা বাদ্যি' —'বাজা'—ক্রিয়া? না সংজ্ঞা? 'বাজা বাদ্যি' মানে —বাদ্য বাজাও? না—বাজনা বাদ্য?—'ঢয় ঢুলি, বাজা বাদ্যি—কিরূপে অন্বয় করিব? 'গায়েনের গা'না—এক 'গান' বলা চলে, নতুবা 'গাওনা' বলা চলে; 'গা' না' এ কিরূপ ভাষা? এইরূপ শত স্থলে, বোধ করি সহস্র স্থলে আছে। চারি ছত্র উদ্ধৃত করাতেই অবশ্য পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছে। কিন্তু কি করি বলুন? বড় বড় লোকে বলিতেছেন, এই গ্রন্থ গৃহে গৃহে বিরাজিত হৌক্—তাই শুনিয়া চুপ করিয়া থাকা কি ভাল? গ্রন্থদ্বয়ের কাগজ ভাল, ছাপা ভাল, ছবিগুলি খুব সুন্দর, কিন্তু এইরূপ ভাষা ও বানান সমেত এই পুস্তকখানি ছেলেদের হাতে যাওয়া ভাল কি? যদি না হয়, আর দুজন দশজনে সেই কথা মুখ ফুটিয়া বলুন। ছেলেদের মুখের দিকে তাকাইয়া, মাতৃ ভাষার মুখের দিকে তাকাইয়া, যাহা বলা উচিত তাহাই বলুন——ইহাই আমার বিনীত নিবেদন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম এ, ও দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রণীত

আর্য্যনারী প্রথম ভাগ—অতি উত্তম গ্রন্থ। ইহাতে পঁচিশটি নারী চরিত্র বিবৃত হইয়াছে। পাঠিকা মাত্রেরই ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য।

পূর্ণিমা আফিস হইতে দুইখানি কাব্য গ্রন্থ সমালোচনার জন্য আমার নিকট পাঠান হয়, আমার প্রথামত তুলিয়া রাখিয়াছিলাম। আজি ইচ্ছা পূর্ব্বক যখন হিসাব মিটাইতেছি, তখন সেই দুইখানি পুস্তকই বা কি অপরাধ করিল? শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় রচিত ১৩১০ সালে প্রকাশিত 'বেলা' আর তাঁহারই রচিত ১৩০৪ সালে প্রকাশিত 'পরিমল'। বাঙ্গালার মুদ্রাযন্ত্র গগণ হইতে অবিরল কবিতা বৃষ্টি হয়। কিন্তু এই 'বেলা' ও 'পরিমল' সেরূপ সাধারণ বর্ষার বৃষ্টি নহে; দাশরথি বলিয়াছেন;—

"তুলা রাশি মাসে, তিথি অমাবস্যে;
স্বাতি নক্ষত্রে, —যে বারি বরিষে,
সে বারি বরিষে কি বরিষার জলে?
কৃষ্ণের প্রেম কি পায় সকলে গো?
রাধার প্রেম কি পায় সকলে?

না, কৃষ্ণের প্রেমও সকলে পায় না; গিরিজানাথের মত অপূর্ব্ব কবিত্ব শক্তি ও ভাবের অভিব্যক্তি সকলে পায় না; আমাদের সৌভাগ্যে আমরা স্বাতি নক্ষত্রের জলের মত এইরূপ কাব্য পাইয়াছি।

একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থের পরিচয় দিয়া আমরা এই পালাতে একটি গাঁটি দিব। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গভাষার ঐকান্তিক সেবায় জীবন যাপন করিয়া আমাদের সকলেরই কাছে সমাদরের পাত্র হইয়াছেন। ১৩১৫ সালের প্রথমেই তিনি একখানি ক্ষুদ্র পদ্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন, নাম 'জড় ভরত'। প্রাচীন জরভরতের উপাখ্যান, অতি বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল, প্রসাদ-গুণে-পরিষ্কার বাঙ্গালা ভাষায় বিবরিত হইয়াছে। ভারতের প্রাণের কথা ইহাতে প্রাণের ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, গ্রন্থ ক্ষুদ্র—কিন্তু হীরার টুক্‌রা। সকলেরই একবার এই ক্ষুদ্র পুস্তক পড়িয়া দেখা কর্ত্তব্য।

মাসিক সমালোচনা।

প্রবাসী—চৈত্র পর্য্যন্ত। রাজসাহী কলেজের আরবীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল করীদ খাঁ, রাজশাহীর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে, "বঙ্গীয় মুসলমানদের মাতৃ ভাষা কি?" বিষয়ে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, চৈত্র সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। মৌলবী সাহেব নিজের উত্থাপিত প্রশ্নের অতি সদুত্তর দিয়াছেন। তিনি প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছেন—"সুতরাং বঙ্গীয় মুসলমান ছাত্রগণকে সর্ব্ব প্রথম কিছু বাঙ্গালা শিখাইয়া বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে আরবী ও ইংরাজী শিক্ষা দিলে, সময়ও অল্প লাগিবে, এবং আমার বিশ্বাস শিক্ষাও ভাল হইবে। একথাগুলি চিন্তাশীল মুসলমানগণ একটু বিবেচনা করিয়া দেখিবেন কি?" আমাদের বিশ্বাস মুসলমানগণ এই পরামর্শ গ্রহণ করিলে, ভাল করিবেন। প্রবন্ধ ও পরামর্শ সমীচীন। এই প্রবন্ধে লিখিত দুই একটি কথায়— দুই একটা কথা বলিব। এই 'কলম' কথাটা ধরুন। পার্শীতে কলম্ কথা আছে, থাকুক। কিন্তু এটা কি সংস্কৃত মূলক নহে। 'ক' শব্দে জল; যে জলে বা জলের ধারে খাড়া হইয়া, 'লম্ব' হইয়া উঠে, তাহার নাম 'কলম্ব' মানে 'শর'। শর মানে শর কাঠিও বটে, বাণও বটে। কলম্ব শব্দে শর কাঠিও বটে বাণও বটে। আর 'ক' শব্দে জল, যে জলে লম্বী হইয়া পড়িয়া থাকে —সে 'কলম্বী'—কল্‌মী শাক। এই শাকের ডাঁটা হইতে কলমীর কলম্ হয়। কলম্বর বা শরের এবং কলম্বীর বা কলমীর কলম্ দুই প্রচলিত আছে। এখনও কি বলিতে পারা যায় যে প্রাকৃত কলম্ শব্দ সংস্কৃত মূলক নহে; পারসী মূলক?

মানিকচাঁদের গানে দুই একটা মুসলমানি শব্দ দেখাইয়া, মৌলবী সাহেব ইঙ্গিতে বলিতেছেন, ঐ গান নিশ্চয়ই মুসলমানের বাঙ্গালা বিজয়ের পরে। একথাও ঠিক নহে। একটি খাঁটি হিন্দু গান মুসলমান মধ্যে প্রচলিত হইলে, তাহাতে যে দুই চারিটা মুসলমানি কথা মিলিয়া যাইবে না— এমন হইতে পারে না। আর কইতর শব্দ—সংস্কৃত মূলক, কপোত শব্দ হইতে আসিয়াছে। পুরাবিৎগণ মানিকচাঁদের ও গোবিন্দচাঁদের যে সময় নিরূপণ

করিয়াছেন, তাহা গানে দুইটা মুসলমানি শব্দ দেখাইয়া, খণ্ডিত হয় না।

বঙ্গদর্শন—ফাল্গুন। এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী লিখিত "সমালোচনা" প্রবন্ধ—সুদীর্ঘ, সুন্দর, শিক্ষা-প্রদ এবং উপদেশ পূর্ণ। এই প্রবন্ধ পাঠ করিতে সকলকেই অনুরোধ করি।

উপাসনা—পৌষ মাঘ। মাঘ মাসে মুদ্রারাক্ষসের সুদীর্ঘ সমালোচনা, বোধ করি, শেষ হইল। সমালোচনা সমীচীন। তবে মুদ্রারাক্ষসের সময় নির্ণয় করিতে গিয়া, লেখক অনর্থক একটু অধিক পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন; যাউক তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু শকুন্তলার নিন্দাকল্পে, উপসংহারে যে একটা কথা বলিয়াছেন, তাহা না বলিলেও চলিত। "অভিজ্ঞান শকুন্তল প্রভৃতি আদিরস পূর্ণ নাটকাপেক্ষায় নীতি প্রধান বীররস পূর্ণ নাটকের অধ্যা-পনা যে সমীচীন এবং মঙ্গলকর তাহা হয় ত অনেকেই স্বীকার করিবেন"। গেটে এবং রবীন্দ্র নাথ—তোমরা এইবার রসাতলে যাও।

ভারতী—ফাল্গুন ও চৈত্র। ভারতী আগামী বর্ষ হইতে বর্দ্ধিত গৌরবে প্রকাশিত হইবে। তাহাই হৌক। যে কথা কোন মাসিক পত্রে প্রায় খুঁজিয়া পাই না—তাহা চৈত্রের ভারতীতে পাইয়াছি। "প্রজার স্বাস্থ্য ও রাজা"। ভারতী বলিতেছেন "আজি পঞ্চাশ বৎসরের অধিক বঙ্গদেশ ম্যালেরিয়া প্রকোপে পীড়িত। এই কারণে দেশের কত গ্রাম পরিত্যক্ত, কতজনপদ জনহীন এবং সমগ্র জাতি রুগ্ন, দুর্ব্বল ও নির্জ্জীব। কিন্তু এতকাল গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার অবসর লাভ করেন নাই।" তাহার পর লালগোলার রাজা যে মুর্শিদাবাদ জেলার অস্বাস্থ্যকর স্থান সকলের উন্নতির জন্য লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ আছে। পরিশেষে ভারতী উপসংহার করিতেছেন—"আমাদের প্রার্থনা, যে গবর্ণমেণ্ট এখনও এ কর্ত্তব্য সাধনে মনোযোগী হউন, এবং তাঁহাদের উপেক্ষার ফলে অকারণ প্রজানাশ নিবারণ করুন।"

বামাবোধিনী—ফাল্গুন পর্য্যন্ত। ফাল্গুন সংখ্যায় যে "এই সেই" গল্পটি শেষ করা হইয়াছে, সেটি ইংরাজীতে কবি পার্ণেলের লিখিত সন্ন্যাসীর উপা-খ্যান অবলম্বনে; একটু বাড়াইয়া লিখিত। বাড়াইয়া ভাল হইয়াছে কি?

পন্থা—মাঘ পর্য্যন্ত। পন্থায় প্রায় একটি করিয়া অলৌকিক ঘটনা থাকে;

কিন্তু গল্পগুলি তেমন শিক্ষাপ্রদ হয় না। প্রবাদ কথা ও সেইগুলির সংস্কৃতানুবাদ, ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতেছে, এগুলি বেশ:—আপন নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ। ছিত্বা স্বনাসামন্যস্য যাত্রাভঙ্গো বিধীয়তে। জন জামাই জমিদার—এ তিন নহে আপনার। এতে ত্রায়া নচাত্মীয়া, জামাতা জ্যাপতি র্যমঃ।

জাহ্নবী—ফাল্গুন পর্য্যন্ত। জাহ্নবী, কেন বলিতে পারি না, এবৎসর বড় পিছাইয়া পড়িয়াছিল; এখন যে শুধরাইয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। পৌষের জাহ্নবীতে 'শব্দ সিন্ধু' অভিধানের পরিচয় পাইয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। 'বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রচলিত দেশজ, আরবী, পারসী, উর্দ্দু, হিন্দী, পোর্টুগিজ, ডেনিস্, ফ্রেঞ্চ, ইংরাজি প্রভৃতি যাবতীয় শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ, প্রকৃতি, প্রত্যয়, অর্থ, শিষ্ট প্রয়োগ সম্বলিত বাঙ্গালা অভিধান; শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ সঙ্কলিত। প্রকাশক মেসার্স বি ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং। মূল্য ১।০।" পাঁচ সিকায় যে এমন একখানি অভিধান পাওয়া যায় তাহা শুনিলেও আহ্লাদ হয়। প্রবন্ধে এই অভিনব অভিধানের সমালোচনা ও পরিচয় দেওয়া আছে। অধুনা অপ্রচলিত শব্দের পরিচয়ে—'ওতু' শব্দ দেওয়া হইয়াছে। অর্থ বিড়াল। আমরা জানি বিড়াল অর্থে ওতু শব্দ সংস্কৃত— তবে আবার অধুনা অপ্রচলিত কি? টিটি—প্রচারিত পরিজ্ঞাত। সমালোচক বলিতেছেন কথাটি খারাপ অর্থেই ব্যবহৃত হয়—Famous নহে Notorious। আমরা বলি, তাহা নহে। ভাল মন্দ দুই অর্থেই ব্যবহার হইতে আমরা অনেক বার শুনিয়াছি। গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজ মহাশয় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া বৃহৎ সরোবর কাটাইয়া দেন। 'চারিদিকে টিটী পড়িয়া গেল।' অর্থাৎ চারিদিকে তাঁহার যশঃ ঘোষিত হইল। 'টিটী' বোধ করি 'ডিণ্ডিম' শব্দ হইতে।

উদ্বোধন—চৈত্র পর্য্যন্ত। উদ্বোধনে শান্তি সুধা নাম দিয়া, পরমহংস দেবের জীবনী পদ্যে প্রকাশিত হইতেছে। শান্তিসুধাই বটে। চৈত্র সংখ্যায় 'আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার প্রতিকার'—প্রবন্ধ ভাল। উপসংহারে লিখিয়াছেন "মনে কখন স্থান দিওনা ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে ঋষির বংশধরগণ ভগবানের কৃপাবঞ্চিত।"—এই কথাই কথা।

হিন্দুপত্রিকা। বড় পিছাইয়া আছে। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণের সংখ্যা মাত্র পাওয়া গিয়াছে—ইহা কি নামের গুণে?

সাহিত্যসংহিতা—পৌষ ও মাঘ। মাঘ সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ "বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপির উৎপত্তি।" প্রবন্ধ গবেষণাপূর্ণ বটে তবে "ললিত বিস্তর" এবং 'মহাবস্তু অবদান' নামক আর একখানি গ্রন্থোক্ত বঙ্গলিপির কথা উদ্ধৃত করা হয় নাই। কেন ঐ দুই গ্রন্থের প্রামাণিকতা কি কিছুমাত্র নাই? বুদ্ধদেব আচার্য্যকে বলিতেছেন "কতমাং ভো উপাধ্যায়! লিপিং মে শিক্ষয়িষ্যসি? ব্রাহ্মীং ক্ষরোষ্ট্রীং পুষ্করাসারীং অঙ্গলিপিং বঙ্গলিপিং মগধ-লিপিং মাঙ্গল্যলিপিং (এইরূপ চৌষট্টিলিপি) * * ভো উপাধ্যায় চতুঃষষ্টি লিপীনাং কতমাং লিপিং মাং ত্বং শিক্ষয়িষ্যসি?——ললিত বিস্তর। যা ইমা লোকে সংজ্ঞা ব্রাহ্মী, পুষ্করকারী, খরোষ্ঠী (ইত্যাদি ইত্যাদি) * * * মাধুর—দরদ—চীন—হূন—পীরা, বঙ্গা, অঙ্গা, দ্রাবিড়া সীহলা (ইত্যাদি ইত্যাদি) * * * সর্ব্বা এষা বোধিসত্ত্বানাং নীতি, মহাবস্তু অবদান বঙ্গলিপির উৎপত্তির কথা ভাবিতে হইলে, এ সকলেরও বিচার আবশ্যক।

পল্লীচিত্র—মাঘ। পল্লীচিত্রের আমরা যে শুভানুধ্যায়ী তাহা পূর্ব্বেই প্রকাশ পাইয়াছে। ছোট গল্পটি "বন্ধুত্ব ও দাম্পত্য" বেশ সুন্দর লেখা, পড়িতে পড়িতে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। লেখক বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ সুলেখক, সম্পাদকের "কাজের কথাও" বেশ। "নাগানন্দ" নাটকের বিশ্লেষণও ভাল।

বিদ্যোদয়ও বড় পিছাইয়া আছে। হাম্‌লেট্ চরিতম্ বেশ চলিতেছে।

স্বদেশী—মাঘ। স্বদেশীতে দেখিতেছি—শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'মা বা আহুতি' নামে একখানি গীতি কাব্যের একটু তীব্র সমালোচনা আছে। সমালোচক কতকগুলি বিকৃতি দেখাইয়া উপসংহার করিতেছেন, "কবিতা লিখিতে বসিলেই যে ভাষা ভাব প্রভৃতির আদ্য শ্রাদ্ধ করিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই; অক্ষম লেখকেরাই এইরূপ করিয়া থাকে। দক্ষিণারঞ্জন বাবুর লেখনীমুখে এই সকল প্রকটিত হইতে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম।" দুঃখ নয়? এমন গুণী লোকের এমন অবহেলা দেখিলে বাস্তবিক বড় দুঃখই হয়।

আর্য্য বিভূতি। ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা—আমি যেন এই প্রথম দেখিতেছি। এবার এই প্রাপ্তি স্বীকার পর্য্যন্ত।

ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। নূতন কল্প ষষ্ঠ খণ্ড—অথচ সপ্তম বর্ষ। তাহার পর লেখা আছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (তৃতীয়) সংস্করণ। তস্য ভক্ত সাধু উমেশচন্দ্র দত্তের জীবন কীর্ত্তন। তাহার পর ধর্ম্মক্ষেত্র ও কর্ম্মক্ষেত্রের চিত্র আছে। মাঝে কল্প বৃক্ষ আছে। আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি না।

ভারত মহিলা। পূর্ব্বে পূর্ণিমারই আসিতেছিল; এবার একখানা নূতন বর্ষের ভারত মহিলা, আমার নামে আসিয়াছে। নূতন বর্ষে ভারত মহিলার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে বটে কিন্তু সেকথা এখন এখানে নয়।

কৃষক—ফাল্গুন পর্য্যন্ত দেখিতেছি বটে; কিন্তু এখানি পূর্ণিমারও নহে আমারও নহে। সুতরাং এই পর্য্যন্ত।

কদমতলা, চুঁচুড়া। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

কাব্য কথা—or Studies in Literature.

শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন এম এ প্রণীত।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায় :—

(১) মেসার্স এস্, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং
৫৪নং কলেজষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

(২) শ্রীযুক্ত হিমাংশুশেখর রায়—
৫৫নং কলুটোলাষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

(৩) শ্রীহরিনাথ রায়—কুঠীবাড়ী, কলিকাতা।